বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

প্রথম ভাগ।

(ইংরেজ প্রভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।)

" নানান্ দেশের নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ?"

নিধুবাবু।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, প্রণীত।

শ্রীহেমচন্দ্র সেন বি, এ, প্রকাশিত।

PRINTED BY GOPAL CHANDRA DAS.
AT THE CHAITANYA PRESS
Comilla.

উৎসর্গ-পত্র।

অশেষ গুণ-সম্পন্ন চন্দ্রবংশাবতংশ প্রজারঞ্জক

স্বাধীন-ত্রিপুরার শ্রীশ্রীমন্মহারাজ

বীরচন্দ্রমাণিক্য দেব-বর্ম্মণ বাহাদুরের

শ্রীশ্রীচরণ কমলে,—

ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ

এই সামান্য পুস্তক

উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার।

Printed By Gopal Chandra Das
At The Chaitanya Press
Comilla

উৎসর্গ-পত্র।

অশেষ গুণ-সম্পন্ন চন্দ্রবংশাবতংশ প্রজারঞ্জক

স্বাধীন-ত্রিপুরার শ্রীশ্রীমন্মহারাজ

বীরচন্দ্রমাণিক্য দেব-বর্ম্মণ বাহাদুরের

শ্রীশ্রীচরণ কমলে,—

ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ

এই সামান্য পুস্তক

উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

বঙ্গভাষার উৎপত্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গলা।

তৃতীয় অধ্যায়।

পাশ্চাত্যমত। বিভক্তি চিহ্ন ও ছন্দ।

চতুর্থ অধ্যায়।

(১) মাণিক চাঁদের গান। (২) ডাক ও খনার বচন।

ও খনার বচন।৮ মাণিকচাঁদের গান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা, প্রক্ষিপ্ত অংশগুলির বিচার, বৌদ্ধাধিকারের নিদর্শন, মাণিকচাঁদের সময় নির্দ্ধারণ, কবিত্বের নমুনা। ডাক ও খনার বচন, বৌদ্ধাধিকারের প্রভাব;—ডাক ও খনার ঐতিহাসিকত্ব, ডাকের বচন ও খনার বচনে প্রভেদ। বর্ণিত বিষয় সমালোচন, জ্যোতিষের প্রতি অতিরিক্ত আস্থা, বৌদ্ধাধিকারে অপ্রচলিত শব্দের বিস্তৃত তালিকা। এই সময়ের বঙ্গভাষা সংস্কৃতের প্রভাব বর্জ্জিত, উদাহরণ; সামাজিক আচার ব্যবহার, 'সাদিনা', 'দশা', 'ত্রিশা' প্রভৃতি আচারের উল্লেখ।

পঞ্চম অধ্যায়।

(১) ধর্ম্মকলহে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। (২) প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ।

(৪৯—৬৩ পৃঃ)।

নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম সমর্থন জন্য ভাষায় তাঁহাদের মাহাত্ম্য প্রচারের প্রয়োজন, ও তদুপলক্ষে মনসা, চণ্ডী, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেব দেবীগণের গীতি প্রচার,—শাস্ত্র চর্চ্চার প্রভাব ও নিম্নশ্রেণীতে শাস্ত্র জ্ঞানের বিস্তার; হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে ব্রাহ্মণ্য শক্তি প্রচারিত হইলেও ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই ধর্ম্মের নায়ক হইতে পারেন নাই, উদাহরণ। এই ধর্ম্মকলহে বৈষ্ণবগণের নেতৃত্ব, বৈষ্ণবগণের প্রতি নানারূপ বিরুদ্ধতা সত্বেও তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার ও তাঁহাদের দ্বারা বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ,—ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে প্রভেদ, বঙ্গীয় প্রাচীন লেখকগণের অনুকরণ বৃত্তি, তৎসম্বন্ধে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে বহুবিধ উদাহরণ। সমগ্র কাব্য অনুকরণের চেষ্টার সঙ্গে অংশ বিশেষের অনুকরণের উদাহরণ। এই অনুকরণ বৃত্তির দোষ ও গুণ। বৈষ্ণব সাহিত্যে স্বাধীনতার নব বিকাশ ও তদুপলক্ষে জয়দেব, জ্ঞানদাস এবং কৃষ্ণকমল প্রভৃতি কবিগণের রচনা হইতে দৃষ্টান্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গৌড়ীয়যুগ অথবা শ্রীচৈতন্য পূর্ব্ব সাহিত্য।

(১) পঞ্চগৌড়। (২) অনুবাদশাখা। (৩) লৌকিক ধর্ম্মশাখা। (৪) পদাবলীশাখা (৫) কাব্যেতিহাসের সূত্রপাত শাখা।

(৬৪—১২৭ পৃঃ)।

পঞ্চগৌড়ের প্রসঙ্গ, ও বঙ্গসাহিত্য হইতে পঞ্চগৌড়ের গৌরবের উদাহরণ। গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহে বঙ্গভাষা সর্ব্ব প্রথম পুষ্ট হয়। কৃত্তিবাসের আত্ম বিবরণ। কৃত্তিবাসের রামায়ণের সঙ্গে প্রক্ষিপ্ত অংশের যোজনা। বটতলার মুদ্রিত রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূলতঃ প্রভেদ। (এই সম্বন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে ২৯৯ পৃষ্ঠা ও দ্রষ্টব্য)। কৃত্তিবাসের রামায়ণের সমালোচনা। কৃত্তিবাসী রামায়ণের উপর শেষ সময়ের কবিগণের হস্তক্ষেপ জনিত পরিবর্ত্তনকে বিকৃতি বলা যায় কি না। মহাভারতের অনুবাদ প্রসঙ্গ। সঞ্জয় কৃত মহাভারত। সঞ্জয়ের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। সঞ্জয়ের মহাভারত হইতে কবিত্বের দৃষ্টান্ত। কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দীর মহাভারত। হুসেন সাহার প্রসঙ্গ, পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্রের মহাভারতের

অনুবাদে হস্তক্ষেপ। কবীন্দ্রের মহাভারত হইতে রচনার দৃষ্টান্ত। ছুটি খাঁর আদেশে রচিত অশ্বমেধ পর্ব্ব; কবি শ্রীকর নন্দী কৃত সেই সময়ের সামান্য রূপ একটু ঐতিহাসিক বিবরণযুক্ত অবতরণিকা। শ্রীকর নন্দীর কবিত্বের দৃষ্টান্ত। সঞ্জয় কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের মহাভারত জৈমিনী ভারত দৃষ্টে সঙ্কলিত। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, মালাধর বসুর বৃত্তান্ত, মূলের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের তুলনা, ও শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের কবিত্বের সমালোচনা। লৌকিক ধর্ম্ম প্রসঙ্গ, লৌকিক দেবতা মনসা, চণ্ডী, সত্যনারায়ণ, দক্ষিণের রায় প্রভৃতির পূজা প্রচারের প্রয়োজন। মনসা পূজার প্রসঙ্গ। চাঁদ সদাগর, বেহুলা ও মনসার চরিত্র সমালোচনা। কাণা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব প্রভৃতি মনসামঙ্গল রচক কবিগণের বিস্তৃত প্রসঙ্গ। মনসার গীতের বিষয়ের ঐতিহাসিকত্ব। চণ্ডীর পাঁচালী লেখক কবি জনার্দ্দনের প্রসঙ্গ। রতিদেব কৃত মৃগলব্ধের বিষয়। পদাবলীশাখা। বাঙ্গালী কবিগণের পদাবলী রচনায় শ্রেষ্ঠত্ব—পদাবলীর বিষয়। বিদ্যাপতি, বিদ্যাপতির জীবনী। মিথিলার সহিত বঙ্গদেশের সম্বন্ধ। বিদ্যাপতির কবিত্বের সমালোচনা। বিদ্যাপতির প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাঁহার তুলনা। চণ্ডীদাস, ও তাঁহার পদ সমালোচনা। কাব্যেতিহাসের সূত্রপাত শাখা, শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের প্রসঙ্গ, খেলারাম কবির ধর্ম্মমঙ্গল। রাজমালা।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

(১২৮—১৪৬ পৃঃ)।

ষষ্ঠ অধ্যায়োক্ত কবিগণের সময় নির্দ্দেশ সহিত সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ। প্রাচীন কবিগণের স্বপ্ন কিম্বা দৈব বরের ভাণ করিয়া কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপপ্রথা, বৈষ্ণব কবিগণের সততা। পঞ্চগৌড়ের পরস্পর সম্বন্ধ পূর্ব্বে বেশী ঘনিষ্ঠ ছিল ভাষা ও সাহিত্যে নির্দ্দিষ্ট আচার ব্যবহার হইতে তাহার উদাহরণ। পূর্ব্ববঙ্গ ও প্রাচীন বঙ্গের ভাষাগত পার্থক্য ও তৎসম্বন্ধে সূত্র-সঙ্কলনের চেষ্টা। সংস্কৃতের প্রভাবের নিদর্শন। গৌড়ীয়যুগ অধ্যায়ের অপ্রচলিত ও দুরূহ শব্দের বিস্তৃত তালিকা। বিভক্তি ক্রিয়া ও ছন্দাদি সম্বন্ধে আলোচনা। পরিচ্ছদ, আচার, ব্যবহার, বাণিজ্য ইত্যাদির প্রসঙ্গ।

"শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য" যুগের পূর্ব্বাভাস; বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের জয়, চণ্ডীদাসের নির্ভীক প্রেমের কথা। শ্রীচৈতন্য প্রভুর প্রসঙ্গ।

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীচৈতন্য সাহিত্য বা নবদ্বীপের ১ম যুগ।

(১) শ্রীচৈতন্য দেব ও এই যুগের সাহিত্য, (২) শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন, (৩) পদাবলীশাখা, (৪) চরিতশাখা।

(১৪৭—২১৯ পৃঃ)।

চণ্ডীদাসের গানে শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বাভাস। পদাবলীর সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের সম্বন্ধ। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন, তাঁহার আবির্ভাবের সময় নবদ্বীপের অবস্থা, ভক্তির প্রচার,

ভিন্ন ভিন্ন দেশী অপরাপর বৈষ্ণবগণের উল্লেখ, শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের কৃতকার্য্যতার মূল কারণ। জন্ম ও শৈশব, শৈশবের চাপল্য। নিমাই ছাত্র ও নিমাই অধ্যাপক। গদাধর, ঈশ্বরপুরী ও শ্রীহট্টবাসীগণের সঙ্গে চাপল্য। দিগ্বিজয়ী জয়। নিমাইর চরিত্রে ভক্তির পূর্ব্বাভাস, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, গয়ায় গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন, ভক্তির বিহ্বলতা। শ্রীচৈতন্য দেবের প্রতি লোকবৃন্দের অনুরাগ। তাঁহার জীবনে ধর্ম্মনীতি, কোমলতা ও কঠোরতার সংমিশ্রণ। সোহং। শ্রীচৈতন্যদেবের বিনয়। সমাজে শ্রীচৈতন্যদেব কৃত নব জীবন প্রতিষ্ঠা। বঙ্গসাহিত্যে চরিতাখ্যানের সৃষ্টি। পদাবলী সাহিত্য। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃত বৈষ্ণব কবিগণের নাম ও পদ সংখ্যার তালিকা। মৎ সংগৃহীত অতিরিক্ত তালিকা। একাধিক ব্যক্তির এক নাম ও তদন্তে দাস শব্দ গ্রহণে পরিচয়ে বিঘ্ন, এই প্রসঙ্গে 'গোবিন্দ দাস' 'বলরাম দাস', 'যদুনন্দন দাস', 'নরহরি দাস' প্রভৃতি এক নামে অভিহিত ভিন্ন ভিন্ন কবিগণের পরিচয়ের চেষ্টা। নয়জন মুসলমান বৈষ্ণব কবির নাম। গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, যদুনন্দন, পুরুষোত্তম (প্রেমদাস) গৌরীদাস, নরহরি সরকার, বসু রামানন্দ, রায় রামানন্দ, ঘনশ্যাম, বংশীবদন ঠাকুর, চৈতন্য দাস, পরমেশ্বর দাস, বীর হাম্বীর, নৃসিংহ দেব, মাধবী প্রভৃতি বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। বৈষ্ণব কবিগণের পদের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতি কবিগণের তুলনায় সমালোচন। পদ সংগ্রহ সমূহের প্রসঙ্গ, বাবা আউল মনোহর দাস কৃত, পদ সমুদ্র। বৈষ্ণব দাস (কাহারও কাহার মতে এই ব্যক্তির নাম গোকুলচন্দ্র সেন) কৃত পদকল্পতরু। অপরাপর পদ সংগ্রহ ও তৎ সঙ্কলন কর্ত্তাদিগের নাম। পদকল্পতরু সম্বন্ধে আলোচনা। যে প্রণালীতে পদের যোজনা করা হইয়াছে, তাহার সমালোচনা ও উদাহরণ স্বরূপ পদকল্পলতিকা হইতে এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন। পদাবলী সাহিত্য সম্বন্ধে শেষ কথা। চরিতশাখা। গোবিন্দ দাসের করচা ইত্যাদি। চরিতশাখা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা। গোবিন্দ দাসের করচার সমালোচনা, মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের প্রসঙ্গ এবং ফুটনোটে আধুনিক মানচিত্রোল্লিখিত স্থান সমূহের সঙ্গে চৈতন্যদেব অনুসৃত পথের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, গ্রন্থকারের বিবরণ ও উক্ত পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচন। লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল। গ্রন্থকারের বিবরণ ও চৈতন্যমঙ্গলের বিস্তৃত সমালোচনা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্য চরিতামৃত। গ্রন্থকারের বিবরণ ও চৈতন্য চরিতামৃতের বিস্তৃত সমালোচন। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পরিচয়। তদ্রচিত ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা। রূপ গোস্বামীর বংশাবলী। অপরাপর বৈষ্ণব মহাজনের সংক্ষিপ্ত চরিত। ভক্তিরত্নাকরের সমালোচনা, তৎ প্রসঙ্গে বৈষ্ণব চরিতাখ্যান সমূহের লক্ষ্য সম্বন্ধে মন্তব্য। ভক্তিরত্নাকরের অধ্যায় বিভাগ ও গ্রন্থোক্ত বিষয়ের আলোচনা। নরহরি চক্রবর্ত্তী রচিত অপরাপর পুস্তকের নাম, নরোত্তম বিলাসের বর্ণিত বিষয় ও তৎসমালোচন। নরহরির ইতিহাস [illegible] নিদর্শন। 'গৌরচরিত চিন্তামণি' হইতে কবিত্বের দৃষ্টান্ত। নিত্যানন্দ দাস কৃত প্রেম বিলাসের সমালোচনা। রচনার নমুনা প্রদর্শন। যদুনন্দন দাস কৃত 'কর্ণামৃত',

প্রেমদাস (পুরুষোত্তম) রচিত বংশীশিক্ষা, ও চৈতন্যচন্দ্রোদয়, জগজ্জীবন মিশ্র প্রণীত মনঃসন্তোষিণী, মহাপ্রসাদ বৈভব, ও বৈষ্ণবাচার দর্পণ প্রভৃতি পুস্তকের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ।

৭ম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

(২১৯—২৪১ পৃঃ)।

আগর দাসের শিষ্য নাভাজী রচিত ভক্তমালের কৃষ্ণদাস বাবাজি কৃত বঙ্গানুবাদের সমালোচনা। মাধবাচার্য্য বিরচিত ভাগবতের অনুবাদ। মাধবাচার্য্যের পরিচয়। লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস রচিত ভাগবতের অনুবাদ। লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের পরিচয়। লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের "অদ্বৈত সূত্র করচা।" ঈশান নাগর প্রণীত "অদ্বৈত প্রকাশ।" যদুনন্দন দাস কৃত গোবিন্দলীলামৃত। যদুনন্দন দাস কৃত অপরাপর অনুবাদ পুস্তকের উল্লেখ। নরোত্তম দাসের প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, সাধনভক্তি চন্দ্রিকা, হাটপত্তন প্রভৃতি পুস্তকের উল্লেখ। বিবর্ত্ত বিলাসের প্রসঙ্গ। বৈষ্ণব গ্রন্থগুলির আদর্শের ঐক্য। বঙ্গভাষায় হিন্দীর প্রভাব। গোবিন্দ দাসের মৈথিলভাষা অনুকরণ। শ্রীহট্টের সত্যরাম কবির রচনা হইতে দৃষ্টান্ত সঙ্কলন। চরিত-সাহিত্যে হিন্দীর প্রভাব। চরিতাখ্যান সমূহে নানারূপ ভাষার মিশ্রণ, চৈতন্য চরিতামৃতের মিশ্র ভাষার দৃষ্টান্ত। বঙ্গসাহিত্যে উর্দ্দু, সংস্কৃত, ও খাটি বাঙ্গলা এই তিন শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বঙ্গভাষার 'প্রাকৃত' অভিধান। এই যুগের অপ্রচলিত ও ভিন্নার্থে ব্যবহৃত শব্দের তালিকা। ছন্দ ও বিভক্তি বিচার। সমাজের অবস্থা। শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের কলহ। অবতার বাদের প্রচার। বৈষ্ণবগণের ক্রমশঃ বিলাসের প্রতি রুচিপ্রবণতা। শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের প্রসঙ্গ। শ্রীনিবাসের জীবনের প্রথম ভাগের উন্নত ভক্তি বিহ্বলতা, কিন্তু পরে কিঞ্চিৎ অবনতি। জাহ্নবীদেবীর বিষয়। বৈষ্ণব সমাজের সংস্কারের অবনতি। সমাজের অপরদিকের দুর্গতি। নরহত্যা প্রভৃতি ব্যভিচার। এই সময়ের বাজার দর। বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারের খরচ. এই সম্বন্ধে চৈতন্যপ্রভুর বিবাহের প্রসঙ্গ। সেকেলে নামের সঙ্গে অসঙ্গত উপাধির যোজনা। রাজনৈতিক অবস্থা, দস্যুগণের প্রাদুর্ভাব ও বিখ্যাত দস্যুগণের নাম। মৈথিল শব্দগুলির কতকটির অর্থযুক্ত তালিকা। বাঙ্গলা ভাষার উপর হিন্দীর স্থায়ী চিহ্ন। বৈষ্ণবগণের 'শ্রী' শব্দ প্রিয়তা। বৈষ্ণবগণের শিরোমুণ্ডনের সমালোচনা। বৌদ্ধগণের প্রভাবের শেষ চিহ্ন। সুবুদ্ধি রায়ের বিষয়। বৈষ্ণবযুগের সম্বন্ধে শেষ কথা। সংস্কারযুগের প্রসঙ্গ।

অষ্টম অধ্যায়।

সংস্কারযুগ। (১) লৌকিক ধর্ম্মশাখা। (২) অনুবাদশাখা।

(২৪১—৩১৭ পৃঃ)।

সংস্কারযুগ কেন বলি? প্রাচীন কাব্যগুলির অনুকরণ। এই অনুকরণ সর্ব্বত্রই চৌর্য্য আখ্যায় বাচ্য কি না? লৌকিক ধর্ম্মশাখা। মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি ও ঘনরাম। বলরামের চণ্ডীকাব্য। মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম

এই দুই কবিকে তুলনায় সমালোচন। মাধবাচার্য্যের রচনার স্বাভাবিকত্ব। মাধবাচার্য্যের রচিত বৈষ্ণবপদ। মাধবাচার্য্যের যুদ্ধ বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের যুদ্ধ বর্ণনার পূর্ব্বাভাস। কবিকঙ্কণের সময় দেশের অবস্থা, মুসলমানগণের অত্যাচার, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে নানা স্থান হইতে দৃষ্টান্ত সঙ্কলন। প্রচলিত মুসলমানী শব্দ দ্বারা সমাজের অবস্থা প্রদর্শন। মুকুন্দ রামের পরিচয়। চণ্ডীকাব্যের সময় নির্দ্ধারণ। মুকুন্দ রামের ভ্রাতাগণের প্রসঙ্গ। চণ্ডীকাব্যের সমালোচনা। কবিকঙ্কণের মনুষ্য চরিত্রে অন্তর্দৃষ্টি। তাঁহার রচনায় পুরুষ চরিত্রের খর্ব্বতা। ঘটনার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠ কাব্যোচিত মূল কেন্দ্রের অভাব। কালকেতুর গল্প, শৈশব, বিবাহ, পশুগণের সঙ্গে দ্বন্দ, চণ্ডীর পশুগণকে আশ্রয় প্রদান। কালকেতুর সুবর্ণ গোধিকা আনয়ন; ফুল্লরার সন্দেহজনিত কষ্ট, স্বামীকে ভৎসন, ভগবতীর স্বরূপ গ্রহণ, কালকেতুর রাজা হওয়া ও কলিঙ্গাধিপতির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়। কলিঙ্গাধিপতির সঙ্গে মিত্রতা। কালকেতু ও ফুল্লরার স্বর্গারোহণ। ভাড়ু দত্তের বিস্তৃত বিবরণ। শ্রীমন্তের গল্প। ধনপতি সদাগরের পায়রা উড়ান। খুল্লনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পূর্ব্বরাগ। খুল্লনার সঙ্গে বিবাহ, লহনাকে প্রবোধ প্রদান। খুল্লনার প্রতি লহনার স্নেহ। দুই সতিনে কলহ। খুল্লনার ছাগ রক্ষণ। বনের শোভা দেখিয়া খুল্লনার বিরহ। চণ্ডীর কৃপা। ধনপতির প্রত্যাগমন। ধনপতি ও খুল্লনার মিলন। খুল্লনার পরীক্ষা। ধনপতির সিংহল গমন, কমলে কামিনী দর্শন ও কারাবাস। শ্রীমন্তের বাল্যকাল। শ্রীমন্তের সিংহল গমন। সিংহলে কষ্ট। শ্রীমন্তের মশান। সুশীলার বারমাস্যা। পিতা পুত্রের দেশে প্রত্যাগমন। শ্রীমন্তের দেশীয় রাজার কন্যাকে বিবাহ। স্বর্গারোহণ। মুকুন্দরামের শিব বিবাহাদির বর্ণনা ও তৎপ্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তুলনা। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পরিচয়, তৎপ্রণীত শিব সংকীর্ত্তনের সমালোচনা। সত্যপীরোপাখ্যান। কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি ৩১ জন মনসার ভাসান রচক কবি। বেহুলার চরিত্র। কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দের যৎ সামান্য পরিচয়। বর্দ্ধমান দাসের কবিত্বের নমুনা। ঘনরাম। ময়ুর ভট্ট, খেলারাম ও রূপ রামের ধর্ম্মমঙ্গল। ঘনরামের পরিচয়। ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের বিস্তৃত সমালোচনা। অনুবাদশাখা। (ক) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানাদি। (খ) রামায়ণ ও মহাভারতাদি। সংস্কৃতের অনুকরণ চেষ্টা। সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ পুস্তক, তৎপ্রসঙ্গে দ্বিজ কংসারি প্রণীত প্রহ্লাদ চরিত্র, পরীক্ষিত সম্বাদ, লোকনাথ দত্ত প্রণীত নৈষধ, দ্বিজ মুকুন্দ প্রণীত ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যান, রাজারাম দত্ত-প্রণীত দণ্ডীপর্ব্ব, মধুসূদন নাপিত প্রণীত নল দময়ন্তী, দ্বিজ ভবানন্দ প্রণীত হরিবংশ, অনন্তরাম দত্ত রচিত ক্রিয়াযোগসার, বিবিধ লেখক সংকলিত রঘুবংশের অনুবাদ, গরুড় পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি অনুবাদ পুস্তকের উল্লেখ। এইসব কবির রচনা হইতে কবিত্বের দৃষ্টান্ত। মধুসূদন নাপিত রচিত নল দময়ন্তীর সমালোচনা। দণ্ডী কাব্যের বিষয় ও অনন্তরাম দত্ত প্রণীত ক্রিয়াযোগসারের প্রসঙ্গ। ঘোষাল বংশীয় রাজা জয়নারায়ণ রচিত কাশীখণ্ডের অনুবাদের বিস্তৃত সমালোচনা। প্রেমানন্দ দাস লেখকের বিষয়। রামায়ণ ও মহাভারতাদির অনুবাদ। কৃত্তিবাসের রামায়ণে পরবর্ত্তী যোজনা। ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস

সেনের রচিত রামায়ণ। ভবানীদাস বিরচিত লক্ষ্মণদিগ্বিজয়। দ্বিজ দুর্গারাম প্রণীত রামায়ণ। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ। জগৎরাম রায়ের রামায়ণ। রামমোহনের রামায়ণ। রঘুনন্দন-গোস্বামী রচিত রামরসায়ণ। মহাভারত। মহাভারতে গল্পের বাহুল্য ও যোজনার সুবিধা। পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারত রচকগণের পরে রাজেন্দ্রদাস কৃত শকুন্তলোপাখ্যান। গঙ্গাদাস সেনের আদিপর্ব্ব ও অশ্বমেধপর্ব্ব। ষষ্ঠীবরের রচিত স্বর্গারোহণ পর্ব্ব। গোপীনাথ দত্তের দ্রোণপর্ব্ব। কাশীদাসের মহাভারত। কাশীদাসের পরিচয়। পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারত রচকগণের রচনা হইতে অংশ উদ্ধৃত করিয়া কাশীদাসী মহাভারতের সেই সেই অংশের সহিত তুলনা ও সাদৃশ্য প্রদর্শন। কাশীদাসের কবিত্বের সমালোচনা। কাশীদাস বিরচিত অপর তিন খানা কাব্যের উল্লেখ। গদাধর দাস বিরচিত 'সারণ বিরাট।' রামেশ্বর নন্দী বিরচিত মহাভারত ও ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী বিরচিত মহাভারতের প্রসঙ্গ।

অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

(৩১৭—৩২৬ পৃঃ)।

বাঙ্গালীর বীরত্ব, কর্ম্মকার পাইক, চামার পাইক, নট পাইক প্রভৃতির উল্লেখ। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রকৃত বীরত্ববর্ণনার অভাব। রাজনৈতিক বৃত্তান্ত। সামাজিক আচার ব্যবহার, পরিচ্ছদাদি। শিক্ষার অবস্থা। নিম্ন শ্রেণীতে শিক্ষার অনুশীলন। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা। সামাজিক অপরাপর কথা। অপ্রচলিত ও দুরূহ শব্দার্থের তালিকা। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের কয়েকটি বাঁধাবিষয়ের সমালোচনা। দেব দেবীর প্রসঙ্গোপলক্ষে সামাজিক অবস্থা উদ্ঘাটন। সংস্কৃতের অনুকরণের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু চেষ্টা ও পরবর্ত্তী যুগের পূর্ব্বাভাস।

নবম অধ্যায়।

কৃষ্ণচন্দ্রীয়যুগ অথবা নবদ্বীপের দ্বিতীয়যুগ।

(১) নবদ্বীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র। (২) সাহিত্যে নূতন আদর্শ। (৩) কাব্যশাখা। (৪) গীতিশাখা।

(৩২৭—৩৮৯ পৃঃ)।

নবদ্বীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ-সভা, ও চরিত্র। তাঁহার রহস্য প্রিয়তা। চৈতন্যোপাসক প্রতি বিদ্বেষ। সাহিত্যে নূতন আদর্শ। পার্শীর অনুকরণ। জেলেখা, বদরচাচ্ প্রভৃতি পুস্তক হইতে দৃষ্টান্ত সংকলন। সৌন্দর্য্যের আদর্শের খর্ব্বতা। লয়লা-মজনু, জেলেখা প্রভৃতি পুস্তকের রচনার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের স্থলে স্থলে সাদৃশ্য। নৈতিক আদর্শের অবনতি কিন্তু শব্দ প্রয়োগে পটুতা। কাব্যশাখা। সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপর পরস্পরের প্রভাব। পদ্মাবতী। আলোয়াল কবির পরিচয়। পদ্মাবতী কাব্যের বিস্তৃত সমালোচনা। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের সহিত ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের তুলনা। কবি

৯ম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

সাঙ্কেতিক শব্দের অর্থ।

সাঙ্কেতিক শব্দ	অর্থ
অ: ম	ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল।
উ: চ:	উত্তর চরিত।
কবীন্দ্র	কবীন্দ্র পরমেশ্বরের কৃত মহাভারতের অনুবাদ (পরাগলী মহাভারত।)
ক, ক, চ, ...	কবিকঙ্কণ চণ্ডী।
চ ; কৌ	চণ্ড কৌশিক।
চৈ, চ, ...	চৈতন্য চরিতামৃত।
চৈ, ভা, ...	চৈতন্য ভাগবত।
চৈ, ম, ...	চৈতন্য মঙ্গল।
প, ক, ত, ...	পদকল্পতরু।
বি সু	বিদ্যাসুন্দর।
বে: গঃ পুঁথি	বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের পুঁথি।
ভা, বি	ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর।
মা, চ, গা, ...	মাণিক চাঁদের গান।
মা, গা	ঐ
মা, চ	মাধবাচার্য্যের চণ্ডী।
মৃ: ক:	মৃচ্ছ কটিক।
মু: রা:	মুদ্রারাক্ষস।
রা, বি	রাম প্রসাদের বিদ্যাসুন্দর।
সঞ্জয়	সঞ্জয়কৃত মহাভারত।
শকু:	শকুন্তলা।

নবম অধ্যায়।

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ

অথবা

নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ।

১। নবদ্বীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র।

নবদ্বীপ হইতে লক্ষ্মণসেন স্বাধীনতার পতাকা ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন, নবদ্বীপের কোলে বসিয়া জয়দেবকবি সুধাময় গান গাহিয়াছিলেন; তারপর নবদ্বীপ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতচর্চার স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, মহাপ্রভুর পদধূলি দ্বারা ইহা বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হইয়াছে,—নবদ্বীপের ধূলিরেণুতে হৃদয়বান বাঙ্গালী অশ্রুপাত করিবেন।

কিন্তু বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা ফিরিয়াছিল; যুগে যুগে স্বর্গের শাসন লইয়া প্রতিভাবান ব্যক্তি পতিত সমাজকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু দৈববরে দিগ্বিজয়ী রাজা যেরূপ সমস্ত বল প্রয়োগ দ্বারাও কৈলাস পর্ব্বতকে কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়াই অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই গিরিতুল্য অনড় সমাজের নিকট ধর্ম্মবীরের প্রাণান্ত চেষ্টাও সেইরূপ বিফল হইয়া পড়ে। যে নবদ্বীপে বৈষ্ণবগণ এক সময়ে মেঘদর্শনে কৃষ্ণভ্রম করিয়া পাগল হইতেন, সেই স্থানে ভারতচন্দ্রের শিষ্যগণ স্ফুরিত কদম্ব কি দাড়িম্ব দর্শনে কুভাবনায় কণ্টকিত হইয়া রাত্রি জাগরণ করিতে লাগিলেন। এই সময় নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গদেশের যুগাবতার। বঙ্গদেশ তখন বর্গীর হাঙ্গামে অস্থির ছিল; ইহার কিছু পরে নবদ্বীপে যে সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব হয়, তাহাতে ৬ অংশ লোক নষ্ট হইয়া যায়, "১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ডাকাতের দল বঙ্গদেশে ৫০০০০ গৃহ ও ২০০ লোক অগ্নিতে দগ্ধকরে।" (হাণ্টার, এনালস্ অব রুরাল বেঙ্গল ৭০ পৃঃ)। এই সময় ভারত-

চন্দ্র, স্বীয়প্রভু—"সদাজোৎস্নাময় দুই পক্ষ"-সেবী নৃপনন্দনের জন্য কামোদ্দীপক বটিকা প্রস্তুত করিতেছিলেন; জাতীয় চরিত্রের এই হীনতায় ভাবী রাষ্ট্রবিপ্লবের পথ সুগম হইয়াছিল; এই বিপ্লববন্যায় "ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি। কালোয়াত মরিল বীণার লাউ ধরি।"—দশাটি হইয়াছিল, অযোধ্যার ওয়াজেদ আলি তাহার সাক্ষী।

কিন্তু দোষে গুণে সৃষ্টি; পৌরষের ভগ্নকাণ্ড বেষ্টন করিয়া "ললিত লবঙ্গ লতার" ন্যায় সুকুমার বিদ্যাগুলি লতাইয়া উঠিল। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বিশ্রাম খাঁ গায়েনের ওস্তাদি গানের মূর্চ্ছনা, গদাধর তর্কালঙ্কারের পুরাণ পাঠ ও ভারতচন্দ্রের কবিতা হইতে যে মধু ক্ষরিত হইতে লাগিল, তাহা এই রাজ-নৈতিক বাদলের মধ্যে মনোরম রৌদ্রের মত মৃদুহাস্য করিতেছিল; নবদ্বীপ হইতে একদা নিস্বার্থ ও নির্ম্মল প্রেমের রপ্তানি হইত, এখন নবদ্বীপাধিকার হইতে ভারতচন্দ্রের কবিতা, শান্তিপুরে ধুতি ও কৃষ্ণনগরের পুতুল বস্তায় বস্তায় বিক্রয়ের জন্য দেশে দেশে প্রেরিত হইতে লাগিল। ধূর্ত্তপণা ও প্রতারণা—চরিত্র-হীনতার সঙ্গী, নবদ্বীপের রাজসভায় এই সব শিক্ষার জন্য টোল প্রতিষ্ঠিত হইল। আমরা এখানে যুগাবতার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কৃষ্ণচন্দ্র।

১৭১০ খৃঃঅব্দে কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতৃব্য রামগোপালেরই রাজা হইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি পথে তাম্রকূট-প্রিয় পিতৃব্য মহাশয়ের বিলম্ব ঘটনা করিয়া নবাব দরবারে অগ্রে উপস্থিত হন ও বাক্‌চাতুরী দ্বারা রাজ্য দখল করেন। আলিবর্দ্দি খাঁ তাঁহাকে এতদূর ভালবাসিতেন যে, তাঁহাকে রাজসভায় না দেখিলে তালাস করিতেন এবং তাঁহাকে 'ধর্ম্মচন্দ্র' উপাধি দিয়াছিলেন, কিন্তু এই 'ধর্ম্মচন্দ্র' মহাশয় প্রতারণা পূর্ব্বক আলিবর্দ্দী খাঁকে স্বীয় রাজ্যের অনুর্ব্বর ভূমিগুলি দেখাইয়া ২০ লক্ষ টাকা মাপ পান। যখন মীরকাশেমের হস্তে বন্দী, মৃত্যুর আজ্ঞা তাঁহার মস্তকের উপর, তখন পুত্র শিবরামকে লইয়া এক বিরাট পূজার ফাঁদ পাতিয়া উদ্ধার হইয়া আসেন। কনিষ্ঠ পুত্র শম্ভুচন্দ্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দকে হাত করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রবঞ্চনা করিতে

চেষ্টা করিলে কৃষ্ণচন্দ্র হেষ্টিংস্ রমণীকে একছড়া মুক্তার হার ঘুষ দিয়া পুত্রের উদ্দেশ্য বিফল করেন। ইংরেজ আনিতে যে ষড়যন্ত্র হয়, কৃষ্ণচন্দ্র তাহার গুরু। রাজবল্লভের হাতে "রাখি" বাঁধিয়া তিনি ঢাকার নবাব-সরকারে কয়েক লক্ষ টাকা মাপ লইয়া আসেন, অথচ রাজবল্লভের বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা চক্র করিয়া বিফল করেন। তাঁহার অনুচরগণের কেহ কেহ উপস্থিত ধূর্ত্তপনায় তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন; নবাব যখন অগ্রদ্বীপে লোকজন বিনষ্ট হওয়ার সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রশ্ন করেন, "অগ্রদ্বীপ কাহার?" তখন অগ্রদ্বীপের মালিকের মোক্তার বিপদ আশঙ্কা করিয়া চুপ হইয়া রহিল, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের মোক্তার উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এস্থল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের", তৎপর উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা লোকহত্যার একটা কৈফিয়ৎ দিয়া উক্ত স্থান কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যান্তর্গত করিয়া লইলেন। বীরোচিত সৎসাহসের অভাব থাকিলেও কুট রাজ-নীতিতে কৃষ্ণচন্দ্র অতি প্রাজ্ঞ ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে মুসলমান শাসন এই কুট রাজনীতি-আশ্রিত হইয়াছিল। মুসলমান দরবারের দুর্নীতিগুলি রাজাকৃষ্ণচন্দ্র অনেকাংশে অনুসরণ করিয়াছিলেন; এক সময় মোগল সম্রাট পুত্রের ব্যাধি নিজে গ্রহণ করিয়া নিজের প্রাণ দিয়া পুত্রকে বাচাইয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে; কিন্তু শেষ সময়ে মুসলমান সম্রাটগণের রাজপ্রাসাদ অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল,—পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের ষড়যন্ত্র, পুত্রের হস্তে পিতা বন্দী, ভ্রাতৃহনন প্রভৃতি পাতক মুসলমান ইতিহাস কলুষিত করিয়াছে; হিন্দুর চক্ষে এই সব পাপ অতি অস্বাভাবিক; কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের যোগ্য পুত্র শম্ভুচন্দ্র পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু রটাইয়া নিজে রাজগী লইয়াছিলেন; কৃষ্ণচন্দ্র এই ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া গঙ্গাগোবিন্দের নিকট দু ছত্র কবিতা লিখিয়াছিলেন—"পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য। যা করেন গঙ্গাগোবিন্দ।" বস্তুত পুত্রের বিশেষ দোষ নাই, তাঁহারও পড়া শুনা রাজসভার টোলেই হইয়াছিল।

কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্য শাসনে ও সংরক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তাহা অতি দুর্লভ; সিংহাসনারোহণের সময় তাঁহার ঋণ ১০ লক্ষ টাকা ছিল, ইহা ছাড়া ১২ লক্ষ টাকা নজরানার জন্য মহাবদ্ জঙ্গ তাঁহাকে

বন্দী করিয়াছিলেন, তিনি এই সমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার রাজ্য অনেক পরিমাণে বাড়াইয়াছিলেন; তিনি "শিব-নিবাসকে" ইন্দ্রপুরীর মত সাজাইয়াছিলেন, তাঁহার উৎসাহে স্থপতি বিদ্যার উন্নতি হইয়াছিল; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কোন কোন দেবমন্দির এখনও বঙ্গদেশের গৌরব একটি সম্বন্ধে:—"এমন সুন্দর সুপ্রসাস্ত ও সুদৃঢ় পূজার প্রসাদ এবং এরূপ উন্নত ও দৃঢ়তর মন্দির বঙ্গদেশের অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না"—(ক্ষিতীশ বংশাবলী ৩১ পৃঃ)। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের-বিশেষ তাঁহার-যত্নে কৃষ্ণনগরের কুমারগণ এরূপ সুন্দর মূর্ত্তি গড়া শিখিয়াছিল, তাঁহার উৎসাহে শান্তিপুরের ধুতির যশঃ দেশ বিখ্যাত।

কৃষ্ণচন্দ্র নিজে সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাঁহার সভায় কেবল কবিগণের আদর ছিল এমত নহে; দর্শন, ন্যায়, স্মৃতিধর্ম্ম এ সমস্ত বিষয়েরই সেখানে চর্চ্চা হইত। তিনি এই সর্ব্বশাস্ত্র চর্চ্চায়ই নিজে যোগ দিতেন, ও বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিতগণের গুণের আদর করিতে জানিতেন; তিনি হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি ও রামগোপাল সার্ব্বভৌমের সঙ্গে ন্যায়ের কুটবিচার করিতে পারিতেন; প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, গোপাল ন্যায়ালঙ্কার ও রামানন্দ বাচস্পতির সঙ্গে ধর্ম্মশাস্ত্রের তত্ত্ব নিরূপণ করিতেন এবং শিবরাম বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ ও বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চাননের সঙ্গে ষড়দর্শন সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে সক্ষম ছিলেন; বাণেশ্বর তাঁহার সভার রাজকবি ছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সঙ্গে সংস্কৃত কবিতা প্রণয়ন করিতেন। এই উচ্চ-শিক্ষিত কুটরাজনীতিপ্রাজ্ঞ, মহামান্বিত রাজচক্রবর্ত্তী একটী পল্লীগ্রামের বোম্বেটের ন্যায় কৌতুকপ্রিয় ছিলেন; তাঁহার কৌতুকরাশিতে সুরুচি কি সংযত ভদ্রতা ছিল না, কিন্তু সে গুলি চার্লস দি সেকেণ্ডের পরিহাস হইতে বেশী দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইবে না। কৌতুকার্থ রাজসভায় তিনটী লোক নিয়োজিত ছিলেন; ১ম—গোপালভাঁড়, এই ব্যক্তির নাম এখন দেশবিখ্যাত, গোপাল নর-সুন্দরকুলের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ২য়,—হাস্যার্ণব, ইহার বাড়ী বিল্বপুষ্করিণী, ইনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ইহাঁর নকল করিবার শক্তি ছিল। ৩য়—মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, ইহার বাড়ী বীরনগর, রাজার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ ছিল না, সুরসিক দেখিয়া রাজা ইহাকে বৈবাহিক বলিয়া

থাকিতেন। এই ব্যক্তিত্রয়ের কৌতুকাভিনয়ে রাজসভায় হাস্য ও বীভৎস রসের শ্রাদ্ধ হইত, নমুনা এইরূপ—গোপালভাঁড়ের সুন্দর ছেলেটি দেখিয়া একদিন রাজা বলিলেন "এ যে রাজপুত্র দেখ্‌ছি!" গোপালের উত্তর—"ধন্য তুই ছেলে, তোর কল্যাণে আমি রাজপুত্রের বাপ হইলাম।" মুক্তারামের বাড়ী বীরনগরের কোন দুষ্ট লোক কৌশলে অন্য এক ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রয় করাতে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুখুয্যে, তোমাদের ওখানে কি বউ বিক্রীত হয়?" তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ মহারাজ গত মাত্রেই"; রাজা একদিন প্রাতে মুক্তারামকে বলিলেন—"মুখুয্যে— গতরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন তুমি বিষ্ঠার হ্রদে ও আমি পায়েসের হ্রদে পড়িয়াছি। তিনি উত্তর করিলেন, "ধর্ম্মাবতার আমিও এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি, কেবল বিশেষ এই যে হ্রদ হইতে উত্থান করিয়া আমরা পরস্পরের গাত্র লেহন করিতেছি।" রাজসভায় এইরূপ রহস্যের ধুলি খেলা হইত, রাজা এই তিনটি ভাঁড় প্রতিপালন করিয়া তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত মুষ্টি মুষ্টি ধুলি খাইতেন ও হাসিতেন।

এই আমোদ প্রমোদ ভিন্ন রাজা শাস্ত্রালোচনা করিতেন, রাজ্যশাসন ও বিস্তারের নূতন নূতন ফন্দি উদ্ভব করিতেন, শিল্পের উন্নতির জন্য নানারূপ উৎসাহ দিতেন ও ভারতচন্দ্রকে দিয়া তোটক ছন্দে কবিতা লিখাইতেন। বিলাসের এই বিবিধ সম্ভারের মধ্যে নির্ম্মল প্রেমের কথা কেহ শুনাইতে গেলে উপহাসাস্পদ হইত; রাজা "কেবল চৈতন্যোপাসক সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ করিতেন" (ক্ষিতীশ বংশাবলী ২৯ পৃঃ)। কৃষ্ণচন্দ্র শিব ও শক্তির বিশেষ উপাসক ছিলেন, ভারতচন্দ্র যখন চণ্ডীর দশাবতার বর্ণনা করিয়া লিখিতেন,—"ভারত কহিছে মাগো এই দশ রূপে। দশ দিকে রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে"। তখন, আমরা কল্পনা নেত্রে দেখিতে পাই, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তিপূর্ণ গলদশ্রুনেত্রে প্রিয়কবির প্রতি অনুগ্রহ-হাস্য বিতরণ করিতেছেন।

এই শাস্ত্র চর্চ্চা, সুকুমার বিদ্যায় অনুরাগ, কূটনীতি, কুরুচি ও বিলাস-প্রিয়তা এই যুগের সাহিত্যকে একরূপ মিশ্রিত ছাঁচে গঠিত করিয়াছে, তাহার দোষ গুণ পাঠকের বিচারাধীন করিতেছি।

২। সাহিত্যে নূতন আদর্শ।

বস্তুতঃ বাঙ্গলা কবিতা এখন আর 'কৃষকের গান' নহে; ইহার উপর

সংস্কৃত ও ফার্শীর বড় বড় পণ্ডিতগণের নজর পড়িয়াছে, অলঙ্কারের বাহুল্যে স্বভাবরূপ ঢাকা পড়িয়াছে; এখন বঙ্গভাষা রাজসভায় অনুগৃহীতা, পল্লীবাসিনীর সাদা জুইফুলের মত প্রাণটি ইহার আর নাই, সংকুচিত সৌন্দর্য্য ও নিষ্কাম প্রেমের আবেগ ইহা পল্লীগ্রামে ফেলিয়া আসিয়াছে, রাজসভায় ইহার কামকলাপূর্ণ ক্রীড়ায় দর্শকবৃন্দের চিত্তে উত্তপ্ত মদিরায় উল্লাস প্রবাহিত হয়, ইহার নীলনিচোলের অসংযত বিক্ষেপে নানা আভরণের জ্যোতি ফুটিয়া উঠে।

কবিগণ এখন বুদ্ধি-সাগর মন্থন করিয়া রূপবর্ণনার উৎপত্তি করেন, যিনি কল্পনার কুহক সৃষ্টি করিতে যত পটু, তিনি তত প্রশংসনীয়; প্রকৃত রূপের আর কে খোঁজ করে! আমরা নৈষধ চরিত হইতে একটি অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি, পাঠক দেখিবেন বঙ্গভাষা কোন্ আদর্শের অনুসরণ করিতেছিল;—"হে রাজন্ দময়ন্তীর চুলের কথা কি বলিব? পশু হরিণ যে চামর স্বীয় পুচ্ছরূপে পশ্চাৎভাগে রাখিয়া তিরস্কৃত করে, সেই চামরের সঙ্গে কি দময়ন্তীর চুলের তুলনা দিতে ইচ্ছা হয়?", "দময়ন্তীর চক্ষু হরিণের চক্ষু হইতেও সুন্দর, তাই হরিণ ভূমিতলে ক্ষুরাঘাত করিয়া স্বীয় পরাজয় ও ক্ষোভ ঘোষণা করিতেছে।" "বিধাতা চন্দ্রের শ্রেষ্ঠভাগ গ্রহণ করিয়া দময়ন্তীর মুখ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই জন্য চন্দ্রমণ্ডলে একটা গর্ত্ত হইয়াছে, লোকে তাহাকে কলঙ্ক বলে।" "দময়ন্তীর মুখ দেখিয়া পদ্মগুলি পরাজয় চিহ্ন স্বরূপ জলদুর্গে বাস করিতেছে, অদ্যাপি উঠিতে সাহস পাইতেছেনা।" "দময়ন্তীর পূর্ব্বে বিধাতা যত রমণী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা শিক্ষানবিসের মক্সের মত, তারপর যেগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তুলনায় দময়ন্তীর রূপের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য।" বহুপত্র ব্যাপিয়া এই ভাবের বর্ণনা চলিয়াছে। বাঙ্গালী কবি শুধু সংস্কৃতের অনুকরণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ফার্শী ও উর্দ্দু হইতেও ইচ্ছাক্রমে সংগ্রহ করিয়াছেন; "তাঁহার কাল চুল বুদ্ধিমানদিগের বেড়ি স্বরূপ," "তাঁহার নখের জ্যোতিতে সমস্ত মনুষ্যের মন লগ্ন আছে, তাহা নূতন চন্দ্রের ন্যায়," "তাঁহার নিতম্ব আক্কা পাহাড়ের ন্যায়;" "তাঁহার কটীদেশ চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম, বরং তাহারও অর্দ্ধেক," (জেলেখা)। "সুন্দরী স্নানান্তে মেন্দীরঞ্জিত অঙ্গুলীদ্বারা চুল ঝাড়িতেছে, যেন মেঘ হইতে মুক্তা বর্ষণ হইতেছে" (বদরচাচ্)। এই শেষের কয়েকছত্র পড়িয়া বিদ্যাপতির—"চিকুরে গলয়ে জলধারা। মেহ বরিষে যেন মোতিম হারা।" স্বভাবতঃই মনে পড়িবে। এইরূপ অতিশয়োক্তি পড়িয়া পাঠকগণ কবির অতি বুদ্ধির অবশ্যই প্রশংসা করিবেন কিন্তু কোন সুন্দরী রমণী দেখিলেন বলিয়া

অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না। উপমার অতিরঞ্জন সৌন্দর্য্যের বর্দ্ধক নহে, হানিকারক।

বঙ্গসাহিত্যে সৌন্দর্য্যের আদর্শের খর্ব্বতার সঙ্গে করুণ প্রভৃতি রসের ধারা ও স্তিমিত হইয়া পড়িল, ভারতচন্দ্রের রতি সামান্য গণিকার ন্যায় কৃত্রিমস্বরে পতি বিয়োগে বিলাপ করিতেছে—"আহা আহা হরি হরি, উহু উহু মরি মরি, হায় হায় গোসাঞি গোসাঞি॥" ইহা করুণ রসের বিদ্রুপ ভিন্ন কি বলিব? সুন্দরকে দেখিবার ব্যগ্রতা বর্ণনা করিয়া কবি বলিতেছেন—"এ নীল কাপড়, হানিছে কামড় যেমন কাল নাগিনী।" গম্ভীর কথায় ভারতচন্দ্র অপটু, অন্নদা মঙ্গল রূপ ধর্ম্মমণ্ডপে তিনি বাই নাচ দেখাইয়াছেন; যে দেশে এক সময়ে গকুল চক্রবর্ত্তী চণ্ডীদাস ও গোবিন্দ দাসের গীত গাইয়া শ্রোতাকুলকে মোহিত করিতেন—"বঁধু কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুঃখ। তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে সুখ॥ সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি। কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম, তোমার চরণখানি॥" ইত্যাদি সরস প্রেমের কথায় মর্ম্মের আবেগ উক্ত হইত, সেই দেশে রামপ্রসাদের "বলে মুহু মুহু মুখে উহু উহু। যেন কোকিল কুজিত কুহু কুহু॥" ও তৎপথাবলম্বিত ভারতচন্দ্রের তোটক পড়িতে তরুণ সম্প্রদায় আগ্রহান্বিত হইলেন; যে দেশে প্রেমের স্বভাব করুণায় দেশের সর্ব্ব কলুষ ভাসাইয়া লইয়াছিল, সেই দেশে প্রেমের অভাবে কুলবধুকে স্বামী একটী হরবোলার ন্যায় প্রেমের পাঠ শিখাইতেছেন, বিদেশে গমনোন্মুখ সাধু স্ত্রীকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন—"বাহিরে পদরাখা জেন ফণি ফণা পরে। দ্বীপান্তর যাওয়া হেন মান অন্তঘরে॥ পর পুরুষের রব বজ্রতুল্য কাণে। ভাল শয্যা কুসুম কণ্টক করি মনে॥" (জয়নারায়ণের চণ্ডী)।

এস্থলে বক্তব্য এই, বিদ্যাসুন্দরের হীরা, বিন্দু ব্রাহ্মণী প্রভৃতি কুট্‌নী ও কামিনীকুমারের সোণামুখীর ন্যায় দাসী বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের খাঁটি চরিত্র নহে; দুর্ব্বলাদাসীর ন্যায় চরিত্র এখনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকা সম্ভব, কিন্তু হীরার ন্যায় নাগর ধরিবার কল বিদেশের আমদানী; মুসলমানী কেতাবে কুটনীদাসী অনেকস্থলে দৃষ্ট হয়, জেলেখার দাসী তাঁহাকে বলিতেছে;—"কে তোমাকে ঠকাইয়াছে বল, তোমার ফুলের ন্যায় মুখ হরিদ্রার ন্যায় বিবর্ণ কেন? তুমি চন্দ্রের মত দিন দিন ক্ষয় পাইতেছ কেন? আমি বোধ করি, তুমি কাহারও প্রেমের ফাঁদে পড়িয়াছ, বল সে কে? যদি সে আসমানের

ড়ার হয়, তবে তাহাকে জমিনে ফেলিয়া তোমার নিকট বন্দী করিব। সে যদি পাহাড়-বাসী দেবতা হয়, তবে মন্ত্রবলে তাহাকে শিশিতে পুরিয়া তোমার নিকট হাজির করিব। যদি সে মনুষ্য হয়, তবে তুমি যাহার দাসী হইতে ইচ্ছা করিতেছ, সে আমার কুহকে তোমার দাস হইয়া পদানত হইবে।" (জেলেখা)। লয়ালীমজনুতে পড়িয়াছি—"কুটনী আছিল এক সেই সহরেতে। তেমন কুটনী কেহ না ছিল দেশেতে।। মন ভুলাইতে সেই কথায় কথায়। জমিনেতে চন্দ্রসূর্য্য করিত উদয়।। (মুসলমানী কেতাব)।

এই যবনীগণের চন্দ্রসূর্য্য ও বাঘের দুধ করায়ত্ত ছিল, ইহারা আকাশে ফাঁদ পাতিয়া নায়িকার কামাভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিত; এই রমণীগণই হিন্দু সাহিত্যে হীরামালিনী ও সোণামুখী হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, পাঠক তাহাদিগকে—নারদ ঋষির স্ত্রীসংস্করণ কুব্জা ও দুর্ব্বলার সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত করিবেন না।

বিদ্যাসুন্দরের সিঁধকাটা বিলাসের অভিনয় ও কুটনী সংযোগে গৃহস্থের বাড়ীর কন্যাকে বশীকরণ—এ সমস্ত সম্ভবতঃ মুসলমানী সাহিত্যের প্রভাবের পরিচায়ক। ফার্শী অনুরাগী ধর্ম্মভীরু কবিগণ চণ্ডী পূজার বিল্বপত্র কাণে গুজিয়া মুসলমানী কেচ্ছা শুনাইয়াছেন, তাঁহাদের বক্ষস্থলে লম্বমান পৈতা, চন্দনচর্চ্চিত ললাট, কর্ণ লগ্ন বিল্বপত্র ও মুখে "কালি কালি কালি কালি কালি কালি কালিকে। চণ্ডমুণ্ডি মুণ্ডখণ্ডি, খণ্ডমুণ্ড মালিকে।।" প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ শুনিয়া শ্রোতাগণ বিদ্যাসুন্দর পূজামণ্ডপে গাওয়াইয়াছেন; কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের উপর মুসলমান সাহিত্যের ছায়া বড় স্পষ্ট, চণ্ডীর "চৌতিশায়"ই উহার চুড়ান্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। লায়লীর মাতা হইতে বীরসিংহের মহিষী বিদ্যাকে গালি দিতে শিখিয়াছেন, মুসলমানী কেতাব হইতে তুলিয়া দেখাইতেছি—"গোস্বা মনে লাল আখি, লায়লীকে কহে ডাকি, কাল মুখী হায় কি করিলি। এই কি বাসনা তোর, জাত কুল গেল মোর, দেশ মাঝে কলঙ্ক রাখিলি।। কি পড়া পড়িতে গেলি, প্রেমে মন মজাইলি, কে শিখাল এমন ব্যাভার।। লাজভয় গেল তোর, অক্ষাতি হইল মোর; কুলে কালি দিল সবাকার।।" (লয়লামজনু)।

বিদ্যাসুন্দরের জয়লাভের একমাত্র কারণ ইহার অপূর্ব্ব শব্দমন্ত্র। "জনুমোর হ'ল যন্ত্র, যত শিরা তত তন্ত্র, আলাপে মাতিল মন মাতালে নাচাও না। ওহে পরাণ বঁধু যাই গীত গেওনা।।" প্রভৃতি পদ পড়িতেই সংগীতের ন্যায় সুধা-বর্ষী, উহাদের ভাব চিত্তে উপলব্ধি হইবার পূর্ব্বে কর্ণ মুগ্ধ হইয়া পড়ে। বিদ্যা-সুন্দর প্রভৃতি কাব্য নৈতিক-জীবনের ভগ্ন-পতাকা, বিজাতীয় আদর্শ ও কুরুচি-

লুষিত ; কাচের মূল্যে বিকাইবার যোগ্য, কিন্তু ইহাদের ছাচেঢালা সুন্দর মার্জ্জিত ভাষার জ্যোতিতে আদর্শের হীনত্ব পাঠকগণের উপলব্ধি হয় নাই, এক যুগ ভরিয়া এই কাব্যগুলি পাকাসোণার মূল্যে বিকাইয়াছে।

এই অশ্লীল মিষ্টভাষী সাহিত্য যখন রাজানুগ্রহে পুষ্ট হইতেছিল, তখন বঙ্গের দূর পল্লীতে সরলভক্তি ও প্রেমাশ্রু বিধৃত সংগীত পুনশ্চ আরব্ধ হইয়া শ্রোতার প্রাণের কামনা পরিতৃপ্ত করিতেছিল, অনুপ্রাস-প্রিয়তা ও কোমলভাষা ব্যতীত কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের অন্য কোন গুণ সেই সব সংগীত বহন করে না ; তাহারা সামান্য কবিওলার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া অশিক্ষিত সমাজকেই বেশী আকর্ষণ করিয়াছিল,—কিন্তু বোধ হয় তাহাদের ভাবের নির্ম্মলতা ও আবেগ—রুচিদুষ্ট বৃথা-শিক্ষাকে ধিক্কার দিয়া কালে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবে ; আমরা পরে তাহাদিগের কথা সংক্ষেপে লিখিব।

কাব্যশাখা।

বিদ্যাসুন্দরই এ অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কাব্য ; বররুচি নামক কবি সংস্কৃতে যে কয়েকটি শ্লোক রচনা করেন, তাহা বঙ্গীয় বিদ্যাসুন্দরের ভিত্তি নহে। পল্লীগ্রামের অন্যান্য গল্পের ন্যায় বিদ্যাসুন্দরের গল্পও সম্ভবতঃ বহুদিন পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল কিন্তু উহা কবিগণের ক্রমাগত চেষ্টায় বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, এই আকারে উহা মুসলমানী প্রভাব দ্বারা বিশেষরূপে চিহ্নিত। মুসলমান ও হিন্দু দীর্ঘকাল একত্র বাস নিবন্ধন পরস্পরের প্রতি অনেকটা সহানুভূতি পরায়ণ হইয়াছিলেন, ক্ষেমানন্দ রচিত মনসার ভাসানে দৃষ্ট হয়, লখিন্দরের লোহার বাসরে হিন্দুয়ানী রক্ষাকবচ ও অন্যান্য মন্ত্রপূত সামগ্রীর সঙ্গে একখানা কোরাণও রাখা হইয়াছিল, রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ মুসলমান ফকির সাজিয়া ধর্ম্মের স্তবক শিখাইয়া গিয়াছেন,—তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি ; কিন্তু চট্টগ্রামে এই দুই জাতি সামাজিক আচার ব্যবহারে যতদূর সন্নিহিত হইয়াছিলেন; অন্যত্র সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল ; চট্টগ্রামের কবি হামিদুল্লার ভেলুয়াসুন্দরী কাব্যে বর্ণিত আছে লক্ষপতি সদাগর পুত্র কামনায় ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে আহ্বান করিলে, তাঁহারা কোরাণ দেখিয়া অঙ্কপাত করিতে আরম্ভ করিলেন ও সদাগরের পুত্র বাণিজ্যে যাইবার পূর্ব্বে "বেদপ্রায়" শিন্নি

বাক্য মান্য করিয়া "আল্লার নাম" লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ১৫০ বৎসরের প্রাচীন কবি আওারুদ্দিন তাঁহার "আমিল দিলারাম" কাব্যে নায়িকা দিলারামাকে পাতালে প্রেরণ করিয়া জলঋষির নিকট বর প্রার্থনা করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন ও তাঁহার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে 'লক্ষণের চন্দ্রকলা,' 'রামচন্দ্রের সীতা', 'বিদ্যাধরি চিত্ররেখা' ও 'বিক্রমাদিত্যের ভানুমতীর' সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন * ; হিন্দু ও মুসলমানগণ এইভাবে ক্রমে ক্রমে পরস্পরের ভাব আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল, সুতরাং বিদ্যাসুন্দরকাব্যে যে অলক্ষিতভাবে মুসলমানী নক্সার প্রতিচ্ছায়া পড়িবে, তাহাতে বিচিত্র কি? এই সময় নায়ক নায়িকার বিলাসকলাপূর্ণ প্রেমের গল্প উর্দ্দু ও ফার্সী বহুবিধ পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছিল; এই সব পুস্তকে প্রায়ই দেখা যায়, নায়কগণ নায়িকাদের পটে লিখিত মূর্ত্তি দেখিয়াই পাগল হইয়া অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন, তাজি ঘোড়া সমারূঢ় সুন্দরকে নায়িকার খোঁজে যাইতে দেখিয়া আমাদের সেই সব নায়কের কথাই মনে পড়িয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে বিবাহের পূর্ব্বে বরের এইরূপ প্রেমাবেশ আর ইতি পূর্ব্বে বর্ণিত হয় নাই।

পদ্মাবতী।

প্রায় ২৫০ বৎসর হইল কবি আলোয়াল পদ্মাবতী নামক একখানা কাব্য প্রণয়ন করেন। এই কাব্য কৃষ্ণচন্দ্র রাজার বহুপূর্ব্বে রচিত হইলেও ইহাতে এই যুগের মুখ্য-চিহ্নগুলি বিদ্যমান সুতরাং কবিকে কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের পথ প্রদর্শক বলা যাইতে পারে, আমরা এজন্যে পদ্মাবতী প্রসঙ্গ দ্বারা কাব্যশাখার মুখবন্ধ করিতেছি। পাঠক দেখিবেন কবি আলোয়াল সংস্কৃতে কিরূপ বুৎপন্ন ছিলেন ও হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার কতদূর অভিজ্ঞতা ছিল। এই পুস্তক পড়িয়া অনেক সময় প্রশ্ন হইবে, মুসলমানের লেখনী এতদূর হিন্দুয়ানী শিখিল কিরূপে? যাঁহারা ৯ জন মুসলমান বৈষ্ণবকবির কবিতা পড়িয়া চমৎকৃত, তাঁহারা কবি আলোয়ালের এই সুস্বাদু কাব্যখানা পাঠ করুন।

৯২৭ সালে মীর মহাম্মদ নামক জনৈক কবি হিন্দী-ভাষায় পদ্মাবতী

* এই কাব্যের হস্ত লিখিত পুঁথি আমার নিকট আছে; ইহাতে উর্দ্দু শব্দ খুব অল্প, ভাষাটি ঠিক হিন্দুকবির ভাষার ন্যায়।

রচনা করেন†—ইহা পদ্মিনী-উপাখ্যান; দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন চিতোর-রাজ্ঞীর রূপ-তৃষ্ণায় যে সমরানল বা কামানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, এই কাব্য তাহারই ইতিহাস। দুএক স্থলে ঐতিহাসিক সত্যের বিপর্য্যয় আছে—চিতোরাধিপ ভীমসেন কবিকর্ত্তৃক রত্নসেন নামে অভিহিত হইয়াছেন, পুঁথি শেষে আলাউদ্দিনের পরাজয় লিখিত হইয়াছে; যাহাহউক কবির স্বাধীন কল্পনাকে ইতিহাসের সীমাবদ্ধ তুলাদণ্ড দ্বারা মাপ করা উচিত হইবে না। মীর মহাম্মদের এই কাব্যের অনুবাদ করিয়াছেন—কবি আলোয়াল; সে আমলের অনুবাদ অর্থে অনেক স্থলেই নূতন সৃষ্টি।

আলোয়াল কবি ফতেয়াবাদ পরগণায় (ফরিদপুর) জালালপুর নামক স্থানের অধিপতি সমসেরকুতুবের একজন সচিবের পুত্র ছিলেন; যৌবনারম্ভে ইনি পিতার সহিত জলপথে গমন করিতেছিলেন, পথে হার্ম্মাদগণ (পর্ত্তুগিজ জলদস্যু) তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে, কবির পিতা যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। এই সময় হার্ম্মাদগণের অত্যাচারে সমুদ্রের প্রান্তভাগে সর্ব্বদা বিপদাশঙ্কা ছিল, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ও আমরা ইহা দেখিয়াছি। কবি পিতৃবিয়োগের পর রোসাঙ্গের (আরাকানের) রাজার প্রধান অমাত্য মাগণঠাকুরের শরণাপন্ন হন। মাগণ ঠাকুর সম্ভবতঃ মগ ছিলেন, সংগীত ও অপরাপর সুকুমার শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল; আলোয়ালের উৎকৃষ্ট কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া তিনি তাঁহাকে মীর মহাম্মদকৃত পদ্মাবতীকেচ্ছার বঙ্গানুবাদ করিতে আদেশ করেন, তদনুসারে পদ্মাবতী রচিত হয়; পদ্মাবতী লেখার পর তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু মাগণ ঠাকুর তাঁহাকে আবার বৃদ্ধবয়সে "ছয়ফুল মুল্লুক ও বদিউজ্জামাল" নামক ফারসী কাব্য অনুবাদ করিতে নিযুক্ত করেন। এই পুস্তক কতকদূর রচনার পর মাগণ ঠাকুরের মৃত্যু হয়, গভীর দুঃখে কবি লেখনী ত্যাগ করেন। সহসা আরাকানে এক ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল; সুজা বাদসা তথায়

† এই পুস্তক সম্বন্ধে আমার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 'ভারত-জীবন' পত্রিকার সম্পাদক কাশীনিবাসী শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র বর্ম্মা আমাকে লিখিয়া পাঠান—"মহাশয়, সাহিত্য নামক মাসিক পত্রে (১৩০১ বাং) মাঘ মাসের সংখ্যায় "মুসলমান কবির বাঙ্গলা কাব্য" শীর্ষক প্রবন্ধের ৩২১ পত্রে ২১ পংক্তিতে আপনি লিখিয়াছেন যে মীর মহাম্মদের রচিত হিন্দী পদ্মাবতী পাওয়া যায় নাই। মহাশয়, ধন্যবাদ পূর্ব্বক জানাইতেছি যে হিন্দী মীরমালিকমহাম্মদ রচিত পদ্মাবতী কাব্য কাশী ও লক্ষ্ণৌতে ছাপা হইয়াছে ও বাজারে পাওয়া যায়।"

আসিয়া আরাকানপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, আরাকানরাজ সুজার অনুচর গুলি বিনষ্ট করেন, মুসলমানগণের উপর উৎপীড়ণ আরম্ভ হইল, মৃজা নামক এক দুষ্ট লোকের মিথ্যা সাক্ষ্যে কবি আলোয়াল কারাগারে আবদ্ধ হইলেন; কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া কবি নয় বৎসর অতি দীন ভাবে কর্ত্তন করেন, এই দীর্ঘকালপরে কবির উপর গ্রহগণ পুনরায় সুপ্রসন্ন হন; ছৈয়দ মুছা নামক এক সদাশয় ব্যক্তি তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে "ছয়ফুলমুলুক ও বদিউজ্জমাল" পুঁথির অবশিষ্টাংশ রচনা করিতে আদেশ করেন; তখন কবি ভগ্নবীণায় পুনঃ তার যোজনা করিলেন; কিন্তু তখন তিনি বড় বৃদ্ধ,—বয়ঃ গতে বনিতা বিলাসের গীত কণ্ঠে উঠিতে চাহে না, আলোয়াল এই দায়ীত্ব গ্রহণে প্রথমত অসম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু সৈয়দমুছা তাঁহার দেশ বিখ্যাত যশের কথা বলিয়া পীড়াপীড়ি করিলেন। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে সুজার মৃত্যু হয়, তাহার অনুম ২০ বৎসর পুর্ব্বে কবির ৪০ বৎসর বয়সে পদ্মাবতী রচনার কাল ধরিলে, তিনি ১৬১৮ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই রূপ অনুমান করা অন্যায় হইবে না; কবি আলোয়াল কবিকঙ্কণও কাশীদাসের পরবর্ত্তী কবি।

পদ্মাবতীকাব্যে আলোয়ালের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে; কবি পিঙ্গলাচার্য্যের মগণ, রগণ প্রভৃতি অষ্টমহাগণের তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন; খণ্ডিতা, বাসকসজ্জা ও কলহান্তরিতা প্রভৃতি অষ্ট নায়িকার ভেদ ও বিরহের দশ অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র লইয়া বড়দরের কবিরাজী কথা শুনাইয়াছেন, জ্যোতিষ-প্রসঙ্গে গর্গাচার্য্যের ন্যায় যাত্রার শুভাশুভের ও যোগিনীচক্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; একজন প্রবীনা এয়োর মত হিন্দুর বিবাহাদি ব্যাপারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও পুরোহিত ঠাকুরের মত প্রশস্তবন্দনার উপকরণের একটি শুদ্ধ তালিকা দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত টোলের পণ্ডিতের মত অধ্যায়ের শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন। আলোয়াল "ছয়ফলমুলুক ও বদিউর্জ্জমাল" কাব্যে লিখিয়াছিলেন—"আজ্ঞা পাইয়া রচিলাম পুস্তক পদ্মাবতী। যতেক আছিল মোর বুদ্ধির শকতি।" এই উক্তি অতি সত্য;—তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধিতে যতদুর বেড়

পাইয়াছিল, তিনি পদ্মাবতী কাব্যে তাহার কিছু বাদ দেন নাই। তিনি বয়ঃ সন্ধি বর্ণনায় একজন রসজ্ঞ বৈষ্ণব কবি, যথা—"আড় আঁখি দরশন ক্রমে ক্রমে হয়। ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু আসি সঞ্চরয়। চোর রূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে উপজয়। বিরহ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়। অনঙ্গ সঞ্চার অঙ্গে রঙ্গ তরঙ্গে। আমোদিত পদ্মগন্ধ পদ্মিনীর অঙ্গে। * * * আভেদ আছয়ে দুই কমলের কলি। না জানয়ে পরশে কোন্ ভাগ্যবন্ত অলি।" অন্যত্র "কুটিল কবরী কুসুম মাঝ। তারকা মণ্ডলে জলদ সাজ। শশীকলা প্রায় সিন্দুর ভালে। বেড়ি বিধুমুখ অলকজালে। সুন্দরী কামিনী কাম বিমোহে। খঞ্জন গঞ্জন নয়নে চাহে। মদন ধনুক ভুরু বিভঙ্গে। অপাঙ্গ ইঙ্গিত বাণ তরঙ্গে। নাসা খগ পতি নহে সমতুল। সুরঙ্গ অধর বাঁধুলী ফুল। দশন মুকুতা বিজলি হাসি। অমিয় বরিষে আঁধার নাশি। উরজ কঠিন হেম কটোর। হেরি মুনি মন বিভোর। হরিকরিকুম্ভ কটি নিতম্ব। রাজ হংস জিনি গতি বিলম্ব। কবি আলোয়াল মধুগায়। মাগন আরতি রহুক সদায়।" স্থলে স্থলে কথার বাঁধুনি জয়দেবের মত,—"বসন্তে নাগরবর নাগরী বিলাসে। বরবালা দুই ইন্দু, শ্রবে যেন সুধা বিন্দু, মৃদুমন্দ অধরে ললিত মধু হাসে। প্রফুল্লিত কুসুম, মধুব্রত ঝঙ্কৃত, হুঙ্কৃত পরভৃত কুঞ্জে রত রাসে। মলয় সমীর, সুসৌরভ সুশীতল, বিলোলিত পতি • অতি রস ভাবে। প্রফুল্লিত বনস্পতি, কুটিল তমাল দ্রুম, মুকুলিত চুতলতা কোরক জালে। যুবজন হৃদয়, আনন্দে পরিপূরিত, রঙ্গ মল্লিকা মালতি মালে।" অন্যত্র বিদ্যাপতিকে মনে পড়িবে,—"চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী, খঞ্জন গমন শোভিতা।" ঋতু বর্ণনার পদগুলি মসৃন ও ললিত, তাহা আমাদের বৈষ্ণব কবিকুলগুরুদিগের রচনার সঙ্গে গাঁথিয়া রাখার উপযুক্ত—"নিদাঘ সময় অতি প্রচণ্ড তপন। রৌদ্রত্রাসে রহে ছায়া চরণে শরণ। চন্দন চম্পক মাল্য মলয়া পবন, সতত দম্পতি পাশে ব্যাপৃত মদন।" বর্ষাকালে—"ঘোর শব্দ করিয়া মল্লার রাগ গায়। দক্রুরী শিখিনীরব অতি মনে ভায়। স্বামিসঙ্গে নানারঙ্গে নিশি বসি জাগে। চমকিলে বিদ্যুত চমকি কণ্ঠে লাগে। বজ্রপাতে কমলিনী ত্রাসিত হইয়া। ধরয় পতির গীমে অধিক চাপিয়া। কীট কুলকলরব কঙ্কণ ঝঙ্কার। শুনিয়া যুবক চিত্তে চমকিত মার।" শরৎকালে—"আসিল শরৎ ঋতু নির্ম্মল আকাশে। দোলেয় চামর কেশ কুসুম বিকাশে। নবীন খঞ্জন দেখি বড়হি কৌতুক। উপজিত দামিনী দম্পতি মনে সুখ। কুসুমিত ক্ষেত্র শয্যা অতি মনোহর। কুঙ্কুম চন্দনে লেপিয়া কলেবর। নানা আভরণ পট্টাম্বর পরিধান। যুবকের মরমে জাগয় পঞ্চবান।" শিশিরকালে—"সহজে দম্পতি মজে প্রীতের সোহাগে। হেমকান্তি দুই অঙ্গ এক হৈয়া লাগে।" হেমন্তে—"শিতলিত বাসে রবি ত্বরিতে লুকায়। অতি দীর্ঘ সুখ নিশি পলকে পোহায়। পুষ্প শয্যা মৃদু শোভা চিত্রিত বসন। বক্ষে বক্ষে এক হৈলে শীত নিবারণ।" আলোয়াল কবির বারমাস বর্ণনায়ও এই সুন্দর ও নিপুণ তুলির কর্ম্ম দৃষ্ট হইবে—যথা—

"ভাদ্রেতে যামিনী ঘোর তমঃ অতিশয়। নানা অস্ত্র আনিবার মদন ক্ষেপয়॥"—"আশ্বিনে প্রকাশ নিশি নির্ম্মল গগন। গৃহ অন্ধকার নাহি চাঁদের কিরণ॥ সকলের মতে চন্দ্র, রাহু মোর মতে। মুদিত কমল আঁখি চন্দ্রিকা উদিতে॥" কার্ত্তিকে—"পরব দেওয়ালি ঘরে ঘরে সুখ ভোগ। নিরপতি বিনে মোর ভোগ ভেল রোগ॥" ফাল্গুণে—"মোর অঙ্গ পরশি পবন যথা যায়। তরুকুল পত্র ঝরি পড়য় তথায়॥" বৈশাখে—"বিদরে মহী অরুণ প্রবলে। ভ্রষ্ট ভেল বায়ু অঙ্গ বিরহে অনলে। মিত্র হৈয়া কমল না সহে দিনমণি। পতিবিনে কেমতে সহিবে কমলিনী॥" জ্যৈষ্ঠে—"পুষ্প রেণু চন্দন ছিটায় সখিগণ। ভস্মবৎ হয় মোর অঙ্গ পরশন॥" মহাদেব বর্ণনায় আলোয়াল কবি শৈবের প্রশংসা পাইবেন,—"শিরে গঙ্গাধারা ঘটা গলে অস্থিমালা। অঙ্গে ভস্ম পৃষ্ঠেতে পরণ বাঘ্র ছালা॥ কণ্ঠে কালকূট ভালে চন্দ্রমা সুচারু। কক্ষে শিঙ্গা ভুতনাথ করেত ডুম্বুরু॥ শঙ্খের কুণ্ডলী কর্ণে হস্তেতে ত্রিশূল। ওড়ের কলিকা জিনি নয়ন রাতুল॥" এতদ্ব্যতীত নানা বিচিত্র বিদ্যাসুন্দরী ধুয়া গুলির মত গীত-ভাঙ্গা পদ পুস্তকের সর্ব্বত্র পাওয়া যাইবে। মধ্যে মধ্যে দর্শনাত্মক উচ্চভাবের বিকাশ আছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় কবি পাণ্ডিত্য ছাড়িয়া দিলে অন্তর্দৃষ্টির রাজ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম ছিলেন, যথা—"কাব্য কথা সকল সুগন্ধি ভর পুর। দূরেতে নিকট হয় নিকটেতে দূর॥ নিকটেতে দূর যেন পুষ্পেতে কলিকা। দূরেতে নিকট মধুমাঝে পিপীলিকা॥ বনখণ্ডে থাকে অলি কমলেতে বশ। নিকটে থাকিয়া ভেক না জানের রস॥" এবং ছয়ফলমুল্লুক ও বদউজ্জমালে—"উজ্জ্বল মহিমা নাহি অন্ধকার বিনে। অধর্ম্ম না হৈলে বল উত্তম কেবা চিনে॥ লবণ কারণে চিনে মিষ্ট জল সীমা। কৃপণ না হৈতো কোথা দাতার মহিমা॥ সত্য যে অসত্য দুই মতে হৈলো যত। ভাল মন্দ যে বলে না কর কর্ণগত॥ যেই পুঁজি আছে মাত্র হৃদয় ভাণ্ডার। লাজ ছাড়ি আলোয়াল ব্যক্ত কর তার॥"

পদ্মাবতী কাব্যে মুসলমানীভাব না আছে, এমন নহে; এই কাব্যে কল্পনার কতকটা অস্বাভাবিক আড়ম্বর আছে, যাহা পড়িতে পড়িতে আরব্য ও পারস্যদেশের গল্পগুলির কথা মনে হয়; রত্নসেন শুক মুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন, প্রায়ই মূর্চ্ছিত হইয়া থাকিতেন, শেষে রাজ্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে "ষোলশত রাজার কুমার হৈল যোগী।" রাজকুমারীর দুঃখ সংবাদ জানাইতে যে পক্ষী দূত হইয়া চলিল, তাহার বর্ণনায় রাজকুমারীর বিরহ ব্যথার পরিমাণ দত্ত হইয়াছে;—"দুঃখের সংবাদ লয়ে বিহঙ্গ উড়িল।

সেই দুঃখে জলদশ্যামল বর্ণ হৈল। স্ফুলিঙ্গ পড়িল উড়ি চাঁদের উপর। অন্তরে শ্যামল তাহি ভেল শশধর। উড়িতে না রিল পাখা শূঙ্গের উপর। উল্কা পাত হয় হেন বলে তারে নর। সমুদ্র উপর দিয়া করিল গমন। জলনিধি হৈল তুহি পূর্ণিত লবণ।" যখন মুসলমান কবিকে পাঠক কিঞ্চিৎ কালের জন্য হিন্দু কবি বলিয়া ভ্রম করিবেন, তখনই সহসা কল্পনার আকস্মিক জাঁকাল বিকাশে শৈশবশ্রুত পরীবানু কি দানহাসের বৃত্তান্ত স্মরণ পড়িবে, ও পদ্মাবতী কাব্য মুসলমানী কেচ্ছার আকার ধারণ করিবে।

পদ্মাবতীতে প্রথম শ্রেণীর কাব্যের গুণ দৃষ্ট হয় না; পুস্তক আগাগোড়া পড়িলে পাঠক মাঝে মাঝে সুন্দর ভাব ও সুন্দর কথা পাইবেন; কিন্তু সেই সব ললিত ভাব ও শব্দকুসুম দ্বারা মালা গাঁথা হয় নাই, অথবা গাঁথা মালা ছিঁড়িয়া পড়িলে যেরূপ কোন কুসুম ভূচ্যুত, কোন কুসুম সূত্রে অর্দ্ধ সংলগ্ন অবস্থায় পাওয়া যায়, আলোয়ালের কবিত্বসূচক অংশগুলিও সেই রূপ গল্পসূত্রে অর্দ্ধ সংযুক্ত, অর্দ্ধ বিযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহা সুচারু রূপে সম্বন্ধ হয় নাই; সেই রূপ সম্বন্ধ করা, সূতায় নানা ফুল উৎকৃষ্ট রুচি ও সৌন্দর্য্য বোধ সহকারে গাঁথা—প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর কর্ম্ম। ইহা ছাড়া প্রথম শ্রেণীর কাব্যে বড় কোন এক আদর্শ পরিষ্কার রেখায় আঁকা থাকে, সেই আদর্শের চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্রতর সৌন্দর্য্যরাশি পল্লবিত হয়। পদ্মাবতীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্যের অভাব নাই, কিন্তু বড় আদর্শের অভাব; অথচ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে যেরূপ সর্ব্বত্র সুললিত ভাষা, উজ্জ্বল হাস্য রসের দীপ্তি ও কৌতুকাবহ প্রতিভার খেলা, পদ্মাবতীর সর্ব্বত্র তাহা নাই, কচিৎ কচিৎ সেরূপ আছে ও কচিৎ কচিৎ আলোয়াল ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ। আলোয়াল রচিত "ছয়ফলমুল্লক ও বদিউজ্জমাল" পদ্মাবতী হইতে নিকৃষ্ট; কিন্তু এই দুইকাব্যেরই ভাষা সংস্কৃত-প্রধান বাঙ্গলা, যবনী ভাষার মিশ্রণ অল্প; আলোয়াল কবি এই হেতু বঙ্গীয় সাহিত্যে হিন্দুকবিগণের সমাজে আদরের সহিত গৃহীত হইবেন। এই কবি সম্বন্ধে আমাদের শেষ বক্তব্য—চট্টগ্রামের মুসলমানগণের প্রথা অনুসারে আলোয়াল এই দুই বাঙ্গলা কাব্য ফারসী অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং সংস্কৃতানভিজ্ঞ প্রকাশক হামিদুল্লাসেক ফারসী অক্ষর বাঙ্গলায় প্রবর্ত্তিত করিতে যাইয়া অনেকগুলি গুরুতর ভ্রম

করিয়াছেন,—তাহা সংশোধন করিয়া এই দুই খানা কাব্য উদ্ধার করা একান্ত আবশ্যক।

বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গল ইত্যাদি।

এই যুগের বিশেষ প্রশংসিত কাব্য ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর; কিন্তু ইহাতে অপ্রশংসার কথা অনেক আছে।

এই কাব্যে হীরামালিনী ভিন্ন অন্য কোন চরিত্র পরিষ্কার রূপে অঙ্কিত হয় নাই।—আদিরসের ভূতাশ্রিত নায়ক নায়িকার তোটক-ছন্দাত্মক রাত্রিজাগরণ বর্ণনায় তাঁহাদের চরিত্রের কোন অঙ্গ পরিস্ফুট হয় নাই। বিদ্যা ও সুন্দরের কামোন্মত্ততা ক্ষণস্থায়ী ইতর-প্রকৃতি-সুলভ উত্তেজনার ফল,—উহা চরিত্রের বিকাশ দেখায় না। বিদ্যার রূপ বর্ণনায় রূপবতীর রূপ অপেক্ষা কবির লেখনীলীলার দৌড় বেশী প্রদর্শিত হইয়াছে। সুন্দরের রাজ সভায় বক্তৃতায় ও কেবল শব্দ লইয়া ক্রীড়া,—তাহাতে সুন্দরের চরিত্র খুঁজিলে অতিশয়োক্তির একটি নিবিড় ছায়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। মশানে যখন সুন্দরের শিরোর্দ্ধে কোটালের খরশাণ খর্গ উদ্যত, তখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে অভিধান খুঁজিয়া চণ্ডী শব্দের প্রতিশব্দ বাহির করিতেছিলেন, অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার এই প্রাণান্ত অনুরাগ দৃষ্টে,—বিপদজালবেষ্টিত গণিতে ঘোর নিবিষ্ট-চিত্ত ভ্রূক্ষেপহীন আর্কমিডাসের কথা মনে হয়; হর্ষচরিতে পড়িয়াছি, আসন্ন মৃত্যু রাজা জ্বর বিকারগ্রস্ত হইয়া "হারং দেহিমে হরিণি" প্রভৃতি ভাবে কেবল যমক মিলাইতেছেন, শিক্ষা-স্পর্দ্ধিত কবিগণ বিদ্যা বুদ্ধি দেখাইবার ব্যস্ততায় বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন, মশানে পতিত সুন্দরকে দিয়া ও ভারতচন্দ্র সেই রূপ সময়ানুচিত অলঙ্কার শাস্ত্রের অভিনয় করিয়াছেন। সুন্দরের স্তবে ভক্তির কথা দুর্লভ—লিপিশক্তির পরিচয় সুলভ। সুন্দর ধরা পড়িলে বিদ্যা বিনাইয়া কাঁদিতে বসিল, তাহার ক্রন্দনে চক্ষুজল ব্যতীত সকলই ছিল—ছন্দের প্রতি সাবধানতা বিশেষ; রাম-প্রসাদী বিদ্যা সুন্দরের রাণী ও তাহার গর্ভবতী কন্যার শ্লেষপূর্ণ উত্তর পড়িয়া বিজয়গুপ্ত বর্ণিত পূর্ব্বদেশীয় বর্ব্বরগণের কথা মনে হইয়াছিল—

"জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠতারা সব করে ঠাঠা। ব্রাহ্মণ সজ্জন তারা বৈসে চর্ম্মকাটা॥"

রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর হইতে সেই অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি—

"আলো গর্ব্বের লক্ষণ সর্ব্ব। বিদ্যাবলে বাতাসে কি জন্মে গর্ভ॥ আলো উদর ডাগর তোর। বিদ্যা বলে উদরী হয়েছে মোর॥ আলো স্তনে কেন করে পয়। বিদ্যা বলে এ রোগে বাচা সংশয়॥ আলো শয়ন কেন ভূতলে। বিদ্যাবলে নিরন্তর দেহ জ্বলে॥ আলো মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম। বিদ্যাবলে নিদাঘ কালের ধর্ম্ম॥" এই "মা ও মেয়ে" প্রহসনের আর অধিক উদ্‌ঘাটিত করিতে লজ্জা বোধ হয়।

বিজাতীয় আদর্শ অনুসরণ করার দরুণই হউক কি অন্য যে কোন কারণেই হউক, বিদ্যা ও সুন্দরের চরিত্র অস্বাভাবিক হইয়াছে; কিন্তু ভারতচন্দ্র হীরামালিনীকে মূর্ত্তিমতী করিয়াছেন, এই চরিত্রের ভাব কতকটা তাঁহার স্বীয় প্রতিভার অনুরূপ, বিশেষ হীরা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্র রূপে কল্পিত না হওয়াতে, কবি তাহাকে উপলক্ষ করিয়া বাক্‌জাল বিস্তার করা আবশ্যক মনে করেন নাই; শিক্ষিত কবির চেষ্টার হাত হইতে নিস্কৃতি পাইয়া হীরামালিনী স্বভাবের বর্ণে খাড়া হইয়াছেন, বিদ্যার রূপ বর্ণনায় কবির প্রাণান্ত চেষ্টাজালে খাটি মূর্ত্তি ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, তৎপার্শ্বে হীরার রূপবর্ণনা স্থাপন করিলে পাঠক তারতম্য করিতে পারিবেন—'সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী। হেন কালে তথা এক আইল মালিনী॥ কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম। দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥ গাল ভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে। কাণে কড়ি কড়ে রাঁড়ি কথা কয় ছলে॥ চূড়া বাঁধা চুল পরিধান সাদা সাড়ী। ফুলের চুপড়ি কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥ আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে। এবে বুড়া তবু কিছু গুড়া আছে শেষে॥ ছিটা ফোঁটা মন্ত্র তন্ত্র জানে কত গুলি। চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় জানে কত ঠুলি॥ বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়। পরসী না থাকে কাছে কোন্দলের দায়॥ মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া। তুলিতে বৈকালে ফুল আইল সেই পাড়া॥"

নানা দোষ সত্ত্বে ও ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর এত আদরণীয় হইল কেন, তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি—ভারতচন্দ্রের অপূর্ব্ব শব্দমন্ত্র। বাঙ্গলা পৃথিবীর কোমলতম ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু এই কোমলতার কিরূপ আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর না পড়িলে সম্যক উপলব্ধি হইবে না; বাঁশীর রবে হরিণ ফাঁদে পড়ে, হাতী কাদাঁয় মগ্ন হয়, ভারতচন্দ্রের ললিত শব্দে মুগ্ধ হইয়া এক সময় যুবকগণ নৈতিক কূপে পড়িয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী আর দুই খানা বাঙ্গলা বিদ্যাসুন্দর পাওয়া

গিয়াছে, তাহাতে ভারতের পদলালিত্য ও অপূর্ব্ব শব্দ মন্ত্র নাই, কিন্তু দোষ গুলি সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান। এই দুই খানা বিদ্যাসুন্দর -প্রণেতা—কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ। প্রাণরাম নামক এক কবি ভারতচন্দ্রের পর আর এক খানা বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কয়েকটি কথা আছে—"বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ। বিরচিল কৃষ্ণরাম নিমতা যার বাস॥ তাঁহার রচিত পুথি আছে ঠাঁই ঠাঁই। রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই॥ পরেতে ভারতচন্দ্রের অন্নদা মঙ্গলে। রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥"

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর অবলম্বন করিয়া ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, এই অবলম্বন অর্থে এক রূপ চৌর্য্য বৃত্তি। কিন্তু প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষে ইহা দোষ নহে, প্রতিভার কর্ম্মের গূঢ় ভাঙ্গিয়া দেখিলে তাহা সংগ্রহ কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়—প্রতিভাবান্ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট সংগ্রাহক নাম বাচ্য। প্রকৃতিতে ও নূতন সৃষ্টি কিছু দেখা যায় না, শুষ্ক পল্লবের স্থলে নূতন পল্লবটির উৎপত্তি হইতেছে—উহা অতীতের পুনরাবৃত্তি মাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাসুন্দর গুলির ভাব ও ভাষা ঘষিয়া মাজিয়া ভারতচন্দ্র সুন্দর করিয়াছেন; দোমেটে মূর্ত্তির পর রং ফিরান মূর্ত্তি যেরূপ দেখায়, পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাসুন্দর গুলির পরে ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর ও ঠিক সেইরূপ দেখাইবে—নিম্নে তুলনার জন্য কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

১। কহে এক সতী, সেই ভাগ্যবতী, সুন্দর এ পতি যায় লো ঘটে॥ হৃদয় মাঝারে, রাখিয়া ইহারে, নয়ন দুয়ারে কুলুপ দিয়া। রূপ নহে কালো, নিরখিতে ভাল, দেখ্ সখি আলো আঁখি মুদিয়া॥ কহে রামা আর, গলে পরি হার, এ হার কি ছার, ফেলিলো টেনে। সাধ পুরে তবে, হেন দিন হবে, কোন্ জন কবে ঘটাবে এনে॥ কহে কোন আই, আমি যদি পাই, পালাইয়া যাই, এ দেশ থেকে। নারী কলা ফাঁদে, বাঁধি নানা ছাঁদে প্রাণ বড় কাঁদে, দেনালো ডেকে॥" রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর, নাগরী উক্তি।

১। "আহা মরি যাই, লইয়া বালাই, কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে। কহে এক জন, লয় মোর মন, এ নব রতন ভুবন মাঝে। বিরহে জ্বলিয়া, সোহাগে গলিয়া হারে মিলাইয়া পরিলো সাজে॥ আর জন কয়, এই মহাশয়, চাঁপা ফুলময় খোঁপায় রাখি। হলুদী জিনিয়া, তনু চিকনিয়া, মেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি॥" ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর নাগরী উক্তি।

২। "ডুবিল কুরঙ্গ শিশু মুখেন্দু সুধায়। লুপ্ত গাত্র জত্রমাত্র নেত্র দেখা যায়॥ নাভিপদ্ম পরিহরি মত্ত মধু পান। ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণ কুম্ভ স্থান॥ কিম্বা লোম

রাজি ছলে বিধি বিচক্ষণ। যৌবন কৈশোর দ্বন্দ্ব করিল ভঞ্জন॥" "কোন বা বড়াই কাম পঞ্চ শর তূণে। কত কোটি খর শর সে নয়ন কোণে॥" বিদ্যার রূপ বর্ণনা, রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর।

২। "কাড়ি নিল মৃগ মদ নয়ন হিল্লোলে। কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥ নাভিপদ্মে যেতে কাম কুচশম্ভু বলে। ধরিল কুন্তল তার রোমাবলী ছলে॥" "কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥" "কেবা করে কাম শরে কটাক্ষের সম। কটুতায় কোটী কোটী কালকূট কম॥" ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর' বিদ্যার রূপ বর্ণনা।

৩। উত্তম ঘটক সুন্দরের গাঁথা হার। বর কর্ত্তা কন্যা কর্ত্তা চিত্ত দোহাকার। পুরোহিত হইলেন আপনি মদন। বিদ্যালাপ ছলে বুঝি পড়াগো বচন॥ উলু দিছে ঘন ঘন পিক সীমন্তিনী। নয়ন চকোর সুখে নাচিছে নাচনী॥ বরযাত্র মলয় পবন বিধুবর। মধুকরনিকর হইল বাদ্যকর॥" "উভয়ত কুটুম্ব রসনা ওষ্ঠাধর। পরস্পর ভুঞ্জে সুধা মুখেন্দু উপর॥" "নুপুর কিঙ্কিনী জালে নানা শব্দ হয়। দুই দলে দ্বন্দ্ব যেন চন্দন সময়॥" "সস্ত্রীক আইল কাম দেখিতে কৌতুক। দম্পতীরে পঞ্চশর দিলেক যৌতুক॥" গন্ধর্ব্ব বিবাহ, রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর।

৩। বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার। গন্ধর্ব্ব বিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার॥ কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তাবর। পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর॥ কন্যা যাত্র বর যাত্র ঋতু ছয় জন। বাদ্যকরে বাদ্যকর কিঙ্কিনী কঙ্কন॥ নৃত্যকরে বেশরে নূপুরে গীত গায়। আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈল তায়॥ ধিক ধিক অধিক আছিল সখী তায়। নিশ্বাস আতসবাজি উত্তাপে পলায়। নয়ন অধর কর জঘন চরণ। দুহার কুটুম্ব সুখে করিছে ভোজন॥" গন্ধর্ব্ব বিবাহ, ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর।

৪। "কেমন পণ্ডিত বাপা জানা কিছু চাই। রাজাবলে কাট চোরে মশানে বাধাই॥ আঁখি ঠেরে আরবার করে নিবারণ।" রাজসভায় সুন্দর, রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর।

৪। "চাহে কাটিতে কোটাল চাহে কাটিতে কোটাল। নয়ন ঠারিয়া মানা করে মহীপাল॥" ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর।

৫। "অগুরু চন্দন চুয়া চাইতে চাইতে। চক্ষু ঠিকরিয়া যায় আছে কি পাইতে। জায় ফল লবঙ্গ প্রসাদ মাত্র নাই। আনিয়াছি কিন্তু কিছু বলি আমি তাই॥" মালিনীর বেসাতি, কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর।

৫। আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি। অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥ দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায় ফল। সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল॥" ভারত-চন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর।

৬। "বুঝিয়া বিদ্যার মনে বাড়িল আহ্লাদ। হেনকালে ময়ূর করিল কেকানাদ॥

সুন্দর কেমন কবি বুঝিতে পদ্মিনী। সখীরে জিজ্ঞাসা করে কি ডাকে স্বজনি॥" প্রথম মিলন—কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর।

৬। "হেনকালে ময়ূর ডাকিল গৃহপাশে। কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে॥" ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর।

কৃষ্ণরামের হাতে বিদ্যাসুন্দর এক মেটে, রামপ্রসাদের হাতে দোমেটে ও ভারতচন্দ্রের হাতে বিদ্যাসুন্দরের রং ফিরান হইয়াছিল। কংস সভায় শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিতে গেলে তৎপ্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"কংসের গায়ন যারা, যে বীণা বাজায় তারা, বীণা যে গোবিন্দ গুণ গায়।" কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের বীণায় যে গান উত্থিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারাও সেইরূপ পদার্পণমাত্র অতুল সৌভাগ্যশালী ভারতচন্দ্রের গুণ কথাই জ্ঞাপিত হইল; পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদ্বয় ন্যায্য প্রশংসা বঞ্চিত হইয়া নিঃশব্দে শ্মশানে সুপ্ত হইলেন ও সমালোচকগণের জন্য এই নীতি সূত্র ফেলিয়া গেলেন,—ভাগ্য বৃক্ষই সর্ব্বত্র ফল ধারণ করে, পরিশ্রম অনেক সময় কাঁটা বনের ন্যায় পদতল ক্ষত বিক্ষত করে মাত্র। আমরা এস্থলে কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের জীবন সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কবি কৃষ্ণরাম দাস অনুমান ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে কলিকাতা হইতে চারি ক্রোশের মধ্যে বেলঘরিয়া ষ্টেসনের আধ ক্রোশ পূর্ব্বে নিমতা গ্রামে কায়স্থকুলে জন্ম গ্রহণ করেন; তাঁহার পিতার নাম ভগবতীচরণ দাস। ১৬৮৬ খৃঃ অব্দে তিনি এক দিবস এক গোয়ালের ঘরে রজনী অতিবাহিত করেন, সেই রজনীতে ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে চড়িয়া দক্ষিণ রায় নামক দেবতা তাঁহাকে তৎসম্বন্ধীয় কাব্য রচনা করিতে স্বপ্নে আদেশ দেন, আমরা "রায় মঙ্গল" হইতে সেই অংশ ৬০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি। এই কাব্য রচনার পর কবি বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, ইহা তাঁহার কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃষ্ণরাম কবির বিদ্যাসুন্দরের যে হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছেন, তাহা ১১৫৯ সালের লেখা; এই পুঁথি লিখার সময় ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের রচনা শেষ হয় নাই,—সম্ভবত কৃষ্ণরামের কাব্য ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরের ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। কবি কৃষ্ণরাম চৈতন্যোপাসক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়, তিনি চৈতন্য বন্দনায় লিখিয়াছেন—"যথায় কীর্ত্তন হয় চৈতন্য চরিত্র। বৈকুণ্ঠ সমান ধাম পরম পবিত্র॥ তাহে গড়াগড়ি

দেয় (বেবা) প্রেমে নৃত্যকরে। জীবন সুকৃতি তার ধন্য দেহ ধরে॥ হেলায় শ্রদ্ধায় জীব কঠী ধরে যত। তাহা সবাকারে মোর প্রণাম শত শত।" *

বৈদ্যবংশোদ্ভব রামপ্রসাদ সেন হালিসহর অন্তঃপাতী কুমারহট্ট গ্রামে ১৭১৮-১৭২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন, † রামরাম সেনের দুই বিবাহ; প্রথম পক্ষে নিধিরাম নামক পুত্র, ও দ্বিতীয় পক্ষে অম্বিকা ও ভবানী নাম্নী কন্যাদ্বয় এবং রামপ্রসাদ ও বিশ্বনাথ পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা নিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের সঙ্গে রামপ্রসাদের দ্বিতীয় ভগ্নী ভবানীর পরিণয় হয়,—এই ভগ্নীর দুই পুত্র জগন্নাথ ও কৃপারামের নাম কবি উল্লেখ করিয়াছেন। রামপ্রসাদের রামদুলাল ও রামমোহন নামে দুই পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নাম্নী দুই কন্যা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কবি তাঁহার পিতামহ রামেশ্বর ও বংশের আদি পুরুষ কৃত্তিবাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; আমরা তাঁহার কাব্যে আরও জানিতে পাই যে রামপ্রসাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ ধনাঢ্য ও প্রসিদ্ধ ছিলেন;—"শিশুকালে মাতা মৈল রাজা নিল চোরে" বলিয়া কবি আক্ষেপ করিয়াছেন। কবির প্রিয় পুত্র রামদুলালের বংশ লোপ হইয়াছে। দ্বিতীয় পুত্র রামমোহনের পৌত্র ও কবির বৃদ্ধপ্রপৌত্র বাবু কালীপদ সেন এখনও বর্ত্তমান; কালীপদ সেন উড়িষ্যার অন্তর্গত আঙ্গুলে ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম্ম করিতেছেন। গত দশ বৎসর হইতে হালি সহরে কবির জন্মতিথিতে মেলা হইয়া থাকে। রামপ্রসাদ সেন কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজের সমসাময়িক, এই গুণজ্ঞ রাজা ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে রাম প্রসাদকে ১০০/ বিঘা ভূমি নিষ্কর দান করেন, তাহাতে লেখা আছে,—"গর আবাদী জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে রহ।" যে বৎসর ইংরেজগণ পলাশীক্ষেত্রে জাতীয় সৌভাগ্যধ্বজা প্রথম উত্থিত করেন, তাহার এক বৎসর পরে এই দানপত্র লিখিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র অনেক সময় কুমারহট্টে আসিতেন, তিনি রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়াছিলেন ও তাঁহাকে রাজসভায় আনিতে আগ্রহ দেখাইতেন, কিন্তু বিষয়-নিস্পৃহ

* শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "কবি কৃষ্ণরাম" শীর্ষক প্রবন্ধ, সাহিত্য ১৩০০ সন, ২য় সংখ্যা, ১১৭ পৃঃ

† "রাম রাম সেন নাম, মহাকবি গুণধাম, সদা যারে সদয় অভয়া। তৎসুত রাম প্রসাদে, কহে কোকনদপদে, কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া।" কবিরঞ্জন।

কবি স্বীয় পল্লীতে বসিয়া শ্যামা সংগীত গানে নিজে মুগ্ধ থাকিতেন ও পরকে মুগ্ধ করিতেন, তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধ পালন করেন নাই। কবি লিখিয়াছেন কুমারহট্টে রামকৃষ্ণের মণ্ডপে তিনি সিদ্ধি কামনায় যোগ করিতেন কিন্তু কোন দৈব ঘটনা হেতু সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। এবিষয়ে তাঁহার স্ত্রীর ভাগ্যবল তাঁহার নিজ অপেক্ষা বেশী ছিল বলিয়া কবি বারংবার উল্লেখ করিয়াছে,—"ধন্য দারা, স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে॥ জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদ পদ্মে তব। কহিবার কথা নহে সে কথা কি কব॥"

কথিত আছে রামপ্রসাদ জনৈক ধনী ব্যক্তির সেরেস্তায় মুহুরিগিরি করিতেন, জমিদারী সেরেস্তার হিসাবের জঙ্গলে পড়িয়া কবি মধ্যে মধ্যে হিসাব পত্রের ধারে দুএকটি গান লিখিয়া শ্রম লাঘব করিতেন; একদিন জমিদার মহাশয় সেরেস্তা পরিদর্শনের সময় মুহুরির হিসাবের খাতায়,—"আমায় দে মা তবিলদারী। আমি নেমক হারাম নই শঙ্করী॥" প্রভৃতি পদ পড়িয়া চমৎকৃত হইলেন, ও কবিকে ৩০৲ টাকা পেন্সন দিয়া ঘরে যাইয়া শ্যামা সংগীত লিখিতে উপদেশ দিলেন। তদবধি কবি কুমারহট্ট গ্রামে তাঁহার সংগীত মুক্তাবলী ছড়াইতে লাগিলেন, শিকলকাটা পাখীর ন্যায় কবি প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুধামাখা গানে জগতকে সুখী করিলেন।

প্রাগুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন আর একজন ধনী ব্যক্তি তাঁহাকে কাব্য লিখিতে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, ইঁহার নাম রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়; ইনি কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজের পিসা শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা ছিলেন। কবি এই রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের আদেশে "কালীকীর্ত্তন" রচনা আরম্ভ করেন; সে কথা তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—"শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন। রচে গান মোহান্ধের ঔষধ অঞ্জন।" ভারতচন্দ্র ও এই রাজকিশোর মহাশয়ের গুণ জ্ঞাপক এক পংক্তি কবিতা লিখিয়াছেন,—"মুখ রাজকিশোর কবিত্ব কলাধর।" (অন্নদামঙ্গল)। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর ৭ বৎসর পূর্ব্বে, যে বৎসর রোহিলাদিগকে উৎসন্ন করিয়া ইংরেজ সৈন্য প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন, সেই বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়।

কেহ কেহ বলেন রামপ্রসাদের রচিত 'বিদ্যাসুন্দর', তাঁহার 'কালিকা-মঙ্গলে'র অন্তর্গত; এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে, কারণ বিদ্যাসুন্দর কাব্য

সকল কবিই কালী নামাঙ্কিত মলাটে পুরিয়া শোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দরের নাম 'কালিকামঙ্গল', ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর 'অন্নদামঙ্গলের' অন্তর্বর্ত্তী; এইমত সম্পর্কে আমাদের একমাত্র ও অতি গুরুতর আপত্তি এই যে কালিকামঙ্গল পাওয়া যায় নাই। কালীকীর্ত্তন ও কালিকামঙ্গল এক কাব্য বলিয়া বোধ হয় না; কালীকীর্ত্তন একখানা গীতি কাব্য, ইহার মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের পালার স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকা সম্ভাবিত নহে।

রামপ্রসাদ কোন স্থলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কি তাঁহার পেন্সন দাতা জমিদার মহাশয়ের নাম উল্লেখ করেন নাই; রাজকিশোর মুখোর আজ্ঞাক্রমে কালী কীর্ত্তন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহার নামটি উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অতি সংক্ষেপে ও অসম্পূর্ণভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। যে সময় রায় গুণাকর প্রভৃতি কবিগণ আশ্রয়দাতা-দিগকে কল্পনার স্বর্ণ খট্টায় স্থাপিত করিয়া স্বর্গ মর্ত্তের যাবতীয় উপমার উপঢৌকন দিতেছিলেন, সেই সময়ে রামপ্রসাদের নীরব কৃতজ্ঞতা প্রশংসনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

রামপ্রসাদের গানের এক শত্রু ছিল, এই ব্যক্তি আজু গোসাঞি; ইনি রামপ্রসাদী গানের সময়ে সময়ে যে টিপ্পনী করিতেন তাহা বেশ হাস্যরস-কর, যথা রামপ্রসাদের গান "এ সংসার ধোকার টাটী। ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি ওরে ক্ষিতি বহ্নি বায়ু জল শূন্যে অতি পরিপাটী॥" ইত্যাদি, তদুত্তরে আজু গোসাঞের গান,—"এই সংসার রসের কুটী, খাই দাই রাজত্বে বসে মজা লুটি। ওহে সেন নাহি জ্ঞান, বুঝ তুমি মোটামুটি। ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটী॥"

রামপ্রসাদের সঙ্গে সিরাজোদ্দৌলার সাক্ষাৎ এবং তাঁহার গান শুনিয়া নবাব বাহাদুরের অনুগ্রহ প্রকাশ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে; ধর্ম্ম সম্বন্ধে কাহারও একটু প্রসিদ্ধি হইলে তৎসম্পর্কে কতকগুলি অমানুষী কাণ্ড কারখানার গুজব উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। কালী কন্যারূপে কবির বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, কাশীতে যাইতে অনুমতি দিয়া পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, কালী নাম করিতে করিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া তাঁহার তনুত্যাগ হয়,—এইসব জনশ্রুতির বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া ছাপাইতে অনেক সময় ও ব্যয়ের আবশ্যক, আমাদের তাহা এখন আয়ত্ত নাই।

যাঁহারা কৃষ্ণচন্দ্র রাজার দূষিত রুচির সান্নিধ্যে ছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ স্বভাবতঃ ধর্ম্ম প্রবণ সত্বেও কথঞ্চিৎ সংক্রামিত না হইয়া যান নাই,—ইহার সাক্ষী রামপ্রসাদ। আমরা রামপ্রসাদের নির্ম্মল ভক্তি বিহ্বলতায় মুগ্ধ,তাঁহার উন্নত চরিত্রের সর্ব্বদা পক্ষপাতী; কিন্তু ইহা সত্বেও তৎপ্রণীত বিদ্যাসুন্দরের বীভৎস রুচির সমর্থন করিতে দাঁড়াইব না; ভারতচন্দ্রের রচনা যে গর্হিত রুচি দোষ দুষ্ট, রামপ্রসাদ তাহার পথ প্রবর্ত্তক। ভারতচন্দ্রের মত রামপ্রসাদ বীভৎস আদিরসে সৌন্দর্য্য মাখিতে পারেন নাই; কিন্তু তাহা শক্তির অভাব জন্য,—ইচ্ছার ত্রুটিহেতু নহে।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের অপর নাম কবিরঞ্জন। কবিরঞ্জনে রামপ্রসাদের সংস্কৃত বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় আছে, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত বিদ্যার উত্তম পরিপাক হয় নাই; বাঙ্গলা পদগুলির মধ্যে সংস্কৃত কথাগুলির উত্তম সমন্বয় হয় নাই,—উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি স্থল তুলিতেছি,—"সহজে কলঙ্কী সে তবাস্য সম নহে।" "জলে স্থলে চাস্তরীক্ষে।" "ক্ষেপ করে দশদিক্ষু লোষ্ট্র বিবর্দ্ধনে।" "পূর্ণচন্দ্র শোভা যেন পিবতি চকোর।" কালী কীর্ত্তনে, "বারে বারে ডাকে রাণী জননী জাগৃহি জাগৃহি। আগত ভানু রজনী চলি যায়। উঠ উঠ প্রাণ গৌরী, এই নিকটে গিরি, উঠগো এবমুচিতমধুনা তব নহি নহি। সূত মাগধ বন্দী, কৃতাঞ্জলি কথয়তি, নিদ্রাং জহিহি জহিহি॥" এইরূপ সংস্কৃত পদের ঢেউ লাগিয়া বাঙ্গলা কাব্য কটু হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও রামপ্রসাদ সংস্কৃতের সাহায্য গ্রহণ করিতে যাইয়া উপহাস জনক অযোগ্যতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু রামপ্রসাদে যে স্থলে শিক্ষার অভিমান ত্যাগ করিয়াছেন,—সে স্থলে তিনি বাগ্দেবীর আদরের কবি; তাঁহার গানে প্রাণের কথা সহজ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে; এই যুগের শিক্ষিত সমাজের রুচি বিদ্যা বুদ্ধি দেখাইতে ব্যগ্র ছিল, এই দুষ্ট রুচির সংক্রামনে যখন রামপ্রসাদের ন্যায় ভাবপ্রধান কবিকে ও আমরা লোক মনো রঞ্জনার্থ শব্দ লইয়া বিফল ক্রীড়া করিতে দেখি, তখন আমাদের ইডেন গার্ডেনে এডাম এবং ইভের মনোরঞ্জনার্থ হস্তীর চেষ্টা মনে পড়ে—

> "The unwieldy Elephant,
> To make them mirth, used all his might, and wreathed
> His lithle proboscis." Paradaise Lost Book IV.

রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরের ভাষাকে অলঙ্কার পরাইয়া সুন্দরী করিতে চেষ্টা

করিয়াছেন, "গোযুগে গলিত ধারা তৃষ্ণা নিষ্ঠাগত" প্রভৃতি ভাবের অনুপ্রাস বন্ধন দেখিয়া মনে হয় যেন উন্মত্তা রাধিকার * ন্যায় তিনি পদের অলঙ্কার গলে ও কর্ণের দুল চুলে লাগাইয়াছেন, ভারতচন্দ্র সেইসব অলঙ্কার লইয়া ভাষাকে সাজাইয়াছেন, —একটু সাধারণ সৌন্দর্য্য বোধের অভাবে রামপ্রসাদের বিরাট চেষ্টা পণ্ড হইয়া গিয়াছে, সেই পণ্ড শ্রমের শ্মশানে অদ্য ভারতচন্দ্রের যশোমন্দির উত্থিত হইয়াছে।

কিন্তু শিক্ষার ধূম্রপটলের পুঞ্জীকৃত আঁধার ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে রামপ্রসাদ সুন্দর পদ গাঁথিবার পটুতা দেখাইয়াছেন, মেঘ-বিমুক্ত কিরণ-রাশির ন্যায় সেইসব স্থল তৃপ্তিপ্রদ; আমরা কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে দুইটি স্থল উঠাইয়া দেখাইতেছি,—

(১) "গিরিবর আর আমি পারি নাহে প্রবোধ দিতে উমারে। উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন পান, নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥ অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী বলে উমা ধরে দে উহারে। কাঁদিয়া ফুলাল আঁখি মলিন ও মুখ দেখি, মায়ে ইহা সহিতে কি পারে। আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়া কর অঙ্গুলী, যেতে চায় না জানি কোথারে॥ আমি বলিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়, ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে॥" কালীকীর্ত্তন।

(২) "প্রথম বয়সে রাই রসরঙ্গিণী। ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী॥ রাই বদন চেয়ে ললিতা বলে। রাই আমার মোহন মোহিনী॥ রাই যে পথে প্রয়াণ করে, মদন পলায় ডরে, কুটিল কটাক্ষ শরে, জিনিল কুসুম শরে। কিবা চাচর সুন্দর কেশ, সখি বকুলে বানাইল বেশ। তার গন্ধে অলিকুল, হইয়া আকুল, কেশে করেছে প্রবেশ। নব ভানু ভালেতে বিকাশ। মুখপদ্ম করেছে প্রকাশ॥" কৃষ্ণকীর্ত্তন।

রামপ্রসাদ বৈষ্ণব বিদ্বেষী ছিলেন, বৈষ্ণব নিন্দায় একটু বিদ্রূপ শক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ,— "খাসা চীরা বহির্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে। চিকন গুধড়ী গায় বাঁকা কোৎকা হাতে॥ মুগ্ধ গুপ্ত ছড়া গলে ঠাই ঠাই ছাব। দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টি ছাড়া ভাব॥ পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট। ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট॥ এক এক জনার ধুমড়ী দুটি দুটি। দুই চক্ষু

* "রাই সাজে, বাঁশী বাজে, না পড়িল উল, কি করিতে কিনা করে সব হৈল ভুল॥ মুকুরে আচরে রাই বাঁধে কেশ ভার, পদে বাঁধে ফুলের মালা না করে বিচার॥ করেতে নূপুর পরে জঙ্ঘে পড়ে তাড়। গলাতে কিঙ্কিণী পরে, কটিতটে হার॥ চরণে কাজল পরে নয়নে আলতা। হিয়ার উপরে পরে বঙ্ক রাজপাতা॥ শ্রবণে করয়ে রাই বেশর সাজনা॥ নয়ন উপরে করে বেণীর রচনা॥ বংশীদাসে বলে যাই বলিহারি। রাই অনুরাগের বালাই লয়ে মরি॥"

লাল গাঁজা ধুনিবার ছুট। ভুগলাদি তাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে। শ্রীরামচন্দ্র অদ্বৈত বিষম ডেকে উঠে। সে রসে রসিক নবশাক লোক যত। উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবত। সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী। ভালমতে সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি। গোষ্ঠীশুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজির কাছে। মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে।" বিদ্যাসুন্দর। কালীকীর্ত্তনে রামপ্রসাদ মহাশয় কালী ঠাকুরাণীকে দিয়া নৃত্য করাইয়াছেন, তাঁহার রাসলীলা ও গোষ্ঠ বর্ণনা করিয়াছেন; তাঁহার আরাধ্যা দেবতা যে কৃষ্ণের মত সকল কার্য্য করিতেই পারেন, কালীকীর্ত্তন দ্বারা তিনি এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন; কালীর রাসলীলা ও গোষ্ঠ বর্ণনা পড়িয়া শাক্ত মহাশয়গণ অবশ্যই প্রীত হইয়াছিলেন কিন্তু আজু গোসাঞি এই মধুরভাবে একটু ঠাট্টার অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের গাঢ় রস সম্ভোগে বাধা দিয়াছিলেন যথা,—"না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁঠালের আম সত্ত্ব, মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে। তা যদি হইত, যশোদা যাইত, গোপালে কি পাঠায় রে॥" স্ত্রী লোকের যদি গোষ্ঠে যাইতে বিধান থাকিত, তবে স্নেহাতুরা যশোদা গোপালের গোষ্ঠে সম্মত না হইয়া নিজেই যাইতেন। কৃষ্ণ কীর্ত্তন সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই, যে দুই পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়াছে তাহা বেশ মধুর।

কিন্তু রামপ্রসাদের যশ কাব্য রচনার জন্য নহে, তিনি গান রচনা করিয়া এক সময় বঙ্গদেশ মাতাইয়াছিলেন, তাহাতে কালীদেবী স্নেহময়ী মার ন্যায় চিত্রিত হইয়াছেন, কবি মাসম্বল শিশুর ন্যায় মধুর গুণ গুণ স্বরে কখনও তাঁহার সহিত কলহ করিতেছেন, কখনও মায়ের কর্ণে সুধামাখা স্নেহ কথা বলিতেছেন; জননীর ক্ষিপ্ত ছেলের মত কখনও মাকে গালি দিতেছেন—সেই কপট গালি স্নেহ, ভক্তি ও আত্ম সমর্পনের কথা মাখা,—এখানে রামপ্রসাদ সংস্কৃত ব্যুৎপন্ন কবি নহেন, এখানে তাঁহার ধুলিধুসর নেংটা শিশুর বেশ,—শিশুর কথা; তাহা পণ্ডিত ও কৃষকের তুল্য বোধগম্য তাহাদের সরল অশ্রুপূর্ণ আবদারে সাধকের কণ্ঠ প্রতিপন্ন হয়। আমরা গীতি শাখায় এই গানের বিষয় আবার সংক্ষেপে আলোচনা করিব। রামপ্রসাদ তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে লিখিয়াছিলেন,—'গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত।' তাঁহার রচিত কাব্য প্রকৃত পক্ষেই ভারতচন্দ্রের দ্বারা ভগ্ন হইয়া আজ ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে,—তিনি তাহা ফেলিয়া গানে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, বঙ্গের লোকগণ ও কাব্য ফেলিয়া তাঁহার গান গুলি লইয়া ব্যস্ত হইয়াছিল,—

"যাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥"

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অনুমান ১৭১২ খৃঃ অব্দে ভুরসুট পরগণাস্থ হুগলীর অন্তর্গত পেঁড়ো বসন্তপুরগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণরায় ভুরসুটের জমিদার ছিলেন, তিনি রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। কথিত আছে কোন ভূমি সংক্রান্ত সীমা নির্ণয়ের তর্ক উপলক্ষে নরেন্দ্র নারায়ণ রায় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের মাতা মহারাণী বিষ্ণু কুমারীর প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করেন। মহারাণী এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া আলমচন্দ্র ও ক্ষেমচন্দ্র নামক রাজপুত সেনাপতিদ্বয়কে নরেন্দ্র নারায়ণের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন, তাহারা বহুসৈন্য লইয়া নরেন্দ্র রায়ের অধিকারস্থ 'ভবানীপুরগড়' ও 'পেঁড়োরগড়' প্রভৃতি স্থান বলপূর্ব্বক দখল করিয়া লয়।

নরেন্দ্র রায় ইহার পর অতি দরিদ্র হইয়া পড়িলেন; ভারতচন্দ্র তাঁহার মাতুলালয় 'নাওয়াপাড়া' গ্রামে যাইয়া তাজপুরস্থ টোলে কিছুকাল সংস্কৃত পড়িলেন ও অবশেষে মণ্ডলঘাট পরগণার সারদাগ্রামে কেশরকুনি আচার্য্য-দিগের বাড়ীর একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতা মাতা ও ভ্রাতাগণ এই বিবাহে তাঁহার উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন, বিবাহের সময় তাঁহার ১৪ বৎসর মাত্র বয়স ছিল। গুরুজন দ্বারা তিরস্কৃত অভিমানী কবি গৃহত্যাগ করিয়া হুগলীর অন্তর্গত দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সী নামক জনৈক ধনাঢ্য কায়স্থের শরণাপন্ন হন, তাঁহার আনুকুল্যে তিনি ফার্শি শিক্ষা করেন; এই মুন্সী মহাশয়ের বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজো-পলক্ষে পঞ্চদশ বর্ষীয় কবি স্বকৃত 'সত্যপীরের কথা' পাঠ করিয়া উপ-স্থিত শ্রোতাগণকে মুগ্ধ করেন; এই সময় তিনি দুইখানা সত্যপীরের উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একখানা চৌপদী ছন্দে রচিত হইয়াছিল, এই পুথির শেষে সময় নির্দ্দেশ করা আছে,—"ব্রত কথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা।" অর্থাৎ ১১৩৪ সাল (১৭২৭ খৃঃ)। ইহার পরে ভারতচন্দ্র পুনরায় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, এবার তাঁহার পিতা মাতা ও ভ্রাতাগণ তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে নরেন্দ্র রায় পুনশ্চ বৰ্দ্ধমানাধিপতি হইতে কিছু জায়গা ইজারা লইয়াছিলেন, ভারতচন্দ্র রাজস্বাদি যথা সময়ে রাজসরকারে প্রদান করিতে উপদিষ্ট হইয়া বর্দ্ধমান প্রেরিত হইলেন, কিন্তু তথায় আকস্মিক কোন গোলযোগে পড়িয়া কারারুদ্ধ

হন। কারা হইতে কৌশলে উদ্ধার পাইয়া ভারতচন্দ্র শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন, তথায় শিবভট্ট নামক সুবাদারের অনুগ্রহে পাণ্ডাগণের কর হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বিনা মূল্যে প্রতিদিন এক একটি 'বলরামী আটকে' প্রাপ্ত হন; এই সময়ে তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনুরাগ জন্মিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু তাঁহার লেখায় সেই অনুরাগ মধ্যে মধ্যে একটি ওষ্ঠচাপা শ্লেষে পরিণত হইতে দেখা যায়,—"চল যাই নীলাচলে। খাইয়া প্রসাদ ভাল, মাথায় মুছিব হাত, নাচিব গাইব কুতুহলে।" এই লেখায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ তীর্থের প্রতি কবির বেশ একটু সম্ভ্রমপূর্ণ পরিহাস খেলিয়াছে। যাহা হউক কবি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি এতদূর ৹ কৃপালু হইলেন যে, তিনি বৃন্দাবন যাইয়া বৈরাগী সাজা ঠিক করিলেন, পথে হুগলীস্থিত খানাকুল গ্রামে শ্যালী-পতির বাড়ী, এই মহাশয় নবীন সন্ন্যাসীকে ফিরাইয়া আনিলেন; অতঃপর বৃন্দাবন না যাইয়া কবি শনৈঃ শনৈঃ পদব্রজে স্বীয় শ্বশুরবাড়ী সারদা গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

কিছুকাল শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া ও তাঁহার স্ত্রীকে সেস্থান হইতে নিজ বাটীতে পাঠাইতে নিষেধ করিয়া, কবি ফরাশডাঙ্গায় উপস্থিত হন; তথায় বিখ্যাত দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়া কতকদিন অতিবাহিত করেন। এই ব্যক্তি ভারতচন্দ্রকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে ৪০৲ টাকা বেতনে সভা কবি নিযুক্ত করেন, এই রাজসভায় তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভার বিকাশ পায়, কিন্তু তাহা ব্যভিচারী হয়—তাঁহার চণ্ডী-পূজার মঠ স্বরূপ বিদ্যাসুন্দরের পালা বিরচিত হয়, ও তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ কতকগুলি স্নিগ্ধমধুর শ্লেষাত্মক ধূয়াতে পরিণত হইয়া যায়। বৃন্দাবনের পথফের্ত্তা কবি বিদ্যাসুন্দর রচনা আরম্ভ করেন, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে এই প্রসিদ্ধ পুস্তক শেষ হয়; ইতিমধ্যে রাজা কবিকে মূলাযোড়গ্রাম ইজারা দিয়া তাঁহার বাটী নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আনুকূল্য করেন, কিন্তু সেইস্থান কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজকে শীঘ্রই বর্দ্ধমান রাজার কর্ম্মচারী রামদেব নাগের নিকট পত্তনি দিতে হয়; এই নাগ মহাশয়ের অত্যাচার সহ্য করিয়া কবি অতি সুন্দর নাগাষ্টক রচনা করেন, এই সংস্কৃত কবিতাটির একদিকে হাসি, অপর দিকে কান্না, উহা অম্ল মিষ্ট; কৃষ্ণচন্দ্র উহা পড়িয়া হাসি রাখিতে পারেন নাই

এবং দয়ালু হইয়া কবিকে আনরপুরের গুস্তে গ্রামে ১০৫/ বিঘা এবং মুলাযোড়ে ১৬/ বিঘা ভূমি নিষ্কর প্রদান করেন। ৪৮ বৎসর বয়সে ১৭৬০ খৃঃ অব্দে, পলাশী যুদ্ধের তিন বৎসর পরে, মহাকবি ভারতচন্দ্র বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করেন; কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ তাঁহার প্রিয় কবিকে "রায় গুণাকর" উপাধি দিয়াছিলেন।

রায় গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ; এই অন্নদামঙ্গল তিনভাগে বিভক্ত; প্রথমভাগে দক্ষযজ্ঞ, শিব বিবাহ, ব্যাসের কাশী নির্ম্মাণ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, ভবানন্দের জন্ম বিবরণ প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে, দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যাসুন্দর পালা, ও তৃতীয় ভাগে মানসিংহ কর্ত্তৃক যশোরবিজয়, ভবানন্দ মজুমদারের দিল্লী গমন, সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত তর্ক, দিল্লীতে প্রেতাধিকার ও ভবানন্দ মজুমদারের দেশে প্রত্যাবর্ত্তন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। অন্নদামঙ্গল ছাড়া তিনি রসমঞ্জরী, অসম্পূর্ণ চণ্ডী নাটক, ও বহু সংখ্যক হিন্দী বাঙ্গলা ও সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

আমরা ভারতচন্দ্রের কবিতা ভাবের গুরুত্ব হিসাবে অতি নিকৃষ্ট মনে করি; বিদ্যাসুন্দর সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি; অপরাপর কাব্যেও কবি জীবনের কোন গূঢ় সমাস্যা কি কঠোর পরীক্ষা উদ্ঘাটন করিয়া উন্নত চরিত্র বল দেখান নাই; 'নিবাত নিষ্কম্পদীপ শিখার' ন্যায় মহাযোগী মহাদেবকে ভারতচন্দ্র একটা বাদিয়ার মত খাড়া করিয়াছেন, শিশুগুলি তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে,—"কেহ বলে জটাইতে বার কর জল। কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥ কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া। ছাই মাটী কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥" শ্রদ্ধাস্পদ মহাদেব মহাশয়ের এই অবমাননা একজন শিবশক্তি উপাসক কবির যোগ্য হয় নাই। তারপর নারদ ঋষি কলহের দেবতা, ঢেকি বাহণে আসিয়া সাপের মন্ত্র বকিতেছেন, যে নারদের নাম শুক প্রহ্লাদ হইতে উচ্চে, তাঁহার এই দুর্গতি দেখিয়া ভাগবতগণ কবিকে প্রশংসা করিবেন না। মেনকা উমার মা, ইনি বঙ্গের ঘরের আদর্শ জননী; যশোদা ও মেনকার অশ্রুপূর্ণ অপত্য স্নেহে বঙ্গের স্নেহাতুরা মাতাগণের প্রাণের ব্যগ্রতা একটি নির্ম্মল ধর্ম্মভাবে উন্নীত হইয়াছে, ভারতচন্দ্রের হস্তে মেনকা চিত্র কি বিকটরূপ ধারণ করিয়াছে দেখুন,—

"ঘরে গিয়ে মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয়। হাত নাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছেড়ে কয়। ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদ অ.ল্পেয়ে। হেনবর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥" যাহা হউক, স্বর্গের উচ্চ আদর্শের সন্নিহিত না হইলেও ঘরের কতকগুলি দুঃখচিত্র এইসব দেববর্ণন উপলক্ষে চিত্রিত হইয়াছে; "উমার কেশ চামর ছটা, তামার শলা বুড়ার জটা। উমার মুখ চাঁদের চুড়া। বুড়ার দাঁড়ী শনের নুড়া॥" কিম্বা 'আমার উমার দন্ত মুকুতা গঞ্জন। বায়ে নড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দর্শন" প্রভৃতি পাঠ করিলে মনে হয় দ্বিতীয়ার শশীকলার ন্যায় সুন্দরী কুমারীগণ সামাজিক অত্যাচারে বুড়া দাঁত লড়া স্বামীর হাতে পড়িয়া যে বিষদৃশ খেলার অভিনয় করিত, কবির চক্ষে সেই চিত্রের পূর্ণভাব বিরাজ করিতেছিল, তাই তিনি শিব প্রসঙ্গকে আশ্রয় করিয়া সমাজের এক অধ্যায় উদ্ঘাটন করিয়াছেন। পিতা মাতা কিন্তু অর্থ পাইয়া অনেক সময় "বাঘ ছাল দিব্য বস্ত্র, দিব্য পৈতা ফণী" বলিয়া দাঁত লড়া বরের নব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতেন।

শিব-পার্ব্বতীর কলহের আরম্ভে,—"শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল। আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥" হইতে শ্রীশিবের পরাজয়-সূচক—"ভবানীর কটুভাবে, লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে, ক্ষুধানলে কলেবর দহে॥ কেলা হৈল অতিরিক্ত, পিত্তে হৈল গলা তিক্ত, বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে॥" ইত্যাদিরূপ ব্যাপারটিতে দরিদ্র স্বামী ও পাকাগিন্নির নিত্য গৃহ কান্নার অভিনয় শ্লেষ ও বিদ্রূপের বর্ণে ফলিয়া বড় সুন্দর হইয়াছে। এই ভাবের আরও অনেক দৃশ্য কবির তুলিতে উৎকৃষ্টরূপ অঙ্কিত হইয়াছে; কিন্তু কোথাও ভাবের গুরুত্ব নাই, কোথাও কবি হৃদয় ছুঁইতে পারিতেছেন না; একখানা সুন্দর ছবি দেখিতে চক্ষুর যে তৃপ্তি, ভারতের কবিতা পাঠে সেইরূপ তৃপ্তিলাভ সম্ভব, কিন্তু চিত্রকর হইতে কবির উচ্চতর প্রশংসা প্রাপ্য; চিত্রকরের চিত্র কবির মন্ত্রপূত তুলির স্পর্শে প্রাণ পায়, ভারতচন্দ্রের তুলি প্রাণদান করিতে পারে নাই। তাঁহার কাব্যে কোন স্থানেই হৃদয়ের ব্যাকুলতা নাই, হৃদয়ের মর্ম্ম স্পর্শী দুঃখ কি স্নিগ্ধ সুখধারা তাঁহার কাব্যের কোন অংশ পবিত্র করে নাই।

কিন্তু বোধ হয় এই ভাবে ভারতের গুণবিচার করিলে তাঁহার প্রতি সুবিচার হইবে না; ভাব-যুগ গতে সাহিত্যে শব্দ-যুগ প্রবর্ত্তিত হওয়া স্বাভাবিক, ভারতচন্দ্রের ভাব বিচার না করিয়া ভাষা বিচার করিলে তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে; তাঁহার মত কথায় চিত্ত হরণ করিতে

প্রাচীনকালের অন্য কোন কবি সক্ষম হন নাই। তিনি উৎকৃষ্ট শব্দ-কবি; এই শব্দমন্ত্র কি পদার্থ তাহা নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি পাঠে প্রতিপন্ন হইবে, 'ম'কার, 'ল'কার প্রভৃতি কোমল অক্ষর দ্বারা যে যাদু প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা শ্রুতির অমৃত, তাহা পক্ষীর কাকলীর ন্যায় অর্থশূন্য হইয়াও চিত্তবিনোদনে ক্ষমাবান,—

(১) "কল কোকিল, অলিকুল বকুল ফুলে। বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে॥ কমল পরিমল, লয়ে শীতল জল, পবনে চল ঢল, উছলে কুলে॥ বসন্ত রাজা আনি, ছয় রাগিণী রাণী, করিলা রাজধানী অশোক মূলে॥ কুসুমে পুনঃপুনঃ, ভ্রমর গুণগুণ, মদন দিলা গুণ ধনুক হুলে॥ যতেক উপবন, কুসুমে সুশোভন, মধু মুদিত মন ভারত ভুলে॥" অন্নদামঙ্গল।

(২) শুনলো মালিনী কি তোর রীতি। কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি॥ এত বেলা হৈল পূজা না করি। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥ বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে। কালি শিখাইব মায়ের আগে॥ বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট। রাঁড় হৈয়ে যেন ষাঁড়ের নাট॥ রাত্রে ছিল বুঝি বঁধুর ধুম। এতক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম। দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা। মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস হেলা॥ কি করিবে তোরে আমার গালি। বাপারে বলিয়া শিখাব কালি॥ হীরা থর থর কাঁপিছে ডরে। ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে॥ কাঁদি কহে শুন রাজকুমারী। ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি॥ চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা। তোমার কাজে কি আমার হেলা॥ বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ। করিনু ভালরে হইল মন্দ। ভ্রম বাড়িবারে করিনু শ্রম। শ্রম বৃথা হৈল ঘটিল ভ্রম॥ বিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ। অস্ত গেল রোষ উদয় রস॥ বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার। এ গাঁথনি আই নহে তোমার॥ পুনঃ কি যৌবন ফিরে আইল। কিবা কোন বঁধু শিখায়ে গেল॥ হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে। যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে॥" বিদ্যাসুন্দর।

(৩) "জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংস দানব ঘাতন। জয় পদ্মলোচন, নন্দ নন্দন, কুঞ্জকাননরঞ্জন॥ জয় কেশি মর্দ্দন, কৈটভার্দ্দন, গোপিকাগণ মোহন॥ জয় গোপ বালক, বৎস পালক, পুতনা বক নাশন॥" অন্নদামঙ্গল।

শেষ পদটিতে ও তদ্রূপ অপরাপর বহুপদে দেখা যাইবে, ভারতচন্দ্রের রচনায় সংস্কৃত ও বাঙ্গলার হরগৌরী মিলন হইয়া গিয়াছে, এই পরিণয় ঘটাইতে তিনি রামপ্রসাদের ন্যায় গলদঘর্ম্ম হইয়া পড়েন নাই। হাসিয়া খেলিয়া যাহা করিয়াছেন, রামপ্রসাদ এত পরিশ্রম করিয়াও তাহা পারেন নাই। ভারতচন্দ্রের লিপি চাতুর্য্যের গুণ এই, তাহাতে শ্রমজনিত একটি স্বেদবিন্দু ও পাঠকের নেত্রগোচর হইবে না, শিশুর হাসি ও পাখীর ডাকের

ন্যায় তাহা আয়াস ও আড়ম্বর-শূন্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণনাগুলির মধ্যে স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল প্রতিভা ফুটিয়া ছোট ছোট ঘটনা ও চরিত্র চিত্রের ন্যায় সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। ব্যাসের কাশী নির্ম্মাণ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি, ভবানন্দ মজুমদারের উপাখ্যান, তাঁহার দুই স্ত্রীর স্বামী লইয়া দ্বন্দ্ব—এই সমস্ত ছোট ছোট বিষয় পরিহাসরসে মধুর ও আমোদকর হইয়াছে।

এস্থলে বলা উচিত বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বররুচিকৃত কাব্যে উজ্জয়ণী-নগরে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে; কৃষ্ণরাম ও ঘটনা-স্থান বর্দ্ধমান বলিয়া বর্ণন করেন নাই। রামপ্রসাদ বীরসিংহকে বর্দ্ধমানের রাজা করিয়াছেন, তৎপথাবলম্বী ভারতচন্দ্র ও বর্দ্ধমান স্থির রাখিয়াছেন, এই স্থান নির্দ্দেশে প্রতারিত হইয়া কেহ কেহ এখনও সুড়ঙ্গ দেখিতে বর্দ্ধমান ভ্রমণ করেন। বর্দ্ধমানের বিদ্যার সুরঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে বিদ্যাসুন্দরের প্রবাদ দেশে প্রচলিত থাকা সম্ভব, আমরা প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে কবি আলোয়ালকে এই সুরঙ্গের বিষয় উল্লেখ করিতে দেখিতেছি, যথা 'ছয়ফলমুল্লুক ও বদিউজ্জমাল' পুস্তকে—"বিদ্যার সুরঙ্গ আদি, সিন্ধু জগন্নাথ নদী, একে একে সব বিচারিল।" এস্থলে বর্দ্ধমানের উল্লেখ নাই। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মূল ঘটনা ঠিক থাকিলেও কবিগণের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে অনৈক্য আছে, কৃষ্ণরাম মালিনীকে বিমলা নামে অভি-হিত করিয়াছেন,—সুন্দরের বীরসিংহ নগরীতে প্রবেশ সম্বন্ধে ও তাঁহার গল্প একটু স্বতন্ত্র রকমের, রামপ্রসাদ বিদু ব্রাহ্মণী নামক একটি নব চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন ও চোর ধরা উপলক্ষে ভারতচন্দ্রের মত উপায় বর্ণন করেন নাই। যাহা হউক এরূপ পার্থক্য অতি সামান্য, মূল গল্পটি একরূপ। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ডিঁগুসাইীর নীলমণি কণ্ঠাভারণ গায়েন কর্ত্তৃক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সর্ব্ব প্রথম গীত হয়। ভারতচন্দ্রের পরে প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক কবি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন, এই ব্যক্তি পাগলের ন্যায় নদীর তীরে বসিয়া কূপ খনন করিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের ছোট ছোট কবিতাগুলির সর্ব্বত্রই কথার বাঁধুনি প্রশংসনীয় ও পদ মধুমাখা; 'অনুকূল' শীর্ষক ক্ষুদ্র কবিতাটি তুলিয়া দেখাইতেছি, ইহা তাঁহার রসমঞ্জরীতে পাওয়া যাইবে,—"ওলো ধনি প্রাণধন, শুন মোর নিবেদন

সরোবরে স্নান হেতু যেওনালো যেওনা। যদ্যপি বা যাও ভুলে, অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে, কমল কানন পানে চেওনালো চেওনা। মরাল মৃণাল লোভে, ভ্রমর কমল ক্ষোভে, নিকটে আইলে ভয় পেওনালো পেও না। তোমা বিনে নাহি কেহ, ঘামে পাছে গলে দেহ, বায় পাছে ভাঙ্গে কটি যেওনা লো যেও না।"

এই বিকৃতিরুচিও পদলালিত্য কাব্য সাহিত্যের আদর্শ হইল। গীতি কবিতারও একাংশ ব্যাপিয়া বিদ্যাসুন্দরের পালা স্থান লইয়াছে, আমরা যথা স্থলে তাহা আলোচনা করিব। কিন্তু এই সময়ের যতখানা বড় কাব্য পাওয়া যায়, তাহার একখানা ব্যতীত নির্ম্মলভাব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত, স্বীয় পবিত্রতা গৌরবে স্বতন্ত্র, কঠোর বিষয়-অনুসন্ধিৎসু কাব্যের নাম—"মায়া তিমির চন্দ্রিকা", এই পুস্তক খানা ক্ষুদ্র কিন্তু সমাদরের যোগ্য, আমরা পরে ইহার সম্বন্ধে কিছু লিখিব। ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরের আদর্শে যে কয়েক খানা কাব্য লিখিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে "চন্দ্রকান্ত", কালীকৃষ্ণ দাসের "কামিনীকুমার" এবং রসিকচন্দ্র রায়ের "জীবনতারা" এই কাব্যত্রয় লোকরুচির উপর বহুদিন দৌরাত্ম্য করিয়াছিল। এই কাব্যগুলির ভাষা খুব মার্জ্জিত কিন্তু রচনা এত অশ্লীল যে উহা পাঠে স্বয়ং ভারতচন্দ্র ও চক্ষু লজ্জাগ্রস্ত হইতেন। শুধু কঠোর সমালোচনা করিয়া নিবৃত্ত হইলে উক্ত কাব্য লেখকগণের যথোচিত শাস্তি হয় না, তাঁহারা নৈতিক আদালতের বেত্রাঘাত যোগ্য। এই তিনখানা কাব্যেই কালী নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে; কালী নামের সঙ্গে সংশ্রব হেতু আমাদিগের বৃদ্ধগণ এইসব পুস্তকের শৃঙ্গাররসের মধ্যেও আধ্যাত্মিকত্ব দেখিয়াছেন, এবং উপাখ্যান ভাগ নিষ্কাম ধর্ম্ম পিপাসায় প্রণিপাত পুরঃসর পাঠ করিয়াছেন। দেব দেবীগণ যখন এইভাবে পাপের ঢাকনি হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন পৌত্তলিকতা ভাঙ্গিতে মহাপুরুষ রামমোহনের আগমনের সময় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বর্ণিত নারী চরিত্রগুলিতে হীন প্রবৃত্তির অসভ্য উল্লাস দৃষ্ট হয়; ফুল্লরা খুল্লনাও বেহুলার ন্যায় দুঃখ সহনক্ষম পতিপ্রাণা সুন্দরীগণ সাহিত্যক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল—সহমরণ প্রথা নিবারনার্থ আইন করা প্রয়োজন কেন হইল তাহা সাহিত্যে আংশিক দৃষ্ট হইবে, কারণ সাহিত্যেই সমাজ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। প্রায় একশত বৎসর হইল 'কামিনীকুমার' 'চন্দ্রকান্ত' ও "জীবনতারা"

রচিত হইয়াছিল, ইহারা জাতীয় অধোগতির শেষ চিহ্ন, কবি 'উইচারলীর' নাম করিতে ইংরেজগণ যেরূপ লজ্জা বোধ করেন, এইসব কাব্য প্রণেতাগণের নাম করিতে আমাদের তেমনই লজ্জা হয়; কিন্তু ইহাদের লিপিচাতুর্য্য মধ্যে মধ্যে ভারতকেও পশ্চাতে ফেলিয়াছে,। আমরা সেই ছাঁচে ঢালা ভাষার কিছু নমুনা দেখাইয়া ক্ষান্ত হইব। বসন্ত আগমন,—

"হিমান্ত হইল পরে বসন্ত রাজন। দলবল লৈয়া আইল করিতে শাসন। প্রথমে সংবাদ দতে পাঠাইল দূত। আজ্ঞামাত্র চলিলেক মলয়া মারুত। বায়ু মুখে শুনি বসন্তের আগমন। সুসজ্জা করিল যত পুষ্প সেনাগণ। কেতকী করাত করে করিয়া ধারণ। দন্তে দাঁড়াইল হৈয়া প্রফুল্ল বদন। শূলহস্তে করি শীঘ্র সাজিল চম্পক। অর্দ্ধচন্দ্র বাণ ধরি ধাইলেক বক। গোলাব সেউতি পুষ্প সেনার প্রধান। প্রস্ফুটিত হৈয়া দোঁহে হৈল আগুয়াণ। গন্ধরাজ ধাইলেক পরি শ্বেতবস্ত্র। ওড় জবা ধাইলেক ধরি তীক্ষ্ণ অস্ত্র। মল্লিকা মালতী জাতী কামিনী বকুল। কুন্দ আদি সাজে তারা যুদ্ধেতে অতুল। পলাশ ধনুক হস্তে ধরিয়া দাঁড়ায়। রঙ্গন তাহার বাণ হেন অভিপ্রায়। সরোরুহ ঢাল হয়ে ভাসিল জীবনে। এইরূপে সজ্জা কৈল পুষ্প সেনাগণে। মলয়ার মুখে শুনি রাজ আগমন। অগ্রগণ্য সেনাপতি সাজিল মদন। শরাসনে সন্ধান করিয়া পঞ্চশর। বিরহী নাশিতে বীর চলিল সত্বর। কোকিল ভ্রমরে ডাকি কহিল মদন। দেখ রাজ্যে বিরহিণী আছে কোন জন। প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া দেহ সমাচার। শীঘ্রগতি কর দিতে বসন্ত রাজার। বিশেষ রাজার আজ্ঞা কর অবধান। যে না দেয় কর তার বধহ পরাণ। আজ্ঞা পেয়ে দুই সেনা করিল গমন। রমণী মণ্ডলে আসি দিল দরশন। প্রথমে কোকিল গিয়া বসি বৃক্ষোপরে। রাজ-আজ্ঞা জানাইল নিজ কুহস্বরে। পতি সঙ্গে রঙ্গে ছিল যতেক যুবতী। শব্দ শুনি কর তারা দিল শীঘ্রগতি। প্রথমে চুম্বন দিল প্রণামি রাজার। হাস্য পরিহাস দিল যাহে জমা আর।" কালীকৃষ্ণ দাসের 'কামিনী কুমার। মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতার জন্য বাকী অংশের অনেক স্থল বিশেষ সুন্দর হইলেও উঠাইতে পারিলাম না। বসন্ত রাজার রাজধানীর একটি সমগ্র সুন্দর চিত্রপট প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে রাজাগণের অধিকারশাসন ও কর আদায়ের জন্য যে সব কৌশল অবলম্বিত হয়, তাহার কিছু বাদ পড়ে নাই। কবির হস্ত বেশ নিপুন, সুসঙ্গতভাবে হউক অসঙ্গতভাবে, হউক তাহা পরিপক্ক হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার ইতর জন্তুর ন্যায় প্রবৃত্তির উদ্রেক দৃষ্টে তাঁহাকে ন্যায্য প্রশংসাটুকু দিতেও ইচ্ছা হয় না। অপর দুইখানা কাব্য সম্বন্ধেও এই সমালোচনা অনেকাংশে প্রযুক্ত হইতে পারে।

কিন্তু বিদ্যাসুন্দরাদি কাব্য ও আলোয়াল্ কবির পদ্মাবতী ছাড়া বঙ্গদেশের এক প্রান্তে আর তিনখানা কাব্য রচিত হইয়াছিল। ইহাদের রচকগণ বিক্রমপুরবাসী ও একপরিবারভুক্ত। জয়নারায়ণ সেন ও তাঁহার বিদুষী ভ্রাতষ্পুত্রী আনন্দময়ী গুপ্তা ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, উভয়ে মিলিয়া 'হরিলীলা' নামক কাব্য রচনা করেন; ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনার ২০ বৎসর পরে এই কাব্য রচিত হয়। এই কাব্য রচনার পূর্ব্বে রামগতি সেন "মায়া তিমির চন্দ্রিকা" রচনা করিয়াছিলেন, ও পূর্ব্বোক্ত দুই কাব্যের রচনার পরে জয়নারায়ণ কর্ত্তৃক চণ্ডীকাব্য প্রণীত হয়। এই মনস্বী পরিবার বিশেষরূপে শিক্ষিত ছিলেন, তাঁহাদের কাব্যগুলিতে সেই পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। ইঁহাদের ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে।

বৈদ্যকুলোদ্ভব বেদগর্ভ সেন পাঠাভ্যাস জন্য নিবাসভূমি যশোর ইত্নাগ্রাম ছাড়িয়া বিক্রমপুর আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বিলদায়িনীয়া (রাজনগর) জপসা, ভোজেশ্বর, প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রামের ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া বিলদায়িনীয়াতে নিবাস স্থাপন করেন। সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ এই বেদগর্ভ সেনের পঞ্চম স্থানীয় বংশধর। যে শাখায় রাজবল্লভ জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার জ্যেষ্ঠ শাখায় উৎপন্ন এবং বেদগর্ভের পঞ্চম স্থানীয় গোপীরমণ সেনের নাম মেঃবেভারিজ সাহেবের বাখরগঞ্জের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। গোপীরমণের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণরাম "দেওয়ান" ও তৃতীয় পুত্র রামমোহন "ক্রোড়ী" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফিপথ্ রিপোর্টে দেখা যায়, তাঁহারা চাঁদপ্রতাপ প্রভৃতি পরগণার রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত ছিলেন; কৃষ্ণরাম দেওয়ানের ২য় পুত্র "লালারামপ্রসাদ" বিক্রমপুরের সেই সময়ের অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। লালা রামপ্রসাদের স্ত্রী সুমতি দেবী অতি গুণবতী ছিলেন; ইঁহাদের পাঁচটি পুত্র জন্মিয়াছিল— ১ম লালা রামগতি, ২য় লালা জয়নারায়ণ, ৩য় লালা কীর্ত্তিনারায়ণ, ৪র্থ লালা রাজনারায়ণ ও ৫ম লালা নর নারায়ণ। রামগতি, বাঙ্গলা ভাষায় "মায়া তিমিরচন্দ্রিকা" ও "যোগ কল্পলতিকা" সংস্কৃতে প্রণয়ন করেন; জয় নারায়ণ "চণ্ডীকাব্য" ও "হরিলীলা" নামক বাঙ্গলা কাব্য রচনা করেন; রামগতি সেনের কন্যা আনন্দময়ী গুপ্তা হরিলীলা প্রণয়নে তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। রাজনারায়ণ

'পার্ব্বতী পরিণয়' নামক সংস্কৃত কাব্য প্রণেতা, এই পুস্তক আমরা পাই নাই।

সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ রামগতি সেন ৫০ বৎসর অতিক্রান্তে ধর্ম্মব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি যোগানুশীলন জন্য প্রথমে কলিকাতা কালী ঘাটে ও পরে কাশীধামে অবস্থিতি করেন। ৯০ বৎসর বয়ঃক্রমে কাশীর মহাশ্মশানে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হয়, চিরানুগতা সহধর্ম্মিণী সেই সঙ্গে অনুমৃতা হন। বাল্যকালে যে সব ভাব চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হয়, অজ্ঞাতসারে তাহা চিরকালের জন্য কোমল অন্তঃকরণে মুদ্রিত হইয়া যায়। রামগতি সেন শৈশবে তাঁহার খুল্ল পিতামহ রঘুনন্দনের বাগানে আম চুরি করিয়া খাইতেন, একদিন ভৎর্সিত হইয়া রামগতি আবদার করিয়া বলিয়াছিলেন, "দাদা মহাশয়, এখন আমগুলি আমরাই খাই, তুমি কাশী যাও।" কিন্তু সেই শিশুর আবদার বৃদ্ধের পক্ষে শাস্ত্রের ন্যায় কার্য্যকরী হইল, রঘুনন্দন এই কথা শুনিয়া নিরুত্তর রহিলেন; পরদিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল, গেরুয়া পরিয়া বৃদ্ধ রঘুনন্দন প্রফুল্ল মুখে কাশী যাত্রা করিয়াছেন। খুল্ল পিতামহের এই গেরুয়া পরা দেবমূর্ত্তি বালক রামগতির মনে চিরজীবন অঙ্কিত হইয়া রহিল; তিনিও সর্ব্বদা বিষয় নিস্পৃহ সন্ন্যাসীর ন্যায় সংসারাশ্রমের কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। কনিষ্ঠ জয়নারায়ণের প্রকৃতি বড় উশৃঙ্খল ছিল। তৎকালে তিনি ব্যবস্থাশাস্ত্রানুসারে ।/১॥/ অংশের মালিক ছিলেন, কিন্তু তিনি সমস্ত সম্পত্তির ॥০ আনা হিস্যা কলিকাতা নিবাসী মাণিক বসুর নিকট বিক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত হন। তচ্ছ্রবণে তাঁহার কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ বলিলেন, তিনি তাঁহার অংশ হইতে সূচ্যাগ্র ভূমিও ছাড়িয়া দিবেন না। অবিবেচক ও অসংস্থিতচিত্ত কবি জয়নারায়ণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে মর্ম্মাহত হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, তদ্দর্শনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগতি কনিষ্ঠকে সম্মত করিয়া ভ্রাতৃ প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য ॥০ আনা অংশ বিক্রয় করিয়াছিলেন।

সেনহাটী, পয়গ্রাম, মূলঘর, জপসা প্রভৃতি স্থানে রামগতি সেনের বিদুষী কন্যা আনন্দময়ীর খ্যাতি শুনা যায়। পয়গ্রাম নিবাসী প্রভাকর বংশীয় রূপরায় কবিভূষণের পুত্র অযোধ্যারাম সেনের সঙ্গে ১৭৬১ খৃঃ অব্দে ৯ম বর্ষ বয়সে আনন্দময়ীর পরিণয় হয়। লালারাম প্রসাদ পৌত্রী ও তাঁহার পতিকে যে বৃত্তি প্রদান করেন তাহা কৌতুকচ্ছলে "আনন্দীরাম সেন"

বলিয়া অভিহিত হয়; পতি পত্নীর নামের যোগে এই অদ্ভুত শব্দের নামের উদ্ভব হয়। অযোধ্যারাম সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নীর বিদ্যার খ্যাতি তাঁহার যশঃ লোপ করিয়াছিল। রাজনগর-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের পুত্র হরিবিদ্যালঙ্কার আনন্দময়ীকে একখানা সংস্কৃত শিবপূজা পদ্ধতি লিখিয়া দেন, তাহার মাঝে মাঝে অশুদ্ধি থাকাতে তিনি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে পুত্রের অধ্যয়ন সম্বন্ধে অমনোযোগী বলিয়া তিরস্কার করেন। রাজবল্লভ 'অগ্নিষ্টোম' যজ্ঞের প্রমাণ ও যজ্ঞ-কুণ্ডের প্রতিকৃতি চাহিয়া রামগতি সেনের নিকট পত্র লিখেন, রামগতি সেই সময় পূজায় ব্যাপৃত থাকায় আনন্দময়ী সেই প্রমাণ ও প্রতিকৃতি স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—"সকলেই তাহা বিশ্বাস করিলেন, কারণ আনন্দময়ীর বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে সে সময়ে কাহারও অবিদিত ছিল না, বিশেষতঃ সভাস্থ পণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ আনন্দময়ীর অধ্যাপক ছিলেন।" আনন্দ-ময়ীর রচনা হইতে আমরা যে সব অংশ উদ্ধৃত করিব, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে পাঠকগণেরও অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ থাকিবে না।

রামগতি সেনের 'মায়া তিমির চন্দ্রিকা' ধর্ম্মের রূপক, উহা সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয়ের পথাবলম্বী; সংসারে মন ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্ধ হইয়া সত্য কি বস্তু বুঝিতে পারে না, পথ হারা হইয়া নানা কল্পনা জল্পনা স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়, বিবেক ও আত্মজ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে ধীরে ধীরে চিত্তে বোধের উদয় হয়; তখন কি করিতে যাইয়া কি করিয়াছি, মণি বলিয়া লোষ্ট্রখণ্ড আদর করিয়াছি, যাহার জন্য ভবে জন্ম—সেই লক্ষ্য স্থির না রাখিয়া ভূতের বেগার খাটিয়াছি,—এইসব তত্ত্ব অনুশোচনার অশ্রুতে পরিস্রুত হইয়া চিত্তে প্রকটিত হয়,—তখন বানিয়ানের পথিকের ন্যায় মন এই রাজ্য ছাড়িয়া তত্ত্বপথে প্রবিষ্ট হয়; তৎপর উদাসীনের কথা, যোগ কিরূপে হয় তাহার নানারূপ কূটব্যাখ্যা, সেইসব শব্দের প্রহেলিকা ভেদ করিয়া তত্ত্ব খবর বুঝিতে পারি, আমাদের এরূপ শক্তি নাই,—আমরা সে ভাবের ভাবুক নহি। যোগের অবস্থা বর্ণন করিতে যাইয়া কবি গোরক্ষসংহিতা প্রভৃতি পুস্তক হইতে অনেক দুর্ব্বোধ শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন। কবি "পঞ্চাশ বৎসর বৃথা গেল বয়ঃকাল। কাটিতে না পারিলাম মহামায়াজাল।"

বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন, মনুষ্যের শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া সহানুভূতি ও ভয় কম্পিত কণ্ঠে লিখিয়াছেন,—"ভ্রমের তুরঙ্গে জীব করি আরোহণ। মায়া মৃগ লোভে সদা করেন ভ্রমণ॥" তৎপর ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা, তন্মধ্যে ক্ষণভঙ্গুর যৌবনের মদগর্ব্ব স্মরণ করিয়া কবি কাতরভাবে লিখিয়াছেন, "যৌবন কুসুম সম প্রভাতে বিলীন" এই অনিত্য জীবনে মায়ামুগ্ধ মনুষ্যের অবস্থা অতি বিষম, একদা সুপ্রভাতে মনের মায়াপাশ কাটিয়া গেল, তখন নিজের অবস্থাটি সম্পূর্ণভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে মনের শক্তি জন্মিল, কবি রূপক স্থলে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়য়াছেন,—

"কোপে অতি শীঘ্রগতি মন চলি যায়। যথা বসে নানারসে সদা জীব রায়॥ তনু যার সুবিস্তার দিব্য রাজধানী। হৃদি তারি রম্যপুরী তথায় আপনি॥ অহঙ্কার হয় যার মোহের কিরীটী। দম্ভপাটে বৈসে ঠাঠে করি পরিপাটী॥ পুষ্পচাপ উগ্রতাপ লোভ আনিবার। দুই মিত্র সুচরিত্র বান্ধব রাজার॥ শান্তি ধৃতি ক্ষমা নীতি শুভশীলা নারী। মান করি রাজপুরী নাহি চায় চারি॥ পতিব্রতা ধর্ম্মরতা অবিদ্যা মহিষী। পতি কাছে সদা আছে রাজার হিতৈষী॥ নারী সঙ্গে রতি রঙ্গে রসের তরঙ্গে। এইরূপে কামকূপে জীব আছে রঙ্গে॥"

আমাদের প্রত্যেকের এক বিস্তৃত রাজত্ব আছে, এই শরীরের বিদ্রোহী প্রবৃত্তিদিগকে শাসন করিয়া শিষ্টবৃত্তিগুলিকে পালন করার জন্য আমাদের দায়ীত্ব আছে, তাহা আমাদের সুনির্ব্বাহ হয় না; কবি পরিষ্কার একটি রূপক দ্বারা মনুষ্যের অবস্থা প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন, এই প্রতিবিম্ব ক্রমশঃ আরও পরিস্ফুট হইয়াছে,—তৎপর যোগের পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। অধ্যায়গুলির শেষ সংস্কৃত কাব্যের ভাবে করা হইয়াছে, যথা "ইতি মায়া তিমির চন্দ্রিকায়াং জীবচৈতন্যপ্রসঙ্গে দ্বিতীয় কলা নাম দ্বিতীয়োল্লাসঃ।"

যে সময় দেশ ব্যাপিয়া বিদ্যাসুন্দরের পালার গান, পচা আদিরসের গন্ধ হেতু যে সময়ের কাব্যগুলি ছুঁইতে ঘৃণা হয়, সেই সময় জপ্সা পল্লীর এই প্রবৃত্তি সংযম ও কঠোর উপদেশগুলি সাহিত্যের বিবেক বাণীর ন্যায় উপলব্ধি হয়।

রামগতি সেন চক্ষু মুদিত করিয়া যে গৃহে যোগতত্ত্বে বিব্রত ছিলেন, সেই গৃহের এক প্রান্তে জয়নারায়ণ কল্পনার ময়ূর উড়াইয়া আদিরসের রাজ্যে ঘুরিতেছিলেন; ইনি ভারতচন্দ্রের শিষ্য; ছন্দাদি ইহার করায়ত্ত;

নানারূপ ছন্দের সীমাবদ্ধ মণ্ডলীর মধ্যে কবিতা সুন্দরী আদিরস দুষ্ট হইয়া ইহার মনস্তুষ্টি করিতেছিলেন, কিন্তু ইহার লেখনী ভারতচন্দ্র হইতে কতকটা সংযত। জয়নারায়ণের চণ্ডী কাব্যের প্রথম ভাগে শিব বিবাহাদি ব্যাপার, এইস্থলে শিষ্য গুরুর ছবির উপর তুলি ধরিতে সাহসী; ইহাতে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার সাহস ধৃষ্টতা নামে বাচ্য হইবার যোগ্য নহে; মহাদেবের যোগ ভঙ্গ করিতে ঋতুরাজ আসিয়াছেন কামদেব সেনাপতি। কবির বর্ণনা এইরূপ;—

"মহেশ করিতে জয় রতিপতি সাজিল। দামামা ভ্রমর রব সঘনে বাজিল। নব কিশলয়েতে পতাকা দশ দিশেতে। উড়িল কোকিল সেনা সব চারি পাশেতে॥ ত্রিগুণ পবন হয় যোগ গতি বেগেতে। ফুলধনু পিঠে, ফুলশর কর পরেতে॥ ভ্রমাইয়া তাঙ্গে আড় হেরি আঁখি কোণেতে। কুসুমের কবচ হাতে কিরীট সাজে শিরেতে॥ বামবাহু রতি গলে রতিবাহু গলেতে॥ ভুবন মোহন কর হর মন মোহিতে। বায়ুবেগে সকলে উত্তরে হিম গিরিতে॥ আগমন মদন সকল ঋতু সহিতে। কুসুমে প্রকাশ গিরি বন উপবনেতে। নানা ফুল ফুটিল, ছুটিল রব পিকেতে॥। ছুটিল মানিনী মান, লাগিল ধ্বনি কাণেতে। মৃত তরু জীবিত নবীন ফুল পাতেতে॥ থরথর কেতকী কাঁপিছে মৃদুবাতে॥ অকালে অশোক ফোটে সেফালিকা-দিনেতে। ললিত মালতী ফোটে যুথিকার ডালেতে। বকুল কদম্ব নাগকেশরের পরেতে॥ মধুকর রব বলি ডাকে মন মদেতে। কুহরিছে কোকিল সমূহ পাঁচ শরেতে॥ নব লতা মাধবীর নতশির ভূমেতে। পলাশ টগর বেল নত ফুল-ভরেতে॥"

ইহার পর পশু পক্ষীর ক্রীড়ার একটি পূর্ণ আবেশময় চিত্র দেওয়া হইয়াছে,—তাহাতে অশ্লীলতার একটু গন্ধ আছে, এজন্য উঠাইতে বিরত হইলাম, কিন্তু তাহা এত সুন্দর যে আমাদের ইচ্ছা হইয়াছিল সেই অশ্লীলতাটুকু মুছিয়া ফেলিয়া কবির কবিত্ব শক্তি দেখাই; ভাবাবেশে হরিণী শুকরের সঙ্গে যাইয়া মিশিল, শুকরী হরিণের সঙ্গে খেলিতে লাগিল; স্বীয় শর প্রভাবে এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া—"চর চর রসেতে মোহন বাণ হাতেতে। সকলের ভাব দেখি মনে মনে হাসিতে॥"—কামদেব শিবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু কবি মহিমান্বিত শিব মূর্ত্তিটিকে ভাঙ্গিয়া একটি সুন্দর পুতুল গড়িয়াছেন; তিনি কালিদাসের স্পষ্ট অনুকরণ করিয়াও সেই শিবের মহিমার ছায়া উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, এইজন্যই বিশাল দেবদারু দ্রুমবেদিকা হইতে তাঁহাকে উঠাইয়া আনিয়া রত্নবেদীর উপরে স্থাপিত

করিয়াছেন,—কিন্তু তিনি কালিদাসের কুমারসম্ভব এরূপভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, অনেক স্থলে তাঁহার পদ্য কালিদাসের শ্লোক ভাঙ্গিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, যথা—"নিরখিতে দেবগণ, ডাকে শুন ত্রিলোচন, রক্ষ রক্ষ দয়াল দীনেশ। যাবৎ এ দেববাণী, শিরকর্ণে হৈল ধ্বনি, তাবৎ মদন ভস্মশেষ॥"

জয়নারায়ণের রতি বিলাপটি ভারতের রতিবিলাপ হইতে সুন্দর, এই রতি-বিলাপ অলঙ্কার শাস্ত্র হইতে চুরি করা, কিন্তু কবি পাকা চোর, এমন সুন্দরভাবে অপহৃত কথা যোজনা করিয়াছেন, তাহা ধরিবার উপায় নাই, যথা,

"অন্য নায়িকার ঘরে, নিশিথে বঞ্চিয়া ভোরে, মোর কাছে এসেছিলা তুমি। খণ্ডিতা অধীরা হৈয়া, মন রাগ না সহিয়া, মন্দকাজ করিছিনু আমি॥ রঙ্গনের মালা নিয়া, দুহাতে বন্ধন করিয়ে, কর্ণ-উৎপলে তাড়িছিলে। সে অভিমান মনে, করিয়া আমার সনে, রসরঙ্গ সকলি ত্যজিলে॥ আর দুঃখ মনে জ্বলে, একদিন নৃত্যকালে, পদের নুপুর খসেছিল। ত্বরা তুমি দিতে পায়, বিলম্ব হইল তায়, দিতে দিতে তাল ভঙ্গ হৈল। তাতে আমি মান করি, নৃত্য গীত পরিহরি বসিয়া রহিনু মৌনী হয়ে। যত সাধ কৈলা তুমি, পুনঃ না নাচিনু আমি, তাতে রৈলে বিরস শুইয়ে॥" ইত্যাদি।

পুস্তক ভরিয়াই এইরূপ কোমল পদাবলী, কোমল পুষ্প মালিকায় যেন কবি তাঁহার কাব্যপটখানা ছাইয়া ফেলিয়াছেন; কপট সন্ন্যাসী গৌরীর নিকট শিবনিন্দা করিতেছেন, পাঠক কালীদাসের কবিতা স্মরণ করিতে করিতে বঙ্গীয় কবির এই লেখা পাঠ করুণ,—"করেতে বদন যবে তোমার ধরিবে। ঐরাবত শুণ্ডে কি কমলিনী শোভিবে॥ বাম উরে বসাইলে শোভিবে তেমন। শিরিষকলিকা হিমগিরিতে যেমন। আলিঙ্গনে শোভা পাবে কুমুদিনী যত। সমুদ্রের মধ্যে অতি তরঙ্গ দুলিত॥ আভরণে অঙ্গভূষা চিতা ভস্ম যার। সিদ্ধি দিতে পারিলে পাইবে মন তার॥"

মূল চণ্ডীকাব্যের বিষয়ে জয়নারায়ণ মুকুন্দরামের চিত্র সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ পাল্লা বড় সহজ নহে; ভাষার জোরে তিনি কবিকঙ্কণকে পদচ্যুত করিতে প্রয়াসী; এস্থলে কবিকে আমরা নিতান্ত ধৃষ্ট বলিব। জয়নারায়ণের চণ্ডীতে সুলোচনা এবং মাধবের উপাখ্যান জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা দীর্ঘ, কিন্তু শব্দ বিন্যাসের লালিত্যে এই উপাখ্যান পাঠকের ক্লান্তিকর হয় নাই; নমুনা স্বরূপ কিছু তুলিতেছি,—"শরীর থাকিলে দেখা সখার অবশ্য। কমল ভ্রমরে দেখ তাহার রহস্য। শিশিরে কমল মজি থাকে সুলক্ষণা। বর্ষাকালে পাই হয় জীবনে বাসনা। দিনে দিনে লতা বারি ভেদিয়া উঠিয়া। হইয়া কলিকা, সখা সহায়ে ফুটিয়া। প্রফুল্ল হইয়া প্রেমে মনের উল্লাস। মিলে আসি পূর্ব্ব-

ভৃঙ্গ মনে বহু আশ। পুনঃ পদ্মিনীর মধু মধুকর পিয়ে। অবশ্য যে দেখা-হয় যদি দুই জীয়ে।"

"হরিলীলা"—সত্যনারায়ণের ব্রত কথা, কিন্তু জয়নারায়ণের হাতে ইহা ব্রতকথার ক্ষুদ্র সীমা লঙ্ঘন করিয়া একখানা সুন্দর বড় কাব্যে পরিণত হইয়াছে; আমরা প্রাচীন সত্যনারায়ণের ব্রতকথা অনেকগুলি পাইয়াছি কিন্তু ইহার সঙ্গে সে গুলির তুলনা হয় না; ইহা বিস্তীর্ণ, নানারস পুষ্ট বড় কাব্য কথা। এই পুস্তকে আনন্দময়ীর রচনা সন্নিবিষ্ট আছে,—সেগুলিতে তাঁহার ভণিতা নাই, স্ত্রীলোকের ভণিতা দেওয়ার রীতি ছিল না; কিন্তু আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি সেগুলি যে তাঁহার রচনা তৎসম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই। পিতৃব্যের রচনা হইতে আনন্দময়ীর রচনার আড়ম্বর ও পাণ্ডিত্যবেশী, আমরা তাহা পরে দেখাইব, এখন জয়নারায়ণের নিজ লেখার কয়েকটি অংশ হরিলীলা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

(১) সভা মধ্যে রত্ন সিংহাসনে নরপতি। শিরে শ্বেত ছত্র ইন্দুকুন্দ জিনি ভাতি॥ ধক্ ধক্ জ্বলে ভস্ম ত্রিপল্লব ভালে। মিস্ মিস্ যজ্ঞ ভস্ম ভ্রূমধ্যে জ্বলে॥ * * * টল্ টল্ মুকুতা কুণ্ডল কাণে দোলে। চল্ চল্ গজমতি মালা দোলে গলে॥ কস্ কস্ কসাভা মটুকা কটিতে। ঝল্ ঝল্ ঝকমকে স্বর্ণ বালয়েতে॥ ডগমগ সপ্ত কন্যা চামর লইয়া। ধীরে ধীরে দোলাইছে রহিয়া রহিয়া॥ ঝন্ ঝন্ লাগে কাণে কঙ্কণের ধ্বনি। ঝকমক্ চামর দণ্ডেতে জ্বলে মণি।" রাজ সভা বর্ণন।

(২) আঁচলে ধরিয়া টানিছে নাগর, টানিয়া ছাড়ায় সুন্দরী। মান ভঙ্গ করি, সম্মুখে আনিল, নাগর যতন করি॥ সোণার নাগর, নাগরী স্বচ্ছ, হেরিয়া করিল রঙ্গ। সত ভাগেতে করিলা দান, আপনার বর অঙ্গ॥ কাণে মুখ রাখি, কহিছে নাগর, হৈল নাকি মান ভঙ্গ॥" নায়িকার মানভঙ্গ।

(৩) "ঘোরতর রজনী অতীত এই মতে। পূর্ব্বদিক রক্ত দিনকর কিরণেতে॥ আকাশে নক্ষত্রগণ ভাজি যায় মেলা। চক্রবাকী প্রবর্ত্ত পতির প্রেম-খেলা॥ * * * পাখীগণ ইতিউতি নিজ বাস ছাড়ে। বিরলে ডাকিছে কাক ভূমে নাহি পড়ে॥ চন্দ্রভাগ করদুল ধরি সুনেত্রার। যাই বলি বিদায় মাগিছে বার বার॥ উষা কালে যাত্রা করি যায় চন্দ্রভাগ॥ সজল নয়নে ধনি পাছেতে পরাণ॥ যতদূর চলে আঁখি চাহে দাঁড়াইয়া। সুধাকর যায় ইন্দীবর ভাঁড়াইয়া॥ নিশি ভরি কুমুদিনী কৌতুকে আছিল। রবি অবলোকনে মুখ মলিন হইল॥" সুখনিশি প্রভাত।

মিষ্ট শব্দ প্রয়োগ পটু কবি জয়নারায়ণের কাব্যের একটি বৃহৎ দোষ

আছে,—উহা সেই যুগের দোষ, এ অভিযোগ হইতে ভারতচন্দ্রের ও অব্যাহতি নাই। এইসব কাব্য কেবলই শব্দের কাব্য, ভাবের অভাবে শব্দের লালিত্য অনেক সময়ই নিস্ফল হইয়া পড়ে। এত বড় কাব্যগুলি সমগ্র পাঠ করিয়াও চক্ষুর কোণে একবিন্দু অশ্রু নির্গত হয় না, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে প্রয়োজন হয় না। কাব্য অর্থ কেবলই বাক্য নহে, "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং" রসবিহীন বাক্যাবলী চিত্তে কোন স্থায়ীভাব মুদ্রিত করে না, ঘষা মাজা সুন্দর শব্দ কর্ণের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে মাত্র, কিন্তু তাহার ধ্বনি মনে পৌঁছে না। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য ক্রমে বঙ্গভাষার উপর গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছিল, ভারতচন্দ্রের পরে বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত দ্বারা পুষ্ট করিবার চেষ্টা স্থগিত হয় নাই, বরং ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে,—আমরা আনন্দময়ীর রচনা হইতে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি,—

"হের চৌদিগে কামিনী লক্ষে লক্ষে। সমক্ষে, পরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে॥ কতি প্রৌঢ়ারূপা ওরূপে মজন্তি। হসন্তি, খলন্তি, দ্রবন্তি, পতন্তি॥ কত চারু বক্ত্রা, সুবেশা সুকেশা। সুনাসা, সুহাসা, সুবাসা, সুভাষা॥ কত ক্ষীণ মধ্যা, সুভাঙ্গা সুযোগ্যা। রতিজ্ঞা, বশীজ্ঞা, মনোজ্ঞা, মদজ্ঞা॥ দেখি চন্দ্রভানে, কত চিত্ত হারা। নিকারা, বিকারা, বিহারা, বিভোরা॥ করে দৌড়াদড়ি মদমত্ত প্রৌঢ়া। অমূঢ়া, বিমূঢ়া, নবোঢ়া, নিগুঢ়া॥ কোন কামিনী কুণ্ডলে গণ্ড ঘৃষ্টা। প্রহৃষ্টা, সচেষ্টা, কেহ ওষ্ঠ দষ্টা॥ অনাঙ্গাস্ত্রভিন্না, কত স্বর্ণবর্ণা॥ বিকীর্ণা বিশীর্ণা, বিদীর্ণা বিবর্ণা॥ কারো ব্যস্ত বেণী নাহি বাস বক্ষে। কারো হার কূর্পা পরিস্রস্ত কক্ষে॥ গলভূষণা কেহ নাহি বাস অঙ্গে। গলদ্রাগিনী কেউ মাতিয়া অনঙ্গে। কারো বাহুবল্লী কারো স্কন্ধ দেশে। রহিয়া সাধু বাক্য বক্ত্রে প্রকাশে॥ * * * সুকক্ষে নিতম্বে উর হেমকুম্ভে। এভাবে ও ভাবে হাটিতে বিলম্বে॥ তাহে দোলিতা লাজভারি ভয়েতে। পরে হেলি ছুলি অনঙ্গ জ্বরেতে॥ সুনেত্রাকে কেহ, কেহ চন্দ্রভানে। করে সেক তোয়ে সবে সাবধানে॥ সুহস্তে ঢালিছে সর্ব্ব বারি অঙ্গে। ঝনৃত ঝনৃত গলত্ গলত্ পড়ে নীর অঙ্গে॥ * * * সখী চন্দ্রভানে বলে চাতুরীতে। এরত্নের মালা কাকের গলাতে॥ শুনি চাতুরী দম্পতি হেট মাথে। ঢলাঢল গলাগল সখী সর্ব্ব তাতে॥" চন্দ্রভান ও সুনেত্রার বাসি বিবাহ—(হরিলীলা)। বাঙ্গলা কবিতা এখন আর আপামর সাধারণের বুঝিবার বিষয় নহে। ইহার অর্থ বোধের জন্য এখন অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হয়; এজন্য সহজ পদ্য রচনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ার আবশ্যক হইয়াছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের ইংরেজ গুরুগণ উপযুক্ত সময়েই আসিয়া গদ্য লেখার প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন,

তাহা না হইলে সংস্কৃতাজ্ঞ বাঙ্গালিগণ বাঙ্গলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন করিতে অক্ষম হইয়া এককালে সাহিত্যরসে বঞ্চিত হইতেন বলিয়া আশঙ্কা হয়।

আনন্দময়ীর সহজ রচনার একটু নমুনা দিতেছি,—"আসি দেখহ নাথ। হীন তনু সুনেত্রার হয়েছে ভূষণে॥ হয়েছে পাণ্ডুর গণ্ড, রুক্ষ কেশ অতি। ঘরে আসি দেখ নাথ এসব দুর্গতি॥ রহিয়াছি চির বিরহিণী দীন মনে। অর্পণ করিয়া আঁখি তোমা পথ পানে॥ * * * ভাবি যাই যথা আছ হইয়া যোগিনী। না সহে এদারুণ বিরহ আগুনি॥ যে অঙ্গে কুঙ্কুম তুমি দিয়াছ যতনে। সে অঙ্গ মাখিব ছাই তোমার কারণে॥ যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বাঁধিছ আপনি। তাতে জটাভার করি হইব যোগিনী॥ শীতভয়ে যে বুকেতে লুকায়েছ নাথ। বিদারিব সে বুক করিয়া করাঘাত॥ যে কঙ্কণ করে দিয়াছিলা হৃষ্ট মনে। সে কঙ্কণ কুণ্ডল করিয়া দিব কাণে॥ তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষা পাত্র করি। মনে করি হরি স্মরি হই দেশান্তরী॥ তাতে মাত্র প্রতিবন্ধ বাহিরিতে নারি॥ আর তব স্থাপ্যধন বিষম যৌবন। লুকাইয়া নিয়া ফিরি দরিদ্র যেমন।" বিরহিণী সুনেত্রা (হরিলীলা)। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই রমণীকবির দৃষ্টি শব্দালঙ্কারের প্রতি পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; অলঙ্কার দেখাইবার স্পৃহা রূপসীগণের স্বাভাবিক, আনন্দময়ী নূতন কোন অপরাধ করেন নাই,—কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত রচনা পড়িয়া আনন্দময়ীর অলঙ্কার স্পৃহা পাঠক কি স্ত্রীলোক সুলভ রোগ বলিতে ইচ্ছা করিবেন,—"পতিশোক সাগরে, না দেখিয়া নাগরে, ফিরে যেন পাগরে ডাক ছাড়ি। হইয়ে ক্ষীণ শেষা, বিগলিত বেশা, লটপট কেশা ভূমে পড়ি॥"

জয় নারায়ণের চণ্ডীতে দশ অবতার স্তোত্রের এই দুইটি পংক্তি আনন্দময়ী লিখিয়া দিয়াছিলেন;—"জলজ বনজ যুগ যুগ তিন রাম। খর্ব্বাকৃতি বুদ্ধদেব কল্কি সে বিরাম॥" এই পংক্তিদ্বয় একটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ; বলা বাহুল্য এই দুই ছত্রেই দশ অবতারের বিষয় সংক্ষেপে দত্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্তরূপ শব্দ সাজাইবার কৌশল গিরিধর কৃত গীতগোবিন্দের অনুবাদেও বিশেষরূপে দৃষ্ট হইবে। এই গীত গোবিন্দানুবাদ খানা ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে—ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ১৬ বৎসর পূর্ব্বে সমাপ্ত হয়। রসময় দাস কৃত এক ঘেয়ে পয়ার ছন্দের অনুবাদে আদত গীতগোবিন্দের শব্দলালিত্যের চিহ্ন উপলব্ধি হয় না; কিন্তু গিরিধর যথা সম্ভব সুন্দরভাবে জয়দেব কৃত গীতগুলির মনোহারিত্ব বাঙ্গলা ভাষায় প্রতিভাত করিয়াছেন; গীতগোবিন্দের এই অনুবাদে কেবল অনুস্বার বিসর্গগুলি নাই, কিন্তু শব্দের মিষ্টত্ব বেশ বজায় আছে; চতুর বাঙ্গলা লেখক, বঙ্গভাষাকে কতদূর

সংস্কৃতের মত করা যায়,—তাহা সক্ষম লিপি কৌশলের সহিত প্রমাণিত করিয়াছেন ; আমরা কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম ;—

(১) "তব দন্ত অগ্রে ধরণী রয়, যেন চন্দ্রে লীন কলঙ্ক হয়, জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত শূকররূপ ধরি। হিরণ্যকশিপু ধরিয়া কর, দলিলে ভৃঙ্গের মত নখরে, জয় জগদীশ হরি, অদ্ভুত নরহরি রূপ ধরি।"

(২) এ সখি সুন্দরী যুবতিজনে হরি, নাচত কত প্রকার। পবনে লবঙ্গ লতা, মৃদু বিচলিত, শীতল গন্ধ বহায়। কুহু কুহু করি, কোকিল কুল কুজিত, কুঞ্জে ভ্রমরীগণ গায়॥ বকুল ফুলে মধু পিয়ে মধুকরগণ, তাহে লম্বিত তরুডাল। পতিদূরে যায়, তার প্রতি মনোরথ, মন মথনে হয় কাল। মৃগ মদগন্ধে, তমাল পল্লব, ব্যাপিত হইল সুবাস। যুবজন হৃদয় বিদারিতে, কামের নখ কিবা, হইল পলাশ॥ মদন নৃপের ছত্র হেম নির্ম্মিত কি নাগেশ্বর ফুল। শিলীমুখ সদৃশ বাণ নিরমাওল পাটলী ফুল অতুল॥ দেখি বিলক্ষণ, জগত ফুল ছল তরুণ করুণ কিয়ে হাসে। কেতকী কর সদৃশ করি নিরমিল বিরহী বিদারণ আশে॥"

(৩) "যমুনাতীরে মন্দ বহে মারুত, তাহাতে বসিয়া যুবরাজ। কর অভিসার, করি রতি রস, মদন মনোহর বেশে। গমনে বিলম্বন, না কুরু নিতম্বিনী, চল চল প্রাণনাথ পাশে॥ তুয়া নিজ নাম শ্যাম করি সঙ্কেত, বাজায় মুরলী মৃদুভাবে। তুয়া তনু পরশি, ধূলিরেণু উড়ত, তারে পুনঃ পুনঃ প্রশংসে। উড়ইতে পক্ষী, বৃক্ষদল বিচলিতে, তুয়া আগমন হেন মানে। দ্রুতগতি শেষ করত, পুনঃ চমকই নিরখত তুয়া পানে। শবদ অধীর, নূপুর দূরে, রিপুর সদৃশ রতি রঙ্গে। অতিতমপুঞ্জ, কুঞ্জবনে সখি চল, নীল ওড়নি নেহ অঙ্গে॥"

এখন আমরা আর একখানা পুস্তকের উল্লেখ করিয়া কাব্য শাখার উপসংহার করিব, এই পুস্তকের নাম 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী' ; 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী'—লেখক দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরান্তর্গত উলাগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন ; ইঁহার পিতার নাম আত্মারাম মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম অরুন্ধতী ; অনুমান ১০০ বৎসর পূর্ব্বে, 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী' লিখিত হয়। সকল দেবতাই ভাষা কাব্যরূপ বাহনে চড়িয়া বঙ্গীয় গৃহস্থের ঘরে পূজা খাইতে আগমন করিলেন ; বোধ হয় শিবের জটার কুটিল ব্যূহ ভেদ করিয়া গঙ্গাদেবী যথা সময়ে এ সংবাদ জানিতে পারেন নাই, বহু বিলম্বে তাঁহার ধারণা হইল "ভাষায় আমার স্থান নাই।" তখন কাল গৌণ না করিয়া উলাগ্রামে দুর্গাপ্রসাদের স্ত্রী হরিপ্রিয়ার স্কন্ধে আরূঢ় হইয়া স্বপ্ন প্রচার করিলেন—"তোমার স্বামীকে কহিয়া আমার জন্য কাব্য লিখাও।" কিন্তু

তখন ইংরেজাগমনে দেবদেবীর আফিস বন্ধ প্রায়; যে বৎসর রাজা রামমোহন রায় "হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রণালী" রচনা করেন, সম্ভবতঃ সেই বৎসর স্ত্রীর মারফৎ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" লিখিতে প্রবৃত্ত হন। গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণীতে মধ্যে মধ্যে রচনার পারিপাট্য আছে; আমাদের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহীগণ যখন যুবতী ছিলেন, তখন তাঁহারা কি কি অলঙ্কার পরিয়া আমাদের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহগণের মন চুরি করিতেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি নিচয়ে দৃষ্ট হইবে;—

"টেঁড়ি, চাঁপি; মাকুড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল। কেহ পরে হীরার কমল নহে তুল॥ নাসিকাতে নথ কারো মুক্ত চুণী ভালো। লবঙ্গ বেশরে কারো মুখ করে আলো॥ কিবা গজ মুক্তা কারো নাসিকার কোলে। দোলে সে অপূর্ব্ব ভাব হাসির হিল্লোলে॥ কুন্দ কলিকার মত কারো দন্তপাঁতি। দাড়িম্বের বীজ মুক্তা কারো দন্তভাতি॥ মার্জ্জিত মঞ্জনে দন্ত মধ্যে কাল রেখা। মনে লয় মদনের পরিচয় লেখা॥ মুখ শোভা করে কারো মন্দ মন্দ হাসি। সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বাসি॥ পরিল গলায় কেহ তেনরী সোণার। মুকুতার মালা কণ্ঠমালা চন্দ্র হার॥ ধুকধুকি জড়াও পদক পরে সুখে। সোণার কঙ্কণ কারো শঙ্খের সম্মুখে। পতির আয়াৎ চিহ্ন সোহাগ যাহাতে। পরণ বাজান লোহা সকলের হাতে॥ পাতা মল পাঁশুলি আনট বিছা পায়। গুজরী পঞ্চম আর শোভা কিবা তায়॥"

এইসব অলঙ্কারের অনেকগুলি এখন মুসলমান পাড়ায় খোঁজ করিলে পাওয়া যাইবে।

২য়—গীতি শাখা।

মুসলমানী কেচ্ছার কলুষস্রোতের মুখে পড়িয়া বঙ্গসাহিত্য কলুষিত হইয়াছিল; বিদ্যাসুন্দর, পদ্মাবতী, হরিলীলা প্রভৃতি কাব্যের ভাষা খুব শ্রীসম্পন্ন; কিন্তু চিত্রের পদ্মেতে মধুমক্ষিকার তৃপ্তি হয় না, রসহীন লিপি-কৌশলে ও শ্রোতার মন বহুক্ষণ মুগ্ধ থাকিতে পারে না; সাহিত্যের পঙ্ক উদ্ধার করিয়া নির্ম্মলভাবের প্রবাহে পাঠকের কামনা পরিতৃপ্ত করিতে, পুনশ্চ প্রতিভাবান লেখকের লেখনীর প্রয়োজন হইল। এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে রাজদরবার ও তৎসংশ্লিষ্ট স্থান সমূহের কলুষিত হাওয়া হইতে অতি দূরে—পল্লীগ্রামের স্বভাবস্নিগ্ধ ছায়ায় অনেকগুলি কলকণ্ঠী কবির আবির্ভাব হইল। কিন্তু এই গীতিশাখা একবারে নির্দ্দোষ নহে, ইহার একাংশে বিদ্যাসুন্দরাদি কাব্যের নিন্দনীয় রুচি প্রবেশ করিয়াছে,—কিন্তু

অপরাংশ অতি সুনির্ম্মল। এই দেশের সাহিত্যে কাব্য অপেক্ষা গীতিই প্রশংসনীয়, কারণ এখানে কর্ম্ম অপেক্ষা ভক্তিই অধিক কার্য্যকরী, এই যুগের সাহিত্যেও গীতিরই শ্রেষ্ঠত্ব দৃষ্ট হইবে।

বঙ্গদেশের কতকগুলি গভীর প্রাণের কামনা ছিল,—শিশু কন্যার পিতৃ গৃহ হইতে গমন, দুধের মেয়ে অষ্টমবর্ষে গৌরী সাজিয়া গৃহ ছাড়িয়া যাইত, তাহার ধূলি খেলা সাঙ্গ দিয়া ঘোমটা টানিয়া যুবতী বউএর অভিনয় করিতে হইত, মাতৃ বিরহে বালিকা ঘোমটা ঢাকা সুন্দর মুখ খানা চক্ষুজলে প্লাবিত করিয়া পথের পানে তাকাইয়া থাকিত; মার রাত্রিও সুখে প্রভাত হইত না,—ক্রোড়ের শিশু ছাড়া মা স্বপ্ন দেখিয়া পাগলিনীর ন্যায় কাঁদিয়া বলিতেন, "উমা আমার এসেছিল। স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে, চৈতন্য রূপিণী কোথায় লুকাল।" বহুদিনের অশ্রুসিক্ত এই বিরহ ব্যাপারের পর যখন বালিকা ফিরিয়া আসিত, তখন কত সুখ,—"আমার উমা এলো বলে রাণী এলো কেশে ধায়" এইসব গানের সরল কথায় শ্রোতা অশ্রুজলে গলিয়া পড়িতেন, এগুলির প্রকৃত রঙ্গভূমি কৈলাস বা হিমালয়পুরী নহে,—প্রতি গৃহস্থের হৃদয় ইহার অনুভূতিক্ষেত্র। এই পরম সুন্দর বাৎসল্যভাবকে আমাদের সাধকগণ ধর্ম্মের ছায়ায় স্থান দিয়াছেন, পুত্রের প্রতি স্নেহ যশোদা চিত্রে ধর্ম্মভাবে পরিণত হইয়াছে। "শুন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ দেখা দিয়ে গোপাল কোথায় লুকালে। যেন সে চঞ্চল চাঁদে, অঞ্চল ধরি কাঁদে, জননী দে ননী, দে ননী বোলে।" প্রভৃতি স্নেহ-উদ্বেলিত ভাব-মধুর গান গুলিতে শ্রোতার হৃদয় ছুঁইত ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ করিত—ইহা গৃহস্থের ধূলিমাখা আঙ্গিনার কথা, কিন্তু ইহার অঙ্গুলিসঙ্কেত নির্ম্মল স্বর্গের প্রতি,—কারণ স্বার্থশূন্য পবিত্র স্নেহ পৃথিবীর কথা হইয়াও স্বর্গের কথা। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা এই দেশে উন্নত ধর্ম্মভাবাপন্ন হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের সঙ্গে একাঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে, আমরা বৈষ্ণব-যুগ অধ্যায়ে তাহা বিস্তারিতভাবে দেখাইয়াছি।

শিশুর প্রতি মার স্নেহের মাধুর্য্য একদিকে, নির্ভরান্বিত শিশুর স্নিগ্ধ অভিমান পূর্ণ আব্দার অপর দিকে। মার প্রতি শিশুর সেই গঞ্জনাগুলি বড় মধুর—সেই গঞ্জনার বাহ্যিক কঠোরতা অশ্রুজলে ধৌত হইয়া কোমল হইয়া গিয়াছে। রামপ্রসাদের মার প্রতি ক্রোধ অশ্রুজল গঠিত, উহা মাত্র মাত্র ক্রোধ—উহা নিগৃহীত বালকের স্নেহের স্বত্ব স্থাপন। প্রাচীন

বঙ্গসাহিত্য প্রেমভক্তির বিশেষ লীলাভূমি। এই প্রেমভক্তিই সময়ে সময়ে অঞ্জন শলাকার ন্যায় লোক চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছে। রাজা রামমোহন রায় গভীর শাস্ত্রানুসন্ধান পূর্ব্বক যে সব ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ নির্ম্মল ভক্তি বিহ্বলতায় তৎপূর্ব্বেই সেগুলি হৃদয়ে অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তিনি প্রেম-স্নিগ্ধ হৃদয়ের অনুভূতির বলে পুস্তকগত বিদ্যার অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়া নির্ম্মল সত্যরাজ্য ছুঁইতে পারিয়াছিলেন। "কি কাজ রে মন যেয়ে কাশী।" "নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রম মাত্র পথ হেঁটে।" প্রভৃতি বাক্যে তিনি তীর্থ যাত্রার সম্বন্ধে লৌকিক আস্থার প্রতি নির্ভীকভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। "ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি যেনে ও কি তা জান না। মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তার করতে চাওরে উপাসনা। ধাতু পাষাণ মাটী মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে।" প্রভৃতি কথা তিনি রাজা রামমোহনের পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গানের সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের "আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কার।" প্রভৃতি গান একস্থলে গাঁথা থাকিবার যোগ্য। "বেদে দিল চক্ষে ধুলা ষড়্দর্শনের সেই অন্ধগুলা" বাক্যে রামপ্রসাদ ভক্তির বলে বলীয়ান হইয়া শাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার নির্ম্মল অদ্বৈতবাদ সূচক অসংখ্য পদ দৃষ্ট হয়। যে বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরের শেষভাগে রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন, রামপ্রসাদের কণ্ঠে যে গানের অবসান হইয়াছিল, তাহা পুনরায় রামমোহনের কণ্ঠে উত্থিত হইয়া নব্য সমাজকে মাতাইয়াছিল।

রামপ্রসাদ বিগ্রহ পূজা করিতেন, কিন্তু তিনি সেই বিগ্রহের পদতলে বসিয়া অনন্তরূপের ছায়া অনুভব করিতেন, যে ভোগ সম্ভার তৎ পদপ্রান্তে প্রস্তুত রাখিতেন, তাহা দেখিয়া কখনও ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক মনে মনে গাহিয়াছেন,—"জগতকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা। ওরে কোন লাজে খাওয়াইতে চাস তায়, আলোচাল আর বুট ভিজানা।" কখনও ও ফুল, বেলপাত পদে দিতে উদ্যোগ করিয়া সেই উৎসর্গ অসম্পূর্ণ জ্ঞানে বলিয়াছেন, "ভবের পুষ্প, বেলের পাতা, মাগো আর দিব আমার মাথা।"

কালীমূর্ত্তি যে ভাবে তাঁহার মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ হইত; তাহা মহামহিমা গূঢ় রহস্যে ব্যক্ত—অতি সুন্দর; তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি শব্দ ও

উপমার জন্য লালায়িত হইয়াছেন; অপ্রস্ফুট সৌন্দর্য্যাবলী জড়িত হইয়া সেই মূর্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে নবভাবে তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইয়াছে,—"চলিয়ে চলিয়ে কে আসে গজগতি, দলে দানব দলে, ধরি করতলে গজ গরাসে। কেরে—কালীয় শরীর রুধিরে শোভিছে, কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে।" প্রভৃতি গান ভক্তের কণ্ঠে শুনিলে মনের মধ্যে মাধুর্য্যমিশ্র এক ভৈরব ছবি অঙ্কিত হয়।

সংসার ক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এখনও রামপ্রসাদের গানগুলি অশ্রুমূল্য দিয়া ক্রয় করিবার যোগ্য মনে করিবেন; আমার মনে পড়ে গৃহ প্রাঙ্গনে বসিয়া শ্যাম সন্ধ্যাকালে যখন চির পরিচিত সুহৃদ কণ্ঠে,—"নিতান্ত যাবে এদিন কেবল ঘোষনা রবে গো। তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো"—প্রভৃতি গান শুনিতাম, তখন বাল্যকালের সুকোমল অন্তঃকরণে কত বিষাদ মাখা, মহিমান্বিত ভক্তির কথা জাগিয়া উঠিত। রামপ্রসাদের বৈষ্ণব বিষয়ক গানও কোন কোনটি বড় মধুর, একটি এখানে তুলিয়া দেখাইতেছি;—"ওহে নূতন নেয়ে। ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে। দুকূল রইল দূর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর, কেমন কেমন করেছে মেঘা, মাঝ যমুনায় ভাসে খেয়া, শুন ওহে গুণনিধি, নষ্ট হোক ছানা দধি, কিন্তু মনে করি এই খেদ। কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী, মিছা তবে হইবে হে বেদ।"

রামপ্রসাদের পর শ্যামা বিষয়ক সংগীত রচনায় আরও কয়েকজন কবি বিলক্ষণ পটুতা দেখাইয়াছেন, আমরা এস্থলে সংক্ষেপে তাঁহাদের উল্লেখ করিয়া যাইব।

কবিওলা রামবসু (১৭৮৬—১৮২৮ খৃঃ) কলিকাতার পরপারস্থিত শালিকাগ্রামে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে পাঁচবর্ষ বয়ঃক্রম কালেই ইনি পাঠশালায় বসিয়া কলাপাতে কবিতা রচনা করিতেন, দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক কবির রচিত গান ভবানী বণিক নামক কবিওলা আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া নিজ দলে গাওয়াইতেন। যে ফুলটি অতি শীঘ্র ফোটে, তাহা অতি শীঘ্র শুকায়; রামবসুর ৪২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। প্রথম বয়সে ইনি ভবানী বেণে, নীলুঠাকুর, মোহন সরকার প্রভৃতির দলে গান বাঁধিতেন, শেষে নিজেই একদল সৃষ্টি করেন। রামবসুর বৈষ্ণব সংগীতগুলিই অধিক হৃদয়গ্রাহী, আমরা স্থানান্তরে তাহার উল্লেখ করিব। তাহার উমা সংগীতগুলি ও স্নেহরসে উদ্বেলিত। মার নয়ন জলসিক্ত এই পবিত্র কবিতাটি দেখুন,—"তুমি যে কোয়েছ আমায় গিরিরাজ, কত দিন কত কথা। সে কথা আছে শেল সম হৃদয়ে গাঁথা। আমার লম্বোদর নাকি, উদরের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে বেড়াতো। হোয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক, সোনার কার্ত্তিক, ধূলায় পোড়ে লুটাতো।" পরিবার ভরণ পোষণ অসমর্থ ব্যক্তির হৃদয়ে এইরূপ গান শেলের ন্যায় বিঁধিবার কথা, গায়ের উদর বসন লেজে দরিদ্র জোড়া ঘরের কার্ত্তিক গণেশের কথা ভাবিতে থাকিতেন।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য—১৮০০ খৃঃ অব্দে অম্বিকাকালনা হইতে বর্দ্ধমান কোটালহাট নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন; ইনি বর্দ্ধমানাধিপ তেজশ্চন্দ্রের সভা পণ্ডিত ও গুরু হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত শ্যামা বিষয়ক পদাবলী রামপ্রসাদের গানগুলির মত মধুর।

রামদুলাল রায়—(১৭৮৫—১৮৫১ খৃঃ) ত্রিপুরার অন্তর্গত কালীকচ্ছ ইঁহার জন্ম স্থান, ইঁহার কুল উপাধি নন্দী। কতককাল ইনি নোয়াখালির কলেক্টার হেলিডি সাহেবের সেরেস্তাদারী করেন ও পরে ত্রিপুরার মহারাজের দেওয়ান হন; ইঁহার গানগুলিতে বিষাদ, বিরাগ ও ভক্তির কথা আছে, আমাদের স্থানাভাব, একটি গান হইতে অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি—"ধনাশা, জীবন আশা গেলনা সকলি গেল মা। কৌমার যৌবনগত জরা আগমন হল। * * * অক্ষির গেল মা জ্যোতিঃ, শ্রবণের গেল শ্রুতি, মনের গেল মা স্মৃতি, চরণের গতি। আছে কাস্তা অভিলাষ, অদর্শনে ত্রা'সার আশ। শরশনে জরা বলে কি দায় হল॥"

দেওয়ান রঘুনাথ রায় (১৭৫০—১৮৩৬ খৃঃ) বর্দ্ধমানস্থ চুপীগ্রাম নিবাসী ব্রজকিশোর রায় দেওয়ানের পুত্র। ইঁহার কবিত্ব-শক্তি বেশ ছিল, বর্দ্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের আদেশে ইনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদদিগের নিকট ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করেন; ইঁহার শ্যামা বিষয়ক গানগুলি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ও রামদুলাল রায় প্রণীত গান সমূহের সঙ্গে এক স্থানে রাখার যোগ্য।

যবন কবিগণ—মুজাহসেন আলি ও সৈয়দ জাফর খাঁ, এই দুইজন মুসলমান গীতরচক সমসাময়িক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দশশালা বন্দোবস্তের কাগজে মুজাহসেন আলির নাম পাওয়া যায়, সুতরাং ইঁহারা এক শতাব্দী পূর্ব্বের কবি। মুজাহসেন আলি ত্রিপুরার অন্তর্গত বরদাখাতের জমিদার ছিলেন, কথিত আছে ইনি সমারোহ করিয়া কালী পূজা করিতেন। আমরা ৯ জন মুসলমান বৈষ্ণব কবির নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের সঙ্গে এই দুই মুসলমান শাক্ত কবির কথা বলা যাইতে পারে; মুজাহসেন আলির একটি গান এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—"যারে শমন এবার ফিরি, এসো না মোর আঙ্গিনাতে। দোহাই লাগে ত্রিপুরারী, যদি কর জোর জবরি, সামনে আছে জজ কাছারি, আইনের মত রসিদ দিব, জামিন দিব ত্রিপুরারি। আমি তোমার কি ধার ধারি, শ্যামা মায়ের খাস তালুকে বসত করি। বলে মুজাহসেন আলি, যা করে মা জয়কালী, পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে, পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি।" এই দুই মুসলমান কবির পার্শ্বে আমরা আর একটি কবির স্থান নির্দ্দেশ করিব, ইঁহার নাম এণ্টুনি। ইনি ফরাসডাঙ্গার কোন বিখ্যাত ফরাসী ভদ্রলোকের পুত্র, কিন্তু পুরুষের ভাগ্যের কথা দেবতারাও বলিতে পারে না, এণ্টুনি দৈবক্রমে প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার "পড়েছি বিপদে এবার যা করে মা মাতঙ্গী। ভজন সাধন জানি না মা জাতে আমি ফিরিঙ্গী" ইত্যাদি গান অনেকেই জানেন।

পূর্ব্বোক্ত কবিগণ ছাড়া বঙ্গদেশের কয়েকজন রাজা মহারাজাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্যামা-

বিষয়ক সংগীত রচনা করিয়াছেন। প্রচলিত সংগীত সংগ্রহ গ্রন্থে কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র, নাটোরাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতির রচিত বলিয়া অনেক গান নির্দিষ্ট হইয়াছে।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, এই সংগীত রচকগণের মধ্যে সকলেই নির্মল রুচির পক্ষপাতী ও ধর্ম পিপাসু ছিলেন না। এই সময় বিদ্যা-সুন্দরাদির পালা যাত্রার দলে গীত হওয়ার জন্য,—কতকগুলি ললিত শব্দ বহুল, কদর্য্যভাবপূর্ণ গান, রচিত হইয়াছিল; এইসব গানের সর্ব্বসম্মতিক্রমে ওস্তাদকবি গোপাল উড়ে; ইনি ভারতচন্দ্রের একবিন্দু ঘনরস তরল করিয়া এক শিশি প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এই গান গুলির রচনার ভঙ্গী এতাদৃশী যে ইহা গাওয়ার সঙ্গে নাচনা ও চলিতে পারে; হাটে, মাঠে, ঘাটে এইসব গান পথিকগণ গাহিয়া গাহিয়া পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছেন, তথাপি এখন সমালোচনার অনুরোধে সে গুলি পুনর্ব্বার পড়িয়া গোপালচন্দ্র উড়ে মহাশয়কে একটি বেশ রসিক পুরুষ বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে,—বিদ্যাসুন্দরের প্রধান চরিত্র হীরা মালিনী; সুন্দর ইহাকে "মাসী" বলিয়া সম্বোধন করাতে ইনি ভগ্ন বীণার মত আওয়াজ দিতেছেন,—"বাছ এমন কথা কেন বলি। ভোরের বেলা সুখের স্বপন এমন সময় জাগালি।" ইনি নিজের রূপের ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, যখন বামুনপাড়া ফুলের যোগানে গমন করেন, তখন পূজা পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ এই পককেশী রূপবতীকে দেখিয়া,—"রহে কোশাকুশী অমনি ধরে।" অনেক স্থলেই কেবল শব্দের মার "যামিনীতে যামিনীফুল নিত্য সে যায় চোরে" পড়িতে ভাল, গানে শুনিতে ততোধিক, কিন্তু কামিনী ফুল ছুঁইতে পড়িয়া যায় চোরে লইবে কিরূপে? বিদ্যা হীরাকে দেখিয়া বলিতেছে, "ছেঁড়া চুলে বকুল ফুলে খোঁপা বেঁধেছ। প্রেম কি জাগিয়ে তুলেছ।" এইসব নাচিয়া গাহিয়া কহিবার কথা। হীরা যখন উত্তরে কিছু বলে, তখন আর কিছু নাই কেবল রসিকতা হয়; সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিদ্যার পরিণয় হইবে, এই লইয়া ঠাট্টা করিয়া হীরা বলিতেছে,—"ভাল খেলা খেলি লো তুলে, এই বাজারে রূপে। সন্ন্যাসিনী হবে যদি সন্ন্যাসী কোলে। আহা গলায় মালা মাথায় জটা, মুখে শোভে দাড়ি গোঁফ, পালঙ্ক ঝালর আর নাই নাগর নাগরি লো দব, যোগ কেমন বোলে।" ত্রৈলোক্যচন্দ্র বাঁড়ুয্যে ও রামলাল মুখোপাধ্যায় এই দুই কবি গোপালচন্দ্র দাস উড়ের চেলাগিরি করিয়াছেন, ইহারা দুই জনই অতি যোগ্য শিষ্য, কে বাঁড়ুয্যে কবির আবার চুটকি রাগিণী শিখাইয়া সভার বর্ণনা করিয়াছ

হাত যশটুকু ছিল,—নমুনা এইরূপ; "পা তোলরে দিদি অবসান প্রায়; বাম বসে ডাকে কাক, মাঝি কাটে কপিশাক, গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান।"

এই শ্রুতি সুখকর কিন্তু কুরুচি-দুষ্ট গীত রচকগণের মধ্যে দাশরথি রায় (১৮০৪—১৮৫৭ খৃঃ) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জেলাবর্দ্ধমানস্থিত বাঁদমুড়াগ্রামে দাশরথি রায়ের পিতা দেবীপ্রসাদ রায়ের বাসভূমি ছিল। কিন্তু দাশু শৈশবকাল হইতে পাটুলির নিকটবর্ত্তী পীলা নামক গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে বাস করিতেন। তিনি প্রথমতঃ সাঁকাই নামক স্থানের নীল-কুঠীতে কেরানীগিরি পদ গ্রহণ করেন; কিন্তু অকাবাই নাম্নী ইতরজাতীয়া কোন রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি চাকুরী ত্যাগ করেন; অকাবাই এক ওস্তাদী কবির দল সৃষ্টি করে, তন্মধ্যে দাশু রায় গান বাঁধিয়া দিতেন, কিন্তু অপর কোন এক কবির দলের সরকার দাশুকে ছড়া বাঁধিয়া বিশেষরূপ গালি দেন, সেই ভর্ৎসনার কথা তাঁহার মাতা শুনিয়া পুত্রের কাটাঘায়ে নুনের ছিটা দেন,—মাতার ভর্ৎসনায় দাশু প্রতিজ্ঞা করেন, আর কবির দলে গান বাঁধিবেন না; তদবধি তিনি পাঁচালীর দল সৃষ্টি করেন, এই নূতনাস্ত্র হস্তে দাশু দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন। প্রভাস, চণ্ডী, নলিনীভ্রমরোক্তি, দক্ষযজ্ঞ, মানভঞ্জন, লবকুশের যুদ্ধ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি তাঁহার রচিত অনেক পালা এখন ছাপা হইয়াছে; তাঁহার লেখনীকে একরূপ অবিশ্রান্ত বলিতে হয়,—ইতিপূর্ব্বে যত শব্দকবি জন্মধারণ করিয়াছেন, দাশু তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষিপ্ত হস্ত। তাঁহার অশ্লীলতা এত জঘন্য যে তাঁহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দক্ষিণা প্রদানান্তর ভদ্রলোকের সভা হইতে খেদাইয়া দিতে ইচ্ছা হয়,—কিন্তু হোরেশ, বোকাসিও, বাইরণ ও ভারতচন্দ্র আদর পাইতেছেন,—দাশু ও তদ্রূপ যশের কতকটা অংশী হইবেন সন্দেহ নাই। দাশুর রচনা ভ্রমরের মত—মুখে মধু, কিন্তু হুলে বিষ বহন করে, উহা বিড়াল নবোদগত দন্তের ন্যায়—দর্শনে সুন্দর কিন্তু দংশনে তীব্র; দাশু যে স্থলে গালি দিবেন,—সেখানে তাঁহার লেখনীসংযম অভ্যাস নাই; শত্রুর গালে চুন কালী দিয়া তিনি তামাসা দেখিবেন, বৈষ্ণব নিন্দাটি দেখুন,—"গৌরাং ঠাকুরের ভক্ত নেড়া, যত অকাল কুষ্মাণ্ড নেড়া, কি আপদ করেছেন হরি হরি। বলে গৌর ডাক রসনা, গৌর মন্ত্রে উপাসনা, নিতাই বলে নৃত্য করে, ধূলায় গড়াগড়ি। গৌর বলে আনন্দে মেতে, একত্র ভোজন হবিস জেতে, বাগদী কাওরা যোগী,

ঘুলুতে, একত্র সমস্ত। বিল্বপত্র জবার ফুল, দেখতে আরেন চক্রের শূল, কালী যার গুন্তে কাণে হস্ত। * * * কিবা ভক্তি, কি তপস্বী, জপের মালা সেবা দাসী, কজন কুঠরী আইরি কাষ্ঠের যোড়া। গোসাঞিকে পাঁচ সিকে দিয়ে, ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে, আত্যাংশে কুলীন বস্তু যোড়া। জয়হরি শ্রীনিবাস, বিদ্যাপতি নিতাই দাস, শাস্ত্র ইহাদের অগোচর নাই কিছু। এক একজন কিবা বিদ্যাবন্ত, করেন কিবা সিদ্ধান্ত, বদরিকাকে বাখ্যা করেন কচু।"

কথিত আছে কালিদাসের উপমা গুণ, নৈষধের পদ লালিত্য গুণ, ও ভারবীর অর্থগৌরব গুণ, এইসব কবিগণের গুণের ইয়ত্তা আছে, কিন্তু দাশু রায়ের গুণের সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না; যখন কবি উপমা দিতেছেন, তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান না করিয়া তিনি কথার ঝোঁকে চলিয়াছেন, লেখনীর মুখে মসীবিন্দু না শুকাইলে তাঁহার স্থগিত হওয়া নাই—

"পণ্ডিতের ভূষণ ধর্ম্মজ্ঞানী, মেঘের ভূষণ সৌদামিনী, সতীর ভূষণ পতি। যোগীর ভূষণ ভস্ম, মৃত্তিকার ভূষণ শস্য, রত্নের ভূষণ জ্যোতি। বৃক্ষের ভূষণ ফল, নদীর ভূষণ জল, জলের ভূষণ পদ্ম। পদ্মের ভূষণ মধুকর, মধুকরের ভূষণ গুণ গুণ স্বর, উভয়ে উভয় প্রেম বদ্ধ। শরীরের ভূষণ চক্ষু যাতে জগত হয় দৃষ্ট। দাতার ভূষণ দান করে বলে বাক্য মিষ্ট"

কবিকে থাম থাম বলিয়া পরিত্রাহি চীৎকার না করিলে এই প্রবাহ স্থগিত হওয়ার নহে। 'নলিনী ভ্রমরোক্তি' নামক ক্ষুদ্র পালা কবির বিদ্রূপ, কবিত্ব ও ভাষার অধিকারের এক অমর কীর্ত্তি বলা যায়। পদ্মের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া মধুকর তীর্থযাত্রা করিয়াছেন, এ পালায় তাহার বর্ণনা,—

"চলিলেন পদ্মিনী স্বামী, যেন শুকদেব গোস্বামী, ডাকলে কথা কন না কার সনে।"

এইভাবে কবি কুসুম ও ভ্রমর জগত উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার স্থায় নায়ক ও অক্রাবাইএর স্থায় নায়িকার রসকোন্দল উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, রুচিও পবিত্রতার অনুরোধে বলিতে হয়, এই চিত্র ঢাকা থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু কবিত্বের আকর্ষণে তৎপ্রতি মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়।

নৈতিক প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়া দাশুকে সাহিত্যের তুলাদণ্ডে ধরিয়ে দেখা যাইবে, শব্দের বাঁধুনির জন্য যেরূপ প্রশংসাই দাশুর প্রাপ্য হউক না কেন, তাঁহার বিষয় ও চরিত্র বর্ণনের কৌশল আদৌ নাই। দাশুর প্রসঙ্গ অপ্রসঙ্গ জ্ঞান নাই, সর্ব্বত্রই ইনি 'দন্তরুচি কৌমুদী' দেখাইয়া শ্রোতার হাসি বাড়াইতেছেন; 'প্রভাব-মিলন' পড়িয়া দেখুন,—যে প্রভাব মিলনের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ, যুবা, বালক এক স্থানে বসিয়া কাঁদিয়া বিভোর হইয়াছেন, যে প্রভাব মিলনের সঙ্গে হিন্দুর সুখ দুঃখের কত উন্মাদকর স্মৃতি জড়িত,

দাশু তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া একটি নিঃসম্বল ব্রাহ্মণ তন্ডুলককে কৃষ্ণের নিকটে ভিক্ষা চাহিয়া কিরূপে গলধাক্কা খাইয়াছিল এইরূপ একটি বৃথা গল্প দ্বারা প্রবন্ধ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। দাশুর পাগল প্রতিভা প্রসঙ্গা-প্রসঙ্গ গণ্য করে না। পাঁচালী পড়িতে পড়িতে স্বতঃই মনে হয়, যেন বহুসংখ্যক ইতর ও অর্দ্ধ শিক্ষিত লোক মণ্ডলীর মধ্যে দাশু গাহিয়া যাইতেছে; যে কথা শুনিয়া শ্রোতৃগণ বিমুগ্ধ হইতেছে, দাশু প্রসঙ্গ ভুলিয়া সেই দিকেই গল্পের স্রোত বহাইয়া দিতেছে,—অপেক্ষাকৃত ভাবুক শ্রোতা মূল গল্প শুনিতে উৎসুক হইয়া মনে মনে সা, ঋ, গ, মা বাঁধিয়া সুর দিতেছেন এবং কোন্ সময় কবি মূল সুর ধরিবেন, তাহার অপেক্ষা করিতেছেন,—ইতিমধ্যে দেখিলেন পালা শেষ হইয়া গিয়াছে।

দাশুর রুচি, দাশুর জীবন ও সাহিত্যের প্রতিভা আমাদিগকে জার্ম্মান কবি স্কুবার্ডের কথা মনে করিয়া দেয়।

কবির মৃত্যুর পর তাঁহার "ভাই তিন কড়ি" ও ভ্রাতষ্পুত্রদ্বয় কিছুকাল তাঁহার দল রাখিয়াছিলেন। কিন্তু 'পাঁচালীর' দল তাঁহার মৃত্যুর পরে আর প্রতিপত্তি লাভ করে নাই—যাঁহারা তাঁহার অনুকরণ করিয়া পাঁচালী লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে শ্রীরামপুরের নিকটস্থ বড়া গ্রামনিবাসী কায়স্থ কুলোদ্ভব রসিক চন্দ্ররায়ের নাম উল্লেখ যোগ্য।

এই কদর্য্য আদি রসের স্রোত হইতে দূরে নির্ম্মল বৈষ্ণব সংগীতের ধারা পুনঃ বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই সংগীত প্রাণের কামনা ও নিঃস্বার্থতার আবেগপূর্ণ; এই গীতগুলি যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকান্ত চামার, নীলমণি পাটুনী, নিত্যানন্দ বৈরাগী, ভোলানাথ ময়রা, মধুসূদন কিন্নর, গোজলা গুঁই, রঘুনাথ দাস তন্তুবায় প্রভৃতি কবিগণ নিম্নশ্রেণী হইতে উদ্ভূত হন। বস্তুতঃ কবিওয়ালাগণের বহু-সংখ্যক গীতি রচকই হিন্দু সমাজের অধস্তন স্তর হইতে উৎপন্ন; যখন বড় বড় রাজাগণ, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ বঙ্গসাহিত্যকে কৃত্রিম সৌন্দর্য্য দ্বারা শ্রীসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন ও বিলাসের পঙ্ক দ্বারা ইহাকে কাব্য পিপাসুর অসেব্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখন নিম্নশ্রেণীর লোকগণ ভাষার বিশুদ্ধতা ও রুচির নির্ম্মলতা রক্ষা করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম নিম্নশ্রেণীর

জন্যেই বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই—যে দেশের সামাজিক পদবীতে নিতান্ত ঘৃণ্য ও অধঃপতিত ব্যক্তিগণ এরূপ উৎকৃষ্ট নিষ্কাম প্রেমের কথা বলিতে পারে—সে দেশ কোন একরূপ সভ্যতার উচ্চ আদর্শ আয়ত্ত করিয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে।

বৈষ্ণব সংগীত রচকগণের সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে আমরা রামনিধি রায়ের উল্লেখ করা উচিত মনে করি। ইনি ১৭৪১ খৃঃ অব্দে পাণ্ডুয়ার নিকট চাঁপাতা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন, পরে কলিকাতা কুমার টুলি আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ইনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে কার্য্য করিতেন ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে ৯৩ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। রামনিধি রায়ের গানগুলি সাধারণতঃ 'নিধুর টপ্পা' বলিয়া খ্যাত। প্রাচীন সাহিত্যে কবি নিধুরায় স্বতন্ত্র পথাবলম্বী, ইনি প্রেমসংগীত রচনা করিয়াছেন, অথচ রাধা কৃষ্ণ কি বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন নাই, নিজের ভালবাসা ও মনের ব্যথা স্বাধীনভাবে গাহিয়াছেন, ইহা বঙ্গসাহিত্যে তৎকালে নূতন প্রথা। তাঁহার প্রেম সংগীতে সঙ্গত রুচি ও আত্ম সমর্পনের কথা অধিক,—"ভাল বাসবে বলে ভাল বাসিনে। আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।" "সুরভি গরবে কে তব তুলনা হবে, আপনি আপন সম্ভবে, যেমন গঙ্গা পূজা গঙ্গা জলে।" "তোমার বিরহ সয়ে বাচি যদি দেখা হবে। আমি মাত্র এই চাই, মরি তাহে ক্ষতি নাই, তুমি আমার সুখে থাক, এদেহে সকলি সবে।" "যেও যেও প্রাণনাথ প্রেম নিমন্ত্রণ, নয়ন জলে স্নান করাব, কেশেতে মুছাব চরণ।" বিদ্যাসুন্দরাদির পঙ্কিল স্রোত হইতে সমুত্থান করিয়া পাঠক এই নিঃস্বার্থ উচ্চ অঙ্গের প্রেমের রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুখী হইবেন সন্দেহ নাই।

আমরা এখন সংক্ষেপে কবিওলাগণের বৈষ্ণব সংগীতের আলোচনা করিয়া যাইতেছি।

রামবসু—ইঁহার বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। রামবসুর রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক গানগুলিই বিশেষ প্রশংসনীয়। রাধা জলে প্রতিবিম্বিত শ্রীকৃষ্ণের মিত্ররূপ দেখিয়া বিমুগ্ধা, অশ্রুনেত্রে করযোড়ে সেইরূপ দেখিতেছেন ও সখীগণকে বলিতেছেন,—"ঢেউ দিও না কেউ এ জলে' বলে কিশোরী। সরশনে বাধা দিলে হবে পাতকী।" এই দৃশ্য ছবির উপযুক্ত। রামবসুর বিরহে বধূ বধূর প্রেম পূর্ণ সলাজ হৃদয়টি অঙ্কিত হইয়াছে, বাঙ্গালী জানেন এ দেশে সেই হৃদয়ের দাম নাই। "যখন হাসি হাসি সে আসি বলে। সে হাসি দেখি ভাসি নয়ন জলে।" তাঁহার বিদায়ের সময়ের এই নিঠুর হাসি দেখিয়া যত দুঃখ হইয়াছিল, তাহা মানিনী লজ্জায় জানাইতে পারেন নাই। 'তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদিলাম অবনি। অনাদরে প্রবাসে গেল সে গুণমণি।" সে হাসিতে হাসিতে জন্মশোধে চলিয়া গেল—কিন্তু নীরব অশ্রুপূর্ণ একখানা সুন্দর মুখ এবং বুকভাঙ্গা লজ্জা ও বিরহের একখানা জীবন্ত ছবি পাছে ফেলিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় ভঙ্গে রাধিকা আবার কাঁদিতেছে—

'দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না। * * তুমি চন্দ্র মুখে আমায় দুঃখ দিও না।'' পৃথিবীর উর্দ্ধভাগে অল্পকাল শ্রুত চলন্ত স্বর্গবাসী পাখীর মধুর স্বরের ন্যায় এইসব কবির গীত সহসা মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে। রামবসুর গানে মধ্যে মধ্যে অনুপ্রাসের লীলা আছে, যথা—''এত ভৃঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি এসেছে শ্রীমতীর কুঞ্জে, গুণ গুণ স্বরে কেন অলি, শ্রীরাধার শ্রীপদে গুঞ্জে।''

হরু ঠাকুর (হরে কৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি) ইনি ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতা সিমুলিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। হরু ঠাকুর প্রথমতঃ রঘুনাথ দাস নামক একজন তন্তুবায়ের নিকট কবিতা রচনা শিক্ষা করেন। কথিত আছে একদিন হরুঠাকুর মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীতে এক পেশাদারী কবির দলে সখ করিয়া গাহিতেছিলেন, রাজা তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একজোড়া শাল প্রদান করেন, হরু ঠাকুর অপমান বোধ করিয়া সেই শাল জোড়া তৎক্ষণাৎ ঢুলির মস্তকে নিক্ষেপ করেন। হরু ঠাকুর রামবসুর ন্যায় প্রতিভাপন্ন না হইলেও স্নিগ্ধ ও মধুর কথা রচনায় দক্ষ,—একটি গান এইরূপ ''হরি নাম লইতে অলস হও না, রসনা যা হবার তাই হবে। ঐহিকের সুখ হল না বোলে, কি ঢেউ দেখি তরী ডুবাবে।'' ১৮১৩ খৃঃ অব্দে হরু ঠাকুরের মৃত্যু হয়।

রাম ও নৃসিংহ—ইঁহারা দুই সহোদর, ফরাসডাঙ্গার নিকট কোন গ্রামে বাস করিতেন। ইঁহারা সখী সংবাদ গান রচনা করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। অনুমান ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহারা সংগীত রচনা করেন। রচনার নমুনা যথা—''শ্যাম, তোমার চরিত, পথিক যেমত, হোয়ে শ্রান্তিযুত বিশ্রাম করে। শ্রান্তি দূর হলে, যায় পুন চলে, পুন নাহি চায় ফিরে।'' এতদ্ব্যতীত প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বের কবি গোঁজলা গুঁই রচিত অনেকগুলি গান পাওয়া যাইতেছে। নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী (১৭৫১ খৃঃ—১৮২১ খৃঃ) চন্দন নগরবাসী ছিলেন, ইনিও একজন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ছিলেন। তাঁহার দলের কোন কোন গান বড় মিষ্ট, যথা—''বঁধুর বাঁশী বাজে বিপিনে। শ্যামের বাঁশী বুঝি বাজে বিপিনে। নহে কেন অঙ্গ অবশ হইল, সুধা বরষিল শ্রবণে। বৃক্ষ ডালে বসি, পক্ষী অগণিত, জড়বৎ কোন্ কারণে। যমুনার জলে, বহিছে তরঙ্গ, তরু হেলে বিনে পবনে।''

আমাদের আর স্থানে কুলাইতেছে না, সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্র চর্ম্মকার (কৃষ্টে মুচি), লালু নন্দলাল, নীলমণি পাটুনি, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, সাতুরায়, গদাধর মুখোপাধ্যায়, জয় নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর দাস চক্রবর্ত্তী, রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরক্ষনাথ, নবাই ঠাকুর, গৌর কবিরাজ প্রভৃতি বহুবিধ কবিওয়ালার গান উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। কিন্তু এস্থলে যজ্ঞেশ্বরী নাম্নী রমণী কবি রচিত একটি সখী সংবাদ গানের কতকাংশ তুলিয়া দেখাইতেছি,—''কর্ণ জলে আশ্রমে সুধা হলে যদি অধিষ্ঠান। হেরে মুখ, গেল দুঃখ, ফুটো কমল কথা বলি প্রাণ। আমায় বন্দী করি প্রেমে, এখন ক্ষান্ত হলে হে ক্রমে ক্রমে, দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে; আমি কুলবতী নারী, পতি বই আর জানিনে। এখন অধিনী বলিয়া ফিরে নাহি চাও;

ঘরের ধন ফেলে প্রাণ, পরের ধন আগুলে বেড়াও। নাহি চেন ঘর বাসা, কি বসন্ত কি বরষা, সতীরে কর নিরাশা, অসতীর আশা পুরাও।"

আমরা ভোলা ময়রা কবির নাম একবার উল্লেখ করিয়াছি; ইনি হরু ঠাকুরের চেলা ছিলেন, তাঁহার নাম মাত্রে শিবত্ব আরোপ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী দল ব্যঙ্গ করাতে, ভোলা গালি খাইয়া বলিতেছে—"আমি সে ভোলা নাথ নই, আমি সে ভোলা নাথ নই; আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা, শ্যামবাজারে রই, আমি যদি সে ভোলানাথ হই, তোরা সবাই, বিল্বদলে আমায় পূজলি কই।" পূর্ব্বোক্ত কবিগণ ছাড়া মধুসূদনকিন্নর-রচিত রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক অনেকগুলি পদ পাওয়া যায়।

এই সময় পূর্ব্ববঙ্গেও বহুসংখ্যক কবিওয়ালা উৎকৃষ্ট গান রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত কবিগণের পার্শ্বে দাঁড়াইবার যোগ্য, আমরা আপাততঃ তাঁহাদিগের উল্লেখ করিতে পারিলাম না, সংগ্রহ কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে, পরে তাহা পাঠকগণের বিদিত করিতে ইচ্ছা রহিল। পূর্ব্ববঙ্গের কবিওয়ালা রামরূপ ঠাকুর কৃত একটি সখী সংবাদ গান মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—(চিতান) "শ্যাম আসার আশা পেয়ে, সখীগণ সঙ্গে নিয়ে, বিনোদিনী। যেমন চাতকিনী পিপাসায়, তৃষিতা জল আশায়, কুঞ্জ সাজায় তেম্নি কমলিনী॥ তুলে জাতি যুথি কুটরাজ বেলি, গন্ধরাজ ফুল কৃষ্ণ কেলী, নবকলি অর্দ্ধ বিকশিত, যাতে বনমালী হরষিত, সাজা'ল রাই ফুলের বাসর, আসবে বলে রসিক নাগর, আশাতে হয় যামিনী ভোর, হিতে হ'ল বিপরীত। ফুলের শয্যা সব বিফল হল, অসময়ে চিকন কাল, বাঁশী বাজায়। রঙ্গদেবী তায় বারণ করে দ্বারে গিয়ে। (ধুয়া) ফিরে যাও হে নাগর, প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে কাতর, আছে ঘুমাইয়ে। ফিরে যাও শ্যাম তোমার সম্মান নিয়ে। (পর চিতনে) ছিলে কাল নিশিথে যার বাসরে। বঁধু তারে কেন নিরাশ করে, নিশি শেষে এলে রসময়। বঁধু প্রেমের অমন ধর্ম্ম নয়। তুমি জান্তে পার সব প্রত্যক্ষে, দুই প্রেমেতে যে জন দীক্ষে, এক নিশিতে প্রেমের পক্ষে, দুইএর মন কি রক্ষা হয়। প্যারী ভাগের প্রেম করবে না, রাগেতে প্রাণ রাখবে না, এখন মরতে চায় যমুনায় প্রবেশিয়ে।"

কবিওয়ালাগণের সঙ্গে যাত্রাওয়ালা দলেরও উল্লেখ আবশ্যক। সখী-সংবাদগান ওপেরার ন্যায়, কিন্তু যাত্রাগুলি দেশীয় নাট্যাভিনয়,—এদেশে শ্রীকৃষ্ণ যাত্রাই প্রথম অভিনীত হইত বলিয়া বোধ হয়,—শ্রীকৃষ্ণ যাত্রার সাধারণ নাম ছিল 'কালিয়দমন', কিন্তু এই যাত্রা নামের অর্থ মাত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকার লীলাই এই 'কালিয়দমন' যাত্রায় অভিনীত হইত। আমরা এস্থলে প্রাচীনকালের বড় বড় যাত্রাওয়ালা অধিকারী মহাশয়দিগের নাম উল্লেখ করিয়া যাইব; গোপালচন্দ্র দাস উড়ের নাম আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। যাত্রাগুলির সর্ব্বাদৌ "গৌরচন্দ্রী"

পাঠ হইত, তাহাতে বোধ হয় মহাপ্রভুর পরে যাত্রা সমূহ বর্ত্তমান আকারে প্রবর্ত্তিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ যাত্রায়,—বীরভূম নিবাসী পরমানন্দ অধিকারীর নাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তৎপর শ্রীদাম সুবল অধিকারী কৃষ্ণলীলা বিষয়ে যশ অর্জ্জন করেন। এই কবির সম সাময়িক লোচন অধিকারী অক্রুর সংবাদ ও নিমাই সন্ন্যাস গাহিয়া শ্রোতাগণকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন, কথিত আছে ইনি কুমারটুলির বিখ্যাত বনমালী সরকার ও মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীতে গাহিয়া তাঁহাদিগকে এরূপ মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন, যে তাঁহারা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া কবিকে অপরিমিত সংখ্যক মুদ্রা দান করেন। করুণ রসে বিপ্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় কলিকাতার অন্য কোন ধনী ব্যক্তি ইঁহাকে গান গাইবার জন্য আহ্বান করিতে সাহসী হন নাই। জাহাঙ্গীরপাড়া কৃষ্ণনগর নিবাসী গোবিন্দ অধিকারী ও কাটোয়াবাসী পীতাম্বর অধিকারী, শ্রীকৃষ্ণ যাত্রায় পরসময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পাতাই হাটের প্রেমচাঁদ অধিকারী, আনন্দ অধিকারী ও জয়চন্দ্র অধিকারী রামযাত্রায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। করাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভ চণ্ডীযাত্রা ও বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশ নিবাসী লাউসেন বড়াল 'মনসার ভাসান' পালা গাইতেন ও দুই জনেই স্ব স্ব বিষয়ে অদ্বিতীয় যশস্বী ছিলেন।*

পূর্ব্ববঙ্গ কৃষ্ণ যাত্রার এক বিশেষ অভিনয়ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এই সকল কবির নাম ও গ্রন্থাদির উল্লেখ আমরা এখন করিতে পারিলাম না,—কিন্তু পর সময়ে যিনি পূর্ব্ববঙ্গের যাত্রাগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তিনি পূর্ব্ববঙ্গের লোক ছিলেন না। এই গীতি-কাব্য-শাখায় আমরা যে সব কবির নাম উল্লেখ করিলাম, কৃষ্ণকমল গোস্বামী তাঁহাদিগের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে কৃষ্ণকমলের ন্যায় পদ কর্ত্তা আর জন্ম গ্রহণ করেন নাই—তিনি এই বৈষ্ণব গীতি সাহিত্যের পুনরুত্থান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর বৈদ্যবংশীয় সদাশিব কবিরাজের বংশোদ্ভব; বংশাবলী এইরূপ, ১ম সদাশিব, ২। পুরুষোত্তম, ৩। কানাই ঠাকুর, ৪। বংশীবদন, ৫। জনার্দ্দন, ৬। রামকৃষ্ণ, ৭। রাধাবিনোদ, ৮। রামচন্দ্র, ৯। মুরলীধর, ১০। কৃষ্ণকমল। সুখসাগর ইঁহাদিগের আদিম বাসস্থান ছিল, পরে যশোহর বোধখানা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন; বোধখানা গ্রাম হইতে এক শাখা নদীয়া ভাজনঘাট গ্রামে উপনিবিষ্ট হন, কৃষ্ণকমলের পিতা মুরলীধর ভাজনঘাট বাসী ছিলেন। এই বৈষ্ণব

* ভারতী, মাঘ, ১২৮৮,—দেখুন।

বৈদ্যবংশের এক বিশেষ শ্লাঘার বিষয় এই,—পুরুষোত্তম গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর জামতা মাধবাচার্য্যের গুরু ছিলেন সুতরাং ইঁহারা নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর স্বামী ও সন্তান সন্ততির গুরুকুল।

কৃষ্ণকমল ১৮১০ খৃঃ অব্দে ভাজনঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার মাতা যমুনাদেবী পর দুঃখ কাতরা আদর্শ সাধ্বী রমণী ছিলেন। ৭ বৎসর বয়স্ক বালককে মাতৃক্রোড় বঞ্চিত করিয়া মুরলীধর ঠাকুর বৃন্দাবনে লইয়া যান। সেইখানে কৃষ্ণকমল ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করেন,—কথিত আছে তথাকার এক নিঃসন্তান ধনকুবের বালকের স্নিগ্ধরূপ ও হরি ভক্তির উদ্দাম ভাবাবেশ দৃষ্টে তাহাকে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া পোষ্য রাখিতে ইচ্ছা করেন। মুরলীধর এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতির জন্য পুত্রসহ পলাইয়া গৃহে আগমন করেন। ৬ বৎসর পরে মা যমুনাদেবী পুনরায় শিশুর মুখ চুম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণকমল নবদ্বীপের টোলে পাঠ সাঙ্গ করিয়া 'নিমাই সন্ন্যাস' যাত্রা রচনা করেন ও তাহা অভিনয় করিয়া নবদ্বীপবাসীদিগকে মুগ্ধ করেন। ইঁহার পর তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হয়; পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সে কৃষ্ণকমল হুগ-লীর সোমরা বাঁকিপুর গ্রামে স্বর্ণময়দেবীর পাণি গ্রহণ করেন। বিবাহের পর তিনি বদান্য শিষ্য রামকিশোরের সঙ্গে ঢাকায় আগমন করেন। এই সময় হইতে তাঁহার কবিত্বের বিকাশ পাইতে থাকে; সেই সময় ঢাকা সংগীত চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, যাত্রার নানাদল তথায় প্রতিযোগীতা করিতেছিল, কৃষ্ণকমলের "স্বপ্নবিলাস" রচিত হওয়ার পর সেইসব প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সকলেই নূতন কবির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিল। বৈরাগীগণ সারঙ্গ লইয়া স্বপ্ন বিলাসের গান বাজাইতে লাগিল, বালকগণ পথে পথে চিৎকার করিয়া "এঘর হতে ওঘর যেতে, অঞ্চল ধরি সাথে সাথে, বলত দে মা ননী খেতে, সে ননী অবনীতে পড়ে র'ল গো" প্রভৃতি গাইতে লাগিল; স্বপ্নবিলাস রচিত হওয়ার পর প্রায় ৩৫ বৎসর অতীত হইয়াছে, এখনও পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সেইসব সংগীত গাহিয়া প্রেমিকগণ নীরবে অশ্রুপাত করেন, সেই নির্ম্মল স্বার্থশূন্য দৈববাণীগুলি মর্ত্ত্যধামের দুঃখ পীড়িত লোকের মনে উৎকৃষ্ট নিষ্কাম প্রবৃত্তির উদ্রেক করিয়া দেয়। আবদুলাপুর গ্রামে 'স্বপ্নবিলাসের' প্রথম অভিনয় হইয়াছিল, তৎপর কবি 'রাই উন্মাদিনী', 'বিচিত্র বিলাস,

'ভরত মিলন' 'নন্দ হরণ' 'সুবল সংবাদ', প্রভৃতি পালা রচনা করেন। বিচিত্র বিলাসের ভূমিকায় কবি 'রাই উন্মাদিনী' ও 'স্বপ্নবিলাসের' কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"বোধ হয় ইহাতে সাধারণেরই প্রীতি সাধিত হইয়াছিল, নতুবা প্রায় বিংশতি সহস্র পুস্তক অল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইবার সম্ভাবনা কি?" ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় স্বপ্নবিলাস, রাই উন্মাদিনী ও বিচিত্র বিলাস জর্ম্মেনী, রুসিয়া প্রভৃতি দেশে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন ও লণ্ডন হইতে এই তিন পুস্তক অবলম্বন করিয়া "The Popular dramas of Bengal" নামক সুন্দর পুস্তক প্রনয়ণ করেন।

শেষ জীবন কৃষ্ণকমল ঢাকায় অসামান্য প্রসিদ্ধির সহিত কর্ত্তন করেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার সিমসন্ সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন ও 'পণ্ডিত গোঁসাই' বলিয়া ডাকিতেন,—"বড় গোঁসাই" বলিলে ঢাকাবাসীলোক কৃষ্ণকমলকে বুঝিতেন; অশ্রু গদ্গদকণ্ঠে যথন "বড়গোঁসাই" ভাগবত পড়িতেন, তখন তাঁহার করুণ ব্যাখ্যায় কঠিন হৃদয় দ্রব হইত। জীবনে তিনি অনেক পাষাণ কোমল করিয়াছিলেন।

কবির বৃদ্ধ বয়সে জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যগোপাল গোস্বামীর মৃত্যু হয়, এই শোকে ও নানারূপ জটিল ব্যাধিতে তাঁহার শরীর ভগ্ন হয়—১৮৮৩ খৃঃ ১২ই মাঘ ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রমে চুঁচুড়ার নিকট গঙ্গাতীরে তাঁহার লীলার অবসান হয়। তাঁহার পুত্র নিত্যগোপাল গোস্বামী এখনও ঢাকায় আছেন, ও তাঁহার পৌত্র কামিনীকুমার গোস্বামী অল্প দিন হয় কলিকাতা হইতে কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলীর এক নব সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে ১৮৯৪ সনের মার্চ্চ মাসের ন্যাসনেল ম্যাগাজিনে ও পৌষ মাসের সাহিত্যে আমরা বিস্তারিত ভাবে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।

কৃষ্ণকমল গোস্বামীর "রাই উন্মাদিনীই" বিশেষ প্রশংসনীয় কাব্য। এই পুস্তকের প্রতি পত্রেই চৈতন্যদেবকে মনে করিয়া দেওয়ার বিষয় আছে। যাঁহারা "চৈতন্য চরিতামৃত" প্রভৃতি পুস্তক পড়েন নাই, তাঁহারা "রাই-উন্মাদিনীর" স্বাদ ভাল করিয়া পাইবেন না,—অঙ্কিত চিত্রখানা বৃন্দাবনের উন্মাদের নামে নবদ্বীপের উন্মাদের। কৃষ্ণকমল পুস্তকের সূচনায় বলিয়াছেন,—"বাড়িতে নিজ মাধুরী, * * * নাম ধরি গৌরহরি, হরি বিরহেতে হরি, কাঁদি বলে হরি হরি॥" আমরা নরসিকাসের ন্যায় আত্মরূপে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ দিয়া থাকি, বাহি-

রের বস্তুতে কে কবে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। বাহিরের বস্তু উপলক্ষ করিয়া আমরা স্বীয় আদর্শরূপেরই সত্বা অনুভব করিয়া থাকি; এইরূপের আদর্শ ব্যক্তিগত, রূপ বস্তুগত হইলে সুন্দর ফুল কি স্নিগ্ধ পল্লবটি দেখিয়া মানুষের ন্যায় ইতর প্রাণীগণ ও মুগ্ধ হইত, জাতিগত হইলে চীনদেশের ক্ষুদ্র পদ দেখিয়া আমরা সুখী হইতাম, সমাজগত হইলে দুই প্রতিবাসীর রুচি স্বতন্ত্র হইত না। আমরা প্রত্যেকে 'নিজের মাধুরী' দেখিয়া পাগল, সুতরাং ভালবাসাকে একার্থে আত্মরমণ বলা যাইতে পারে, নিজের কামনার প্রতিবিম্বই রূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে অনুসরণ করিয়া থাকে,* গৌর অবতারে এই প্রেম-লীলা অতি পরিস্ফুট—নিজকে দুই ভাবিয়া এই প্রেমের উদ্ভব, তখন—"দুটি চক্ষে ধারা বহে অনিবার, দুঃখে বলে বা'রে বার, স্বরূপ দেখায়ে একবার,—নতুবা এবার মরি। ক্ষণে গোরাচাঁদ হৈয়ে দিব্যোন্মাদ, উদ্দীপন ভাবে ভেবে কালাচাঁদ, ধরুতে যায় করিয়া দৈন্য।" (রাই উন্মাদিনী)। কৃষ্ণকমলের চক্ষে এই বিরহী গৌরচন্দ্রের মধুর মূর্ত্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাই তিনি "রাই উন্মাদিনী" রূপ উৎকৃষ্ট রূপক চিত্রে পরিণত করিয়াছেন। কৃষ্ণকমল এই প্রেমস্নিগ্ধ গোরা রূপের তুলনায় অন্য সমস্ত রূপ অপকৃষ্ট মনে করিয়াছেন— "চাঁদে যে কলঙ্ক আছে। ছি, ছি, চাঁদ কি গোরা চাঁদের কাছে।" প্রেমিক নিজেই পূর্ণ—তবে বিরহ কেন? গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন,—"তবে যে গোপীকার হয় এতই বিষাদ। তার হেতু প্রোষিতভর্ত্তৃকা রসাস্বাদ। স্ফূর্ত্তিরূপে মূর্ত্তি যখন দেখেন নয়নে। তখন ভাবেন বুঝি এল বৃন্দাবনে॥ অদর্শনে ভাবেন কৃষ্ণ গেছে মধুপুরী।" (রাই উন্মাদিনী)। এই মিলন বিরোধী পথের অন্তরায় যমুনা, যাহা অদ্বৈত ভাবটিকে দ্বৈতভাবে দ্বিখণ্ড করিয়া বিরহের সৃষ্টি করিতেছে,—তাহা আত্ম বিস্মৃতি মাত্র। চৈতন্য চরিতামৃতের আদি খণ্ডে চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই কথার ভাল করিয়া আলোচনা আছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে কৃষ্ণকমলের রাধিকা—চৈতন্যদেবের ছায়া। তাঁহার প্রেমের আবেগ—নির্ম্মল, নিষ্কাম ও আত্ম বিস্মৃতি পূর্ণ। রাধিকা এই প্রেমের আবেশে জড় জগতের স্তরে স্তরে কৃষ্ণ সত্বা অনুভব করিতেছেন,

* লর্ড বাইরণের পদে এই তত্ত্বের আভাষ দৃষ্ট হয়।—"It is to create and in creating live a being more intense, that we endow with form our fancy, gaining as we give the life we enjoy."

তাঁহার প্রেম-বিলাপ প্রলাপের ন্যায় অসম্বদ্ধ, মধুর ও আত্ম-বিহ্বলতার কারুন্য মাখা। কবি প্রেম চিত্রের মোহিনী-মুগ্ধ, রাধিকাকে তিনি কৃষ্ণ প্রেমে সুন্দরী করিয়া গড়িয়াছেন। তাঁহার প্রেম-মাখা কণ্ঠধ্বনি ও প্রেমাশ্রু-উদ্বেলিত চক্ষুর সৌন্দর্য্য বুঝাইতে কম্বু কি কমলের তুলনার আবশ্যক নাই। চন্দ্রাবলী মূর্চ্ছাপন্ন রাধিকার রূপ দেখিয়া বলিতেছে,—"যখন বঁধুর বামে দাঁড়াইত, আবার হেসে হেসে কথা ক'ত, তখন এই না মুখে—মুখের কতই যেন শোভা হ'ত—তা নৈলে এমন হবে বা কেন, বঁধু থেকে আমার বক্ষস্থলে, কেঁদে উঠত রাধা বলে।"—"বঁধু থেকে কুসুম শয্যায়, হৃদয়ে রাখত যায়, সে ধন আজ ধূলায় গড়াগড়ি যায়।"—"অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি। আল্‌তা পরাত বঁধু কতই বাখানি—একোমল চরণে যখন চলিত হাটিয়ে—বঁধুর দরশন লাগি গো অনুরাগে। হেন বাঞ্ছা হ'ত যে পাতিয়ে দেই হিয়ে।" পাঠক দেখিবেন চন্দ্রাবলী রাধিকার কৃষ্ণে প্রীতিই তাঁহার একমাত্র সৌন্দর্য্য বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, কোনও রূপ শারীরিক শোভার বাহুল্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই।

দিব্যোন্মাদের যে স্থলে বিরহিণী রাধিকা কুঞ্জকাননের কুন্দ যূথি লতিকার নিকট দুঃখ কথা কহিতেছেন,—সে স্থলটি কবিত্বময়,—"এই কদম্বের মূলে, নিয়ে গোপকুলে, চাঁদের হাট মিলাইত। সেরূপ র'য়ে র'য়ে মনে পড়ে গো।" ইত্যাদি স্মরণ করিয়া পাগলিনী মিলনের সুখ গাহিতেছেন; নানা অতীত সুখের কথা মনে হইতেছে, একদিন কৃষ্ণ চম্পককুসুম দর্শনে রাধাকে স্মরণ করিয়া অজ্ঞান হইয়াছিলেন, দুপ্রহরে রাধা সুবল সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিলেন,—"দেখি নীলগিরি ধূলায় পড়ে, অমি তুলে নিলাম ধূলা ঝেড়ে, রাখিলাম শ্যাম হিয়ার উপরি। কত যতন ক'রে গো। আমার পরশে চেতন পেয়ে, বলে আমার মুখ চেয়ে, কোথা আমার পরাণ কিশোরী, সুবল বলরে। কইলাম আমি তোমার সেই দাসী, আমায় বুঝি চিন নাই নাথ,—অমি হৃদয়ে ধরিল হাসি, বঁধু কতই বা সুখে।" তার পরে কিরূপে তপস্যার ফলে শ্রীকৃষ্ণ লাভ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছেন,—"প্রেম করে রাখালের সনে, ফিরতে হবে বনে বনে, ভুজঙ্গ কণ্টক পঙ্ক মাঝে—সখি আমার যেতে যে হবে গো, রাই বলে বাজিলে বাঁশী,—অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল, চলাচল তাহাতে করিতেম, সখি আমার চলতে যে হবে গো, বঁধুর লাগি পিছল পথে। হইলে আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি, গতাগতি করিয়ে শিখিতেম, সদা আমায় ফিরতে যে হবে গো, কণ্টক কানন মাঝে।" ইহা কি নিষ্কাম দেব-আরাধনার কথা নহে! শ্রীকৃষ্ণ কত আদর করিতেন, এখন তাঁহার

উপেক্ষা কি সহ্য যায়,—"আচরি চিকুর বানাইত বেণী, সখি সে বেণী সম্বরি, বাঁধিত কবরী, মালতীর মালে বেড়াইত গো। কত সাজে সাজাইত, মুখ পানে চেয়ে র'ত, বঁধুর বিধু বদন ভেসে যেত দুটি নয়নের জলপুঞ্জে।" এই বিলাপাত্মক গীতির স্তরে স্তরে আসন্ন মূর্চ্ছার মূর্চ্ছনা; এই অবস্থায় সহসা পাখীর স্বরে কি মেঘোদয়ে মন উতালা হইয়া পড়ে,—উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষের নিকট মেঘ কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয় ও পাখীর স্বর রাধা নামে সাধা বাঁশীর ধ্বনিতে পরিণত হয়; রাধা মেঘকে কৃষ্ণ মনে করিয়া যুক্ত করে বলিতেছেন, "ওহে তিলেক দাঁড়াও, দাঁড়াও হে, অমন করে যাওয়া উচিত নয়. যে যার স্মরণ লয় নিঠুর বঁধু. তারে কি বধিতে হয়, হেথা থাকতে যদি মন না থাকে, তবে যেও সে থাকে, যদি মনে মনরত, না হয় মনের মত, কাঁদলে প্রেম আর কত বেড়ে থাকে। তাতে যদি মোদের জীবন না থাকে, না থাকে না থাকে, কপালে যা থাকে তাই হবে; বঁধু যথা যে না থাকে, তারে আর কোথা কে, ধ'রে বেঁধে কবে রেখে থাকে।" উন্মাদিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিনাইয়া বলিতেছেন,—"নেত্রপলকে যে নিন্দে বিধাতাকে এত ব্যাজে দেখা সাজে কিহে তাকে, যাহোক দেখা হ'ল দুঃখ দূরে গেল—এখন গত কথায় আর নাই প্রয়োজন" গত কথা বলিতে কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার কথা আসিয়া পড়ে, সে কথায় তাই ক্ষমাশীলা বলিতেছেন "গত কথায় আর নাই প্রয়োজন।" তারপর আবার "বঁধু আমার মতন তোমার অনেক রমণী, তোমার মতন আমার তুমি গুণমণি, যেমন দিনমণির অনেক কমলিনী, কমলিনীগণের ঐ একই দিনমণি"—"বঁধু আমার হৃদয় কমলে রাখিয়া শ্রীপদ, তিল আধ বস বস হে শ্রীপদ" পাগলিনীর এই ভ্রমময়, কৃষ্ণ প্রীতিতে মগ্ন বিহ্বলতার আদত চিত্র পাঠক নিজে দেখিবেন। এই অবস্থায় ভ্রমেও কিছু সুখ আছে, উহা স্বপ্নে মিলনের ন্যায়, কিন্তু চৈতন্য হইলে এই সুখটুকু লুপ্ত হয়। রাধা এইভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মেঘের অদর্শনে মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন; সখীগণ এই মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা—সাক্ষাৎ বিরহরূপিণী রাধিকার প্রেমাশ্রু মিশ্রিত প্রেমোক্তি শুনিয়া বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়াছিল; চৈতন্য প্রভুর উন্মত্তাবস্থার বিলাপ শুনিয়া এইভাবে গদাধর, মুরারি প্রভৃতি পার্শ্বচরগণ দাঁড়াইয়া থাকিত; এই ছবি এত সুন্দর ও স্বর্গীয় বলিয়া বোধ হইত, যে তাঁহারা জগতের কথা বলিয়া তাঁহাকে নির্ম্মল বিস্মৃতির সুখ হইতে জাগাইতে সাহসী হইত না। রাধিকার 'নিশ্বাসে না বহে কমলের আস' এবং "গোবিন্দ বলিতে চাহে বারে বারে, মুখে নাহি সরে, শুধু গো গো করে, বিধুমুখ হেরি পরাণ বিদরে।" আজ বুঝি রাধারে বাচান না যায়।" এই চিত্রের সঙ্গে আর একখানা চিত্র দেখুন—"প্রেমাবেশে মহাপ্রভু গরগর মন।

নাম সঙ্কীর্ত্তন করি করে জাগরণ। * * * সর্ব্বরাত্রি করে ভাবে মুখ সংঘর্ষণ। গোঁ গোঁ শব্দ করে স্বরূপ শুনিলা তখন, চৈ, চ, অন্ত ১৯ পঃ। মিলাইয়া না পড়িলে সম্পূর্ণ সুখ উপলব্ধি হইবে না। রাধার সঙ্গে সখীগণ কাঁদিয়া অজ্ঞান হইল, তখন চন্দ্রাবলী আসিয়া সেই মুদিত পদ্মসংকুল তড়াগের ন্যায় নীরব কুঞ্জবন দেখিয়া বলিতেছে—"মরি একি সর্ব্বনাশ আজ বিপিনে, এসব কণক পুতলী, পড়িয়াছে ঢলি, বিপিন বিহারী শ্রীহরি বিনে, গজোৎখাতে যেন কমল কানন, মহাবাতে যেন হেম রম্ভাবন।" ইত্যাদি। রাধাকে চন্দ্রাবলী চিনিত, কারণ চন্দ্রা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী,—স্থায় পর শত্রু আজ রাধার প্রেম দেখিয়া বলিতেছে, "মরি যে রাধার রূপ বাঞ্ছে শ্রীপার্ব্বতী, যার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে অরুন্ধতী" এস্থল চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদের একটি অংশের পুনরাবৃত্তি।

মূর্চ্ছা ভঙ্গে রাধা ক্ষীণ গলদশ্রুকণ্ঠে আধ ভাঙ্গা স্বরে বিশাখাকে বলিতেছেন,—"কো কো কো কোথা গো, বি বি বি বিশাখে, দে দে দে দেখা, সে ব ব ব বঁধুকে। না না না না দেখে বিবি বিধু মুখে। প প পরাণ যে যা যা যায় দুঃখে।" চন্দ্রা মথুরা হইতে দাস খতের সর্ত্তানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিয়া আনিবেন বলাতে, প্রেম-বিহ্বলা রাধিকা তাহাই বিশ্বাস করিয়া বলিতেছেন "বেঁধ না তার কমল করে, ভর্ৎসনা ক'র না তারে, মনে যেন নাহি পায় দুঃখ। যখন তারে মন্দ কবে, চন্দ্রমুখ মলিন হ'বে, তাই ভেবে ফাটে মোর বুক।" এইরূপ নির্ম্মল আত্ম-ত্যাগপূর্ণ প্রেমের কথা কৃষ্ণকমল গাহিয়া গিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থাবলীর কথা সাঙ্গ করিয়া আমরা এই পুস্তকের প্রথম ভাগের উপর পটক্ষেপ করিলাম।

৯য় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

কবিওয়ালাগণের মধ্যে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১১ খৃঃ—১৮৫৮খৃঃ) নাম উল্লেখ করি নাই। তাঁহার লেখা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজীর প্রভাব বর্জ্জিত নহে—এজন্য দ্বিতীয়ভাগ পুস্তকই তাঁহার গ্রন্থাদি আলোচনার উচিত স্থল হইবে। বিমস্ সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রকে "হিন্দুস্থানী রেবিলেস" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন *; ইনি অনেকগুলি সখী সম্বাদ গান রচনা করিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় সখী সম্বাদ গানাপেক্ষা ব্যঙ্গ কবিতা রচনায়ই কবি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ব্যঙ্গগুলি কোন শ্রেণীবিশেষ কি ব্যক্তি বিশেষে সীমাবদ্ধ

* "Ishawr Chandra Gupta, a sort of Indian Rabelais." Beames Comparative Grammar Vol I. P. 86.

ছিল না,--পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যের উপর সেই ব্যঙ্গের ক্রূররশ্মি নিপতিত হইয়াছে,—লক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে লইয়া ব্যঙ্গ, * আইনের সূত্র লইয়া ব্যঙ্গ, † ইংরেজের বিবি লইয়া ব্যঙ্গ ‡। তাঁহার এই প্রখর ব্যঙ্গরাশি ও সখী-সম্বাদগীতি কালে সাহিত্যের অধঃস্তরে পড়িয়া বিস্মৃত হইবে--কিন্তু তাঁহার অধ্যবসয়ের চির স্মরণীয় কীর্ত্তি প্রাচীন কবিগণের জীবন-সংগ্রহ বিলুপ্ত হইবার নহে। আমরা এই পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগে ঈশ্বরচন্দ্রের বিষয় পুনরায় আলোচনা করিব।

এই যুগের বঙ্গসাহিত্যে নানারূপ সংস্কৃত ছন্দ অনুকৃত হইয়াছিল। কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি লেখকগণের সময় হইতে সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গলাতে প্রবর্ত্তিত করার চেষ্টা দেখা যায়। এই অধ্যায়ের সাহিত্যে সেই চেষ্টার পূর্ণ পরিণতি দৃষ্ট হয়। আমরা নিম্নে সংক্ষেপে বিবিধ ছন্দের কিছু কিছু নমুনা দেখাইতেছি;—

বৃত্তগন্ধী (Hemistich)

"কৌটায় কি আছে দেখ খুলিয়া। থাকিয়া কি ফল যাই চলিয়া॥ বিদ্যা খোলে কৌটা ফল ছুটিল। শর হেন ফুলশর ফুটিল॥" বি, সু (ভারতচন্দ্র)।

ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী।

"থাক থাক, থাক কাটাইব নাক, আগেতে রাজারে কহি। মাথা মুড়াইব, গালে চড়াইব, ভারত কহিছে সহি।" ঐ

ভঙ্গ ত্রিপদী।

"ওরে বাছা ধূমকেতু, মা বাপের পুণ্য হেতু, কেটে ফেল চোরে, ছেড়ে দেহ মোরে, ধর্ম্মের বাঁধহ সেতু।" ঐ

দীর্ঘ ত্রিপদী।

"কালীয়দহের জলে, কুমারী কমল দলে, গজ গিলে উগারে অঙ্গনা।" ক, ক, চ।

---

* "লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে। কিছুমাত্র সুখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥ যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে। নিজে খাও, খেতে দাও সাধ্য অনুসারে॥ ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে। প্যাঁচা লয়ে যাউন মাতা কৃপণের ঘরে॥"

† বিধবা বিবাহের আইন সম্বন্ধে—"সকলেই এইরূপ বলাবলি করে। ছুঁড়ির কল্যাণে যেন বুড়ি নাহি তরে॥ শরীর পড়েছে ঝুলি চুলগুলি পাকা। কে ধরাবে মাছ তারে কে পরাবে শাখা॥"

‡ "বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।"

দীর্ঘ চৌপদী।

"এক কাণে শোভে ফণিমণ্ডল, এক কাণে শোভে মণি কুণ্ডল, আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল, আধই গন্ধ কস্তুরীরে।" অ, ম।

লঘু চৌপদী।

"আহা মরে যাই, লইয়া বালাই, কুলে দিয়া ছাই, ভজি উহারে। যোগিনী হইয়া, উহারে লইয়া যাই পলাইয়া সাগর পারে॥" ভা, বি, স্থ।

মাল ঝাপ।

"কি রূপসী, অঙ্গে বসি, অঙ্গ খসি পড়ে। প্রাণদহে, কত সহে, নাহি রহে ধড়ে॥" কবিরঞ্জন, বি, স্থ।

একাবলী—একাদশাক্ষরাবৃত্তি।

"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ। ক্ষণে হাতে দড়ী, ক্ষণেকে চাঁদ।" ভা-বি, স্থ।

একাবলী—দ্বাদশ অক্ষরাবৃত্তি।

"নয়ন যুগলে সলিল গলিত। কনক মুকুরে মুকুতা খচিত।" কবিরঞ্জন বি, স্থ।

তুণকছন্দ।

"রাজ্যখণ্ড, লণ্ডভণ্ড, বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে। হুলস্থুল, কুলকুল, ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে॥" অ, ম।

দিগক্ষরাবৃত্তি।

"মৃদুমন্দ দক্ষিণ পবন, সুশীতল সুগন্ধি চন্দন, পুষ্পরস রত্ন আভরণ, আজু কেন হৈল হুতাশন।" আলোয়াল।

তরল পয়ার।

"বিনা সুত, কি অদ্ভুত, গাঁথে পুষ্পহার। কিবা শোভা মনো লোভা, অতি চমৎকার॥' কবিরঞ্জন বি, স্থ।

হীনপদ ত্রিপদী।

"হর হর মম দুঃখ হর। হর রোগ হর তাপ, হর শোক হর পাপ, হিমকর শেখর শঙ্কর।" অ, ম।

মাত্রা ত্রিপদী।

"ঝন ঝন কঙ্কণ, নূপুর রণ রণ। ঘুমু ঘুমু ঘুঙ্ঘুর বোলে।" ভা—বি, স্থ।

মাত্রা চতুষ্পদী।

"হে শিব মোহিনী, শুম্ভ নিসূদনি, দৈত্য বিঘাতিনি দুঃখ হরে॥" অ ম।

তোটক।

"রমণী মণি নাগর রাজ কবি। রতি নাথ বিনিন্দিত চারু ছবি।" কবিরঞ্জন,—বি, স্থ।

ভুজঙ্গ প্রয়াত।

"ভদুরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে। অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥" অ, ম।

পূর্ব্বোদ্ধৃত পদগুলিতে আমরা নানারূপ ছন্দের কিছু কিছু নমুনা দিলাম। সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গলাতে অনেক স্থলে খাটিয়াছে ও পদ বিন্যাস সংস্কৃতের ন্যায়ই সুনিপুণ ও শ্রুতিমধুর হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বিধান সর্ব্বত্রই নূতনকালের উপযোগী নহে, ঠিক সংস্কৃতের নিয়মানুসারে গুরু ও লঘু উচ্চারণে আবদ্ধ রাখিয়া বাঙ্গলা পদবিন্যাস করিতে গেলে শব্দগুলি সর্ব্বত্র সুললিত হয় না; ভারতচন্দ্রের রচনায় ছন্দোভঙ্গের দৃষ্টান্ত অল্প, কিন্তু একবারে না আছে এমন নহে;—যথা তোটক ছন্দে "শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে।" এখানে "রী" গুরু হওয়া উচিত হয় নাই। ভারতচন্দ্র ভিন্ন অন্যান্য কবির রচনায় ছন্দোভঙ্গের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে, যথা রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর; তোটকছন্দে,—"ধনি মুখ চিবুক ধরে যতনে।" পদে "মু" ও "বু" লঘু হইয়াছে, এই দুই স্থলে উচ্চারণ গুরু হওয়া আবশ্যক; হরিলীলায় ভুজঙ্গপ্রয়াতছন্দে—"বসিয়া সুবর্ণের পীঠে হাসিছে। প্রবালাধরে মন্দ মন্দ ভাসিছে।" "হাসিছে" ও "ভাসিছে" র "সি" র গুরু উচ্চারণ রাখা উচিত। আর অধিক উদাহরণ দেওয়ার স্থান নাই; সংস্কৃতের ছন্দানুকরণ এখনও শেষ হয় নাই, আধুনিক সময়ে মাইকেলের সম-সাময়িক কবি বলদেব পালিত রচিত ভর্ত্তৃহরি কাব্য এই চেষ্টার পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয়, আমরা কিঞ্চিৎ নমুনা না উঠাইয়া পারিলাম না। মলিনীছন্দঃ— "ফুল সম সুকুমারী, দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী। অচপল তড়িতাভা সুন্দরী গৌরকান্তি। মধুর নববয়স্কা পদ্মিনী অগ্রগণ্যা। যুবক নয়ন লোভা কামিনী কাম শোভা।" বংশস্থবিল,— "তথায় ভীমাসিত-বর্ম্ম ভূষিত। প্রচণ্ড আভাময় চক্র মস্তকে। সবিদ্যুতাগ্নি প্রলয়োম্মুখভ্রবৎ। কৃপাণ পাণি প্রহরি ব্রজে ভ্রমে।" এখন সংস্কৃতের পন্থা হইতে তির্য্যক গমন করিয়া নব নব ভাবুকগণ নূতন ছন্দে কবিতা লিখিতেছেন, তাহা আমাদের পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে আলোচ্য।

প্রথম ভাগ ইতিহাসে আমরা পদ্য সাহিত্যেরই আলোচনা করিলাম। গদ্য রচনার নমুনা একবারে না আছে এমন নহে, কিন্তু তাহা একরূপ নগণ্য। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে আমরা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ দেখাইবার পূর্ব্বে যাহা কিছু প্রাচীন গদ্য রচনা পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা উচিত মনে করি,—সেই ক্ষুদ্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গদ্য রচনাগুলি নব সাহিত্যের ভিত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

আমরা পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের 'গদ্য পদ্যময়' রচনার উল্লেখ পাইয়াছি, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের মতে—এই 'গদ্য রচনা' পদ্যেরই এক প্রকার রূপভেদ। এইমত নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে গ্রহণ করা উচিত কি না বলিতে পারি না। চৈতন্যপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর রূপ-গোস্বামী-বিরচিত 'কারিকা' নামক ক্ষুদ্র গদ্যপুস্তক পাওয়া গিয়াছে*; প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গলা গদ্য বেশ প্রাঞ্জল ও গুরুতর বিষয় রচনার সর্ব্বতোভাবে উপযোগী ছিল বলিয়া বোধ হয়, দুইটি স্থল তুলিয়া দেখাইতেছি—প্রারম্ভ-বাক্য "শ্রীশ্রীরাধা বিনোদ জয়। অথ বস্তু নির্ণয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গুণ নির্ণয়। শব্দ গুণ গন্ধ গুণ রূপগুণ রসগুণ স্পর্শ গুণ এই পাঁচ গুণ। এই পঞ্চ গুণ শ্রীমতী রাধিকাতে ও বসে। শব্দ গুণ কর্ণে গন্ধগুণ নাসাতে রূপগুণ নেত্রে রসগুণ অধরে ও স্পর্শগুণ অঙ্গে। এই পঞ্চগুণে পূর্ব্বরাগের উদয়। পূর্ব্বরাগের মূল দুই; হঠাৎ শ্রবণ ও অকস্মাৎ শ্রবণ।" ইত্যাদি। শেষ অংশ—"আগে তারে সেবা। তার ইঙ্গিতে তৎপর হইয়া কার্য্য করিবে আপনাকে সাধক অভিমান ত্যাগ করিবে। ইতি।"

আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বিরচিত "রাগময়ীকণা" নামক পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা পদ্যগ্রন্থ, কিন্তু যে স্থলে কোন সূত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সবস্থল গদ্যে লিখিত; একটী অংশ এইরূপ—"রূপ তিন কি কি রূপ—শ্যাম১ শ্বেত২ গৌর৩ ধ্যান কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণ জিউর পঞ্চ নাম। গুণ তিনমত হয়ে কি কি গুণ। ব্রজলীলা১। দ্বারকালীলা২। গৌরলীলা৩। দশা তিন কি কি দশা।" ইত্যাদি। বিশ্বকোষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নরোত্তম দাস কৃত একখানা বাঙ্গলা গদ্যগ্রন্থ পাইয়াছেন (১০ই আশ্বিন ১৩০১, বঙ্গবাসী) তাহার ভাষা এইরূপ তাহার রূপ কি। স্বরূপ প্রকৃতিতে জড়িত। বাহ্যজ্ঞান রহিত। তেঁহ নিত্য চৈতন্য। তাঁহাকে জানিব কেমনে। তেঁহ আপনাকে আপনি জানে। যে জন চেতন সেই চৈতন্য। অতএব স্বরূপ এক বস্তু হয়। * * * তেঁহ প্রথম পুরুষ। তাঁর নাসাগ্রে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় স্মৃতিকল্পদ্রুম নামক নিজ বাটীতে প্রাপ্ত একখানা প্রাচীন বাঙ্গলা গদ্য গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ততর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে (সেরপুর) প্রাপ্ত অপর একখানা বাঙ্গলা গদ্যে রচিত স্মৃতি গ্রন্থের বিষয়

* বর্দ্ধমান রয়না নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ এই পুস্তকের কথা প্রথম প্রকাশ করেন। বান্ধব ১২৮৯ সন, অষ্টম সংখ্যা, ৩৬৯ পৃঃ।

জানাইয়াছেন। * আমরা রাজা পৃথ্বীচন্দ্রের রচিত গৌরী-মঙ্গল কাব্যে "স্মৃতি ভাষা কৈল রাধা বল্লভ শর্ম্মণ।" পদে স্মৃতির যে অনুবাদের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা খুব সম্ভব গদ্য গ্রন্থ।

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিদর্শন দ্বারা বোধ হয় দুরূহ সূত্রের ব্যাখ্যা সাধারণের বোধযোগ্য করিতে যাইয়া মধ্যে মধ্যে বাঙ্গলা গদ্যগ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ধারাবাহিক গদ্য রচনার অনুশীলন হইতেছিল, বলিয়া বোধ হয় না।

আমরা দেব-ডামরতন্ত্রে ভূতের মন্ত্রের ন্যায় কতকগুলি বাঙ্গলা গদ্যের নমুনা দেখিয়াছি। এই তন্ত্র খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়, বাঙ্গলাটি বোধগম্য হইল না, একটি ছত্র এইরূপ, "গোঁসাই চেলা সহস্র কামিনী ডোমা চাঁড়াল পাই মুই আকাটান বিষ হাতে এ গুয়া পান খাইয়া।" বেঃ গঃ হস্ত লিখিত পুঁথি।

সূত্রের ব্যাখ্যায় সহজ বাঙ্গলার নমুনা দৃষ্ট হয়; বৈষয়িক পত্রাদির ভাষাও বেশ সহজ; আমরা কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজের সময়ে লিখিত কতকগুলি পত্র দেখিয়াছি, তাহার রচনা আধুনিক পদ্ধতি হইতে বিভিন্ন হইলেও সহজ, এবং ভাব-প্রকাশে সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে নন্দকুমার মহারাজ কনিষ্ঠ রাধাকৃষ্ণ রায়ের ও 'দীননাথ সামন্তজীউ'র নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পাওয়া গিয়াছে; মে, বেভারিজ সাহেব ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ন্যাসনাল মেগাজিন পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পত্র দুইখানার ভাষা সহজ কিন্তু মধ্যে মধ্যে উর্দ্দুর সহিত মিশ্রিত, যথা—'অতএব এ সময়ে তুমি কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার, তবেই যে হউক, নচেৎ আমার নাম লোপ হইল, ইহা মকররর, মকররর জানিবা। নাগাদি ওরা ভাদ্র তথাকার রোয়দাদ সমেত, মজুমদারের লিখন সম্বলিত মনুষ্য কাসেদ এথা পৌছে তাহা করিবা, এ বিষয়ে এক পত্র লক্ষ হইতে অধিক জানিবা।"

রাজ দরবারে উর্দ্দু ও সংস্কৃত মিশিয়া একরূপ বিকৃত বাঙ্গালাগদ্য গঠন করিয়াছিল; এখন ও "কস্য কর্জ্জ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে," "টাল মটালে টাকা আদায় না করাতে," "ওয়াদা কার্ত্তিক মাসে টাকা পরিশোধ করিব" প্রভৃতি দলিল-প্রচলিত ভাষায় সেই বিকৃত রূপের নমুনা বিদ্যমান আছে। আমরা পাঠ্য পুস্তক ও উপন্যাসের ভাষা সংশোধনার্থ ঘোর কোলাহল করিতেছি, কিন্তু সরকারী কাচারী ও জমিদারের সেরেস্তায় প্রাচীন জটিল গদ্য বদ্ধমূল

* শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত, বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত ১৫৯—১৬০ পৃষ্ঠা

হইয়া রহিয়াছে, সেখানে সংস্কারের বীজ এখনও স্থানে পাইতেছে না। আমরা নিম্নে ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দমাণিক্য প্রদত্ত একখানা তাম্রশাসনের প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিতেছি,—"৭ স্বাস্তি শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য দেব বিষম সমর-বিজই মহা মহোদয়ি রাজনামদেশোহয়ং শ্রীকারকোনবর্গে বিরাজতে হুনতে রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগনে মেহেরকুল মৌজে বোলমল অজ হামিলা জমা ১৶ আটার কানি ভূমি শ্রীনরসিংহ শর্ম্মারে ব্রহ্মউত্তর দিলাম এহার পাঁঠা পক্ষক ভেট বেগার ইত্তাদি মানা সুখে ভোগ করোক। ইতি সন ১০৭৭ তে ১৯ কার্ত্তিক।" ৭৮ পৃষ্ঠার ফুটনোটে উদ্ধৃত অনন্তরাম শর্ম্মার গদ্য রচনার কিছু অংশ দেখাইয়াছি, তাহাও প্রায় এই সময়ের রচনা। এই উর্দ্দু মিশ্র ভাষাকে যথা সাধ্য সহজ করিয়া ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এইচ, পি, ফর্ষ্টার সাহেব কতকগুলি আইনের তর্জ্জমা করেন, তাহা দ্বিতীয়ভাগে আলোচনা করিব। সেই তর্জ্জমার ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও অন্বয় ইংরেজীর অনুকরণে সম্পাদিত হইয়া দুরূহ হইয়াছে, তাহাতে কর্ম্ম, কর্ত্তা, ও ক্রিয়ার যথেচ্ছাচার সন্নিবেশ হেতু ছত্রগুলির মাথামুণ্ড ঠিক পাওয়া যায় না।

যে ভাষায় টেকচাঁদ ঠাকুর "আলালের ঘরের দুলাল" রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে, কিন্তু অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে "কামিনীকুমার" রচক কালীকৃষ্ণ দাস "গদ্য ছন্দের" যে নমুনা দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে "আলালী ভাষা" তাঁহার সময়ও প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। আমরা "কামিনীকুমার" হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

রাম বল্লভের তামাক সাজা।

গদ্যছন্দ॥ সদাগর অতিকাতরে এইরূপ পুনঃ পুনঃ সপথ করাতে সুন্দরী ইষৎ হাস্য পূর্ব্বক সোনাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেক। ওহে চোপদার এই চোর এতাদৃশ কাঁকুতিবা বারম্বার করিছে ও নিতান্ত শরণাগত হইয়া আশ্রয় যাচিঞা করিতেছে অতএব শরনাগতে নিগ্রহ করা উচিত নহে বরং নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দেওয়া বেদ বিধি সম্মত বটে। আর বিশেষত আপনার অধিক ভৃত্য সঙ্কেতে নাই অতএব অন্য ২ কর্ম্ম উহা হৈতে বরু হউক আর না হউক কিন্তু এক আধ ছিলিম তামাক চাহিলে ও তো সাজিয়া দিতে পারিবেক। তাহার আর তো কোন সন্দেহ নাই তবু যে অনেক উপকার। সোনা কহিলেক হাঁ ক্ষতি নাই তবে থাকে থাক। কামিনী এইরূপ সোনার সহিত পরামর্শ করিয়া সদাগরকে কহিতেছে। শুন চোর তুমি যে অকর্ম্ম করিয়াছ তাহার উপযুক্ত ফল তোমাকে দেওয়া উচিত কিন্তু তোমার নিতান্ত দুনতা ও বিনয়ে কাকুতি মিনতি এবং কঠিন শপথে এ যাত্রা ক্ষমা করিলাম। এইক্ষণে আমার সর্ব্বদা আজ্ঞাকারী হইয়া

থাকিতে হইবেক আমি যখন যাহা কহিব তৎক্ষণাৎ সেই কর্ম্ম করিবে তাহাতে অন্যথা করিলে তদ্দণ্ডে রাজার নিকট প্রেরণ করিব তাহার আর কথা নাই কিন্তু যদি কর্ম্মের দ্বারায় আমাকে সন্তোষ করিতে পারহ তবে তোমার পক্ষে শেষ বিবেচনা করা যাইবেক। সদাগর এই কথা শুনিয়া মনে২ বিবেচনা করিলেক যে, রাম বাঁচা গেল আর ভয় নাই পরে কৃতাঞ্জলী পূর্ব্বক কামিনীর সম্মুখে কহিতেছে মহাশয় আপনি যে ঘোর দায় হৈতে এদাসের প্রাণ রক্ষা করিলেন ইহাতেই বোধ হয় আপনি জন্মান্তরে এদিনের কেহ ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই নতুবা এমত উপকার পর পরের যে তো কখন করেন না সে যাহা হউক আজি হৈতে কর্ত্তা তুমি আমার ধরম বাপ হইলে যখন যে আজ্ঞা করিবেন এই ভৃত্য কৃত সাধ্য প্রাণ পনে পালন করিব। কামিনী কহিলেক ওহে চোর তুমি আমার আর কি কর্ম্ম করিবে কেবল হুঁকার কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকহ আর এক কথা তোমাকে চোর চোর বলিয়া সর্ব্বদা বা কাঁহাতক ডাকি আজি হৈতে আমি তোমার নাম রামবল্লভ রাখিলাম। সদাগর কহিলেক যে আজ্ঞা মহাশয়. এইরূপ কথোপ কথনান্তে অনেক বিলম্বে কামিনী কহিলেক ওহে রামবল্লভ একবার তামাক সাজ দেখি রামবল্লভ যে আজ্ঞা বলিয়া তৎখাণাৎ তামাক সাজিয়া আলবোলা আনিয়া ধরিয়া দিলেক এই প্রকার রামবল্লভ তামাক সাজা কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন পরে ক্রমে ক্রমে তামাক সাজিতে সাজিতে রামবল্লভের তামাক সাজায় এমত অভ্যাস হইল যে রামবল্লভ যদ্যপি ভোজনে কিম্বা শয়নে আছেন ও সেই সময়ে কামিনী যদি বলে ওহে রামবল্লভ কোথায় গেলেহে রামবল্লভের উত্তর আজ্ঞা তামাক সাজিতেছি। কালীকৃষ্ণ দাস বলে পশ্চাৎ রামবল্লভের এমনি কস্ত হইল যে কামিনীকে আর পষ্ট রামবল্লভ বলিতে হয় না রাম বলিবা মাত্রই রামবল্লভ তামাক সাজাইয়া মজুত।

এক শতাব্দী পূর্ব্বে যে ভাষায় কথা বার্ত্তা চলিত, তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান কালের কথিত ভাষার বড় একটা বৈষম্য হয় নাই। কালীকৃষ্ণ দাস ঠিক কথিত ভাষায় উদ্ধৃত অংশ রচনা করাতে উহার মধ্যে সেকেলে গন্ধ বেশী বর্ত্তে নাই। কিন্তু যাঁহারা বাঙ্গলা গদ্য ইংরেজীর ছাঁচে ঢালিতে চেষ্টা করিলেন, তাঁহাদের ভাষা কালীকৃষ্ণ দাসের ভাষার ন্যায় সহজবোধ্য হয় নাই। রাজা রামমোহন রায়ের ভাষায় শব্দাড়ম্বর নাই, তথাপি তাহা সহজ বোধ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারেনা। কিন্তু যাঁহারা বাঙ্গলা গদ্যে পাণ্ডিত্য খাটাইতে ইচ্ছুক হইলেন, তাঁহারা শব্দ পরম্পরায় ভাষার শ্রী সম্পাদন করিতে যাইয়া বাঙ্গলা রচনাকে নিতান্ত বিশ্রি করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রাচীন এক খানা শিশুবোধকে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের নিকট পত্র লিখিবার যে আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শিরোনামা "ঐহিক পারত্রিক নিস্তার কর্ত্তৃক ভবার্ণব নাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদপল্লবাশ্রয় প্রদানেষু।"

"শ্রীচরণ সরসী দিবানিশি সাধন প্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদ সরোরুহ স্মরণমাত্র অত্র শুভবিশেষ। পরং মহাশয় ধনাভিলাষে পরদেশে চিরকাল কাল যাপন করিতেছেন, যে কালে এদাসীর কালরূপ লগ্নে পাদক্ষেপ করিয়াছেন, সে কাল হরণ করিয়া দ্বিতীয়কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব পরকালে কালরূপকে কিছুকাল সান্ত্বনা করা দুই কালের সুখকর বিবেচনা করিবেন। * * * অতএব জাগ্রত নিদ্রিতার ন্যায় সংযোগ সঙ্কলন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীচরণ যুগলে স্থানং প্রদানং কুরু নিবেদন মিতি।"

স্বামীর উত্তর—শিরোনামা, "প্রানাধিকা স্বধর্ম্মপ্রতিপালিকা শ্রীমতী মালতী মঞ্জরী দেবী সাবিত্রীধর্ম্মাশ্রিতেষু"

পরম প্রণয়ার্ণব গভীর নীর তীর নিবসিত কলেবরাঙ্গসম্মিলিত নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত শ্রীঅনঙ্গমোহন দেব শর্ম্মনঃ ঝটিত ঘটিত বাঞ্ছিতান্তকরণে বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ শ্রীমতীর শ্রীকর-কমলাঙ্কিত কমলপত্রী পঠিতমাত্রে অত্র শুভবিশেষ। বহুদিবসাবধি প্রত্যবিধি নিরবধি প্রয়াস প্রবাস নিবাস তাহাতে কর্ম্ম ফাঁস ব্যতিরিক্ত উদ্ভ্রান্তান্তকরণে কাল যাপন করিতেছি। অতএব মন নয়ন প্রার্থনা করে যে সর্ব্বদা একতা পূর্ব্বক অপূর্ব্ব সুখোদ্ভব মুখারবিন্দ যথাযোগ্য মধুকরের ন্যায় মধুমাসাদি আশাদি পরিপূর্ণ হয়। প্রয়াস মীমাংসা প্রণীতা শ্রীশ্রীঈশ্বরেচ্ছা শীতান্তে নিতান্ত সংযোগ পূর্ব্বক কালযাপন কর্ত্তব্য, বিত্তোপার্জ্জন তদর্থে তৎসম্বন্ধীয় কর্ত্তৃক দুঃখিতা এতাদৃশ উপার্জ্জনে প্রয়োজন নাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি। জ্ঞাপনামিতি।

অনুপ্রাস বাহুল্যহেতু প্রাচীন গদ্যলেখা স্থলে স্থলে ঢক্কানাদের ন্যায় শ্রুতিকটু ও প্রহেলিকার ন্যায় দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িত যথা—"রে পাষণ্ড ষণ্ড এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড দেখিয়াও কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া বকাণ্ড প্রত্যাশার ন্যায় লণ্ডভণ্ড হইয়া ভণ্ড সন্ন্যাসীর ন্যায় ভক্তিভাণ্ড ভঞ্জন করিতেছ এবং গবা পণ্ডের ন্যায় গণ্ডে জন্মিয়া গণ্ডকীস্থ গণ্ড শিলার গণ্ড না বুঝিয়া গণ্ডগোল করিতেছ?" অনুপ্রাস এস্থলে ভাষার অলঙ্কার হয় নাই, গলগণ্ড হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত রচনার পার্শ্বে "কোকিল কলালাপ বাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।" (প্রবোধ-চন্দ্রিকা) প্রভৃতি উৎকট গদ্য সন্নিবেশ করা যাইতে পারে। আমরা দ্বিতীয় ভাগে গদ্য সাহিত্যের বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

আমরা এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় বঙ্গাক্ষর সম্বন্ধে লিখিয়াছি, সেন-রাজগণের তাম্রশাসনের অক্ষর বাঙ্গলা। ১১৬৫ শকে (১২৪৩ খৃঃ) চন্দ্রবংশীয় দামোদর নামক রাজা পৃথ্বীধর শর্ম্মা নামক যজুর্ব্বেদী এক ব্রাহ্মণকে ৫ দ্রোণ ভূমি প্রদান করিয়া যে তাম্রশাসন প্রচার করেন, তাহা চট্টগ্রামের সদর ষ্টেশনের অদূরবর্ত্তী নসিরাবাদ নামক স্থানে পুষ্করিণী খননকালে প্রাপ্ত

হওয়া গিয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটির জারন্যালে * এই তাম্রশাসনের প্রতিলিপি ও সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক কোলব্রুক সাহেবের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"এই তাম্রশাসনের প্রায় সবগুলি অক্ষরই আধুনিক বাঙ্গলার মত, কয়েকটি মাত্র ত্রিহুতে অক্ষরের ন্যায়।" †

বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন ও কেশব সেন প্রদত্ত তাম্রশাসনগুলি পূর্ব্বোক্ত তাম্রশাসন হইতে ও প্রাচীন। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন শ্রীঈশ্বর শর্ম্মাকে ভূমি দান করিয়া যে তাম্রশাসন প্রচার করেন, ওয়েষ্টমেকট সাহেব তাহার প্রতিলিপি ও বিবরণ এসিয়াটিক সোসাইটির জারন্যালে প্রকাশিত করেন।‡ দিনাজপুরের অন্তর্বর্ত্তী দেবকোট নামক গণ্ডগ্রাম হইতে কিছুদূরে "তর্পনদীঘির" পঙ্কোদ্ধারকালে এই তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই তাম্রশাসন ও লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কেশব সেন প্রদত্ত তাম্রশাসনের অক্ষর সম্বন্ধে ওয়েষ্টমেকট সাহেব বলেন,—"এই উভয় তাম্রশাসনের অক্ষরকেই দেবনাগর না বলিয়া বাঙ্গলা বলা যাইতে পারে।" ¶

লক্ষ্মণ সেন মহারাজের অপরাপর তাম্রশাসন ও তাঁহার পিতা বল্লাল সেনের তাম্রশাসনের অক্ষর সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযুজ্য। বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন ৯৩০ শকের (১০০৮ খৃঃ) হস্তলিখিত একখানা কাশীখণ্ড তিনি পাইয়াছেন তাহা বঙ্গাক্ষরে লিখিত, কিন্তু তিনি সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১৩০৩ সাল ৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ) সেই কাশীখণ্ডের অক্ষরের যে প্রতিলিপি দিয়াছেন, তাহা তত প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। সেই গ্রন্থ প্রকৃতই ৯৩০ শকের হস্তলিখিত হইলে বোধ হয় প্রতিলিপি যথাযথরূপ উঠে নাই।

এইসব অক্ষরের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ৮০০ বৎসর ও ততোধিক কালের প্রাচীন বাঙ্গলা অক্ষরের যেরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা মূলতঃ আধুনিক বঙ্গাক্ষরের সদৃশ ও এক সংজ্ঞায় বাচ্য হওয়ার সম্পূর্ণ

* Journal Asiatic Society Vol XLIII, No. 4 (1874)

† "The character agrees nearly with that now in use in Bengal; but some of the letters bear a close resemblance to the writing of Trihut."
Do. P. 318.

‡ Journal Asiatic Society Vol XLIV. No. I (1875)

¶ Both are a type rather Bengali than Dev Nagri—J. A. S. Vol XLIV. No. I. P. 2 (1875).

যোগ্য। আমরা ইতিপূর্ব্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি ত্রিহুতের 'ব' এর নীচে শূন্য দিয়া 'র' এর মত লিখার পদ্ধতি ও অন্যান্য কোন কোন বিষয়ে ত্রিহুতের অনুকৃতি আমরা অনেকগুলি প্রাচীন হস্তলিখিত বাঙ্গলা পুঁথিতে দেখিয়াছি। কলরিজ সাহেব ও লক্ষ্মণ সেন এবং কেশব সেনের তাম্রশাসনের অক্ষর সম্বন্ধে সেই কথা বলিয়াছেন। এই প্রাচীন অক্ষর-গুলির ক্রম পরিবর্ত্তন অতি কৌতুহলকর দৃশ্য। সেইসব তাম্রশাসন ও পরবর্ত্তী প্রাচীন পুঁথিগুলি অক্ষর ক্রমে কিরূপে আধুনিকভাবে গঠিত হইয়াছে—আমরা তাহা দেখিয়াছি, কিন্তু একান্ত অভিপ্রায় সত্বেও নানা-রূপ অসুবিধার জন্য একটি ধারাবাহিক অক্ষরপ্রতিলিপি উঠাইয়া পাঠকগণকে দেখাইতে পারিলাম না।

কেহ কেহ বলেন বঙ্গাক্ষর মাগধী হইতে উদ্ভূত। এক সময়ে মগধের সভ্যতা সমস্ত ভারতবর্ষের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছিল, কিন্তু তজ্জন্যই যে বঙ্গাক্ষর মাগধী অক্ষর হইতে উদ্ভূত কিম্বা বঙ্গাক্ষর অপেক্ষা মাগধী অক্ষর বেশী প্রাচীন তাহার প্রমাণ কি? ললিত বিস্তরে দৃষ্ট হয়, বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব হইতে বঙ্গাক্ষর প্রচলিত ছিল। মগধ বাঙ্গলা দেশের নিকটবর্ত্তী, এইজন্য ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানের প্রচলিত অক্ষর হইতে মাগধী অক্ষরের সঙ্গে বাঙ্গলা অক্ষরের বেশী সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা হইতে ইহা প্রমাণিত হয় না যে একটি অপরটি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে যে সব শব্দ বঙ্গসাহিত্যে খুব প্রচলিত ছিল, তাহাদের কোন কোনটির ব্যবহার ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। পুছিল, পেখিল, মেনে (এই শব্দ চণ্ডীদাসের কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত বহু কবির রচনায়ই পাওয়া যায়, শেষোক্ত কবিদ্বয়ের পুস্তকে ইহার বিশেষ ছড়াছড়ি, কিন্তু অনেক স্থলেই এই শব্দের কোন অর্থ দৃষ্ট না,—পাদপূরণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়) নেহারে, ঘরণী, দোঁহে, (দুইজন), আচম্বিত, এথায়, এবে, এড়িল, প্রভৃতি শব্দের গদ্য সাহিত্যে এখন আর স্থান নাই, ইহাদের কোন কোনটির প্রভাব পদ্য সাহিত্যেও অস্তগামী।

সংস্কৃত শব্দের অর্থ কোন কোন স্থলে বাঙ্গলায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সংস্কৃত "প্রীতি" শব্দ বলিতে যাহা বুঝায় বাঙ্গলা "পীরিত" শব্দে বোধ হয়, তাহা

বুঝায় না। সংস্কৃত 'রাগ' শব্দ বাঙ্গলায় সম্পূর্ণ ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু চৈতন্যপ্রভুর সময়েও রাগ অর্থ ক্রোধ ছিল না,—গোবিন্দ দাসের করচায় "রাগে ডগমগ প্রভু দেন্ন সন্তরণ। পাড়ে দাণ্ডাইয়া দেখে যত ভক্তগণ।" অংশে রাগ শব্দ সংস্কৃতের অর্থ বিচ্যুত হয় নাই, এখন রাগ এবং অনুরাগ বাঙ্গলায় দুই ভিন্নার্থ বোধক শব্দ। ভর্ত্তা হইতে যে শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বাঙ্গলায় কেবল মাত্র অর্থ দুষ্ট হয় নাই, বোধ হয় একটু অশ্লীল হইয়াছে। ভাণ্ডারী নামে পরিচয় দিতে এক সময়ে মহারাজ দুর্য্যোধন ও কুণ্ঠিত হন নাই, এখন ইহার অর্থ তদ্রূপ গৌরবজনক নাই। দেব শব্দ হইতে 'দে' শব্দ উৎপন্ন হইয়া এখন ইহা ভাষায় নিতান্ত নিগৃহীত হইয়াছে, একটু মর্য্যাদা বিশিষ্ট হইলে "দে" গণ 'দাস' আখ্যা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন। 'দেব' গণের বংশধর 'দাস' হইতে ও হীন হইয়াছেন। মনুষ্যের ভাগ্যচক্রের ন্যায় শব্দগুলির ভাগ্যচক্র ও পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। "মহোৎসব" শব্দের অর্থ বাঙ্গলায় সীমাবদ্ধ হইয়াছে, বৈষ্ণবগণ এই শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত করিয়াছেন। মহোৎসবের ন্যায় বোধ হয় "সঙ্কীর্ত্তন" শব্দ ও তাঁহাদের দ্বারা সঙ্কুচিত অর্থ হইয়াছে। যাহা হউক এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার উচিত স্থল হইবে।

পূর্ব্বে যাত্রাওয়ালা ও কবিওয়ালাগণের বিষয় আমরা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছি। "খেউর" গানে গালাগালির চূড়ান্ত করা হইত; দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে নদে ও শান্তিপুর 'খেউর' গানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বিদ্যা সুন্দরকে বর্দ্ধমানে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য প্রলোভন, দেখাইতেছেন,—"নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব। নূতন নূতন ঠাটে খেড়ু শুনাইব।" (ভা. বি)।

কৃষ্ণনগরের পুতুল, ও শান্তিপুরের ধূতির বিষয়ও ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা জয়নারায়ণের কাশীখণ্ডের পরিশিষ্টে দেখিতে পাইয়াছি, নবদ্বীপের কারিকরগণ পাথরের মূর্ত্তি গড়িতে বিশেষ পটু ছিল, কাশীধামে ও তাহাদের আদর ও প্রতিপত্তি ছিল। ভক্তিরত্নাকরে আমরা হালিসহর নিবাসী নয়ন ভাস্কর নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ভাস্করের উল্লেখ পাইয়াছি—("নয়ন ভাস্কর হালি সহর গ্রামে ছিল" ভক্তিরত্নাকর, ১০ তরঙ্গ)। জয় নারায়ণ সেনের চণ্ডীতে দৃষ্ট হয়, বঙ্গদেশে শ্রীহট্টের ঢাল,

লাহোরী কামান, কাশ্মিরী কুঙ্কুম, মুলতানের হিঙ্গ, চিনের পুতুল ও দক্ষিণ দেশের গুবাক, বিশেষরূপ আদৃত ছিল। এতদ্ব্যতীত "কাশ্মীর দেশের জাল শাল গঙ্গাজলি" উক্ত পুস্তকে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। দেশীয় বণিকগণ বাণিজ্য করিয়া বিপুল ধনোপার্জ্জন করিতেন; শ্রীপতি, লক্ষপতি, ধনপতি,—প্রভৃতি নাম ধনের মর্য্যাদা ব্যঞ্জক। রাজপুত্র কি সদাগরের পুত্রকে নায়ক রূপে বরণ করিয়া নিত্য নব উপাখ্যানের সৃষ্টি করা হইত,—আমরা শৈশবকালে সেই সব উপাখ্যান শুনিয়া রাজপুত্র এবং সদাগরের পুত্র উভয়কে প্রায় তুল্যরূপ সম্মাননীয়ই জ্ঞান করিতাম। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য চণ্ডী ও মনসার গীতের নায়ক নায়িকা—সদাগর কুলোদ্ভব। এখন বণিক সম্প্রদায় য়ুরোপে সম্মানিত, আমাদের দেশে নিগ্রহ ভাজন।

এই সময় সংস্কৃত ও পার্শী শিক্ষায় বঙ্গদেশ শীর্ষ স্থান লাভ করিয়াছিল। শিশুবোধকে স্বামীর নিকট স্ত্রীর পত্র লিখিবার যে আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে,—তদ্দ্বারা এই মত প্রচার করা যাইতে পারে, যে স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কেহ কেহ সেইরূপ আদর্শ অনুকরণে পত্র লিখিতে পারিতেন;—রচনার ভাব অসার ও উপাহাসাস্পদ হউক, কিন্তু রমণীগণ ঐরূপ ভাষায় পত্রাদি লিখিতে সক্ষম থাকিলে, তাহাতে অন্তঃপুর শিক্ষারপ্রবাহ স্তিমিত ছিল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না; আনন্দময়ী গুপ্তার যেরূপ রচনা-পারিপাট্যের উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে আধুনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি ধারিণী শিক্ষিতা মহিলাগণের অন্ততঃ সমকক্ষ গণ্য করিতে হইবে। অধ্যায়ভাগে আমরা যজ্ঞেশ্বরী নাম্নী এক রমণীর রচিত গানের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। বিক্রমপুর অঞ্চলে গঙ্গানাম্নী এক রমণী কবি এক শতাব্দী পূর্ব্বে অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি এখনও তদ্দেশে বিবাহোপলক্ষে গীত হইয়া থাকে।

রমণীমহলে লেখা পড়ার এতদূর চর্চ্চা হইতেছিল পুরুষগণের অনেকেই যে সরস্বতীর বর পুত্র হইতে লালায়িত হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি। বাঙ্গলাভাষায় পার্শী ও সংস্কৃত এই দুই পদ মধ্যে মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল, আমরা রামপ্রসাদের কবিতায় সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গলার সংযোগ চেষ্টা দেখাইয়াছি; সলিলে তৈলবিন্দুর মত উক্ত কবির কাব্যে এই দুই পদ ভালরূপ মিশ্রিত হয় নাই। ভারতচন্দ্র, কবি আলোয়াল প্রভৃতি এই বিষয়ে কৃতিত্ব

দেখাইয়াছেন; ভারতচন্দ্র একস্থলে লিখিয়াছেন. "মানসিংহ পাতসার হইল যে বাণী। উচিত যে পারশী, আরবী, হিন্দুস্থানী॥ পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি। কিন্তু সে সকল লোক বুঝিবারে ভারি॥ না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল। অতএব কহি ভাষা যবণী মিশাল॥" কেবল যবনী মিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। স্থলে স্থলে বিদ্যার দৌড় দেখাইতে যাইয়া সংস্কৃত, পার্শী, বাঙ্গলা হিন্দী এই চতুর্বিধ উপকরণে এক বীভৎস অবয়ব প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা যজ্ঞান্তে পুনর্জীবিত দক্ষমূর্ত্তির ন্যায় উৎকট,—যথা, "শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর, বারদকে গোয়দ কুবর, কাতর দেখে আদর কর কাহে মর রো য়োয়কে। বক্‌তুং বেদং চন্দ্রমা, চুঁ লালা চে রেমা, ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা মেট্টিমে কাহে শোয়কে।" এই শিক্ষার ঢেউএ নিমন্ত্রিত সভাগৃহ আন্দোলিত হইত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কিভাবে বিচার করিতেন, জয়নারায়ণ সেন তাঁহার চণ্ডীকাব্যে তাহা অতি সুচারুভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক ইহাতেই সে সময়ে কি কি পুস্তক পাঠ হইত, তাহারও একটা তালিকা দেখিতে পাইবেন।

"ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে, পাইয়া পত্র নিমন্ত্রণে, উপনীত সভা আরোহনে। কেবল অধিষ্ঠানমাত্র, দান নিতে নহে পাত্র, ধর্ম্ম সংস্থাপন কারণে॥ তেজসপুঞ্জ সুকিরণ, শুক্লবর্ণ সুবসন, ভালেতে গঙ্গা মৃত্তিকা ফোটা। শুভ্র যজ্ঞোপবীতে, রক্তভোট আসনেতে, বসিতেছি বিচারের ঘটা॥ অনুমান প্রত্যক্ষেতে, পরম্পরা সম্বন্ধেতে, তার্কিক ঘটার নানা তর্ক। প্রমাণ কুসুমাঞ্জলী সামান্যতে ব্রহ্মবলি, একে আর সৃষ্টির সম্পর্ক॥ পদ পদার্থ বিচারেতে, এক দণ্ড সমাসেতে, কার কর্ত্ত নিশ্চিত বেটাইয়া। বৈয়াকরণিয়া সবে, বিচার কর্কশ রবে, গোপীনাথ পরিশিষ্ট লইয়া॥ মধুর বাক্যের বাণী, অলঙ্কার শুনি ধ্বনি, একদিগে কহিছে রসেতে। ধ্বনি কাব্য কয়ে কয়ে, অলঙ্কারিক লয়ে, কাব্য প্রকাশ উদাহরণেতে॥ নানা ছন্দে শ্লোক পাঠ, সাহিত্যে বিচার ঠাট, কতমত বর্ণনা ভাবের। রসিক বিবুধগণে, মধ্যস্থ পণ্ডিত মানে, রঘুভট্টি মাঘ নৈষধের। পৌরাণিক পণ্ডিতে, নানামত প্রসঙ্গেতে, বিচার করিছে ভাবি মনে। বশিষ্ঠাদি বেদ জ্ঞানে, স্তনক ভাবগণে, অন্ত্য প্রতান্তর লিখি। দশা বিদশা বসতি, জানায় সাধুর প্রতি, সূর্য্য সিদ্ধান্তের মত দেখি। সকলেতে ব্রহ্মময়, বেদান্তে এমত কয়, পাপ পুণ্যালয় নিরঞ্জন। শত্রু মিত্র ময় তিনি, জ্ঞান ভেদে ভিন্ন মানি, শঙ্করাচার্য্যের এ লিখন, পড়িলে বিপত্তি কালে, দোষ যদি ঘটে বলে, ধর্ম্মশাস্ত্র মতে পাপ নহে। স্মৃতি শাস্ত্রে যথা এই, শূলপাণি মত এই, মুক্তকণ্ঠ হৈয়া মনু কহে॥"

পণ্ডিতগণ পরকালের তত্ত্ব নিরূপণ করিতেছিলেন, রাজপুত্রগণ এক হস্তে শুক পক্ষী ও অপর হস্তে রস কথা পূর্ণ কাব্য লইয়া—বিলাস কলায় দীক্ষিত

হইতেছিলেন,—এই সময় ভারতবর্ষের ভবিষ্যত নবভাবে গঠিত হইতেছিল; তাঁহাদের শাস্ত্র কথা ও রস কথা যে হঠাৎ প্রবল এক রাজনৈতিক ঝ্যাপটা বাতাসে স্থগিত হইয়া পড়িবে, ইহা তাঁহারা মনেও করেন নাই।

ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, পারিবারিক জীবনে নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে; নূতন আদর্শ, নূতন উন্নতি ও নূতন অভিপ্রায়ের সঙ্গে সমগ্র জাতি অভ্যুত্থান করিয়াছে। সাহিত্যে এই নবভাবের ফলে গদ্য সাহিত্যের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, বাঙ্গালী এখন বাঙ্গলা ভাষাকে মান্য করিতে শিখিতেছে, এবড় শুভ পূর্ব্বলক্ষণ; ক্রীড়াশীল শিশু যেরূপ সমুদ্রতীরে খেলা করিতে করিতে একান্ত মনে গভীর উর্ম্মিরাশির অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়া চমকিত হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তক লইয়া বাল্যক্রীড়া করিতে করিতে আমি ও সেইরূপ বঙ্গসাহিত্যের অদূরবর্ত্তী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কথা কল্পনা করিয়া সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইয়াছি। অর্দ্ধ শতাব্দীতে বঙ্গীয় গদ্য যেরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কাহার মনে ভাবী উন্নতির উচ্চ আশা অঙ্কিত না হয়! আমরা দ্বিতীয় ভাগে নবভাবে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত নব আশা দৃপ্ত বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিশীল চিত্র আঁকিয়া দেখাইব, আশা রহিল।

সম্পূর্ণ।



ষষ্ঠ অধ্যায়।

গৌড়ীয় যুগ।

অথবা

শ্রীচৈতন্য-পূর্ব্ব সাহিত্য।

১। 'পঞ্চগৌড়।'

২। অনুবাদ-শাখা।

৩। লৌকিক ধর্ম্ম-শাখা।

৪। পদাবলী-শাখা।

৫। কাব্যেতিহাসের সূত্রপাত-শাখা।

মুসলমান-বিজয়ের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ও পরে বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর-বর্ত্তী ও প্রাক্‌জ্যোতিষপুরের পশ্চিম-স্থিত বৃহৎ ভূভাগ সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা, ও উৎকল এই পঞ্চভাগে বিভক্ত ছিল; এই পঞ্চ বিভাগের সাধারণ নাম ছিল, 'পঞ্চগৌড়'। এই নাম গৌড়দেশেরই প্রভাব-ব্যঞ্জক, বস্তুতঃ গৌড়দেশ অতি প্রাচীন রাজ্য।* পূর্ব্বোক্ত পঞ্চরাজ্য ভিন্ন ভিন্ন রাজাদিগের শাসনাধীন ছিল, কিন্তু সমধিক পরাক্রান্ত রাজা, সেক্‌সনদিগের 'বৃটওয়াল্ডার' ন্যায় গর্ব্ব-পূর্ণ 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করিতেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউনসাঙ শিলাদিত্য মহারাজকে এই 'পঞ্চ গৌড়েশ্বর' উপাধি বিশিষ্ট দর্শন করিয়া যান।† গৌড়দেশীয় রাজাগণ অনেকবার এই গর্ব্বিত উপাধিলাভ করিয়াছিলেন; খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে

* গৌড়ের রাজধানী ৭৩০ খৃঃ পূঃ অব্দে স্থাপিত হয়। ইহাকেই বোধ হয় টলমি 'গঙ্গারিডিয়া' সংজ্ঞায় বাচ্য করিয়াছেন। উক্ত সময়ে এই দেশ করতোয়া ও গঙ্গা দ্বারা বিভক্ত হইয়া পশ্চিমাংশ গৌড় ও পূর্ব্বাংশ বঙ্গদেশ বলিয়া খ্যাত ছিল। এক রাজার শাসনাধীন থাকা হেতু এই দুই অংশ কালে 'গৌড়দেশ' এই সাধারণ নামে অভিহিত হইত। মোগল রাজাদিগের সময় গৌড় ও বঙ্গদেশ 'বাঙ্গলা' নাম গ্রহণ করে। See—*Major Ronnel's Map of Hindoostan.*

† বিল (Beal) সাহেব-কৃত হিউন সাঙএর ভ্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' শব্দের স্থলে "Lord of the Five Indies" দৃষ্ট হয়।

কিরণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কগুপ্ত কান্যকুব্জাধিপতি রাজ্যবর্দ্ধনকে যুদ্ধে জয় করিয়া নিহত করেন। বৌদ্ধরাজাদিগের মধ্যে গোপাল, দেবপাল ও জয়পাল সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত জয় করেন। ইঁহারা এতদূর ক্ষমতাশালী ছিলেন যে পঞ্জীকায় কলি-যুগের রাজচক্রবর্ত্তীদিগের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের নাম ও উল্লিখিত দেখা যায়। বলা বাহুল্য ইঁহারাই 'পঞ্চ গৌড়েশ্বর' উপাধির প্রকৃতরূপে বাচ্য ছিলেন। এই গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহই বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির প্রথম কারণ। বঙ্গভাষার প্রাচীন গীতি-সমূহে 'পঞ্চ গৌড়েশ্বর' সংজ্ঞা অনেক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু বোধ হয় কালক্রমে কবি ও স্তুতি-জীবিগণের দ্বারা এই উপাধির অর্থচ্যুতি ঘটিয়াছিল।

আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীনকালে বৌদ্ধরাজন্যবর্গের স্তুতিই বঙ্গীয় কাব্যের বিষয় ছিল। যোগীপাল, গোপীপাল ও মহীপালের গীত শুনিতে লোক-বৃন্দ আনন্দিত হইত।* পূর্ব্ববর্ত্তী এক অধ্যায়ে মাণিকচাঁদের গানের বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী রচনাগুলিতে ও গৌড়েশ্বরগণের মহিমার অজস্র কীর্ত্তন আছে। কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের আজ্ঞাক্রমেই রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি গর্ব্বের সহিত বলিয়াছেন,—"পঞ্চগৌড় চাপিয়া যে গৌড়েশ্বর রাজা। গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে, গুণের হয় পূজা।" শ্রীকৃষ্ণবিজয়লেখক ও গৌড়েশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়া গুণরাজ খাঁ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন,"নির্গুণ অধম মুক্তি, নাহি কোন গ্রাম। গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান॥" গৌড়েশ্বর নসরতখান মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন,—"শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান। রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান॥" (কবীন্দ্র, বে, গ, পুঁথি, ৮৮ পত্র।) এই দৃষ্টান্তে পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁ, সেনাপতিদ্বয়, দ্বিতীয়বার মহাভারতের অনুবাদ সংকলন করিতে দুইজন প্রতিভাবান কবিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই দুই কবি ও পঞ্চগৌড়ের গৌরব বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন, আমরা বারংবার তাঁহাদের রচনায় পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ দেখিতে পাই,—"নৃপতি হুসেন সাহ হয় মহামতি। পঞ্চগৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥" (কবীন্দ্র, বে, গ, পুঁথি ১ম পত্র।) "লস্কর পরাগল গুণের সাগর। অবতার, কল্পতরু, রূপে বিদ্যাধর॥ প্রিয়পুত্র তাহান বিখ্যাত ছুটিখান। পঞ্চম গৌড়েতে যার

* যোগীপাল, গোপীপাল, মহীপাল গীত।
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত॥ চৈ, ভা, অন্ত্যখণ্ড।

রামের বাখান ॥ (কবীন্দ্র, বে, গ, ২৫৭ পত্র।) এতদ্ব্যতীত বিদ্যাপতির "চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর, কবি বিদ্যাপতি ভণে।" বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে পঞ্চগৌড়েশ্বর হুসেন সাহকে "সনাতন", "নৃপতি-তিলক" প্রভৃতি গর্ব্বিত উপাধি দ্বারা স্তুতি ও মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্যে "পঞ্চগৌড় নামে দেশ পৃথিবীর সার। একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥" (মাধবাচার্য্যের চণ্ডী, চট্টগ্রামের সংস্করণ ৮ পৃঃ।) প্রভৃতি পদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। পূর্ব্বঅধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি, প্রাচীনকালে বঙ্গের ধনী ব্যক্তিগণ বঙ্গভাষার আদর করিতেন। তাহার মূল কারণ বোধ হয়, গৌড়েশ্বরগণের সদ্দৃষ্টান্ত। আমরা জগদানন্দের সঙ্গে কবি ষষ্ঠিবরের*, রঘুনাথদেবের সঙ্গে মুকুন্দরামের যশোমন্ত সিংহের সঙ্গে শিব-সংকীর্ত্তন-লেখক রামেশ্বরের†, বিশারদের সঙ্গে অনন্তরামের‡, কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের, মাগন-ঠাকুরের সঙ্গে কবি আলাওলের¶ ও রাজা জয়চন্দ্রের সঙ্গে ভবানী দাসের§ নাম একত্র পাইয়াছি। রাজমালায় দৃষ্ট হয়, ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ (২য়) ধর্ম্মমাণিক্য মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন। গজদন্ত স্বর্ণ জড়িত হইলে যে শোভা হয়, ধন ও জ্ঞান মর্য্যাদার এই যোগ তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

আমরা আশা করি, পাঠকগণ এখন বুঝিতে পারিলেন, আমরা কেন এই অধ্যায় 'গৌড়ীয়যুগ' সংজ্ঞায় অভিহিত করিলাম। গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহে যে ভাষার মুখবন্ধ হইয়াছিল, তাহা 'গৌড়ীয় সাধু ভাষা' আখ্যায় পরিচিত হইয়াছিল।

---

* "অমৃত লহরী ছন্দ, পুণ্য ভারতের বন্ধ, কৃষ্ণর চরিত্র শেষ পর্ব্বে। শ্রীযুত জগদানন্দে, অহর্নিশ হরিবন্দে, কবি ষষ্ঠিবর কহে সর্ব্বে॥" সঞ্জয় বে, গ, পুঁথি, ৭৮৯ পত্র।

† "যশোমন্ত, সবগুণবন্ত, তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করি ঘর, বিরচিল শিব-সংকীর্ত্তন।" রামেশ্বরের শিবসংকীর্ত্তন।

‡ "বিশারদ পদে সেই রেণু অভিপ্রায়। পদবন্ধে রচিলেক প্রথম অধ্যায়॥" অনন্তরামকৃত, ক্রিয়াযোগ সার, হস্তলিখিত পুঁথি।

¶ বিরহ মত্ত মাতঙ্গ, বহুল বাহিনী সঙ্গ, হরি দরশনে, অঙ্গ পরশনে, সসৈন্য হইল ভঙ্গ। অতি রসিক সুজন, রূপ জিনি পঞ্চবাণ, শ্রীযুত মাগন, আরতি কারণ, হীন আলাওলে ভণে। পদ্মাবতী ২০৪ পৃঃ।

§ "কহেন ভবানীদাস, শ্রীরামের পদে আশ, জয়চন্দ্র রাজার বচনে।" লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়। রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্করণ (২৮৫ নং আপার চিৎপুর রোড) ১২২ পৃঃ।

২। অনুবাদ-শাখা—(ক) কৃত্তিবাস।

ভাষার ভিত্তি দৃঢ় করিতে প্রথমতঃ অনুবাদ গ্রন্থেরই আবশ্যক। গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহে বঙ্গভাষার আদিকালে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত গ্রন্থের অনুবাদ রচিত হইয়াছিল। কৃত্তিবাস অশিক্ষিত ছিলেন, তিনি স্বভাব-কবি বা হটাৎ-কবি, কথকদিগের মুখে গান শুনিয়া সহসা কবিত্বের স্ফুরণে, কবি-যশ-স্পৃহার শির-কণ্ডুয়নে রামায়ণ ভাষায় বিরচিত করেন; তিনি ৩০০ বৎসরের কবি; এইরূপ অনেক কথাই তাঁহার সম্পর্কে সাহিত্য-সংসারে রাষ্ট্র হইয়াছে। সুবিজ্ঞ ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় 'কৃত্তিবাস ওঝাকে' ব্রাহ্মণ প্রমাণ করিতেই গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছিলেন।* বঙ্গবাসীর সম্পাদক মহাশয় দেখাইয়াছেন, কৃত্তিবাস ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। আমরা ও জন্মভূমিতে এই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রমাত্মক মত খণ্ডন করিয়াছিলাম।† কৃত্তিবাস ৫০০ বৎসরের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধকালে বর্ত্তমান ছিলেন, একথা আমরা এখন একরূপ স্থিরভাবে বিশ্বাস করি। এখন এবিষয়ে অন্য কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া ১৪২৩ শকের হস্ত-লিখিত বহি হইতে আমরা কৃত্তিবাসের স্বকৃত-আত্ম-বিবরণ দিতেছি। ইহার রচনা ও ভাব এমনই সুন্দর, স্বচ্ছাম্বুর প্রতিবিম্বের ন্যায়; ইহা যিনি একবার পড়িবেন, তাঁহাকেই বিশ্বাস করিতে হইবে, এটি একখণ্ড খাঁটি ঐতিহাসিক স্বর্ণ; ইহাতে ঐতিহাসিক ঐন্দ্রজালিকের জালিয়তি নাই।

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজঃ মহারাজা।
তাঁহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা ।।¶
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার ।‡
বঙ্গভাগে|| ভূপ্রে তিঁহ সুখের সংসার ।।

---

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ৭৬ পৃঃ।

† জন্মভূমি, ১৩০১ সন ভাদ্র—'কৃত্তিবাস' প্রবন্ধ দেখ।

‡ ইনি সম্ভবতঃ সুবর্ণ গ্রামের দনুজ রায়। ইনি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিতেছিলেন।

¶ নৃসিংহ ওঝা আদিত হইতে অধস্তন ৪র্থ পুরুষ। ইঁহার পরবর্ত্তী যে সমস্ত নাম পাওয়া যায়, তাহা কুলজী গ্রন্থের সঙ্গে সকলই ঐক্য হইয়া যাইতেছে।

|| পূর্ব্ববঙ্গ।

বঙ্গদেশে প্রমাদ* হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥
সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুজেখুজে বুলে॥
গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিগে চায়।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথায়॥
পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি॥
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিগে চায়।
হেনকালে আকাশ-বাণী শুনিবারে পায়॥
মালীজাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এথানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥
গ্রাম রত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়য় সন্ততি॥
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি, সূর্য্য, গোবিন্দ, তাহার তনয়॥
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত।
সাত পুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্ম্মচর্চ্চায় রত মহান্ত যে মানী॥
মদ-রহিত ওঝা সুন্দর মূরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি॥
সুশীল ভগবান তথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞি প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে॥
মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিণী॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস॥
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীকর ভাই তার নিত্য উপবাসী॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিন হৈল সতাই উদর॥
মালিনী নামেতে মাতা, বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী॥
আপনার জন্ম কথা কহিব যে পাছে।
মুখটি বংশের কথা আরো কৈতে আছে॥
সূর্য্য পণ্ডিতের পুত্র হৈলা নাম বিভাকর।
সর্ব্বত্র জিনিয়া পণ্ডিত বাপের সোসর॥
সূর্য্য পুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে যাহার॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী একঘোঁড়া।
পাত্র মিত্র সকলে দিলেন থাবা জোড়া॥
গোবিন্দ, জয়, আদিত্য, ঠাকুর বসুন্ধর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাঁহার কোঙর॥
ভৈরব সুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারানসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাঁহার॥
মুখটি বংশের পদ্ম, শাস্ত্রে অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে যাঁহার আচার॥
কুলে, শীলে, ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে।
মুখটি বংশের যশ জগতে বাখানে॥

---

* সম্ভবতঃ তোগরল খাঁর বিদ্রোহ-জনিত বিপ্লব। দনুজ রায় এই সময় বিদ্রোহীর সঙ্গে যোগ না দিয়া সম্রাটের পক্ষে দৃঢ় ছিলেন, এজন্য বিদ্রোহীদল তাঁহার রাজ্যে নানাভাবে উৎপীড়ন করিয়াছিল।

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলেন কৃত্তিবাস।।
শুভক্ষণে গর্ভ হৈতে পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা নৈল কোলে।
দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ।।
এগার নিবড়ে* যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ।।
বৃহস্পতিবারের ঊষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গাপার।।†
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার।।
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে।।
বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন।।
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাক্রি আমার বিদ্যা সমাপন।।
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উন্মাকার।‡
হেন গুরুর ঠাক্রি আমার বিদ্যার উদ্ধার।।
গুরু স্থানে মেলানি¶ লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে।।

রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম§ রাজা গৌড়েশ্বরে **।।
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম।।
সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধাই আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ লাঠি।।
কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ।।
নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনপরে।।
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ।।
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন।।
গন্ধর্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজ সভা পূজিত তিঁহ গৌরব অপার।।
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে।
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে।।
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস্য আদি ধর্ম্মাধিকারিণী।।
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহা পাত্রের কোঙর।।
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার।।

* নিবড়ে—অতীত হইলে।

† বড় গঙ্গা যশোহরে; "পূর্ব্ব সীমা ধুল্যাপুর বড় গঙ্গাপার" অন্নদা মঙ্গল।

‡ উন্মাকার—তেজস্বী।

¶ মেলানি—বিদায়।

§ ভেট (উপহার) দিলাম, পাঠাইলাম।

** এই গৌড়েশ্বর সম্ভবতঃ কংসনারায়ণ (রাজা গণেশ)। নৃসিংহ ওঝা দনুজ রায়ের সময় বর্ত্তমান ছিলেন (১২৭৭ খৃঃ হইতে ১২৮২ খৃঃ কি এইরূপ কোন সময়)। কৃত্তিবাস নৃসিংহ ওঝা হইতে অধস্তন ৫ম পুরুষ। উদ্ধৃত বর্ণনায় যেরূপ হিন্দু ভাবাপন্ন রাজ সভার বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে গৌড়েশ্বর হিন্দু ছিলেন এবিষয়ে সন্দেহ হয় না,—সমস্ত সভাসদই

পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।*
অনেক লোক দাণ্ডাইয়া রাজার সম্মুখে ।।
চারিদিগ নাটগীত সর্ব্বলোক হাসে।
চারিদিগে ধাওয়াধাই রাজার আত্তাসে ।।*
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাজা মাজুরি।
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি ।।
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথায় উপর।
মাঘমাসে খরা† পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর ।।
দণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজ বিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাত সানে‡ ।।
রাজ আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে ।।
রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে ।।
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে ।।
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায় ।।
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুষি হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্প মাল ।।
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া ।।¶
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্র মিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান ।।
পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা ।।
পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে ।।
কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার ।।
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ।।

হিন্দু, তৎপর,—"চন্দনেরছড়া",—ও "পাটের-পাছড়া" (পট্টবস্ত্র) প্রভৃতি কথাও হিন্দুভাব স্মরণ করাইয়া দেয়। গৌড়েশ্বর কংসনারায়ণ ভিন্ন এসময়ে অন্য কেহ হিন্দু ছিলেন না; ১২৭৭ খৃঃ হইতে কংস নারায়ণের সময় (১৩৮৫-১৩৯২) একশত বৎসরের কিছু উপরে। ১২৭৭ খৃঃ অব্দ নৃসিংহের জন্মকাল নহে। সুতরাং নৃসিংহ ওঝার জন্মকাল হইতে, কংস-নারায়ণ পর্য্যন্ত প্রায় ১৫০ বৎসর পাওয়া যাইতেছে। দেড়শত বৎসরে পাঁচ পুরুষ গণতি করা নিয়মানুযায়ী বটে। কৃত্তিবাস কংসনারায়ণের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এইমত আমরা প্রচার করিতে পারি। সে আজ ৫০০ বৎসরের কিছু উপরে। তাহা হইলে কৃত্তিবাস ১৩৮৫ কি তৎসন্নিহিত কোন খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর দিন রবিবার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* আত্তাস,—গৃহ, অনেক স্থলেই এই অর্থে ব্যবহৃত হইত, যথা,-"তার মধ্যে দেখ পদ্মাবতীর আওাস। সমীর সঞ্চার নাহি পক্ষীর প্রকাশ।" আলোয়াল-কৃত পদ্মাবতী।

† খরা,—রৌদ্র যথা,—খনা,—"জ্যৈষ্ঠে খরা, আষাঢ়ে ধারা, শস্যের ভার না সহে ধরা।"

‡ সানে,—সঙ্কেত, 'ঋষীসব দেখাইয়া অঙ্গুলীর সানে', রাজেন্দ্রদাসের শকুন্তলা।

¶ পাটের পাছড়া, পট্টবস্ত্র। 'পাটের পাছড়া' শব্দ প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়,—"খিনে বান্দি নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া।" মা, চ, গা, ১০ শ্লোক।

"পাটের পাছড়া পৃষ্ঠে যন উড়ে যায়।
বড়ার আচল লুটি পাএ পড়ি যায়।" শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোষ।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ।।
প্রসাদ পাইয়া বাহির হইলাম সত্বরে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে ।।
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ।।
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী ।।
বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে, গুরু আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান ।।
সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ।।
রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে ।।

সেই সময়ের কবির বিদ্যামর্য্যাদার চিত্র কেমন সরল ও জীবন্ত! উহাতে সদ্য-জাত যূথি জাতির সৌরভ আছে। গুণাস্বাদী গৌড়েশ্বরের উৎসাহে কবির গর্ব্বিত মস্তক নক্ষত্র-লোক স্পর্শ করিয়াছিল। যে দিন রামায়ণ রচনার ভার কবি হস্তে লইলেন, সেই দিন বঙ্গভাষার শুভ দিন, তাঁহার নিজের শুভদিন; সে দিন তাঁহার শরীরে দিব্য লাবণ্যের জ্যোতিঃ বাহির হইয়াছিল, তাই লোকবৃন্দ 'চন্দন চর্চ্চিত' প্রতিভাপূর্ণ 'ফুলিয়ার পণ্ডিতকে' দেখিয়া 'অপূর্ব্ব জ্ঞানে' ধন্য ধন্য বলিয়াছিল। এই বর্ণনাটি সরল ভাষায় অঙ্কিত প্রফুল্লতার এক খানি ছবি বিশেষ!

কিন্তু যে রচনা আমরা কৃত্তিবাসী রচনা বলিয়া পাঠ করি, তাহাতে কৃত্তিবাস কতদূর বিদ্যমান, ইহা একটি যুগের সমস্যা; পরিষদ ইহার কিরূপ মীমাংসা করিতে পারিবেন, বলিতে পারি না; কিন্তু আমার নিকট কৃত্তিবাস নামধেয় কবি বর্ত্তমান ছিলেন, একথা যেরূপ সত্য বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার রচনার সম্পূর্ণ উদ্ধার করা অসম্ভব, এই কথা ও তেমনি আর একটি সত্য বলিয়া বোধ হয়। কৃত্তিবাস শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি রামায়ণ অনুবাদ করিতে যাইয়া বাল্মীকির গণ্ডি কেন অতিক্রম করিবেন, এ কথার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালী, প্রভৃতি স্থান হইতে যে সমস্ত 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' পাইতেছি তাহাতে বীরবাহু, তরণীসেন, প্রভৃতির যুদ্ধ, রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রের স্তব, ও শ্রীরামের চণ্ডী-পূজা, এই সমস্ত মূলগ্রন্থবহির্ভূত বিষয় দৃষ্ট হয় না। সে গুলি কতকাংশে বাল্মীকির প্রতিভা-বজ্র-বিদ্ধ পথে বঙ্গীয় কবির সূত্র নিক্রমণ বলা যাইতে পারে। তবে কোন গুলি খাঁটি, ও দেশের না এ দেশের? কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে, পূর্ব্ব বঙ্গে পৌছিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বটতলার রামায়ণের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে প্রাপ্ত পুঁথির ভাব ও ভাষা অনেক স্থলে ছত্রে ছত্রে ঐক্য

হইতেছে; আমরা ' ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে ছটফট। শীঘ্রকরি রঘুনাথ গেলেন নিকট' (পরিষদের পুঁথি*) ও "বরিষা গোঙাই গেল শরত প্রবেশ। রাম বোলেন না হইল সীতার উদ্দেশ" (পরিষদের পুথি ৯৬ পত্র) প্রভৃতি অনেক স্থলেই বহু ছত্র পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া দেখিয়াছি, সেই সব পুঁথিতে ও বটতলার মুদ্রিত রামায়ণে একই কবির হস্ত-গন্ধ অনুভব করা যায়। "খুল্লতাত পড়িল দুই, তিন সহোদর। রুষিল অতিকা বীর যমের সোসর।।" (পরিষদের পুথি ২২৭ পত্র) ও প্রায় একরূপ। কিন্তু বটতলার পুস্তকে এই দুই ছত্রের পরে "চিন্তা করি মনে মনে বলিছে তখন। শ্রীচরণে স্থানে দেও কৌশল্যা নন্দন।। রাবণ-সন্তান বলি দয়া না করিবে। দয়াময় রাম নামে কলঙ্ক রহিবে।" আছে, এই রূপ রাক্ষসী বৈষ্ণবী ভক্তির খোঁজ পূর্ব্ব বঙ্গের হস্ত লিখিত পুস্তকে পাওয়া যায় না। এরূপ হইল কেন? সুমধুর তরনীসেনের বধোপাখ্যান, রাম 'কমল-আঁখির' কমলাক্ষ দ্বারা হারানো নীলোৎপলের স্থল পূর্ণ করিয়া চণ্ডী-পূজার উদ্যোগ এই সব সুন্দর স্থান পূর্ব্ব বঙ্গের পুঁথি গুলিতে পরিত্যক্ত হইল কেন? আমার মনে একটি গভীর সন্দেহ আছে; শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি সাধনে নানারূপে কার্য্যকরী হইয়াছে। বৈষ্ণব-গণ রাক্ষসদিগের দ্বারা শ্রীরামের স্তব গান করাইয়াছেন, ক্ষেদ মিটাইতে শাক্তগণ শ্রীরামকে দিয়া চণ্ডী-পূজা করাইয়াছেন; এই দুই দলের চেষ্টায় মূল অনুবাদ বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে ঠিক বিকৃতি বলা যায় না; যদি ও রাক্ষস বিরবাহুর শ্রীরামচন্দ্রকে "রাক্ষসবিনাশকারী ভুবনমোহন" বলাতে রাক্ষসী বির্য্যবত্তার বিরুদ্ধ ভাব দৃষ্ট হয়, তথাপি বোধ হয় এই রচনা তাৎকালিক বঙ্গীয় জীবনের মূল নীতি উল্লঙ্ঘণ করে নাই। বৈষ্ণবীর নীতি বঙ্গের সমাজের অভ্যন্তরে কার্য্য-করী হইয়াছিল; এই বৈষ্ণবীর নীতি দ্বারাই রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ

* পরিষদের জন্য আমি যে পুস্তক ত্রিপুরা হইতে খরিদ করিয়া দিয়াছি, সে রামায়ণ খানা খুব প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; উহা নিম্নশ্রেণীর লোকের হাতের লেখা; ও অনেক স্থল পাঠবিকৃতিপূর্ণ, কিন্তু এস্থলে যে সব মত লিপিবদ্ধ করিলাম তাহা শুধু পরিষদের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া নহে, পূর্ব্ব বঙ্গে যে ১২।১৪ খানা রামায়ণের হস্তলিখিত প্রাচীন বই পাইয়াছি, তাহার সমস্তই আমার লক্ষ্য। আলোচনার সুবিধার জন্য পরিষদের পুঁথির উল্লেখ করিলাম।

সম্পূর্ণ রূপে শাসিত। এ সমস্ত পরবর্ত্তী যোজনা কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু বঙ্গীয় প্রকৃতি উলঙ্ঘিত হয় নাই বরং তদনুকূলে হইয়াছে, এই জন্য যোজনা হইলে ও উহা বিকৃতি নহে। ত্রিপুরা, নোয়াখালী ইত্যাদি স্থানের লোকগণ যে মূলগ্রন্থ জাল করিয়াছে, বোধ হয় না। সে সব দেশে ভারত চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বিশেষ কোন রূপ বিকৃতি দৃষ্ট হয় না; শুধু 'লাফ' স্থলে 'ফাল,' 'মা' স্থলে 'মাও' প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের শব্দ গুলির দিগে রুচি প্রবল দৃষ্ট হয়; পরিবর্ত্তন এইরূপ শব্দের, কিন্তু বিষয়গত পরিবর্ত্তন ত দেখা যায় না। তবে এক কৃত্তিবাস পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুই রূপে উদয় হইলেন কেন? যদি প্রকৃত পক্ষেই পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানগুলি যোজনা হইয়া থাকে, তবে কি সে অংশ গুলি এখন রামায়ণ হইতে কর্ত্তন করিতে পারি? তরণীর কাটামুণ্ড 'রাম রাম' বলিয়া শ্রীরামের পদস্পর্শ করিয়াছিল, এই ভক্তির কথাই আমাদের প্রিয়; আমরা রাক্ষসী বিভীষিকা হইতে রাক্ষসী বৈষ্ণব-ভাবেরই বেশী পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি, সে গুলি ছাড়িয়া দিলে বঙ্গীয় রামায়ণে কি পড়িব? আমরা একখানা অতি প্রাচীন হস্ত লিখিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে এইরূপ সূচনা পাইয়াছি,—

"বাল্মিকী বলিলা গোসাঞি তুমি অন্তর্যামি।
তোমা ঠাঞি কিছু কথা জিজ্ঞাসিব আমি ॥
কোন মহাপুরুষ হয় সংসারের সার।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম অবতার ॥
সংসারের সাধু প্রিয় জগতের হিত।
যার ক্রোধে দেবগণ শতেক বেভিত ॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ যার হয় অধিষ্ঠান।
হিংসার ঈষৎ নাই, চন্দ্র সূর্য্যের সমান ॥
ইন্দ্র যম বায়ু বরুণ সেই বলবান।
ত্রিভুবনে নাই কেহ তাহার সমান ॥"
ইত্যাদি,—বে, গ, পুঁথি ৪ পত্র।

বিক্রমপুর হইতে প্রাপ্ত একখানা প্রাচীন পুঁথির প্রারম্ভ ও এইরূপ দৃষ্ট হয়—ইহা অনেকটা মূলের মত। যাহাহউক, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থলের কতিপয় হস্ত-লিখিত পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া আমরা রামায়ণসম্বন্ধে জটিল সমস্যার মীমাংশা করিতে সাহসী নহি। ঐ সব উপাখ্যান বাদ দিলে অবশিষ্ট যে অংশ থাকে তাহা ও রামায়ণের ঠিক অনুবাদ বলা যায় না। ফটোগ্রাফে যেমন প্রকৃতির চিত্রালেখ্য স্বল্পায়তনে অথচ যথার্থ রূপে প্রতিবিম্বিত হয়, কৃত্তিবাসী-মুকুরে বাল্মীকির

রামায়ণ সেইরূপ প্রতিবিম্বিত হয় নাই; মূল পাঠ করিলে দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্র দেবতা নহেন—দেবোপম; মানুষী শক্তি ও বীর্য্যবত্তার আতিশয্যে তাঁহাকে ক্ষণে ক্ষণে দেব বলিয়া ভ্রম হয়, এই মাত্র। কৃত্তীবাসী রামায়ণের রাম নৈবিদ্যাহারী গড়া-পুতুল, তুলসী চন্দনে লিপ্ত বিগ্রহ। তিনি কোমল কর-পল্লবের ইঙ্গিতে সৃষ্টি স্থিতি সংহার করিতে পারেন, তিনি বংশীধারীর ভ্রাতা, প্রেমাশ্রু পূর্ণ-চক্ষু; ভক্তের চক্ষে জল দেখিলে যোজিত শরটি তূণীরে রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। মূলে আছে, কৌশল্যা বনগত পুত্রকে স্মরণ করিয়া সুমন্ত্রের নিকট বলিতেছেন,—'রাম পুষ্পবৎ কোমল উপাধানে শির রক্ষা করিয়া নিদ্রা সুখ উপভোগ করিত, এথন স্বীয় বজ্রবৎ কঠিন ভুজে শির রক্ষা করিয়া কিরূপে শয়ন করিবে?' রামের চিত্র পাছে কঠোর হয়, এই ভয়ে কৃত্তিবাস বজ্রবৎ কঠিন ভুজের কথা উল্লেখ করেন নাই। কি ভীরু, প্রকৃতই যদি রামের ভুজ কোমল কিশলয়োপম হইত, ও "চাঁপা নাগেশ্বর দিয়া রামের চূড়া বাঁধা"* থাকিত, তবে কি রাবণ বধ হইত, না এথনকার ঐতিহাসিকদিগের মতানুসারে, আর্য্য-ভুজ বলে দাক্ষিণাত্য বিজয় হইত। শৌর্য্যই পুরুষের সৌন্দর্য্য, কমনীয়তা নহে। মূল রামায়ণে রামের ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখিয়া মারিচ রাক্ষস বলিয়াছিল,—"বৃক্ষে বৃক্ষে আমি করাল রামমূর্ত্তি দর্শন করি, ধনুষ্পাণী রামমূর্ত্তি ছায়ার ন্যায় কাননের সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া নির্জ্জনে চমকিত হই।" যথন গদ্গদনাদী গোদাবরীতীরে কদম্ব, অশোক, কর্ণিকার বৃক্ষকে শোকে রক্তেক্ষণ বিরহী শ্রীরামচন্দ্র বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পান নাই, পথে রক্তবিন্দু ও রাক্ষসের পদাঙ্ক দর্শন করিয়া রাক্ষস কর্ত্তৃক সীতা বধ আশঙ্কা করিলেন, তথন বিরাট ধনুতে জ্যা আরোপন করিয়া জরা, ব্যাধি কি মৃত্যুর ন্যায় করাল বেশে প্রকৃতিকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইলেন, ত্রিপুরান্তক হরের ন্যায় কি যুগান্তকারী কালের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের সেই চিত্র অতি ভীষণ। সে সব কথা প্রলাপ হউক, কিন্তু কি ভয়ঙ্কর ও সুন্দর! সেই ক্রোধে ভাবী রাক্ষস সংহারের ছায়া পড়িয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই সব ছবির যথাযথ প্রতিকৃতি উঠে নাই। যে আনন্দে প্রকৃতির মাধুরী মূলে প্রতিবিম্বিত, পদ্ম-সম্পীড়িত পম্পাবারি, কান্তোপভুক্তা অলস-গামিনী রমণীর ন্যায় বর্ষাক্ষয়ে নদীর ধীর মন্থরগতি, শৃঙ্গধারী ককুদ্মানের

* লঙ্কাকাণ্ড, বিদ্যুৎজিহ্ব কর্ত্তৃক মায়ামুণ্ড নির্ম্মাণ দেখ।

ন্যায় বালেন্দুশীর্ষ মেঘেরপট, হস্তি কর্ত্তৃক পদ্মবনে উপগীত শ্লোক, এই নানাবিধ প্রফুল্লতার উন্মাদকর ছবি, কৃত্তিবাসী অনুবাদে প্রতিবিম্বিত হয় নাই। কিন্তু রাম ও লক্ষ্মণের সৌহার্দ্য, কৌশল্যার শোক, সীতার (ক্ষাত্রেয় তেজ ও ব্রহ্মচর্য্য নহে) গৃহস্থবধূর ন্যায় ব্রীড়ানত মাধুরী,—বোধ হয় মূলাপেক্ষা অনুবাদে আরও সুন্দর হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত যদি পশ্চিম-বঙ্গ-প্রচলিত রামায়ণের পাঠই ঠিক হইয়া থাকে, তবে একটি অভিনব বস্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাই,—তাহা রামচন্দ্রের বৈষ্ণবীয় কোমলতা—ভক্তের জন্য করুণা। ইহা খৃষ্টীয় কোমলতা হইতে ও সুন্দর; ইহার ছায়া রামায়ণে, কিন্তু পূর্ণতা বৈষ্ণবীয় পদাবলীতে।

বাঙ্গালীর নিজভাব দ্বারা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ও নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে 'রামায়ণ' বঙ্গীয় গৃহস্থের এত আদরের বস্তু হইয়াছে। মিত-ব্যয়ী বণিক ক্ষুদ্র দীপাধার অকাতরে তৈল-পূর্ণ করিয়া যে গীতি অর্দ্ধরাত্র জাগিয়া পাঠ করে, তাহা এখন ও আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়া কোমল করে; সেই গীতি আমাদের শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। উহার অপরিস্ফুট মাধুর্য্য শুধু শৈশবের কথা নহে, কত যুগ যুগান্তরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ইদানীং কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠবিকৃতির দোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়া করিয়া জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের শ্মশানের ছাই কুড়াইয়া ফাঁসির ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু যাঁহারা উক্ত তর্কলঙ্কারের বিরোধী, তাঁহাদের নিকট এই বক্তব্য, যদি তাঁহারা প্রাচীন বঙ্গীয় পুঁথির আলোচনা করিয়া থাকেন, তবে দেখিবেন পুস্তকের হস্তলিপি যত প্রাচীন, ভাষা ও সেই অনুসারে জটিল ও প্রাচীন; পরবর্ত্তী পুঁথি গুলির ভাষা ক্রমশঃ সহজ দৃষ্ট হয়।* এক জয়গোপালের উপর ক্রুদ্ধ হইলে কি হইবে? কত জয়গোপাল বঙ্গীয় রামায়ণের বিকৃতিসাধনে সহায়তা করিয়াছেন, তাহার অবধি নাই। প্রাচীন অপ্রচলিতশব্দবহুল একখানি পুঁথি উদ্ধার করিয়া চালাইতে চেষ্টা

* "Every one who has gone into the work of editing ancient songs in Bengali has felt this difficulty, later M.S.S always giving a smoothed down version of the ancient dialects." Pundit Hara Prashad Shastri's Pamphlet on old Bengali Literature P. 3.

করিলে, তাহা দেশী আপামর সাধারণ পড়িবে কি? প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের সন্তোষ অর্থকরী নহে।

আমার বিবেচনায় বঙ্গীয় পুঁথি গুলির এইরূপ পরিবর্ত্তন সর্ব্বাংশেই পরিতাপের বিষয় নাই। এইরূপ যুগে যুগে সময় উপযোগীভাবে ভাষার একটুকু একটুকু সংস্কার হওয়াতেই ৫০০ বৎসরের অধিক কালের রচিত রামায়ণ এখন পর্য্যন্ত ও এদেশে এতদূর প্রচলিত আছে। ইংরেজী চছারের গীতি কত জনে পড়ে?

কিন্তু মূল রামায়ণ নানা কারণেই উদ্ধার করা আবশ্যক। আধুনিক শব্দের মনোহারীত্বে অভ্যস্ত বহুসংখ্যক লোকের শ্রুতি মূল রামায়ণ শ্রবণে সুখী হইবে কি না বলা যায় না। তথাপি আমাদের সাহিত্যের আদি-গৌরব কৃত্তিবাসকে সমুচিতরূপে অধিষ্ঠিত দেখিবার বাসনা কাহার না হয়?

আমরা যে সব রচনা কৃত্তিবাসের লিখিত বলিয়া প্রাচীন কবির কবিত্ব গৌরবের বড়াই করিয়া থাকি, সেই প্রশংসার পুষ্প ও বিল্বপত্র হয়তঃ এই জয়গোপাল কি পূর্ব্ববর্ত্তী কোন জয়গোপালের মস্তকে পড়িতেছে, কৃত্তিবাস হয়তঃ তাহা পাইলেন না। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে,—সুবিখ্যাত নিম্নলিখিত পদগুলি আমরা কোন ও হস্তলিখিত পুঁথিতে পাই নাই,—

"গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্ম বনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিলা কি গ্রাস॥
রাজ্যচ্যুত যদ্যপি হয়েছি আমি বটে।
রাজলক্ষ্মী আমার ছিলেন সন্নিকটে॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারালাম বনে।
কৈকয়ীর মনোভিষ্ট সিদ্ধ এত দিনে॥

রামায়ণ ভিন্ন কৃত্তিবাস 'যোগাধ্যার বন্দনা' ও 'শিবরামের যুদ্ধ' নামক অপর দুইখানা খণ্ডকাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা এখন একরূপ দুষ্প্রাপ্য।

অনুবাদ-শাখা—(খ) সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, ও শ্রীকর নন্দী।

খাঁটি কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ' উদ্ধার করা সহজ নহে; নানা কবির হাতে তাহা নানারূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুলের সঙ্গে এইসব উপকাব্য জড়াইয়া এক হইয়া গিয়াছে।

৫০০ বৎসরের অধিক হইল রামায়ণের অনুবাদ রচিত হইয়াছিল, তার ২০০ বৎসরের কিছু অধিক হইল কাশীদাস মহাভারত অনুবাদ করেন; মধ্যবর্ত্তী ৩০০ বৎসরের মধ্যে অন্য কেহ মহাভারত প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন নাই, এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক। এইজন্য লুপ্ত মহাভারত-অনুবাদ-কারক মহাজনগণের খোঁজ করিতে প্রবৃত্ত হই। সুখের বিষয় বহুকষ্টে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অনেকগুলি প্রাচীন মহাভারতের পুঁথি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব পাঠকগণ নির্ণয় করিবেন, কিন্তু আমি কলম্বাসের মতই তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। বহুসংখ্যক অনুবাদকারীদিগের মধ্যে সঞ্জয়, কবীন্দ্রপরমেশ্বর ও রামেশ্বর নন্দীর রচিত মহাভারতগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। আকাশের তারার ন্যায় অগণ্য মহাভারতের অংশরচকদিগের নাম এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রোয়জন। অনুমান ও কল্পনার দুরবিণ যোগে সেইসব কবি-নক্ষত্রগণ এসময় হইতে কত দূরবর্ত্তী, সে প্রশ্নের ও উত্তর দিতে এস্থলে চেষ্টা করিব না।

কবীন্দ্র রচিত মহাভারত হুসেন সাহার সময় লিখিত হয়। সুতরাং ৪০০ বৎসর পূর্ব্বের অনুবাদ পাওয়া গেল। এই মহাভারতের বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহার মহাভারতে উল্লেখ করিয়াছেন;—

"শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান।
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান॥" কবীন্দ্র, বে, গ, পুঁথি ৮৮ পত্র।

এই দুই ছত্র একবার ৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সুতরাং কবীন্দ্র রচিত মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন লুপ্ত মহাভারতের ও খোঁজ পাওয়া গেল। কবীন্দ্র রচিত ভারতের ভাষার সঙ্গে কাশীদাসী মহাভারতের ভাষার স্থলে স্থলে খুব বেশী সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়; কাশীদাস চট্টগ্রামের কবির ভাষা চুরি করিয়াছেন সম্ভব নহে; আর কবীন্দ্রের রচিত মহাভারতের যে সব প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার একখানি প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন, সুতরাং তাহাও অবিশ্বাস্য নহে; তবে এইরূপ সাদৃশ্যের কারণ কি? বোধ হয় কোনো ও লুপ্ত মহাজনের গৌরব উভয়েই অপহরণ করিয়া থাকিবেন।

কবীন্দ্র-রচিত মহাভারত হইতে আর একখানা অতি প্রাচীন মহাভারত পাওয়া গিয়াছে, তাহা সঞ্জয়-বিরচিত। ইহার ঐতিহাসিক কোন গোড়া পাওয়া গেল না; কিন্তু এই পুস্তক নানা কারণে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হইতেছে। কবীন্দ্র-রচিত প্রাচীন পুঁথি যেখানেই পাওয়া যাইতেছে, তৎসঙ্গে মূল-পুঁথির হস্তলিপি অপেক্ষা প্রাচীন হস্তাক্ষর যুক্ত দুচারিখানা সঞ্জয় মহাভারতের পৃষ্ঠা ও সংলগ্ন দেখা গিয়াছে, সুতরাং সঞ্জয়ের মহাভারতের পরে কবীন্দ্রের অনুবাদ প্রচলিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কবীন্দ্র রচিত ভারতের প্রচার শুধু কবির-নিবাস ভূমি 'ফণী নদীর' নিকটবর্ত্তী স্থলে; কিন্তু সঞ্জয়-রচিত মহাভারত বিক্রমপুর, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি সর্ব্বস্থলেই পাওয়া যাইতেছে সুতরাং এই গ্রন্থের প্রচার একরূপ সমস্ত পূর্ব্ব-বঙ্গময় বলা যাইতে পারে। সঞ্জয় রচিত ভারতের ভাব ও ভাষার বিকাশ কবীন্দ্রের ভারতে দৃষ্ট হয়; যযাতি ও দেবযানির মিলন স্থলে সঞ্জয় এইমাত্র লিখিয়াছেন;—

"ফলিত পুষ্পিত বন বসন্ত সময়।
সদাএ সুগন্ধী বায়ু মন্দ মন্দ বয়॥
বিচিত্র যে অলঙ্কার বিচিত্র ভূষণে।
কন্যা সব নানা রঙ্গ করে সেই বনে॥
কেহ মিষ্ট ফল খাএ, কেহ মধু পিএ।
শর্ম্মিষ্ঠা যে দেবযানি চরণ সেবএ॥"

সঞ্জয়, বে, গ, ১১ পত্র।*

কবীন্দ্র এই উপলক্ষে লিখিয়াছেন,—

* বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের জন্য যে হস্ত লিখিত সঞ্জয় পুঁথি খরিদ করিয়াছি, তাহার শেষ পাত্র এইরূপ;—

"এই অষ্টাদশ ভারত পুস্তক শ্রীগোবিন্দরাম রায়ের একোন পত্র অঙ্ক সাতশত উননব্বই সমাপ্ত হইছে। অত্রক্ষরমিদং শ্রীঅনন্তরাম শর্ম্মাঃ র ইহার দক্ষিণা জন্মাবধি সামান্যতাক্রমে অন্নপত্রে প্রতিপাল্য হৈয়া সশ্রদ্ধাহ হইয়া পুস্তক লিখিয়া দিলাম। নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম তার পর রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়া পাইবারহ আজ্ঞা হইল। শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৩৬ সন ১১২৪ তারিখ ২৫শে কার্ত্তিক রোজ বৃহস্পতিবার দিবা দ্বিতীয় প্রহর গতে সমাপ্ত। মোকাম শ্রীস্থলগ্রাম লেখকের নিজ গ্রাম।"

"একদিন দেবযানি, হৃদয়ে হরিষগুণি,
শর্ম্মিষ্ঠা লইয়া রাজ সুতা।
ঋতুরাজ মধুমাস, ক্রীড়াখণ্ডে অভিলাষ,
চলি আইল পুষ্পবন যথা॥
নানা পুষ্প বিকাশিত, গন্ধে বন আমোদিত,
কুসুমে নমিত হৈছে ডাল।
কোকিলের মধুর ধ্বনি, শুনিতে বিদরে প্রাণী,
ভ্রমর করয়ে কোলাহল"॥
সানন্দিত বন দেখি, মিলিয়া সকল সখি,
ক্রীড়া তাতে করয় হরিষে।
মলয় সুধীর বাও, ধীরে ধীরে বহে গাও,
প্রাণ মোহিত পুষ্পবাসে॥
হেন সময় যযাতি, বিধাতা নির্ব্বন্ধ গতি,
মৃগয়া কারণে সেই বনে।
ভ্রমিয়া কাননে চাএ, মৃগ কোথা নাহি পাএ,
কন্যা সব দেখি বিদ্যমানে॥
তার মধ্যে এই কন্যা, রূপে গুণে অতি ধন্যা,
জিনি রূপে রম্ভা উর্ব্বশী।
অধরে বাঁধুলি জোতি, দশন মুকুতা পাঁতি,
বদন ঝলয়ে যেন শশী।।
নয়ন কটাক্ষ শরে, মুনি জন মন হরে.
ভ্রূযুগে কাম ধনু ধারা।
চারিভিতে সহচরী, বসি আছে সারি সারি,
রোহিণী বেষ্টিত যেন তারা॥
শয়ন করিয়া আছে, রতি কাম অভিলাষে,
বিচিত্র পাতিয়া নানা ফুল।
শর্ম্মিষ্ঠা চাপে পাও, কোন সখি করে বাও,
কোন সখী যোগায় তাম্বুল॥"

কবীন্দ্র, হস্তলিখিত পুঁথি।

এইরূপ অনেক স্থলেই কবীন্দ্র সঞ্জয়ের উপর তুলি ধরিয়া চিত্রগুলি বিকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীহরি যে স্থলে স্বপ্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া রোষক্ষিপ্ত গজেন্দ্রবৎ ভীষ্মকে বধ করিতে সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন,—কবীন্দ্রের বর্ণনা সে স্থলে বড় সুন্দর, কিন্তু সঞ্জয়-ভারতে এই প্রসঙ্গ এবং অন্যান্য সুন্দর আখ্যানের একবারে উদয় হয় নাই। সঞ্জয় রচিত ভারতের বনপর্ব্বে ১৪ পাতা, অনুশাসন পর্ব্বে ৩ পাতা মহাপ্রস্থানিকা পর্ব্বে ৩ পাতা ও সৌপ্তিক পর্ব্বে ৫ পাতা পাইলাম। সুতরাং প্রায় স্থলেই বৃত্তান্ত অতি সংক্ষিপ্ত। মহাভারত-প্রসঙ্গ যখন দেশে নূতন বস্তু ছিল, এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সেই সময়েরই উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। খাঁটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় খাঁটি আগা গোড়া সঞ্জয়ের মহাভারত অতি দুর্ঘট। আমি একখানা মাত্র শ্রীযুক্ত বাবু অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট দেখিয়াছি।

সঞ্জয়-রচিত মহাভারত কাব্যের স্কন্ধে কত কবি শাখা-কাব্যের উৎপত্তি করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। শকুন্তলা-উপাখ্যানটি রাজেন্দ্র দাস কবি উৎকৃষ্ট খণ্ড-কাব্যে পরিণত করিয়া সঞ্জয় ভারতের অন্তবর্ত্তী করিয়া দিয়াছেন; গঙ্গাদাস সেন অশ্বমেদ পর্ব্বটি সংযুক্ত করিয়াছেন; গোপীনাথ কবি দ্রোণ

পর্ব্ব সংলগ্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের বাক্য-বিন্যাস উৎকৃষ্ট, রচনার নিপুনতা উৎকৃষ্ট, ভাব নব-যুগের প্রভা-ধারী; কিন্তু সঞ্জয়ের রচনা অনাড়ম্বর, সংক্ষিপ্ত ও সরল। অথচ এই সমস্ত উপকরণ রাশি গ্রাস করিয়া সঞ্জয়-কৃত মহাভারত 'তালের বড়ার' ন্যায় নামমাত্র তালের কীর্ত্তিই ঘোষনা করিতেছে। কোন কোন পুঁথির অধিকভাগই অপরাপর কবির লিখিত, অথচ গ্রন্থের নাম 'সঞ্জয়কৃত' মহাভারত। নারায়ণদেব ও বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণের অবস্থাও তাই।

এই সংক্ষিপ্ত সরল বর্ণনাযুক্ত মহাভারতটির প্রতিপত্তি এতবেশী হইল কেন? কবি ষষ্ঠিবরের, তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেনের, রাজচন্দ্র দাসের উজ্জ্বল পংক্তি নিচয়ের যশঃ সঞ্জয়-নামের আড়ালে পড়িল কেন? বোধ হয় সঞ্জয় প্রাচীনতম কীর্ত্তি এই জন্য।

আমরা সঞ্জয়-রচিত ভারতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রমাণ দেখিতেছি,—যে স্থলেই সঞ্জয়ের ভণিতা, সেই স্থলেই লোক বুঝাইতে সঞ্জয় ভারত অনুবাদ করিয়াছেন একথা লিখিত দেখিতেছি। মহাভারত অতি কঠিন, সঞ্জয় লোক হিতসংকল্পে তাহা বাঙ্গলা ভাষার প্রচার করিতেছেন প্রতি পত্রে এই কথা দৃষ্ট হয়;—কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি;—

"সঞ্জয় বোলেন্ত মহাভারতের সার।
পয়ার প্রবন্ধে কহে লোক বুঝিবার॥"
সঞ্জয় বে গ, পুঁথি, ২০ পত্র।

"সঞ্জয় কহিল কথা সুখে বুঝ লোকে।"
১৫৯ পত্র।

"বিরাট পর্ব্বের কথা পয়ার প্রবন্ধে।
সঞ্জয় কহিল কথা বুঝহ সানন্দে॥"
১৭০ পত্র।

"বিরাট পর্ব্বের কথা নানা রসময়।
সর্ব্বলোকে বুঝিবারে কহিল সঞ্জয়॥"
১৮২ পত্র।

"মহাভারতের কথা অতি অনুপম।
সঞ্জয় বলএ ইহা করিয়া সুগম॥" ৫০২ পত্র।

"এমতে ভারর্ত কথা কহিল সঞ্জয়।
গীত হেন গাহে লোকে মোহিত হৃদয়॥"
৫০৫ পত্র।

"কর্ণ অর্জ্জুনের যুদ্ধ সুলভ লোকএ।
নাচিতে গাইতে মোক্ষ কহিল সঞ্জয়॥"
৫২৫ পত্র।

"একলক্ষ শ্লোক মহাভারত সংহিতা।
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদ ব্যাসের কবিতা॥
সাবধানে ধর্ম্ম কথা বুঝাইবার তরে।
সঞ্জয় কহিল কথা মধুর পয়ারে॥" ৪৫৬ পত্র।

"অতি অন্ধকার যে মহাভারত সাগর।
পাঞ্চালী সঞ্জয় তাকে করিল উজ্জ্বল॥
৪৬২ পত্র।

কৃত্তিবাস ভিন্ন অন্য কোন কবির ভণিতায় বারংবার এইরূপ কথা দৃষ্ট হয় না। মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী অনুবাদ থাকিলে এরূপ লেখা স্বাভাবিক হইত না।

এই সঞ্জয় কে? তাঁহার কোন বিশেষ পরিচয় নাই, একবার ভাবিয়াছিলাম বিদুর-পুত্র সঞ্জয়কেই কি আমরা কাব্য-প্রণেতা বলিয়া ভুল করিতেছি? ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সঞ্জয় যুদ্ধ বর্ণনা করিতেছেন, সুতরাং যুদ্ধ পর্ব্বগুলিতে সঞ্জয় কহিতেছেন, একথা মহাভারতমাত্রেই থাকিবেক। এই সঞ্জয় কি সেই সঞ্জয়? এই ভ্রম পাছে পাঠকের হয়, এই জন্য সঞ্জয় কবি নিজেই সতর্ক হইয়াছেন,—তিনি লিখিয়াছেন,—

"ভারতের পুণ্য কথা নানা রসময়।
সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয়॥"
বেং, গ, পুঁথি ৫৭৭ পত্র।
"সঞ্জয় কহিল কথা, রচিল সঞ্জয়॥" ৫৮৭ পত্র।

"সঞ্জয়ের কথা শুনি, সঞ্জয়ের কথা পুনি,
শুনিলে আপদ হৈতে তরি।" ৫৩৬ পৃঃ
"প্রথম দিনের রণ ভীষ্ম পর্ব্ব গোঁথা।
সঞ্জয় রচিয়া কহে সঞ্জয়ের কথা॥" ২৩৩ পৃঃ।

সুতরাং সঞ্জয় পৌরাণিক ভূত নহেন, একালেরই মানুষ; তাঁহার পরিচয়স্থলে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরীর জন্য আমি যে পুঁথি খরিদ করিয়াছি, তন্মধ্যে এই দুটি ছত্র পাওয়া যায়,—"ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম। সঞ্জয়ে ভারত কথা কহিলেক মর্ম্ম।।" ৪৬৩ পত্র। যে বংশে শ্রী হর্ষ, কৃত্তিবাস ও ভারতচন্দ্র, সঞ্জয় কি স্বভাবিজাত কবিগুণ-সম্পন্ন সেই প্রসিদ্ধ বংশের একজন?

সঞ্জয়ের কবিত্ব স্বাভাবিক, তাহাতে লিপিচাতুর্য্য নাই, বর্ণনাচাতুর্য্য নাই, অথচ তাহা একঘেয়ে নহে। পাঠক উচ্চ শিক্ষার অভিমান বিস্মৃত হইয়া একবার ভাই বলিয়া নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকেও যদি চিনিতে পারেন, তবে এই সব গ্রাম্য কবিতার সরল জীবন্ত চিত্র-পট আপনাকেও প্রীতি দান করিবে,—উহাতে একটুকু গ্রাম্য-সৌন্দর্য্য আছে, গ্রাম্য লতা পুষ্পের ঘ্রাণ আছে, তাহা বড়ই মনোমুগ্ধকর। এই কবিতা যদিচ হৃদয়কে মেঘ-লোক পর্য্যন্ত পৌঁছায় না সত্য, কিন্তু উহা পাঠে প্রকৃতির সঙ্গে হৃদয়ের হারানো বাঁধ ফিরিয়া পাওয়া যায়, সঞ্জয় মহাভারত শীঘ্রই সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত জয়দেবপুরাধিপতি বাহাদুরের ব্যয়ে ও পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের যত্নে মুদ্রিত

হইবে। পাঠক গ্রাম্য মনোরম চিত্রপট ও সৌন্দর্য্যের ছবি মুদ্রিত পুস্তকে দেখিবেন, আমরা নিম্নে ক্রোধের অভিনয়ের কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি,—

দ্রৌপদীর অপমান।

রাজার আদেশ পাই, দুঃশাসন গেল ধাই,
সভাতে আনিল একেশ্বরী।
একবস্ত্র রজস্বলা, দ্রুপদ-নন্দিনী বালা,
রাহুএ যেন চন্দ্র নিল হরি।
মন্দ বোলে সভাজন, ধর্ম্মশাস্ত্র অকারণ,
উচিত না বোলে কোন জনা॥
কাঁদয়ে সুন্দরী রামা, রূপ গুণে অনুপমা
নয়নে বহয়ে জলধারা।
আপনে হারিল পতি, মোহোর যে কোন গতি,
উত্তর না দেও সভাজন।
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি, সভাসদে কাণাকাণি,
অন্যে অন্যে মুখ নিরীক্ষণ॥
তাহা দেখি কম্পয়ে যে বীর বৃকোদর।
বজ্রসম গদা হস্তে, কম্পে থর থর॥
থাউক সেবিয়া ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির রাজা।
কুরু বল মারি আজি যমে কঁরো পূজা॥
কোথায় আছয়ে ধর্ম্ম কেবা তাহা জানে।
কোন ধর্ম্ম সেবি রাজ্য পাইল দুর্য্যোধনে॥
কিবা যে অধর্ম্মে আমি হারি পাশা খেলি।
কিবা অধর্ম্মে আনে দ্রৌপদীর কেশ ধরি॥
কোন অধর্ম্মে বিবস্ত্রা করয়ে রজস্বলা।
কোন অধর্ম্মে সভাতে কাঁদয়ে সুন্দরী বালা॥
এই দুঃখে ভীমসেন কম্পয়ে দ্বিগুণ।
অন্তরেতে মহাকোপ কম্পয়ে অর্জ্জুন॥
নকুল সহদেব কম্পয়ে শরীর।
হাতে ধরি নিবারণ করে যুধিষ্ঠির॥
ইতে অপরাধ মোর ক্ষম ভাই সব।
আপন অধর্ম্ম হইতে মজিবে কৌরব॥
চক্ষু পাকায় ভীম যেন কাল যম।
বন্ধনে থাকিয়া যেন সর্পের বিক্রম॥

সঞ্জয় বে, প, পুঁথি ১১৫ পত্র।

কর্ণের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন।

তবে কর্ণ কটকের রঙ্গ বাড়াইতে।
একে একে সমাইরে লাগিল পুছিতে।
কে আজি অর্জ্জুনে দেখাইতে পারে।
রত্নের শকট ভরি দিমু আজি তারে॥
বৎসের সহিত দিমু ধেনু একশত।
যে আজি অর্জ্জুনে দেখাইয়া দিব মোত॥
লেজ কালা ধোপ ঘোড়া বহে যেই রথ।
তাক দেই অর্জ্জুনেরে যে দেখায় মোত॥
ছএ হস্তি দিমু শকট ভরিয়া সোণা।
তাক দিমু অর্জ্জুনক দেখায় যেই জনা॥
শ্যাম তরুণী গীত বাদ্যে যে পণ্ডিতা।
একশত সুন্দরী সুবর্ণ অলঙ্কৃতা॥
তাক দেই যেই মোকে দেখায় অর্জ্জুন।
শতে শতে ঘোড়া রথ হস্তি যে সুবর্ণ॥
সবৎসা তরুণী ধেনু সুবর্ণ ভূষণ।
তাক দেঁহো যে আমারে দেখায় অর্জ্জুন॥
শুভ্র ঘোড়া পঞ্চশত, গ্রাম একশত।
তাহা দেঁহো যেই অর্জ্জুন দেখাএ মোত॥
কাম্বোজিয়া ঘোড়া বহে সোণার রথখান।
তাক দেই অর্জ্জুন দেখাএ আগুয়ান॥
ছএ শত হস্তি যে সুবর্ণ বিভূষিত।
সাগর তীরেতে জন্ম বীর্য্যে সুসারিত॥
চৌদ্দগ্রাম দেই তাক অতি সুচরিত।
নিকটে জীবন যেই নির্ভয় সতত॥

এক রাজা এক গ্রাম জুয়াএ ভুঞ্জিতে।
মগধের এক শত দাসী দেই তাতে॥" *

শৈল্যের উত্তর।

কোপ বাড়িবার শৈল্য বলে আরবার।
ফুটিলে অর্জ্জুন বাণ না গর্জ্জিবে আর॥
সুহৃদ নাহিক কর্ণ তোমা কেহ দেখে।
অগ্নিতে পতঙ্গ মরে তারে কেবা রাখে॥
অজ্ঞান মায়ের কোলে থাকিতে ছাওয়ালে।
চন্দ্র ধরিবারে হাত বাড়াএ কুতুহলে॥
সেইমত কর্ণ তুমি বোলহে দারুণ।
রথ হৈতে পাড়িবারে চাহসি অর্জ্জুন॥
চোঁকা ধার ত্রিশূলেতে ঘব কেন গাও।
হরিণের ছায়ে যেন সিংহের বোলাও॥
মৃত মাংস খাইয়া শৃগাল বড় স্থূল।
সিংহেরে ডাকএ সেই হইতে নির্মূল॥
সুতপুত্র হৈয়া রাজপুত্রে ডাক কেনে।
মশা হৈয়া মত্ত হস্তি ডাক যুদ্ধে যেনে॥
গর্ত্তের কাল সাপ খোকাও কাটি দিয়া।
সিংহকে ডাকহ তুমি শৃগাল হইয়া॥
সর্প যেন খাইয়া যায় মারিতে গরুড়ক।
সেইমত চাহ তুমি মারিতে অর্জ্জুনক॥
চন্দ্র উদয় যেন সাগর অন্তর।
বিনি নৌকাএ পার হৈতে চাহসি বর্ব্বর॥
সেইমত কর্ণ তোমার বুঝিল যে মন।
মেঘ মধ্যে শুনি যেন ভেকের গর্জ্জন॥

সঞ্জয়, বে, প, পুঁথি, ৪৭৭ পত্র।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী।

১৪৯৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫২৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সম্রাট হুসেন সাহ গৌড়-দেশ শাসন করেন; চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে হুসেন সাহ প্রথমে সুবুদ্ধি রায় নামক জনৈক হিন্দু জমিদারের ভৃত্য ছিলেন, একদা পুষ্করিণী খনন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কর্ত্তব্যে অমনোযোগী হওয়াতে সুবুদ্ধি রায় তাঁহাকে বেত্রাঘাত করেন। হুসেন সাহ উচ্চ বংশজাত ছিলেন, তিনি

---

* এই অংশ পড়িয়া এ্যাকিলিসের ক্রোধ নিবৃত্তির জন্য এগামামননের চেষ্টা মনে পড়ে,—

"Ten weighty talents of the purest gold,
And twice ten vases of refulgent mould;
Seven sacred tripods whose unsullied frame,
Yet knows no office nor has felt the flame;
Twelve steeds unmatched in fleetness and in force,
And still victorious in the dusty course;
Seven lovely captives of the Sesbian line,
Skilled in each art, unmatched in form divine,
All these, to buy his friendship, shall be paid &c."

Iliad Book IX. (Pope's Translation.)

রাজ সরকারে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে উজিরি পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং শেষে ১৪৯৪ খৃঃ অব্দে সম্রাট মুজাফর সাহ নিহত হইলে গৌড়ের সম্রাটরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। মুসলমানী ইতিহাসে একথা বিস্তারিত ভাবে লেখা নাই বলিয়া কেহ কেহ এ বৃত্তান্ত অমূলক মনে করেন; বৈষ্ণব গ্রন্থকার সেই সময়ের লোক, তিনি হাওয়া হইতে এই গল্পের উদ্ভব করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না; বরং ইতিহাস আলোচনায় একথা প্রামাণিক বলিয়াই বোধ হয়।*

যদিও প্রথমতঃ হুসেন সাহ উড়িষ্যার দেবদেবী ভগ্ন করিয়াছিলেন, † তিনি পরে হিন্দুগণের প্রতি বিশেষ সদয় ও উদার ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয় তিনি চৈতন্য-প্রভুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। একথার কিছু বাদ দিয়া বিশ্বাস করিতে গেলেও মানিতে হইবে, তিনি চৈতন্য-প্রভুকে শ্রদ্ধা করিতেন। হুসেন সাহার সময় কামরূপ বিজিত হয়, চট্টগ্রামে মগগণ পরাস্ত হয়, ত্রিপুরেশ্বর ও মুসলমান-ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পৃথিবীর যে কোন সম্রাট বহু রাজ্য জয় করিয়া দীর্ঘকাল শান্তিতে রাজত্ব উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারই অসিবল হইতে প্রীতিবল বেশী প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। যে গুণে আকবর ভারত-ইতিহাসের কণ্ঠে কণ্ঠহার হইয়া রহিয়াছেন, সেই গুণে হুসেন সাহা বঙ্গের ইতিহাসের উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া গণ্য হইবেন। একাব্বরী মোহরের ন্যায় হুসেনী মোহর ও লোক-প্রীতির কল্পিত মূল্যে মূল্যবান। রাজকৃষ্ণ বাবু বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন,—

"হুসেন সাহার রাজত্বকালে এতদ্দেশীয় ধনীগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন, এবং যিনি নিমন্ত্রিত সভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি তত মর্য্যাদা পাইতেন। গৌড় বা পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্টালিকা পরিলক্ষিত হয় তদ্দ্বারা ও বাঙ্গলার ঐশ্বর্য্যের ও তাৎকালিক শিল্প নৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয়

* "It is however certain, that on his first arrival in Bengal, he was for some time in a very humble position."

Stewart's History of Bengal. P. 71.

† "যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িষ্যার দেশে।
দেব মূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে ॥" চৈ, ভা, অন্ত্যখণ্ড।

পাওয়া যায়; বাস্তবিক তখন এদেশে স্থাপত্য বিদ্যায় আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি হইয়াছিল, এবং গৌড়ে যেখানে সেখানে মৃত্তিকা খনন করিলে যেরূপ রাশি রাশি ইষ্টক দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে নগরবাসী বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহে বাস করিত, দেশে অনেক হিন্দু ভূম্যাধিকারী ছিলেন এবং তাহাদের ক্ষমতা ও বিত্তর ছিল।"

হুসেন সাহা বঙ্গ সাহিত্যের উৎসাহ-বর্দ্ধক ছিলেন; যে সভায় রূপ, সনাতন ও পুরন্দর খাঁ সভাসদ ছিলেন, সে সভায় হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া হিন্দু শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন; মালাধর বসুকে হুসেন সাহ "গুণরাজ খাঁ" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে হুসেন সাহার প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে, হুসেন সাহার পুত্র নসরত সাহা "ভারত পাঞ্চালী" রচনা করাইয়াছিলেন, এসকল কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি। পরাগলী মহাভারত ও ছুটি খাঁর অশ্বমেধ-পর্ব্বে পত্রে পত্রে হুসেন সাহার প্রশংসা ও গুণবর্ণনা দৃষ্ট হয়।

এই রাজসভা হইতে দুইজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা মগীরাজার সৈন্যদিগকে চট্টগ্রাম হইতে দূর করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন; একজন স্বয়ং রাজকুমার,—ভাবী সম্রাট নসরত সাহা, অপর—সেনাপতি পরাগল খাঁ।

ফণী নদীর (আধুনিক ফেণী) তীরে চট্টগ্রাম জোরওয়ারগঞ্জ থানার অধীন 'পরাগলপুর' এখন ও বর্ত্তমান, 'পরাগলী দীঘি' অতি বৃহৎ এখন ও তাহার জল ব্যবহৃত হয়; পরাগল খাঁর প্রাসাদাবলী এখন রাশীকৃত ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপে পরিণত। ইঁহারা কেহই সেই মগী-সৈন্য-জয়ী সেনাপতির কাহিনী লোক স্মৃতিতে আনিতে পারে নাই, কিন্তু একখানি তুলট কাগজে লিখিত, কীট দংষ্ট্রাবিদ্ধ, লূতাতন্তুজড়িত প্রাচীন পুঁথি লুপ্ত স্মৃতির উদ্ধার করিয়াছে; সে পুঁথি খানি—

'পরাগলী ভারত।'

অথবা

কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত

মহাভারত।

তাহার ভূমিকা এইরূপ;—

০ কবীন্দ্র-রচিত ভারতের ১৬৪৬ শকের হাতের লেখা পুথি খরিদ করিয়া বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরীতে দিয়াছি, তাহা ছাড়া আরো দুইখানা পুঁথি পাইয়াছি তাহার এক [illegible] ২০০ শত, আর একখানা প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন।

নৃপতি হুসেন সাহ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি ॥
অস্ত্র শস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হরি যেন কৃষ্ণ অবতার ॥
নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান হক্ সেনাপতি হওন্ত লস্কর ॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ু গতি ॥
লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া ॥
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি ॥

কবীন্দ্র. বে, গ, পুঁথি ১ পত্র।

পরাগল খাঁর পিতার নাম রাস্তি খাঁ ও পুত্রের নাম ছুটি খাঁ, এই পুঁথিতেই উল্লেখ আছে। কবীন্দ্র স্বীয় অনুগ্রাহক খাঁ মহাশয়ের গুণ প্রতি পত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, সময়ে সময়ে উচ্ছলিত কৃতজ্ঞতা রসে পয়ারের বাঁধ ছুটিয়া গিয়াছে, পদ কোথায় দাঁড়াইয়াছে দেখুন;—

"ক্ষৌণী কল্পতরু শ্রীমান দীন দুর্গতি বারণ।
পুণ্যকীর্ত্তি গুণাস্বাদী পরাগল খান।" বে, গ, পুঁথি ৮৮ পত্র।

পরাগলী মহাভারত প্রায় ১৭০০০ শ্লোকে পূর্ণ। এ পুস্তক খানা উদ্ধার করা একান্ত আবশ্যক; শুনিয়াছি পরাগল খাঁর বংশ এখনও বর্ত্তমান ও তাঁহারা অবস্থাপন্ন লোক। ইহা প্রথমতঃ তাঁহাদেরই কার্য্য।

চট্টগ্রামের প্রাচীন ভাষা স্থলে স্থলে এত জটিল যে, গবেষণার দন্ত ভাঙ্গিয়া যায়, অর্থ পরিগ্রহ করা যায় না; সহজ স্থল বাছিয়া কবীন্দ্রের কবিত্বের নমুনা দেখাইতেছি।

দ্রৌপদীর বিরাট নগরে আগমন।

তার পাছে দ্রৌপদী সৈরন্ধ্রীরূপ ধরি।
অধিক মলিন বস্ত্রে গেলা একেশ্বরী ॥
দূর হৈতে যায় যেন ত্রসিত হরিণী।
নগরের নারী সব পুছন্ত কাহিনী ॥
দ্রৌপদী বোলেন্ত সৈরন্ধ্রী মোর নাম।
দ্রৌপদীর পরিচর্য্যা কৈলুঁ অনুপাম ॥
অন্তঃপুর নারী যত উত্তর না পাইল।
সুদেষ্ণা দেবীএ তাকে সাদরে পুঁছিল ॥
সত্য কহ আহ্মাতে(*) কপট পরিহরি।
কি নাম তোহ্মার কহ কাহার বরনারী ॥
দুই উরু শুরু তোর অতি সুবলিত।
নাভী গভীর তোর বাক্য সুললিত ॥
দশন ডালিম্ব বিজ্জুলি নয়ন।
রাজার মহিষী যেন সব সুলক্ষণ ॥

'আমি' স্থানে 'আহ্মি' ও 'তুমি' স্থানে 'তুহ্মি' পূর্ব্ব বঙ্গের প্রাচীন তাবত পুঁথিতেই ... । সঞ্জয় রচিত ভারতের প্রাচীন পুঁথি গুলিতেও তাহাই দৃষ্ট হয়। শুধু কেবল পরবর্ত্তী ...টির কাপিতে 'আমি' 'তুমি' রূপ পাইয়াছি।

কিবা গন্ধর্ব্বের তুহ্মি হয়সি বনিতা।
নাগ কন্যা তুহ্মি কিবা নগর দেবতা।।
বিদ্যাধরী কিবা তুহ্মি কিন্নরী রোহিণী।
অনুসূয়া কিবা তুহ্মি উর্ব্বশী মানিনী।।
ইন্দ্রের ইন্দ্রানী কিবা বরুণের নারী।
তোহ্মারূপ দেখি আহ্মি লইতে না পারি।।
সুদেষ্ণার বচন যে শুনিআ তৎপর।
সেইথানে দ্রৌপদীএ দিলেন্ত উত্তর।।
আহ্মি দেব কন্যা নহি গন্ধর্ব্বের নারী।
সহজে সৈরন্ধ্রী আহ্মি কেশ কর্ম্ম করি।।
মালিনী মোহোর নাম দ্রৌপদী ধরিল।
তোহ্মাকে সেবিতে মোর হৃদয় বাঞ্ছিল।।
তেকারণে আইলুঁ হেথা বিরাট নগর।
সত্য কথা কৈল এহি তোহ্মার গোচর।।
সুদেষ্ণাএ বোলেন্ত শুনহ বর নারী।
মাথে করি তোহ্মারে রাখিতে আহ্মি পারি।।
নারী সব তোহ্মা দেখি পাসরিতে নারে।
কেমত পুরুষ আছে ধৈর্য্য রাখিবারে।।
রাজাএ দেখিলে তোহ্মা মজিবেক মন।
বল করি ধরিতে রাখিবে কোন্ জন।।
আপন কণ্টক আহ্মি আপনে রোপিব।
মৃত্যুএ ধরিলে যেন বৃক্ষ আরোহিব।।
কর্কটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর কারণ।
তেনমত দেখি আহ্মি তোহ্মারে ধারণ।।"*

কবীন্দ্র বে. গ. পুঁথি ৫৭ পত্র।

শ্রীহরির রূপ বর্ণন।

পরিধান পীতবর্ণ কুসুম বসন।
নবমেঘ শ্যাম অঙ্গ কমল লোচন।।
মেঘের বিদ্যুত তুল্য হসিত মুখেত।
শংখ চক্র গদা পদ্ম এচারি করেত।।
শিরেতে বান্ধিছে চূড়া মালতী মালাএ।
দেখিয়া মোহন বেশ পাপ দূরে যাএ।। ৪৪পত্র।

ভীষ্ম পর্ব্বের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ।

"দেখহ সাতাকি মুঁঞি চক্র লইমু হাতে।
ভীষ্ম দ্রোণ কাটিয়া পাড়িমু রথ হৈতে।।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সব করিমু সংহার।
যুধিষ্ঠির নৃপতিক দিমু রাজ্যভার।।
এবলিয়া সাতাকীরে করি সম্বোধন।
হস্তেত লইল চক্র দেব জনার্দ্দন।।
সূর্য্যের সমান জ্যোতি সহস্র বজ্রসম।
চারি পাশে ক্ষুর তেজ যেন কাল যম।।
রথ হৈতে ফাল দিয়া চক্র লৈয়া হাতে।
ভীষ্মক মারিতে জাএ দেব জগন্নাথে।।
কৃষ্ণ অঙ্গে পীতবাস শোভিছে তখন।
বিদ্যুত সহিত যেন আকাশে শোভে ঘন।।
দেখিয়া সকল লোক বলিল তখন।
কৌরবের ক্ষয় আজি দেখিএ লক্ষণ।।
পদ ভরে কৃষ্ণের কম্পিত বসুমতী।
গজে জ্ঞ ধরিতে যেন জাএ মৃগপতি।।
সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভএ বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর।।
শ্রীযুত পরাগল খান পদ্মিনী ভাস্কর।
কবীন্দ্র কহন্ত কথা শুনন্ত লস্কর।। ১০৫পত্র।

---

* কবীন্দ্র সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি স্থানে স্থানে মূলের প্রায় অক্ষরে অক্ষরে অনু[illegible] করিয়াছেন। সেকালের অনুবাদ-গ্রন্থের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। স্থানাভা[illegible] সংস্কৃত উদ্ধৃত করিয়া বিশেষরূপে তুলনা করিতে পারিব না। দ্রৌপদীর বিরাট নগরে আ[illegible]

পরাগল খাঁর মৃত্যুর পরে তৎপুত্র ছুটি খাঁকে সম্রাট হুসেন সাহ সেনাপতির পদে বরণ করেন। ছুটি খাঁর গৌরব কবীন্দ্র বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"তনয় যে ছুটি খান পরম উজ্জ্বল।
কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল সকল॥" বে, প, পুঁথি ৮৮ পত্র।

ছুটি খাঁ ও পিতার দৃষ্টান্তানুসারে শ্রীকর নন্দীকে অশ্বমেদ পর্ব্বের অনুবাদ করিতে আদেশ করেন; এই কবির কল্পনা বৃক্ষবাহী লতার ন্যায় আকাশ ছুঁইতে ইচ্ছুক। ইনি স্বীয় প্রভুর মনস্তুষ্টি কিরূপে করিতে হয় বিশেষরূপে জানিতেন। কল্পনার তৈলাধার মুক্ত করিয়া ইনি ছুটি খাঁর পদ সেবা করিয়াছেন। আমরা সাহিত্য পত্রিকায় * যাহা উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, সেই অংশ পুনঃ এস্থলে ও উদ্ধৃত করিতেছি,—

নসরত সাহ তাত † অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসেন সাহ হএ ক্ষিতিপতি।
সামদান দণ্ডভেদে পালে বসুমতী॥
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটিখান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান॥
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে।
চন্দ্রশেখর পর্ব্বত কন্দরে॥

অল্প কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা জৈমিনি ভারত হইতে নহে, মূল ব্যাসের মহাভারত হইতে উদ্ধৃত হইল, পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন।—

সুদেষ্ণোবাচ।

মুর্দ্ধ্নি ত্বাং বাসয়েয়ং বৈ সংশয়ো মে ন বিদ্যতে।
ন চেদিচ্ছতি রাজা ত্বাং গচ্ছেৎ সর্ব্বেণ চেতসা॥
স্ত্রিয়ো রাজকুলে যাশ্চ যাশ্চেমা মম বেশ্মনি।
প্রসক্তাস্ত্বাং নিরীক্ষন্তে পুমাংসং কং ন মোহয়েঃ॥
বৃক্ষাংশ্চাবস্থিতান পশ্য যইমে মম বেশ্মনি।
তে ঽপি ত্বাং সন্নমন্তীব পুমাংসং কং ন মোহয়েঃ॥
রাজা বিরাটঃ সুশ্রোণি দৃষ্ট্বা বপুরমানুষম্।
বিহায় মাং বরারোহে ত্বাং গচ্ছেৎ সর্ব্বেণ চেতসা॥
অধারোহেদ্ যথা বৃক্ষানবধায়েবাত্মনো নরঃ।
রাজবেশ্মনি তে শুভে অহিতং স্যাত্তথা মম॥
যথাচকর্কটকী গর্ভমাধত্তে মৃত্যুমাত্মনঃ।
তথাবিধমহং মন্যে বাসন্তব শুচিস্মিতে॥"

* সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩০১।

† নসরত সাহ চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন তাই তাঁহার পিতা অপেক্ষা তিনি সেদেশে বেশী পরিচিত ছিলেন এবং সেই জন্য কবি পুত্রের নামে পিতার পরিচয় দিতেছেন। নসরত সাহ বঙ্গ সাহিত্যের উৎসাহ বর্দ্ধক ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে; আমরা বৈষ্ণব পদাবলীতে ও নসরত সাহার উল্লেখ দেখিতে পাই "সে যে নসিরা সাহ জানে, যারে হানিল মদন বানে।" (সাধনা শ্রাবণ ১৩০০, ২৭২ পৃঃ।)

চারলোল গিরি তার পৈত্রিক বসতি।
বিধিএ নির্ম্মিল তাক কি কহিব অতি।।
চারি বর্ণ বসে লোক সেনা সন্নিহিত।
নানাগুণে প্রজা সব বসয়ে তথাত।।
ফণী নামে নদীএ বেষ্টিত চারিধার।
পূর্ব্বদিগে মহাগিরি পার নাহি তার।।
লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভএ ছুটিখান মহাশয়।।
আজানুলম্বিত বাহু কমল লোচন।
বিলাস হৃদয়ে মত্ত গজেন্দ্র গমন।।
চতুঃষষ্ঠি কলা বসতি গুণের নিধি।
পৃথিবী বিখ্যাত সে যে নির্ম্মাইল বিধি।।
দাতা বলি কর্ণ সম অপার মহিমা।
শৌর্য্যে বীর্য্যে গাম্ভীর্য্যে নাহিক উপমা।।
তাহান যত গুণ শুনিয়া নৃপতি।
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতুহল মতি।।
নৃপতি অগ্রেত তার বহুল সম্মান।
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটি খান।।
লস্করী বিষয় পাইয়া মহামতি।
সামদান দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী।।
ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্ব্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ।।
গজবাজি কর দিয়া করিল সম্মান।
মহাবন মধ্যে তাঁর পুরীর নির্ম্মাণ।।
অদ্যাপি ভয় না দিল মহামতি।
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি।।
আপনে নৃপতি সম্ভাষিয়া বিশেষে।
সুখে বসে লস্কর আপনার দেশে।।
দিনে দিনে বাড়ে তার রাজ সম্মান।
যাবত পৃথিবী থাকে সন্ততি তাহান।।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে সভাখণ্ড মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি।।
শুনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা।।
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়।।
দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারৌক কীর্ত্তি মোর জগত সংসার।।
তাহান আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকরনন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া।।

ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, সে গুলি ছুটি খাঁর পদে পুষ্প বিল্বদলে অর্চ্চনা। ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিবেন এগুলা ঝুঁট ফুলের অঞ্জলি; সে সময়ে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্যমাণিক্য ও তাঁহার সেনাপতি মহাবীর চয়চাগ রণক্ষেত্রে মুসলমানগণকে দেখাইয়াছিলেন—ত্রিপুর পাহাড়ের তীব্র বায়ু তাঁহারা সহ্য করিতে অশক্ত। তথাপি আমরা কবির কল্পনাকে ধন্যবাদ দিব; সত্য হইতে মিথ্যার ছবিই কবির তুলিতে সুন্দর হয়, চার্লস্ সেকেণ্ডের কবি স্বীয় প্রভুর নিকট অম্লান বদনে একথা স্বীকার করিয়াছিলেন।

নন্দী কবির কবিত্ব একটুকু ব্যঙ্গ মিশ্রিত হইয়া মধ্যে মধ্যে বড়ই মনোরম হইয়াছে, আমরা ভীম ও কৃষ্ণের উত্তর প্রত্যুত্তর উদ্ধৃত করিতেছি।—ভীম যুবানাশ্বের পুরী হইতে অশ্ব আনার জন্য মনো

হইলে শ্রীকৃষ্ণ এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। অনেকগুলি যুক্তির মধ্যে এই একটি,—

"বহু তক্ষ হএ ভীম স্থূল কলেবর।
হিড়িম্বা রাক্ষসী ভার্য্যা যাহার সহচর॥

ভীমের উত্তর।

কৃষ্ণের বচনে ভীম রুষিয়া বলিল।
মোকে মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ না দেখিল॥
তোহ্মার উদরে যত বসে ত্রিভুবন।
আহ্মার উদরে কত অন্ন ব্যঞ্জন॥
সংসার উপালম্ভ সব খাইলা তুহ্মি।
তাহা হৈতে বহু ভয়ংকর বোলে আহ্মি॥
ভল্লুক কুমারী তোমার ঘরে জাম্বুবতী।
তাহা হৈতে অধিক বোল হিড়িম্বা যুবতী॥
তুহ্মি নারীজিৎ না হও আহ্মি নারীজিৎ।
আপন না দেখিয়া মোক বল বিপরীত॥"

ভাষার জটিলতা হেতু উদ্ধৃত ছত্রগুলিতে তোত্‌লার রাগ মনে পড়ে। কাশীদাস এস্থল মসৃণ করিয়াছেন, কিন্তু ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণত্ব হ্রাস হইয়াছে।

একখানা প্রাচীন পরাগলী ভারতে আমরা একস্থলে এইরূপ ভণিতা পাইয়াছি,—

"কহে কবি গঙ্গানন্দী, লেখক শ্রীকর নন্দী" এই গঙ্গানন্দী আবার কে? শ্রীকর নন্দীই বা এস্থলে কবির আসন হইতে লেখকের আসনে নামিলেন কেন? হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির আলোচনায় নানা রূপ জটিল প্রশ্নের উদয় হয়, অতীতের অন্ধকারে কল্পনার তীর নিক্ষেপ ভিন্ন অনেক সময়ই পথ পরিষ্কার করিবার অন্য উপায় দেখা যায় না।

সঞ্জয়, কবীন্দ্র, শ্রীকর নন্দী ও পরবর্ত্তী অনুবাদকারিগণের প্রায় তাবতেই জৈমিনি সংহিতা দৃষ্টে অনুবাদ সঙ্কলন করিয়াছেন; ব্যাসের সঙ্গে ইঁহাদের সম্পর্ক অতি অল্প, মধ্যে মধ্যে দোহাই আছে এই পর্য্যন্ত। বঙ্গের মৃদু-সমীর-স্পর্শ-সুখে কি ব্যাস ঋষি নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন? জৈমিনির প্রতি সকলের লক্ষ্য হইল কেন?

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকারী, জৈমিনি তাঁহাদের অগ্রণী; তাঁহারই শিষ্য ভট্টপাদ রাজা সুধন্বার সভায় বৌদ্ধকুল বিজয় করেন। শঙ্কর ইঁহাদের পরবর্ত্তী। জৈমিনি ভারত-গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করেন; মহাভারত শাস্ত্রকারদিগের মতে দুস্তর ভবসাগর পার হইবার একমাত্র সেতু, কিন্তু ব্যাসের বিরাটার্ণব সন্তরণ করা সহজ নহে; তাই জৈমিনি সহজ পথের আবিষ্কার করিয়া ভবার্ণবের বিপন্ন পথিকদিগকে

ত্রাণ করিলেন। জৈমিনি-ভারত দেশময় প্রচলিত হইয়াছিল; অনেক বাঙ্গলা প্রাচীন পুঁথিতে জৈমিনি-ভারতের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা চণ্ডী-কাব্যে শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভে,—

"জৈমিনি-ভারত, সূত, তবে পড়ে মেঘদূত,
নৈষধে কুমার সম্ভবে।"

অনুবাদ-শাখা—(গ) মালাধর বসু।

কুলিন গ্রামের বসুবংশ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, গ্রামখানি দুর্গ-সংরক্ষিত ছিল; এই পথের যাত্রিগণ বসু মহাশয়দিগের নিকট হইতে ছুরি প্রাপ্ত না হইলে জগন্নাথ তীর্থে যাইতে পারিতেন না। মালাধর বসু ও হুসেন সাহার মন্ত্রী গোপীনাথ বসু (উপাধি পুরন্দর খাঁ) এক সময়ের লোক। বসু পরিবার বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন; মালাধর বসুর পৌত্র বসুরামানন্দের নাম বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত।

মালাধর বসু আদি বসু হইতে অধস্তন ২৪শ পুরুষ; ইঁহার পিতার নাম ভগীরথ বসু ও মাতার নাম ইন্দুবতী দাসী।

মালাধর বসু হুসেন সাহ হইতে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।—সেকালের উপাধিগুলি কিছু অদ্ভুত রকমের ছিল; 'পুরন্দর খাঁ', 'গুণরাজ খাঁ' এইসব রাজ-দত্ত খেলাৎ। আমরা একখানা প্রাচীন কৃত্তিবাসী রামায়ণে কৃত্তিবাসকে 'কবিত্ব-ভূষণ' উপাধি-বিশিষ্ট দেখিয়াছি, এই 'কবিত্ব-ভূষণ' কি রাজ-দত্ত উপাধি অথবা পুঁথি-লেখকের জাল প্রশংসাপত্র, স্থির করিতে পারিলাম না; যাহা হউক 'গুণরাজ' উপাধি দেশে প্রচলিত ছিল; আমরা ষষ্ঠীবর কবিকে ও 'গুণরাজ' উপাধিযুক্ত পাইয়াছি। টুলে পণ্ডিতগণ দক্ষিণাপ্রাপ্ত হইয়া কাণাকে ও কমলাক্ষ নাম দিতে পারেন কিন্তু গৌড়ের সম্রাট নির্গুণকে গুণরাজ উপাধি দেন নাই; বৈষ্ণবোচিত বিনয় সহকারে মালাধর নিজকে 'নির্গুণ' 'অধম' প্রভৃতি সংজ্ঞায় জ্ঞাপন করিয়াছেন।

১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খৃঃ) মালাধর বসু ভাগবতের বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হন ও ৭ বৎসরে দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ

করেন।* এই অনুবাদ-গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', কোন কোন প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে 'গোবিন্দ-বিজয়' নাম দৃষ্ট হয়; শেষ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের দেহ ত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে, এইজন্যই বোধ হয় 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' নাম দেওয়া হইয়াছে, প্রাচীনকালে 'মৃত্যু', বা 'যাত্রা' এই দুই অর্থে 'বিজয়' শব্দ ব্যবহৃত হইত। ভগবতী যে দিন পৃথিবী হইতে কৈলাস গমন করেন সেইদিন 'বিজয়ার দিন' নামে পরিচিত।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কবি সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মূল গ্রন্থের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় মিলাইয়া দেখিলে অনুমিত হইবে, মালাধর বসু শুধু কথকদিগের মুখে শুনিয়া ভাগবত প্রণয়ন করেন নাই, তিনি স্বয়ং ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। সেকালে ঠিক অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া অনুবাদ করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না; 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' ও সেরূপ অনুবাদ নহে, তবে মূলের সঙ্গে কতকটা ভাষাগত সংস্রব না আছে এমন নহে; নিম্নে উদাহরণরূপে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

মূল হইতে অনুবাদিত ;—

(১) "কোন সময় বনেতেই প্রথম ভোজন করিবার মানসে প্রত্যূষে হরি গাত্রোত্থান করিলেন, এবং বৎসপালক বয়স্যদিগকে প্রবোধিত করিয়া মনোহর শৃঙ্গ ধ্বনি করিতে করিতে বৎস সকলকে অগ্রে করিয়া নির্গত হইলেন।

কতিপয় বালক বংশী বাদ্য করিতে করিতে, কতকগুলি শৃঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে, কতিপয় অর্ভক ভৃঙ্গসহ গান করিতে করিতে, অন্য বালকেরা কোকিল সঙ্গে কলরব করিতে করিতে খেলা করিতে লাগিল। অপর শিশুরা পক্ষীদিগের ছায়ায় ধাবন, হংসদিগের সহিত গমন, বক সঙ্গে উপবেশন, ও ময়ূর সহ নৃত্যে প্রবৃত্ত হইল। আর কোন কোন বালক বানরশিশুদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।" শ্রীমদ্ভাগবত। ১০ম স্কন্ধ, ১২শ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বিজয় † ;—

"প্রভাতে ভোজন করি শিঙ্গা বাজাইয়া। | একত্র হইল সব যমুনার তীরে।
পিছে পিছে চলে যত বাছুর চালাইয়া॥ | নানামতে ক্রীড়া করি যায় দামোদরে॥

"তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥" শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।

† মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় আমার নিকট আপাততঃ নাই। পূর্ব্ববঙ্গে প্রাপ্ত প্রায় ২[illegible]ৎসরের প্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথি হইতে এই অংশ এবং পরবর্ত্তী অংশ গুলি উদ্ধৃত হইল।

কথাতে কোকিল পক্ষীগণে নাদ করে।
তার সঙ্গে নাদ করে দেব গদাধরে॥
কথাতে মর্কট শিশু লাফ দেহি রঙ্গে।
সেই মতে যায় কৃষ্ণ বালকের সঙ্গে॥
কথাতে ময়ূর পক্ষী মধু নাদ করে।
সেইমত নৃত্য করে দেব দামোদরে॥
কথা কথা পক্ষীএ আকাশে উড়ি যাই।
তার ছায়া সঙ্গে নাচে রামকানাই॥
কথা বা সুগন্ধি পুষ্প তুলিয়া মুরারি।
কত হৃদে মস্তকে শ্রবণে কেশে পড়ি॥"

মূল হইতে অনুবাদিত ;—

(২) কোন কোন গোপাঙ্গনা গো দোহন করিতেছিল, তাহারা দোহন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সমুৎসুক হইয়া গমন করিল। অন্যান্য গোপী অন্ন পাকানন্তর মহানসে রাখিয়া স্থালীস্থ জল নিঃসারণ করিতেছিল, সমুদায় কাথ নির্গম প্রতীক্ষা করিতে পারিল না। অপরা গোপী গোধুম কণার রন্ধন করিতেছিল, পক্ব অন্ন না নাবাইয়াই চলিল। কোন কোন গোপী গৃহে অন্নাদি পরিবেশন করিতেছিল, কেহ কেহ শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করাইতেছিল, অন্য কয়েক জন পতি শুশ্রূষায় রত ছিল, তাহারা তত্তৎ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গেল। অন্য গোপাঙ্গনাগণ ভোজন করিতেছিল, গীত শুনিবা মাত্র আহার ত্যাগ করিয়া চলিল।" ১০ম স্কন্ধ, ২৯ অঃ।

শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে,—

সবার হৃদয়ে কানু প্রবেশ করিয়া।
বেণুদ্বারে গোপীচিত্ত আনিল হরিয়া॥
ছাওয়ালের স্তন পান করে কোন জন।
নিজপতি সঙ্গে কেহ করেছে শয়ন॥
গাভী দোহায়েন্ত কেহ দুগ্ধ আবর্ত্তনে।
গুরুজন সমাধান করে কোন জনে॥
ভোজন করএ কেহ করে আচমন।
রন্ধনের উদ্যোগ করয়ে কোন জন॥
কার্য্য হেতু কেহ কারে ডাকিবার যায়।
তৈল দেহি কোনজন গুরুজন পাএ॥
কেহ কেহ পরিবার জনেরে প্রবোধে।
কেহ ছিল কার কার্য্য অনুরোধে॥
হেনছি সময়ে বেণু শুনিল শ্রবণে।
চলিল গোপীকা সব যে ছিল যেমনে॥

আমরা বাছিয়া উঠাই নাই; মূলের সঙ্গে মোটামুটি বেশ ঐক্য আছে, কেবল রাধিকার প্রসঙ্গ ভাগবত-বহির্ভূত।

এই কুমারী প্রথমতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও আর কয়েক খানা সংস্কৃতগ্রন্থ আশ্রয় করিয়া শুভ দিনে আর্য্যাবর্ত্তের দেব-মণ্ডপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন; চির-শ্রদ্ধেয় দেব দেবীগণ প্রকৃতির এই আভরণ-হীনা নগ্ন সৌন্দর্য্যময়ীর আঁড়ালে পড়িয়া গেলেন; সদ্যচ্যুত অনাঘ্রাত মালতী পুষ্পের ন্যায় এই কুমারীকে পাইয়া কবি ও ভক্ত আনন্দিত হইল; চিরারাধ্যা দুর্গা ও কালী উদ্দেশে আহৃত পুষ্পমালা শ্রীরাধিকার কণ্ঠে দোলাইয়া দিল। ব্রজের কুসুম-সিংহাসনে; ফুল্ল পঙ্কজ ও চন্দনার্দ্র তুলসী-দলে সজ্জিত হইয়া এই

কুমারী অধিষ্ঠিত হইলেন; প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্যের সার সৌন্দর্য্য—শ্রীরাধিকার চরণ কমলের সুগন্ধি। রাই কানু নাম বঙ্গ-সাহিত্য হইতে বাদ দিলে এই দেশের অতীত ও ভাবী শত সহস্র উৎকৃষ্ট গীতের শিরে বজ্রাঘাত করা হয়; এই দেশে সেই সব গীতের তুল্য মনোহারী কিছু হয় নাই।

দানলীলা অধ্যায়ে কবি মালাধর বসু এই নূতন সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করিয়াছেন। ভাগবতের গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করিতেছে, তাঁহাদের প্রেম শ্রীকৃষ্ণের দেব শক্তিতে বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, সুতরাং তাহা কতকাংশে বিস্ময়ের উচ্ছ্বাস ভিন্ন কি? কিন্তু তুল্য জ্ঞান না হইলে বাহু জড়াইয়া আলিঙ্গন করা যায় না, হাত বাড়াইয়া ফুল্ল ফুলটি পদে রাখিয়া আসা যায় মাত্র। ভক্তের মত ভক্ত হইলে, দেবতা ও ভক্তের আসন একখানে, কারণ ভক্ত ভিন্ন দেবতা কাষ্ঠ-পুত্তলি মাত্র, চকোর এবং চন্দ্রে প্রকৃত প্রেম হয় না; চণ্ডীদাস বলিয়াছিলেন—

"কি ছার চকোর চাঁদ,—দুহুঁ সম নহে।"

ভাগবতের অসম্পূর্ণ অংশ মালাধর বসু এই স্থলে পূরণ করিয়াছেন। দানলীলা ও পার খণ্ডে; রাধিকা ও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কৌতুক করিতে ও তাঁহাকে মান ভরে গালিদিতে শিখিয়াছে; এখানে শ্রীকৃষ্ণ পীত ধরা পরিহিত বংশীধারী একটি প্রস্তর মূর্ত্তি নহেন;—তিনি প্রেমিক শিরোমণি, চতুর শিরোমণি; ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে প্রেম দান করিয়া অনুগৃহীত করেন, শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের নায়ক প্রেম দিয়া যেরূপ অনুগৃহীত করেন, প্রেম পাইয়া ও সেইরূপ অনুগৃহীত হন।

দক্ষিণা পবনে নৌকা টলমল করিতেছে তখন,——

"কি হৈল কি হৈল বলি কাঁদে গোপ নারী।"

এবং "কাঁধকে রুমাল করি হালয়ে মুরারি।" শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।

এর পরে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে এ শঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে বলিতেছেন, যে যে উৎকোচ দিবেন এই লউন তার ফর্দ্দ;——

"কেহ বলে পরাইমু পীত বসন। | কটিতে কঙ্কণ দিমু বলে কোহু জন।
[illegible]পে নূপুর দিমু বলে কোহু জন। | কেহ বলে পরাইমু অমূল্য রতন।
[illegible]কেহ বলে বনমালা গাঁথি দিমু গলে। | শীতল বাতাস করিমু অঙ্গ জুড়ায়।
[illegible] হার দিমু কোহু সখী [illegible]। | কেহ বলে সুগন্ধি চন্দন দিমু গাএ।

কেহ বলে চূড়া বান্ধাইমু নানা ফুলে।
মকর কুণ্ডল পরাইমু শ্রুতি মূলে।
কেহ বলে রসিক সুজন বড় কাণ।
কর্পূর তাম্বুল সমে জোগাইব পান।"
শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এসব কিছুই চান না। গোপীগণের ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার ও আশা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে—তিনি বলিলেন,—"প্রথমে মাগিএ আমি যৌবনের দান।" রাধিকা ক্রুদ্ধা, তিনি এই অবনতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তখন হাসিয়া হাসিয়া—

"কাণু বলে সত্য কহি বিনোদিণী রাই।
নবীন কাণ্ডারী আমি নৌকা নাহি বাই।" শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।

এই খানে প্রাণের খেলা, রসের এই অপ্রস্ফুট মাধুর্য্য যাহা পদকর্ত্তাগণ প্রস্ফুট করিয়াছেন, ভালবাসার মাহাত্ম্যে আরাধ্য ও আরাধকের এই গূঢ় চিত্ত-সংযোগ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে অভিনব বস্তু। তাই কাব্যের এই স্থানের মৌলিক রসধারায় অনুবাদের কৃত্রিমতা নাই; ভালবাসার শাস্ত্র ভাগবতের পর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে আর একটুকু অগ্রসর হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্ত দেব যে সমস্ত ভাষা গ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া সুখী হইতেন শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় তাহার অন্যতম।

---

(৩) লৌকিক ধর্ম্ম-শাখা।

(ক)—লৌকিক ধর্ম্মের উৎপত্তি।

(খ)—চাঁদ সদাগর, বেহুলা ও মনসা।

(গ)—কাণা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও কবি জনার্দ্দন প্রভৃতি।

মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী, সত্যনারায়ণ, দক্ষিণের রায় ইঁহারা বাঙ্গালীর ঘরের দেবতা। বঙ্গভাষাই ইঁহাদের শাস্ত্র লিখিত; বঙ্গীয় গৃহস্থ বধূগণই ইঁহাদের পূজার উৎকৃষ্ট পুরোহিত, ইঁহাদের ছড়া পাঁচালী মুখস্থ করা গৃহস্থ বধূগণের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণিত ছিল; ইঁহারা কেহ সপ্তাহান্তে কেহ মাসান্তে খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে এখনও পূজা পাইয়া থাকেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এইসব দেবতার ছড়া পাঁচালী প্রথমে নগণ্য

গ্রথিত হইয়া কালসহকারে যুগে যুগে কবিগণের হস্তস্পর্শে বিশাল কাব্যরূপে বিকাশ পাইয়াছে; ক্ষমতাপন্ন শেষ কবি যশের ভাগটা নিজেই সমস্ত একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। এইসব ছড়া পাঁচালী শিশুর ক্রীড়নকের ন্যায় নগণ্য, কিন্তু এই উপকরণ রাশির আয়তন বৃদ্ধি করিয়া কবিগণ কিরূপে উৎকৃষ্ট কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষ-মন কিরূপে যুগ-ব্যাপী চেষ্টায় অতি সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে অতিবিশাল সৌন্দর্য্যের পট আয়ত্ত করিয়াছে, তাহা পাঠ করাতে কেবল কাব্যামোদীর পরিতৃপ্তি হইবে না, সাইকলজির পাঠক ও মনের গতি-বিধির একটি আশ্চর্য্য ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করিয়া নব শিক্ষা লাভ করিবেন।

লৌকিক-দেবগণের পূজা প্রচলনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। যেখানে আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি, সেইখানেই একটি দুর্ব্বলের সহায় দেবতার আবশ্যক হয়। শিশুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য চিন্তিত মাতা কি মাতামহীর দুর্ব্বলতাসূত্রে ষষ্ঠী কল্পিত হইলেন। চণ্ডিকা ও হরি চির-প্রসিদ্ধ দেবতা; কিন্তু বিপদনিবারনার্থ ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি-কল্পে এই দুই দেবতা ঈষৎ নাম ও ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দুর্ব্বলের সহায়রূপে উপনীত হইলেন; একজনের নাম হইল মঙ্গলচণ্ডী, আর একজনের নাম হইল সত্যনারায়ণ। এ চণ্ডী শুধু বিপদ ত্রাণ-কারিণী; ইনি বসন্তকালে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যে মধু-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, কিম্বা যে বেশে বৎসরান্তে পিত্রালয়ে আগমন করেন, এখানে সে বেশে আসেন নাই—এখানে ইনি শুধু বিপদ-বারিণী। সত্য নারায়ণ ননীচোরা গোপাল হইতে পৃথক্ বস্তু; ইনি অর্থ সম্পদ দাতা, কুবের কি ম্যামন স্থানীয়।

বঙ্গদেশ যখন নীল সমুদ্র-গর্ভে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ পুঞ্জের সমষ্টি ছিল এবং আর্য্যগণ যখন এই রাজ্যে প্রথম বসতি স্থাপন করেন, তখন সর্প ও ব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের এই বনপ্রদেশ অধিকার করিতে হইয়াছিল; সিংহবাহুর জন্ম বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কৌতুকাবহ গল্প ইতিহাসের পাঠক অবগত আছেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ব্যাঘ্রাদির সঙ্গে যুদ্ধ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। কালকেতু ও লাউসেনের সঙ্গে ব্যাঘ্র যুদ্ধ চণ্ডীকাব্য ও শ্রীধর্ম্ম মঙ্গলে পাইয়াছি, কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলে যোদ্ধাদিগের সঙ্গে ভীষণ ব্যাঘ্র যুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এইসব উপাখ্যান বর্ণিত

ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুর সঙ্গে মনুষ্যের আলাপ ব্যবহার বর্ণনায় কবি-কল্পনা অনেক দূর গড়াইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অসির সঙ্গে শৃঙ্গ ও নখরের প্রতিদ্বন্দিতা ঠিক কল্পনার কথা নহে; এই প্রতিযোগীতায় অসি-অগ্রভাগে শৃঙ্গ ও নখর ভগ্ন হইয়াছিল, ও অসিধারীকে শৃঙ্গী ও নখিগণ স্বরাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছিল। সভ্যতার দ্বিতীয় পর্য্যায়ে গুলির নিকট অসি হটিয়াছে, হায় কবে প্রীতির নিকট অসি, গুলি, নখ, শৃঙ্গ সকল অস্ত্রই পরাজয় স্বীকার করিবে!

বঙ্গদেশের রয়েল টাইগারের সঙ্গে বিরোধ করা ও বরং সহজ; অন্ততঃ উভয় পক্ষেরই তুল্য সুবিধাজনক ক্ষেত্রে যুদ্ধ চলিতে পারে; কিন্তু কেউটার দন্ত অলক্ষ্যে কাটে। বিশেষতঃ ব্যাঘ্র শুধু বনবাসী শত্রু, সর্প গৃহস্থের গৃহ-শত্রু; কোন্ ছিদ্র হইতে বিষ উদ্গীরণ করিবে নিশ্চয় নাই; এইজন্য ব্যাঘ্রের দেবতা 'দক্ষিণের রায়' হইতে সর্পের দেবতা 'মনসা'র প্রতিপত্তি বেশী হইয়াছিল।

লৌকিক ধর্ম্ম-শাখা,—

(খ) চাঁদসদাগর, বেহুলা ও মনসা।

মনসা পূজা উপলক্ষে চাঁদ সদাগরের চরিত্র বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যে পুরুষকারের জীবন্ত আদর্শ। মনসার ক্রোধে ছয় পুত্র বিনষ্ট হইল; 'মহাজ্ঞান' লুপ্ত হইল, 'সপ্তডিঙ্গা মধুকর' অমূল্য সম্পত্তি লইয়া জলমগ্ন হইল; এই অসহ্য বিপদে ভ্রূক্ষেপ নাই, সনকার মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে ও সে চরিত্র হেলে নাই। এই দুস্তর ভব-সাগরে ঝড়ে কে পড়ে নাই? কিন্তু চাঁদের উপর যে ঝড় বহিয়াছে সেরূপ অতি বিরল; চাঁদ এই সর্ব্বগ্রাসী তুফানকে উপেক্ষা করিয়া যেরূপ অনড় ও অটলভাবে দাঁড়াইয়াছে সেরূপ দৃশ্য অতি বিরল; তাহার দৃঢ় মজ্জাগত সাহসের নিকট কাম্নিওলেনাসের বীরত্বকেও শিশুর উৎসাহ বলিয়া বোধ হয়। চাঁদের নৌকা সমুদ্র বক্ষে ঝটিকা-তাড়িত, জলমগ্ন হইতে উদ্যত; বিপদের মূল মনসা। এই শত্রু তর্জ্জনী বাড়াইয়া মেঘ হইতে তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছেন; চাঁদ এ বিপদে ও ধৈর্য্য ছাড়ে নাই,—

"এত যদি বলে পদ্মা রথে করি ভর।
হেঁতালের বাড়ি স্কন্ধে কাঁপে থর থর॥
মনেতে ভাবিছ কাণি অন্তরীক্ষে রৈয়া।
সাহস যদ্যপি থাকে কহ আগু হৈয়া॥
মোর মন্দ করি যদি সারিবার পার।
তবে কেন কাণা আঁখির ঔষধ না কর॥

বিজয় গুপ্ত।

চাঁদ সমুদ্রে পড়িল, লোনাজলে প্রায় সংজ্ঞাহীন, এই অবস্থায় পদ্মা কয়েকটি পদ্ম-ফুল ফেলাইয়া দিলেন; পদ্মার তাঁহাকে মারিতে ইচ্ছা নাই, চাঁদ মরিলে পূজা প্রচলিত হয় না; চাঁদ সেই অন্ধকার রাত্রের ঈষৎ বিদ্যুতালোকে মুমূর্ষু অবস্থায় পদ্মফুলের স্তূপ দেখিয়া আশ্রয় বোধে হাত বাড়াইল; কিন্তু পদ্ম স্পর্শে পদ্মাবতীর নাম-সংশ্রব স্মরণ করিয়া ঘৃণায় হাত ফিরাইল, লোনা জলে মরিতে ডুব দিল।

তিন দিন উপবাসের পর চাঁদ বন্ধুগৃহে খাইতে বসিয়াছে; নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রীর সঙ্গে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত; ক্ষুধার্ত্ত চাঁদ গণ্ডূষ করিয়া খাওয়া আরম্ভ করিবে, এমন সময় বন্ধু চাঁদকে মনসার সহিত বাদ ক্ষান্ত দিতে উপদেশ দিলেন। "বর্ব্বর ভাঁড়ায়ে খাও কানি" বলিয়া ক্রোধোন্মত্ত চাঁদ অন্ন ব্যঞ্জনে পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল ও নদীর পারে বসিয়া কদলীর পরিত্যক্ত ছোবড়া খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিল।

ছয় পুত্রের শোকে জর্জ্জরিত-চিত্ত চাঁদ লখিন্দরকে পাইয়া মণি মাণিক্য তুল্য অমূল্য জ্ঞান করিয়াছিল। কিন্তু মনসার সাপ লখিন্দরকে খাইয়াছে; সনকা শোকে ক্ষিপ্ত, গভীর ক্রোধে ও বিষাদে চাঁদের ললাটে মেঘবৎ ছায়া পড়িয়াছে; তবুও চাঁদ কাঁদিল না, মনসাকে বধ করিতে হেঁতাল কাঁধে তুলিয়া লইল।

কিন্তু পদ্ম-পুরাণের শেষ অঙ্কে পরাভব। সে পরাভব ও চাঁদের ন্যায় বীরের উপযুক্ত। মনসা ইতি পূর্ব্বে কতবার ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন, একবার এক মুষ্টি ফুল তাঁহার পদে ফেলিয়া দিলেই তিনি পুত্রগুলি বাঁচাইয়া দিবেন, 'সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর জল' হইতে তুলিয়া দিবেন কিন্তু চাঁদ বীর হেলে নাই। এই শাল্মলী তরু কিসে নত হইল? বেহুলার স্নেহ চাঁদবেগে রোধ করিতে পারিল না; সনকার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন সে উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু বেহুলা রমণী হইয়া ও তাহারই মত এক জন। সে ছয় মাস স্বামীর গলিত শব লইয়া ভেলায় ভাসিয়াছে; সে কত প্রলোভন দলন করিয়া, কুলকুম্ভীর

ও জলকুম্ভীরের লেলিহান জীভ ও মুক্ত দশন হইতে একাগ্রতার বলে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কঠোর তপস্যায় স্বগণবর্গকে বাঁচাইয়া আনিয়াছে; সে কোন প্রাণে এমন পুত্র বধূকে বহু-কৃচ্ছ-অর্জ্জিত স্বগণসহ মৃত্যুর দ্বারে ফিরিয়া যাইতে বলিবে?

এখানে বিধাতা নীলোৎপল পত্রে শমীতরুচ্ছেদন করিলেন, স্নেহে বশীভূত ততোধিক গুণে চমৎকৃত চাঁদ পদ্মপুরাণের শেষ অঙ্কে অন্যদিগে মুখ ফিরাইয়া বাম হস্তে বিষহরির পদে অঞ্জলি দিলেন। যে হস্তে শিবের পদে অঞ্জলি দানে নিযুক্ত, 'চেঙ্গমুড়ি কাণী' সে হস্তের অঞ্জলি প্রত্যাশা করিতে পারেন নাই; এ অঞ্জলি বিষহরির পদে সেবা নহে, ইহা তাঁহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা-জ্ঞাপক নহে; ইহা পতিব্রতা সতী সাধ্বী পুত্র বধূর শিরে আশীর্ব্বাদ; ইহা গুণীর নিকট গুণীর অবনতি; গুণশীলা পুত্রবধূকে চাঁদবেণে কষ্ট দিতে পারেন নাই।

বেহুলা।

এই স্থানে পাঠকের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আমরা বেহুলার চরিত্র সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিব; বিলাতী এণ্ড্রমেকি, ডিডো, ডেসডেমণা, জুলিয়েট দেখিয়াছি তথাপি বেহুলার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারি নাই; বিলাতী উদ্যানে এমন সুগন্ধি কুসুম দেখি নাই, সতীত্বের এমন উজ্জ্বল পট এমন চারুচিত্রলেখা বুঝি আর কোথা ও নাই।

বেহুলা রূপে গুণে অতুল্যা; তথাপি ভাগ্য দোষে বেহুলা বিবাহের রাত্রেই স্বামী-হীনা হইল; স্বামী রাত্রে ক্ষুধায় অন্ন চাহিয়াছিলেন, সতী নেতের আঁচল চিরিয়া অগ্নি জ্বালিয়া, নারিকেল দ্বারা উনন প্রস্তুত করিয়া ভাত রাঁধিয়াছিল; একটি একটি করিয়া কৌশলক্রমে তিনটি সাপকে বন্দী করিয়াছিল; কিন্তু বিধি লিপি নির্ম্মম, অখণ্ড; ঈষৎ নিদ্রাবেশে বেহুলার চক্ষুপুট মুদিত হইয়া আসিয়াছে, কাল সর্প এমন সময় লখীন্দরকে দংশন করিল; লখীন্দর ডাকিয়া বলিল,—

"জাগহ ওহে বেহুলা সায়বেণের ঝি।
তোরে পাইল কাল নিদ্রা মোরে খাইল কি?"

কেতকা দাস

বেহুলার কাল নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, চমকিত হইয়া যখন স্বামী

বুকিতে হাত বাড়াইল তখন আর স্বামী জীবিত নাই, শব স্পর্শে শিহরিত হইয়া বেহুলা কাঁদিয়া উঠিল; সেই ক্রন্দনে শাশুরী সনকা ছুটিয়া আসিল ও বেহুলার ক্রোড়ে মৃত পুত্রকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বেহুলাকে গালি দিয়া বলিল,—

"সনকা কাঁদিয়া দেয় বেহুলাকে গালি।
সিতার সিন্দুরে তোর না পড়িল কালি॥
পরিধান বস্ত্রে তোর না পড়িল মলি।
পায়ের আলতা তোর না পড়িল ধুলি॥
খণ্ড কপালিনী বেহুলা চিরুনী দাঁতী।
বিভা দিনে খাইলি পতি না পোহাতে রাতি॥"

ক্ষেমানন্দ।

কিন্তু বেহুলা সে গালি শুনে নাই, স্বামী রাত্রে আলিঙ্গন চাহিয়াছিলেন, লজ্জিতা নববধূ লজ্জায় তাহাতে স্বীকৃতা হয় নাই; সেই কথা স্মরণ করিয়া তাহার বক্ষঃ দ্বিধা ও চক্ষু ফাটিয়া জল পতিত হইতেছিল। তারপর আর এক দৃশ্য। বেহুলা কলার মান্দাসে স্বামীর শব ক্রোড়ে করিয়া ভাসিতেছে; বেহুলা এই স্থলে নিরূপমা সুন্দরী। যে শ্বাশুড়ী গালি দিয়াছিলেন তিনি সাধিতেছেন,—

সনকা কাঁদিয়া বলে আলো অভাগিনী।
এ তিন ভুবন মাঝে কোথাও না শুনি॥
বালিকা যুবতী বৃদ্ধা যার পতি মরে।
বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে॥
কিসের কারণে তুমি জলেতে ভাসিবে।
প্রতীত কাহার বোলে কান্ত জীয়াইবে॥

কেতকা দাস।

তাহার ভ্রাতাগণ কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতেছেন,—

"হরি সাধু বলে ভগ্নি মোর বাক্য ধর।
সমুদ্রের কূলে তুমি লখিন্দরে পোড়॥
এইক্ষণে চল বেহুলা মুক্ত সায়ের বাড়ী।
খদি বদলে দিব কাঁচা পাটের শাড়ি॥
শঙ্খ বদলে দিব সুবর্ণের চুরি।
সিন্দুর বদলে দিব ফাউগের গুঁড়ি॥"

বিজয় গুপ্ত।

কিন্তু বেহুলা স্বামীর প্রার্থিত আলিঙ্গন দিয়া কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়াছে, সে আর এ আলিঙ্গন ছাড়িবে না; শব ক্রমে গলিত হইল,—

"দেখিয়া বেহুলা কাঁদে পায়ে বড় শোক।
...রী মরার গায় হানে এক জোঁক॥
...াইতে নাহি ছাড়ে মাংসেতে লুকায়।
...ি বেহুলার কি হবে উপায়॥
* * * *
অবিরত নেত্র জল নিবারিতে নারি।
গোয়াদার ঘাটে ভাসে বেহুলা সুন্দরী॥

কেতকা দাস।

এই দুঃখের অবস্থায় একদিগে জলজন্তুগণ শব কাড়িয়া খাইতে আসিয়াছে, অপরদিগে;—

"পথের পথিক যত পথ বৈয়া যায়।
বেহুলার রূপ দেখি ঘন ঘন চায়॥
ত্রিজগৎ মোহিনী কেন মরা লৈয়ে কোলে।
কলার মান্দাসে ভাসে ঢেউর হিল্লোলে॥
কেতকা দাস।

কত লোকে তাঁহাকে লাভ করিতে হাত বাড়াইতেছে, সতীত্বের জোরে কপালের সিন্দুরের জোরে বেহুলা চলিতেছেন, তাঁহাকে কে স্পর্শ করিবে? একজন বৈদ্য অশিষ্টপ্রস্তাব করিয়া শব বাঁচাইয়া দিবে বলিয়া আশা দিয়াছিল, বেহুলা তাহার মুখে ছাই দিয়া ভেলা ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন। গোদা, ধনা, মনা তাঁহার লোভে সাঁতার দিয়াছিল, বেহুলা দৈববরে তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন; কিন্তু জলমগ্ন লম্পটত্রয়ের জন্য করুণার অশ্রু বিন্দু রাখিয়া গেলেন। সুখে দুঃখে বেহুলার চরিত্রে কখনও স্নেহ মমতা দয়া প্রভৃতি উৎকৃষ্টভাব লুপ্ত হয় নাই, সর্ব্বদা আরও প্রস্ফুট হইয়াছে। মরার হাড় অঞ্চলে বাঁধিয়া বক্ষে লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নৈশ আঁধারে সতী লক্ষ্মী ভাসিয়া যাইতেছেন; মেঘপুঞ্জ ঘিরিয়া আসিয়াছে, আশার ক্ষীণ আলো নিবু নিবু, এসময়ে শৃগালের বিকট ধ্বনি,—

"যতেক শৃগাল, হয়ে একপাল,
একত্রে বেহুলারে ডাকে।
মরা ফেলাইয়া, যাহ না ফিরিয়া,
প্রাণ পাই তোর পাকে॥" কেতকা দাস।

কিন্তু শৃগালগুলিকে সতী প্রবোধ দিয়া যাইতেছেন, এ তাঁহার জীবন অপেক্ষা প্রিয় স্বামীর হাড়, ইহা তিনি দিতে পারেন না, ইহাতে তিনি জীবন প্রতিষ্ঠা করিবেন, নতুবা প্রাণ দিবেন, তখন,—

"এত কথা শুনি, যত শৃগালিনী,
এ পড়ে উহার গায়।
অপূর্ব্ব কাহিনী, কভু নাহি শুনি,
মরা নাকি প্রাণ পায়॥" কেতকা দাস।

কিন্তু,—

"শৃগাল কথনে, বেহুলার মনে,
কিছু নাই অভিমান।"

নৃত্য গীতে অনুরক্তি—পদ্মিনী নারীর লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত আ-

ছোট বেলা বেহুলা নাচিতে গাইতে শিখিয়াছিল, তাহার নৃত্য দেখিয়া তাহার মাতা অমলা মোহ যাইত। পুনরায় এই দুঃখের সময় হাস্যমুখে বেহুলা দেব সভায় নাচিয়া গাইয়া স্বামীর ও তাহার ভ্রাতাগণের জীবন পুরস্কার লইয়া ফিরিয়া আসিল।

এই গল্পের আদ্যন্ত একটি কল্পনার খেলার ন্যায় বোধ হইবে, কিন্তু ইহা ডানহাস্ কি উড্ডীয়মান তুরঙ্গের গল্প নহে; পাঠক পদ্মপুরাণখানা পড়িবেন, ইহা কল্পনার কথা নহে; প্রতিপত্রে মর্ম্মের উক্তি— আমরা বেহুলার সঙ্গে ছত্রে ছত্রে অশ্রু আকুলিত চক্ষে তাহার স্বামীর জীবন প্রার্থনা করিয়া অগ্রসর হইয়াছি। তাহার সৌম্যমূর্ত্তি, সদা হাস্যময় মুখ খানা, সুখে সৌম্য দুঃখে সৌম্য মনোমুগ্ধকর স্বভাব, দৃঢ়ব্রত চরিত্রের লাবণ্য ভুলিবার জিনিষ নহে। কবি স্বচক্ষে সতী দেখিয়া সতী আঁকিয়াছেন। হিন্দুর গৃহলক্ষ্মী চক্ষু-লগ্নজল গড়াইয়া গণ্ডে পড়িতে দেন নাই, ললাটের সিন্দুর বিন্দু স্বামী বিয়োগের পর আরও উজ্জ্বল করিয়া স্বামীর শব সঙ্গে পুড়িয়া ছাই হইয়াছেন, সেই আগুনে কষিত সতীত্ব যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি বেহুলার চিত্র আঁকিতে পারিবেন না। এ স্থলে শুধু দেবদত্ত ক্ষমতায় কুলাইবে না, মাইকেল এঞ্জেলো ও র‍্যাফিয়েল এখানে অপারগ হইবেন।*

মনসা।

এই সর্পভীতিপূর্ণ ত্রিপুরার জঙ্গলে বসিয়া কম্পিত হৃদয়ে একটি সত্য কথা বলিতে হইতেছে, মনসার মত দুষ্টা মেয়ে দেবকুলে দ্বিতীয়টি নাই। চাঁদ সদাগরের পূজা খাইতে ইঁহার কি ভয়ানক লোভ! কখনও চাঁদের বহুকষ্ট অর্জ্জিত তণ্ডুলকণা নষ্ট করিতে ইনি গণদেবের নিকট একটি সামান্য মূষিক ভিক্ষা করিতেছেন, কখনও সমুদ্রে একটু তুফান উঠাইতে

* বেহুলার চরিত্র সম্বন্ধে ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন;—

"স্ফীত গলিত কীটাকুলিত পূতিগন্ধি মৃতপতিকে ক্রোড়ে লইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে ও নির্ভয় মনে বেহুলার মান্দাসে যাত্রা ভাবিতে গেলে সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সতীগণের পতিনিমিত্তক সেই সেই ক্লেশ-ভোগ ও সামান্য বলিয়া বোধ হয়, এবং বেহুলাকে সতীত্বতার পতাকা বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা হয়।"

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ১১৮ পৃঃ।

হনুমানের স্মরণ লইতেছেন, কখন ও লৌহের বাসর নির্ম্মাণ কারীকে একটি সূচিকা প্রমাণ ছিদ্র রাখিতে অনুনয় করিতেছেন, দেব সভায় অনায়াসে মিথ্যা কথা গুলি বলিয়া ফেলিলেন। ইঁহার ক্রোধে অপর দূরে থাকুক পিতা শিব ও স্বামী জরৎকারু টলিয়া পড়িয়াছিলেন; বিষনেত্রে যে দিগে চাহিয়াছেন, শ্যামল ভূমির স্থলে শ্মশান হইয়াছে, কুসুম পল্লবের স্থলে তীক্ষ্ন সূচি দেখা দিয়াছে; একথা স্থির, এহেন দেবতার পদে যে এত পূজা পড়িয়াছে-তাহা প্রেমে ও নহে, ভক্তিতেও নহে,—ভয়ে।

চাঁদের ন্যায় বীরপুরুষের পূজা পাওয়ার যোগ্যতা ইহার কিছুমাত্র নাই; চাঁদ যখন পূজা দিতে স্বীকৃত, তখন ও ইনি মণ্ডপে নাবিতে সাহসী নহেন,—

"যদি মোর পূজা করিবে চাঁদ বেণে।
হেঁতালের বাড়ি গাছি আগে ফেল টেনে ।।
এ কথা শুনিয়া হৈল চাঁদ বেণের হাস।
হেঁতালের বাড়িতে আর নাহি কর ত্রাস ।।
বেহুলা বিনয় করে আসিয়া শ্বশুরে।
হেঁতালের বাড়ি তুমি টেনে ফেল দূরে ।।"

ক্ষেমানন্দ।

(গ)—কাণা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও কবি জনার্দ্দন প্রভৃতি।

কাণীর গীত প্রথমতঃ এক কাণা রচনা করে; কাণী তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই, তাই তিনি ফুলশ্রী গ্রাম-নিবাসী বিজয় গুপ্তকে স্বপ্নে কাব্য রচনা করিতে নিযুক্ত করেন—

"মূর্খেতে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরি-দত্ত ।।" বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ।

সুতরাং বিজয়গুপ্তকে দেবীর অনুরোধে পড়িয়া এ কার্য্যে ব্রতী হইতে হয়; আমরা বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে পুস্তক রচনার সময় উল্লিখিত পাইয়াছি। বিজয় গুপ্ত সম্বন্ধে যে কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব সুলভ, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত পংক্তি নিচয়ের অন্তর্গত আছে,—

"হেনমতে স্বপ্ন কথা কহি উপদেশ।
নাগরথে চড়ি দেবী গেল নিজ দেশ ।।
স্বপ্ন দেখি বিজয় গুপ্তের দূরে গেল নিদ্রে।
হরি হরি নারায়ণে স্মরিয়া গোবিন্দে ।।
প্রভাত সময়ে কাক প্রকাশে দশ দিশা।
স্নান করি বিজয় গুপ্ত পূজিল মনসা ।।
হরি নারায়ণ স্মরি নির্ম্মল কৈল চিত্ত।
রচিতে আরম্ভ কৈল মনসার গীত ।।

যেইমতে পদ্মাবতী করিল সম্বিধান। •
সেইমতে করে সব গীতের নির্ম্মাণ ।।
ছায়া শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক ।।
উত্তরে অর্জ্জুন রাজা প্রতাপেতে যম।
মুলুক ফতেজাবাদ বাঙ্গালার সীম ।।
পশ্চিমে ঘাঘরা নদী পূর্ব্বে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুলশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ।।
চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্যজাতি বৈসে তথা শাস্ত্রেতে কুশল ।।
কায়স্থ জাতি বৈসে তথা লিখিতে প্রচুর।
আর যত জাতি নিজ শাস্ত্রেতে চতুর ।।
স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুলশ্রী গ্রামে নিবসে বিজয় ।।"

বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ।

অন্য এক স্থলে,—

"সনাতন তনয় রুক্মিণী গর্ভজাত।
সেই বিজয় গুপ্তে রাখ তব পদ সাত ।।"

প্রথমাংশ বিজয় গুপ্তের নিজের রচনা কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে, কারণ ঐ অংশের অব্যবহিত পরেই এই দুই পংক্তি পাওয়া যায়,—

"গায়ক হৈয়া তাল ধরে জন্মে নানা জাতি।
বিজয় গুপ্তে বন্দিয়া ভাই গীতে দেও মতি ।।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাচীন কবিগণের স্বরূপ আবিষ্কার করা সহজ কর্ম্ম নহে। বিজয় গুপ্তের ছদ্মবেশে জয়গোপালগণ ঐতিহাসিক মরীচিকা উৎপাদন করিতেছেন, এই গাঢ় ভ্রম সমুদ্র হইতে রত্ন উঠাইতে যাইয়া অনেক সময় শঙ্খ লইয়া ফিরিতে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যগুলির ন্যায় বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ ও নানা হস্ত স্পর্শে, নানা তুলির বর্ণক্ষেপে পরিশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ডুবন্ত দিবালোক ও উদিত নক্ষত্রালোক যেরূপ সান্ধ্যগগনে মিশিয়া যায়, প্রাচীনকালের ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিগণের লেখাও সেইরূপ মিশিয়া গিয়াছে; বিজয় গুপ্তের পদ্ম-পুরাণে প্রকাশ্যভাবে অন্যান্য কবির ভণিতারও অভাব নাই। আমরা ৫৯ পৃষ্ঠায় যোজনাকারিদিগের নামের একটা তালিকা দিয়াছি।

যদি উদ্ধৃত অংশের উল্লিখিত তারিখ (১৪০০ শক*) আমরা বিজয় গুপ্তের নিজের লিখিত বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারি, তবে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কতদূর আস্থাবান্ হওয়া উচিত, সে বিষয়ও বিবেচ্য। যাঁহারা বঙ্গদেশের ইতিহাস

* হুসেন সাহার রাজত্ব-কালের সঙ্গে এই তারিখের ঐক্য হয় না, ইহা রাজত্ব আরম্ভের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হইয়া পড়ে।

ভালরূপ পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন হুসেনসাহ ও তৎপুত্র নসিরাসাহ বঙ্গদেশে হিন্দুদিগের নিকট এতদূর প্রতিপত্তিশালী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন যে, এদেশীয়গণ কোন উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকার সময় নির্দ্দেশ করিতে হইলে, তাঁহাদের রাজত্বকালেই তাহা আরোপ করিতেন; আমরা বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে পাইয়াছি,—

"সে যে নসিরাসাহ জানে।
যারে হানিল মদন বাণে॥
চিরঞ্জীব রহুঁ পঞ্চ গৌড়েশ্বর।
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥"(২)

কোথায় নসিরা সাহ, আর কোথায় বিদ্যাপতি, মধ্যে এক যুগের প্রলয় ব্যবধান।

এইরূপ যোজনা দ্বারা বিজয় গুপ্তের কাল নির্দ্দেশ হওয়া বিচিত্র নহে; নানা কারণে আমরা বিজয় গুপ্তকে ৪০০ বৎসর হইতে অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বলিয়া মনে করি; যাহাহউক আপাততঃ এখানে তাহার আলোচনা হইতে বিরত রহিলাম।

বিজয় গুপ্তের কবিতা কথায় কথায় ব্যঙ্গের দিগে ধাবিত হয়, সেই ব্যঙ্গেই তাহার কবিতা বেশ ফুটিয়া উঠে। এই নগ্নপদ, উত্তরীয়-সার, ঔষধের পুটলি-কক্ষ 'বেজ মহাশয়' সেকালের একজন বিশিষ্ট রসিক লোক ছিলেন, সন্দেহ নাই। সেকালের রসিকতা এখন ভাঁড়ামি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু বিজয় গুপ্ত ভাঁড় ছিলেন না; নিম্নে তাঁহার রচনার কিছু নমুনা দিতেছি,—

পদ্মার বিবাহ সম্বন্ধে শিব দুর্গার আলাপ।

"জামাই এনেছি পুণ্যবান, কন্যা করিব দান,
বিবাহের সজ্জা কর যত্নে।
এনেছি মুনির সুত, রূপে গুণে অদ্ভুত,
কন্যা সমর্পিব তার তরে॥
হাসি বলে চণ্ডী আই, তোমার মুখে লজ্জা নাই,
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে, তারা চাবে পান খাইতে,
আর চাবে তৈল সিন্দুরে॥
হাসি বলে শূলপাণি, এয়ো ভাণ্ডাইতে জানি,
মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হয়ে।
দেখিয়া আমার ঠাঁন, এয়োর উড়িবে প্রাণ,
লাজে সবে যাবে পলাইয়ে॥
আছুক পানের কাজ, এয়োগণ পাবে লাজ,
পান গুয়া দিবে কোন জনে।
বিজয় গুপ্তেতে কয়, এরূপ উচিত নয়,
ঘরে গিয়ে কর সন্বিধানে॥"

বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ।

(২) ইহার কতকাংশ ৮৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

শিবের অদর্শনে চণ্ডিকার রাগ।

ভাল ভাঁড়াইয়া শিব পলাইয়া গেল দূর।
এবার তোমার লাগ পাইলে দর্প করিতাম চুর॥
আঁচলে আঁচড়ে পিটি বাঁধি এক ঠাঁই।
রাখিতে নারিনু তবু পাগল শিবাই॥
কপট চরিত্র তোমার খলের সঙ্গে চঙ্গ।
যাবার কালে লাগ পাইলে দেখাইতাম রঙ্গ॥
পাপ কপাল ফলে স্বামী পাইলাম ভাল।
ভাঙ্গ ধুতুরা খায় পরিধান ব্যাঘ্র ছাল॥
প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সৈতে পারি॥
নিন্দে ভাবিতে প্রাণে বড় লাজ লাগে।
চড়ে বেড়ায় দুষ্ট বলদে তারে খাউক বাঘে॥
আগুন লাগুক কাজের ঝুলি ত্রিশূল লউক চোরে।
গলার সাপ গরুড়ে খাউক যেমন জাঙাল ঘোরে॥
ছিড়িয়া পড়ুক হাড়ের মালা, প'ড়ে ভাঙ্গুক লাউ।
কপালের তিলক চন্দ্র তারে গিলুক রাহু॥"

বিজয় গুপ্ত।

বঙ্গীয় প্রাচীন কাব্যগুলির কয়েকটীর নির্দ্দিষ্ট ভাব কিরূপে এক কাব্য হইতে অন্য কাব্যে অপহৃত হইয়া বিকাশ পাইয়াছে, তাহা বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে লক্ষিত হইবে; আমরা ভারতচন্দ্রের—

"জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে চলিয়া॥
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে॥

ইত্যাদি পড়িয়া ভারতচন্দ্রের কতই সুখ্যাতি করিয়াছি, এইরূপ ছন্দে ভারতচন্দ্রের বহু পূর্ব্বে কবি বিজয় গুপ্ত শিব-নৃত্য বর্ণনা করিয়াছিলেন,—

"জগত মোহন শিবের দাস।
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ।।
রঙ্গে নেহারিয়া গৌরীর মুখ।
নাচেরে মহাদেব মনেতে কৌতুক॥
হাসিতে খেলিতে রঙ্গে।
নন্দী মহাকাল বাজায় মৃদঙ্গে॥
বিশাই নাচেরে হাতেতে বাদ্য বাজে।
হাতেতে তালি দিয়ারে মুখেতে গীত গাহে।।
বিকট দশনে ভ্রুকুটি ভাল সাজে।
ডুম ডুম বলিয়া শিবের ডম্বুর বাজে।।
বিজয় গুপ্ত মধুস্বরে মঙ্গল গায়।
পদ্মার চরিত্রে সবে ধন্য হয়।।"

হ্যামিল্টনের বাড়ীর মুক্তার মালা ছড়া হাতে লইয়া উক্ত কোম্পানীকে কতই প্রশংসা করিয়া থাকি, কিন্তু যে ডুবারি প্রাণ আশা ছাড়িয়া মুক্তার লোভে অতলে ডুব দিয়াছিল, তাহার কথাটা কাহার মনে উদয় হয়? বহু চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, যে উদ্ভাবন করে তাহার অপেক্ষা যে পালিশ করে, এই পৃথিবীতে তাহারই সম্মান অধিক।

বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে আরও অনেক স্থল আছে যাহা পড়িতে পড়িতে পরবর্ত্তী প্রাচীন বড় বড় কবিগণকে মনে হইয়াছে; সে সব

কবিগণ যাঁহাদের কথা লইয়া বড় হইয়াছেন, তাঁহারা অতীতের বিরাট ছায়ার পাছে পড়িয়া রহিয়াছেন, কে তাঁহাদিগের খোঁজ করে? প্রশংসা সম্পদ, যশঃ সমস্তই ভাগ্যাধীন; সংসারক্ষেত্রের স্থায় সাহিত্যক্ষেত্র ও প্রতিভা অপেক্ষা ভাগ্যেরই মাহাত্ম্য জ্ঞাপক, পরে এই কথা আরও পরিস্ফুট হইবে।

নারায়ণ দেব।

সম্ভবতঃ বিজয়গুপ্তের সমকালেই নারায়ণ দেব তাঁহার পদ্ম-পুরাণ রচনা করেন। ইনি ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের সংযোগ স্থলে-জোয়ানসাহী পরগণায় কায়স্থ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। দয়াল চন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক শিক্ষিত লেখক ইহাঁর জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতেছিলেন ও ভারতী পত্রিকায় (১২৯০ সন, কার্ত্তিক) তাহা প্রকাশ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু সহসা তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তিনি এ কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি নারায়ণ দেবকে পদ্ম পুরাণের আদি লেখক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ মন-গড়া কথা।

এই কবির ২০০ শত বৎসরের প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথি আমার নিকট আছে—কিছু মাত্র সংশোধন না করিয়া যেরূপ পাইলাম সেইরূপই একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি—

বেহুলা ও তাহার ভ্রাতা নারায়ণীর কথোপকথন।

নারায়ণী শুনি বোলে বিপুলা বচন।
কি কারণে কৈলা ভইন(১) অশক্য কথন॥
বিষম সায়স(২) ভইন কৈলা কি কারণ।
দেবতা মনিব্য কোথা হইছে দরশন॥
আজ্ঞা দেহ ভইন মরা পুড়িবারে।
একেশ্বর কেমনে যাইবা দেবঘরে॥

কেমতে ছাড়িয়া দিমু সাগর ভিতর।
কথাতে পাইবা তুমি দেবের নগর॥
অগোরি(৩) চন্দন কাটে(৪) লখাই পুড়িমু।
লক্ষিন্দর কর্ম্ম(৫) ভইন এইখানে করিমু॥
লেউটিয়া চল ভইন আপনার ঘরে।
একেশ্বর কেমতে যাইবা দেব ঘরে॥

---

(১) ভইন—ভগ্নী। (২) সায়স—সাহস। (৩) অগোরি—অগুরু। (৪) কাটে—কাষ্ঠে।
(৫) কর্ম্ম—শ্রাদ্ধাদি।

মৎস মাংস এড়ি ভইন যত উপহার।
সর্ব্ব দর্ব্ব দিমু আমি তুমি খাইবার॥
সংখ সিন্দুর মাত্র না পড়িবা তুমি।
নানা অলংকার তোমা দিমু আমি॥
মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর।
বিপুলা রাখিআ আইলা জলের উপর॥
বিপুলা রাখিতে সাধু করএ ক্রন্দন।
বিপুলাএ বোলে কিছু প্রবোধ বচন॥
জীআইতে আইল প্রভু যাইমু পলাইআ।
কেমতে মুখেত অন্ন দিবাম তুলিয়া॥
অসতী হইব মনিষ্য লোকেত প্রচার।
কি কারণে এতেক জে রাখিমু খাখার॥
গোত্র জ্ঞাতি আছে চম্পক নগর।
তারা কি বলিব আমি কি দিব উত্তর॥
বিপুলা শুনিআ বাক্য নিষ্ঠুর বচন।
সকরুণ ভাসে সাধু করএ ক্রন্দন॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালী।
নারায়ণি করুণা সুন একটি লাচাড়ি॥
কাঁদে নারায়ণি সাধু কহত্র বিপুলা চাইআ।
প্রাণে না সয় দুঃখ না দিমু এড়িয়া॥
অবুদ্ধিয়া সদাগর বুদ্ধি অতি ছার।
জীয়তা ভাসাইআ দিছে সইতে মরার॥
বিষম সাগরে ঢেউ তোলপার করে।
জলেত পড়িলে খাইব মৎস্ত মকরে॥
মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর।
কি কথা কহিব আমি উজানী নগর॥
বিপুলা রাখিতে সাধু করএ ক্রন্দন।
নারায়ণ দেবে কহে মনসা চরণ॥
বিস্তর যতন করি রাখিতে না পারিয়া।
চিত্তে ক্ষেমা দিয়া যায় ভেরুআ ভাসাইআ॥
ভাইত বিদায় করি বিপুলা সুন্দরী।
ছাড়াইয়া জাএ তবে ভুরাখান মেলি॥
নৈক্ষত্র সঞ্চারে যেন ভুরার চলন।
সম্মুখে বাঘের ঘাঁকে দিলা দরশন॥"

এই পুস্তকের হস্তলিপিতে সংস্কৃত পড়ার গন্ধ নাই, লেখক যে ভাবে কথা কহিতেন সেই ভাবেই শব্দ গুলি লিখিয়া গিয়াছেন—ইহাতে বিদ্যা না থাকিলে ও স্বাভাবিকত্ব আছে। বিজয় গুপ্তের লেখার পালিস দেখিয়া নারায়ণ দেবকে অগ্রবর্ত্তী কবি মনে করা সঙ্গত হইবেনা। বিজয় গুপ্তের পদ্ম-পুরাণের বটতলার ছাপা দেখিয়া অংশগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, আর নারায়ণ দেবের পুঁথি খানা গত ২০০ বৎসর যাবৎ কোন ও রূপ হাওয়ায় বাহির হয় নাই;—এই সময়ের মধ্যে কীটগণ অবশ্যই কিছু নষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু জয়গোপালগণ সেরূপ সুবিধা পান নাই।*

* ২৮৫ নং আপার চিৎপুর রোড বেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানির ছাপা নারায়ণদেবের পদ্ম-পুরাণ দ্বিজ বংশীদাস ও কবি বল্লভের দ্বারা সম্পূর্ণ রূপ নূতন ভাবে রচিত বলিয়া বোধ হয়। উহার সঙ্গে মুল গ্রন্থের ঐক্য নাই বলিলে ও অত্যুক্তি হইবে না। উহার পত্রে পত্রে ভণিতা এইরূপ,—

(১) "দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বোলে নারায়ণ॥"
(২) নারায়ণ দেবে কয়, সুকবি বল্লভে হয়, ইত্যাদি।

মনসার গীতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া উপসংহার করিব। ত্রিপুরাজেলায় একটি চম্পকনগর আছে, পূর্ব্বাঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, সেই স্থলেই লখিন্দরের কাণ্ড কারখানাটা হইয়াছিল। লখিন্দরের লোহার বাসরের ভিটা ও তথায় দুষ্প্রাপ্য নহে। এদিগে বর্দ্ধমানের ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে চম্পক নগর, ও তন্নিকটে বেহুলা নদী প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ভূগোলবিৎ পণ্ডিতমহাশয়ের একটু গোলে পড়িবারই কথা। চাঁদবেণে এখন বঙ্গসাহিত্যের একটি সজীব ছবি; ইনি চণ্ডীকাব্যে ধনপতি সদাগরের বাড়ীতে পুষ্পমাল্য পাইতেছেন, জয়নারায়ণের চণ্ডীতে ইঁহার সহিত জনৈক কাব্যোক্ত নায়কের দীর্ঘকাল ব্যাপী আলাপ বর্ণিত আছে ও ত্রিবেণীর পারে তাঁহার বাটীর একটা জমকালো বর্ণনা আছে; বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি মনসার গীতি ছাড়িয়া ও এদিক সেদিক হইতে উঁকি দিতেছেন; সুতরাং চাঁদ সদাগরের ন্যায় প্রয়োজনীয় ব্যক্তির নিবাস-ভূমি জানা পাঠকের নিতান্ত আবশ্যক।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের বিশ্বাস চাঁদবেণের গল্পটি আগাগোড়া কল্পনা মূলক। পাঠক শনির পাঁচালী কি সত্যনারায়ণের পাঁচালী দেখিয়াছেন, চাঁদবেণের কথার সুরু ও ঠিক সেইরূপ ছিল। এক একজন করিয়া কবিগণ ঘটনা ও কাব্য-বর্ণিত চরিত্র বাড়াইয়াছেন, এবং মিথ্যাকে এমনই সত্যের পোষাক পরাইয়াছেন,—চাঁদ সদাগর কল্পনার লালপাগরি মাথায় বাঁধিয়া সত্যসত্যই আমাদের ভয় জন্মাইতেছে। কাব্য বর্ণিত ঘটনাগুলি অনুধাবন করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না। মনসার সঙ্গে বাদে চাঁদ সদাগরের দুর্গতিগুলিতে কিছুমাত্র সত্য থাকিতে পারে না। স্বর্গে যাইয়া নাচিয়া গাহিয়া স্বামীর জীবন লাভ করার কথা ও পৃথিবীবাসীগণ না দেখিয়া বিশ্বাস করিবে কিরূপে? এই দুইটি মূল ঘটনাই দুই খানা কল্পনার ইষ্টকে গ্রথিত দেখিতে পারিলেন। সত্যের উপর মধ্যে মধ্যে কল্পনার একটুকু প্রলেপ দিয়া কাব্য প্রস্তুত হয় যথা,—পলাশীর যুদ্ধ কাব্য। কিন্তু এ কাব্য তাহা নহে।

মনসার সেবক যতই বাড়িতে লাগিল ততই চাঁদ সদাগর ও বেহুলার প্রতিবিম্ব গাঢ়তর হইয়া সজীব বস্তুর ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইল। এই বঙ্গদেশে প্রাচীন ভগ্ন কীর্ত্তির অভাব নাই, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে

ইষ্টকস্তূপবিশেষে বৃহৎ চাঁদবেণের ভূতের বাসাবাড়ী নির্দ্ধারিত হইল; বর্দ্ধমান ও ত্রিপুরার চম্পকনগরদ্বয়, নেতধোপানীর ঘাট প্রভৃতি নাম এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বসিয়াছে। চাঁদের এই সৌভাগ্য সত্যনারায়ণের পাঁচালীর নায়কের হইতে পারে নাই।

কবি জনার্দ্দন প্রভৃতি।

মঙ্গল চণ্ডীর ক্ষুদ্র ছড়া ও ক্রমে বড় কাব্য হইয়া পড়িয়াছে; মাধবাচার্য্যের চণ্ডীর (১৫৭৯ খৃঃ) পূর্ব্বে ও মঙ্গল চণ্ডীর গীত ছিল; চৈতন্য-প্রভুর পূর্ব্বে ও মঙ্গল চণ্ডীর ছড়া গাইয়া গায়কগণ রাত্রি জাগরণ করিত।

"মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করিবিষ হরি পূজে কোন জনে॥" চৈ, ভা, আদি।

সেই গীতি কিরূপ ছিল, ঠিক জানি না। আমরা দ্বিজ জনার্দ্দনের একটী চণ্ডী পাইয়াছি—উহা কাব্য নহে, ব্রত কথা। হস্তলিপি প্রায় ২৫০ শত বৎসরের প্রাচীন। এইরূপ কোন চণ্ডীর গীতিকে অবলম্বন করিয়া মাধবাচার্য্য তাঁহার কাব্য গঠন ও চরিত্রগুলির রেখাপাত করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। ছোট ছোট ঢেউ কিরূপে বড় বড় তরঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়—অস্পষ্ট রেখার ক্ষীণ ছবি কিরূপে ক্রমে সম্যক বিকশিত, বড় ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে—জনার্দ্দন মাধবাচার্য্য ও কবিকঙ্কণের চণ্ডী ক্রমান্বয়ে তুলনা করিলে তাহা অনুমিত হইবে। কাব্য-জগতের এই ক্রমিক বিকাশের দৃশ্য, ছায়াবাজির ছায়াগুলির ক্রমশঃ বিশাল, সুস্পষ্ট, ও বিচিত্র-বর্ণ-বিশিষ্ট অবয়বে পরিণতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। জনার্দ্দন কবির কালকেতু ও শ্রীমন্তের উপখ্যান হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

১ম অংশ।

"নিত্য নিত্য সেই ব্যাধ আনন্দিত হইয়া।
পরিবার পালে সে যে মৃগাদি মারিয়া॥
ধনুকে যুড়িয়া বাণ লগুড় কাঁধেতে।
সর্ব্ব মৃগ খাইয়া গেল বিন্ধ্যাগিরিতে॥
ব্যাধ দেখি মৃগ পলাইল ত্রাসে।
পাছে পাছে ধায় ব্যাধ মৃগ মারিবার আশে॥
বৃদ্ধ বরাহক আদি যত মৃগগণ।
মঙ্গল চণ্ডীর পদে লইল শরণ॥
ব্যাধেরে দেখিয়া দেবী উপায় চিন্তিল।
দুর্গতি-নাশিনী দেবী সদয় হইল॥
সুবর্ণ গোধিকারূপ ধরিয়া পার্ব্বতী।
ব্যাধ পথ যুড়িয়া রহিল ভগবতী॥

মৃগয় না পাইয়া ব্যাধ হইল চিন্তিত।
সুবর্ণ গোধিকা পথে দেখে আচম্বিত॥
সুবর্ণ গোধিকা পাইয়া হরষিত মনে।
ধনুর অগ্রে তুলি লইল তখনে॥
মনে মনে ভাবি ব্যাধ ধীরে ধীরে হাটে।
সত্বর গমনে গেল বাড়ীর নিকটে॥
হরষিত মনে ব্যাধ গদগদ বাণী।
উচ্চস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিল গেহিণী॥
যেন মতে গৃহে নিয়া থুইল গোধিকা।
পরম সুন্দরী রূপ ধরিল চণ্ডিকা॥
দিব্যরূপ দেখি জ্ঞান হারা ব্যাধ কালকেতু।
গৃহিণীর মুখ চাহি বোলে কোন হেতু॥
মঙ্গল চণ্ডিকা বোলে শুন ব্যাধবর।
তুষ্ট হয়ে দেখা দিল তোমার গোচর॥
সম্প্রতি হইল ব্যাধ তোমার শুভযোগ।
পঞ্চশত স্বর্ণাঙ্গুরী কর উপভোগ॥
আজু হোতে ব্যাধ তুমি না যাইবা বন।
মৃগ না মারিবা এহি শুনহ বচন॥
অন্ন দ্রব্য অঙ্গুরী দিলা যে আমারে।
ইহা খাইয়া কি করিব বল তার পরে॥
মঙ্গল চণ্ডীকা দেবী হইলা সদয়।
স্বর্ণ ভাণ্ডার তাকে দিলেক নিশ্চয়॥
চণ্ডিকা প্রসাদে ব্যাধ কৃতার্থ হইল।
তারপর ভগবতী অন্তর্দ্ধান হৈল॥
ধন পাইছে হেন রাজাএ শুনিয়া।
শীঘ্র করি কালকেতু বন্দী কৈল নিয়া॥
বন্ধনে পীড়িত হৈয়া ব্যাধ মহাজন।
কাঁদিয়া মঙ্গল চণ্ডী করিলা স্মরণ॥ইত্যাদি।

এস্থলে গুজরাট যাইয়া রাজ্যাদি স্থাপনের কথা ও কলিঙ্গাধিপতির সহিত যুদ্ধ-বর্ণনা নাই; ক্ষুদ্র গীতিটি কাব্যে পরিণত করিবার সময় কবিগণ নিজ হস্তে একটি মানচিত্র আঁকিয়া লইয়াছেন; পদ্ম-পুরাণের ঘটনার কেন্দ্রভূমি ও এইরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে; ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানের উপর বিদ্যাসুন্দরের কেলেঙ্কারী চাপাইয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন; পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন।

"বর্দ্ধমান-রাজ যে ভারতচন্দ্রের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সে কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা যে নিশ্চয়ই বর্দ্ধমানে ঘটিয়াছিল, এ ধারণা অনেকেরই আছে। এবং এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পূজ্যপাদ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় মালিনীর বাড়ী অন্বেষণার্থ বর্দ্ধমান সহরে অনেক দিন ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই সুড়ঙ্গ দিয়া এখন ও রাজবাটী যাওয়া যায় কি না, দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।"*

২য় অংশ।

অনুগত জনে দয়া করে গিরিসুতা।
চলহ খুল্লনা গৃহে সাধুর দুহিতা॥
ব্রতের বিধান সর্ব্ব ব্রতী এ কহিল।
প্রণাম করিয়া তবে খুল্লনা চলিল॥
হারাইয়া ছিল ছাগল পথে পাইল তারে।
গৃহে আসি খুল্লনা যে বিবিধ প্রকারে।
চণ্ডিকার পূজা করে ভক্তি অনুসারে॥
মঙ্গল চণ্ডীর বরে বাড়িল উন্নতি।
ব্রত হনে সুখী হৈল খুল্লনা যুবতি॥
দিব্য বস্ত্র অলংকারে সাধুএ তুষিল।
কতকাল পরে কন্যা গর্ভবতী হৈল॥
খুল্লনার গর্ভ ছয়মাস হৈল যবে।
বাণিজ্যেরে চলে ধনপতি সাধু তবে॥
স্বামীর অগ্রেত গিয়া করিল কাকুতি।

* সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩০০ সন।

বাণিজ্য করিতে সাধু হইলেক মতি ॥*
ছয়মাস গর্ভ মোর জানাইল তোমারে।
জানিবার পত্রে হর্ষে দিলেক কুমারে ॥
হীরা মণি মাণিক্য আর নানা দ্রব্য হতে।
হরষিত তরে ডিঙ্গা যত লয় চিত্তে ॥
ডিঙ্গাতে অর্থ ভরি সাধুর নন্দনে।
খুল্লনা আসিতে আজ্ঞা করিল তখনে ॥
মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত করিতে কারণ।
অর্ঘ আনিতে বিলম্ব হইল তখন ॥
বিলম্ব দেখিয়া তবে সাধু মহাজন।
চণ্ডিকার ঘটে পদ ক্ষেপিল তখন ॥
০ • ০ • *
মঙ্গল চণ্ডীর বরে খুল্লনা যুবতী।
পুত্র প্রসবিল তথা নাম শ্রীপতি ॥
দিনে দিনে বাড়ে কুমার চন্দ্রের সমান।
শুভক্ষণ ক'রয়া কাঠি কৈল দান ॥
লিখিতে কহিল কুমার ছাত্র সব স্থান।
আমারে লিখায়ে দেহ এই খড়ি খান ॥
হাসিয়া সকল ছাত্র বুলিলেক বাণী।
জারজ কুমার তুমি কে দিবে কাঠিণী ॥
অসন্তোষ ভাবি তবে সাধুর কুমার।
হেট মাথা করি গৃহে গেল আপনার ॥
বিষাদ ভাবিয়া তবে সাধুর নন্দন।
মাথাএ বসন দিয়া করিল শয়ন ॥
অন্ন জল না খাইল সাধুর নন্দন।
ম্লান হৈয়া নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘন ঘন ॥
মাতা বিমাতায় বুঝি পুত্রের লক্ষণ।
সাধু দিছে যেই পত্র দিলেক তখন ॥

শেষ পংক্তির উপরের পংক্তির ক্ষুদ্র 'বিমাতা' শব্দটি হইতে হয়ত লহনা নারীর স্পষ্ট ছবি জাগিয়া উঠিয়াছে। শ্রীমন্তের বিদ্যালয়ে মর্ম্মাহত হইবার কথাটি এখানে যেরূপ আছে মাধবাচার্য্য ও প্রায় সেইরূপই রাখিয়াছেন, কবিকঙ্কণ সে স্থানটি ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন।

রতিদেবকৃত মৃগলব্ধ পুঁথির কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি°—উহা শৈব ধর্ম্মের ভগ্ন ধ্বজা। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বঙ্গসাহিত্যে শিব কোন স্থলেই বড় উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই, যেথানেই তিনি দেখা দিয়াছেন, সেই খানেই ভবানীর ভ্রূকুটি-ভঙ্গীতে তিনি থতমত খাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছেন।

'মৃগলব্ধ' গীতি শৈব ধর্ম্মের প্রাবল্য সময়ে লিখিত; উক্ত ধর্ম্ম শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের আঁড়ালে পড়িয়া যাওয়াতে শিব-গীতির আর বিকাশ হইতে পারে নাই।

শনির পাঁচালী, ষষ্ঠির পাঁচালী,—অতি আদিসময়েও বিদ্যমান ছিল; মেয়েলী ছড়ার খোঁজ করিতে করিতে সেইসব প্রাচীন গীতের ভগ্নাংশ কোন বৃদ্ধার পাকস্থলী হইতে জীর্ণ-প্রায় অবস্থায় বহির্গত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না।

° ৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

(৪) পদাবলী-শাখা।

ক। পদাবলী সাহিত্য।

খ। বিদ্যাপতি। গ। চণ্ডীদাস।

বঙ্গদেশে প্রেমের অবতার হইয়াছিল; বাঙ্গালী কবি প্রেমবর্ণনায় পৃথিবীর সব কবি হইতে বড়। আমরা নিজকে এত দীন হীন মনে করি যে, আমাদের দেশে কোন উৎকৃষ্ট জিনিষ ছিল, এ কথা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হই। আত্ম-গরিমা জ্ঞানশূন্য হইলেই এক জাতির প্রকৃত অধঃপতন হয়।

পদাবলীসাহিত্য,—প্রেমের রাজ্য, নয়ন-জলের রাজ্য। পূর্ব্বরাগ, উক্তি, প্রত্যুক্তি, প্রথমমিলন, বাসরসজ্জা, সম্ভোগ, অভিসার, কারণমান নির্হেতুমান, প্রেমবৈচিত্র, দানলীলা, নৌকা-বিলাস বাসন্তী-লীলা, বিরহ, পুনর্ম্মিলন—প্রেমের এই বহু বিভাগের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে কেবল কোমল অশ্রুর উৎস। ইহাতে স্বার্থের আহুতি, অধিকারের বিলোপ; বাঞ্ছিতের দেহ স্পর্শ করিতে, দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে, তজ্জাত অপূর্ব্ব পরিমল ঘ্রাণিতে, তাঁহার সুধা মাখা বাণী আস্বাদ করিতে, মধুগন্ধে অন্ধ অলির ন্যায় কতকগুলি অপ্রাকৃতভাবাপন্ন পাগল কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন, পদাবলী-সাহিত্য তাঁহাদের অশ্রুর ইতিহাস। ভালবাসাকে কোন্ কালে কোন জাতি বাঙ্গালীর ন্যায় একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে পরিণত করিয়া তাহার পর্দ্দায় পর্দ্দায় বেহাগ, ঝিঁঝিঁট, রাগিণীর সুর বাঁধিয়া এরূপ সুধা লহরীর উৎপত্তি করিতে পারেন নাই। এই স্বর্গীয় অশ্রু ও নির্ম্মল স্বার্থত্যাগের রাজ্যে, বিলাস-রসের ওস্তাদ ভারতচন্দ্রগণের প্রবেশ নিষেধ; কামানের গুলি চালাইয়া এই দুর্গের দ্বার মুক্ত করা যায় না—মীনকেতনের এই অপূর্ব্ব ফোর্টউইলিয়মে গোরাপল্টনের প্রবেশ নিষেধ। আমরা এস্থলে শুধু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বিষয় আলোচনা করিব।

খ। বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতির বাড়ী মিথিলা—সীতামরি মহকুমার অন্তর্গত জারৈল পরগণায় অবস্থিত বিসপীগ্রাম। তাঁহার পিতার নাম গণপতি, পিতামহের

নাম জয়দত্ত, প্রপিতামহের নাম ধীরেশ্বর ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম দেবাদিত্য। এই বংশ বিশেষ খ্যাতি বিশিষ্ট ছিল—পিতা গণপতি 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' নামক সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। জয়দত্ত সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, এজন্য তিনি 'যোগীশ্বর' আখ্যায় পরিচিত হন। জয়দত্তের পিতা ধীরেশ্বর স্বীয় পাণ্ডিত্যগুণে মিথিলা-রাজ কামেশ্বর হইতে মাসিক বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি মহারাজ শিবসিংহের (১৪৪৬-১৪৫০খৃঃ) সভাসদ ছিলেন। পুরুষপরীক্ষায় তিনি শিবসিংহকে পরমশৈব ও কৃষ্ণবর্ণ-দেহবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শিবসিংহের পূর্ণনাম "রূপ-নারায়ণ-পদাঙ্কিত-মহারাজ-শিবসিংহ।" ইঁহার আদেশে তিনি সংস্কৃতে 'পুরুষ-পরীক্ষা' রচনা করেন, রাজ্ঞী বিশ্বাসদেবীর (১৪৫৮-১৪৭০ খৃঃ) আজ্ঞাক্রমে তিনি 'শৈব-সর্ব্বস্বসার' ও 'গঙ্গাবাক্যাবলী' নামক অপর দুইখানা সংস্কৃতপুস্তক রচনা করেন। তাঁহার সর্ব্বশেষ সংস্কৃতগ্রন্থ দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী ভৈরবসিংহমহারাজের (হরি নারায়ণ) রাজত্ব সময়ে (১৫০৬-১৫২০ খৃঃ) যুবরাজ রামভদ্রের (রূপ নারায়ণ) উৎসাহে রচিত হয়। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া তিনি 'দানবাক্যাবলী' ও 'বিভাগসার' নামক দুইখানা স্মৃতিগ্রন্থ ও রচনা করিয়াছিলেন। ১৪৫৭ খৃঃ অব্দে তিনি স্বহস্তে যে ভাগবত লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বংশধর বনমালী ও বদরীনাথের নিকট এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে। সম্ভবতঃ মহারাজ শিবসিংহ হইতে বিদ্যাপতি 'কবি-কণ্ঠ-হার' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।* বিদ্যাপতির পদাবলীতে শিবসিংহ ও তাঁহার পত্নী লছিমাদেবীর নাম অনেক স্থলেই উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। বিদ্যাপতি, মহারাজ শিবসিংহ হইতে বিসপী গ্রাম পাইয়াছিলেন। সেই ভূমিদানপত্রে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ এখনও দেখাইয়া থাকেন, ভূমিদানপত্রে ১৪০০ খৃঃ দানকাল বলিয়া উল্লিখিত

---

* "ভণহি বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠ হার।
কোটি হুঁন ঘটয় বিকল অভিসার।" Grierson's Maithil Songs. A. S. J, Extra No. 163.

কেহ কেহ বলেন তাঁহার উপাধি 'কবিরঞ্জন' ছিল,—"চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল" ও "পুহুত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে" প্রভৃতি পদ দৃষ্টে সেরূপ ও বোধ হয়।

আছে; মিথিলার রাজপঞ্জী অনুসারে রাজা শিবসিংহ ১৪৪৬ খৃঃ অব্দে সিংহাসন আরোহন করেন। ভূমিদানপত্রের তারিখ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে তিনটি গোলে পড়িতে হয়;—

(১) বিসপী গ্রাম প্রাপ্তির সময় কবির বয়স মাত্র ২০ বৎসর কল্পনা করিয়া লইতে হয়, তাহা না হইলে জীবন বড় অতিরিক্ত লম্বা হইয়া পড়ে। এরূপ নবীন যুবকের পাণ্ডিত্য দর্শনে মহারাজা তাঁহাকে একখানা বড় গ্রাম দিয়া ফেলিলেন, ইহা কেমন কেমন বোধ হয়; তার পরে ভূমিদান পত্রে বিদ্যাপতিকে "মহা পণ্ডিত" ও "নব জয়দেব" আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। টোলের পড়া সাঙ্গ করিয়া "ঈষদ গোপের রেখা"-যুক্ত যুবকের রাজসভায় "মহাপণ্ডিত" বলিয়া সন্মান লাভ করা কতদূর সম্ভব তাহা বিবেচ্য বিষয়। জগতে চ্যাটার্টন, কার্কহোহাইট এবং অষ্টবক্র না আছেন, এমন নহে; কিন্তু তাহাদের দৃষ্টান্ত বড় বিরল।

(২) মহারাজ শিবসিংহকে রাজা হইবার ৪৭ বৎসর পূর্ব্বেই ভূমি দান করিতে হয়—অথচ ভূমিদানপত্রে তিনি দিগ্বিজয়ী 'মহারাজাধিরাজ' বলিয়া কীর্ত্তিত। ইহা বড়ই অদ্ভুত অনুমান।

(৩) ২০ বৎসর বয়সে (১৪০০ খৃঃ) কবি বিদ্যাপতি 'মহাপণ্ডিত' আখ্যা ও বিসপী গ্রাম দান পাইয়াছিলেন, মানিয়া লইলেও ১২৭ বৎসর বয়ক্রম কালে (ভৈরব সিংহের রাজত্বে ১৫০৬—২০ খৃঃ) তাঁহাকে 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' লিখিতে হয়;* এই বয়সে যে পুস্তক লিখিতে শক্তি থাকে, তাহা প্রমাণ করিতে গ্লাডেষ্টোনের উদাহরণেও কুলায় না; প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের এই অনুমানের প্রসারটা দেখিয়া কবি কল্পনার কথা মনে হয়।

ভূমিদানপত্রের সঙ্গে রাজ সভার পঞ্জীর ঐক্য স্থাপন করিতে ইচ্ছুক লেখকগণ ইতিহাসের ছিন্ন পৃষ্ঠায় এইরূপ তিনটি বড় রকমের তালি দিয়াছেন।

সেটলমেন্ট অফিসারগণ প্রায়ই ভূমিদানপত্র অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। রাজ সভার পঞ্জী অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ নাই—সেখানে স্বার্থের

* কেহ কেহ বলেন তিনি ৯৬ বৎসর বয়সে নরসিংহ দেবের রাজত্বকালে 'গঙ্গা-ভক্তি-তরঙ্গিণী' রচনা করেন। ৯৬ বৎসর বয়স ও সামান্য নহে। কিন্তু স্পষ্টতঃ যখন ভৈরব সিংহের কথা কবি উল্লেখ করিয়াছেন, তখন নরসিংহ দেবের রাজত্বকালে উক্ত পুস্তক লিখিত হইয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত করার কোন কারণ নাই।

সংশ্রব নাই; এই ভূমিদানপত্র সম্বন্ধে আমরা সেরূপ কথা বলিতে পারি না।* কিম্বা এমন ও হইতে পারে, ভূমিদানপত্র প্রায় নষ্ট হওয়াতে তাহা উদ্ধার করা হইয়াছে, তারিখের অংশ পত্রের শেষভাগে থাকে, তাহাই প্রায়শঃ পূর্ব্বে নষ্ট হয়, সেই অবস্থার পরে একটা আন্দাজে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। বিম্‌স্‌ সাহেব বলেন 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' অপর কোন বিদ্যাপতির লেখা হইলে ও হইতে পারে। বিদ্যাপতির এই আসুরিক দীর্ঘায়ু সম্বন্ধে যদি অনুমান দ্বারা অনুমানের উত্তর দিতে হয়, তবে বলা যাইতে পারে যাঁহারা প্রেমকে অতিরিক্ত লাল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, সেই সব কবিগণকে প্রায়ই দীর্ঘায়ু হইতে দেখা যায় না।

খাস মিথিলায় ও বিদ্যাপতির খাটি রচনা উদ্ধার করা অসম্ভব। মিথিলার পাঠ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও বিকৃত, বঙ্গদেশের প্রচলিত পাঠ ও বিকৃত সুতরাং কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির উপর বাঙ্গালী ও মৈথিলদিগের দাওয়া তুল্যরূপ। মিথিলা বাঙ্গলার পঞ্চ বিভাগের এক বিভাগ ছিল ও মিথিলার রাজসভায় লক্ষ্মণাব্দ প্রচলিত ছিল ইত্যাদি বলিয়া কোন কোন লেখক আবার বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী কবি বলিয়াই স্থির করিতে চাহেন। পাঠবিকৃতি সমস্ত প্রাচীন কবির রচনাতেই দৃষ্ট হয় এবং এক দেশ অন্য দেশের অধীন থাকিতে পারে, এজন্য কবির স্বদেশবাসীদিগকে বঞ্চনা করিতে যাওয়া অনুচিত। বিদ্যাপতির সমাধিস্তম্ভ উঠিতে বিসপীতেই উঠিবে, মৈথিলগণই তাঁহাকে লইয়া গর্ব্ব

---

* ভূমিদানপত্র সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত লেখা শেষ হইলে দেখিতে পাইলাম, ১২৮৯ সনের আশ্বিনের ভারতীতে শ্রদ্ধেয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় ও আমাদের অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি যুক্তি এই ;—

"এই সনন্দে যে কেবল লক্ষ্মণাব্দের উল্লেখ আছে এমন নহে, সনন্দের অন্য ভাগে আরও ৩টী অব্দ লিখিত হইয়াছে, যথা সন (হিজিরি) ৮০০ ॥ সম্বত ১৪৫৫ ॥ শাকে ১৩২১ ॥ আমরা প্রাচীন হিন্দু রাজাগণের অনেকগুলি সনন্দ দর্শন করিয়াছি। কিন্তু এরূপ ৪ টি অব্দ কোনও সনন্দে ব্যবহৃত দেখি নাই। প্রাচীন নির্ম্মল হিন্দুহৃদয় এতদূর সতর্ক ছিল না। সনন্দের সময়াবধারণ কালে কতদূর কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা পুরাতত্ত্ববিৎ পাঠকগণ বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। কারণ কোনও সনন্দে একাধিক অব্দ লিখিত হয় নাই এবং সেই অব্দ যে কোন্ রাজার প্রচলিত তাহা প্রায় স্থিররূপে লেখা হয় নাই। কিন্তু এ সনন্দে স্পষ্টাক্ষরে লক্ষ্মণাব্দ, হিজিরি সন, বিক্রমসম্বত, শালিবাহন শকাব্দ অত্যন্ত সতর্ক, এবম্প্রকার নানা কারণে এই সনন্দের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে।"

করিবেন। তবে আমাদের একটা ভালবাসার আধিপত্য আছে, বঙ্গদেশের বহুদিনের অশ্রু, সুখ ও প্রেমের কথার সঙ্গে তাঁহার পদাবলী জড়িত হইয়া পড়িয়াছে; ধীরে ধীরে আমরা বাঙ্গালীর ধুতি চাদর পরাইয়া মিথিলার বড় পাগড়ি খুলিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে আমাদের করিয়া দেখিয়াছি, সেইরূপে তিনি আমাদেরই থাকিবেন; আমরা আসলের পার্শ্বে একটি নকল বিদ্যাপতি খাড়া করিয়াছি; জগতে এই প্রথম বার নকলটি আসলের মতই সুন্দর হইয়াছে। আমরা পদকল্পতরু প্রভৃতি পুস্তক হইতে তাঁহাকে আর বাদ দিতে পারি না। এ শুধু ভালবাসার বল প্রয়োগ; ঐতিহাসিক এ আবদার নাও মান্য করিতে পারেন।

আমাদের অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর কবি বিদ্যাপতির শিষ্য। মিথিলার শিষ্যত্ব আমাদের নূতন কথা নহে। মিথিলার রাজর্ষি জনক, জাজ্ঞবল্ক্য গার্গী, মৈত্রেয়ী, গৌতম, কপিল,—সমস্ত ভারতবর্ষের গুরুস্থানীয়। মিথিলা-রাজ ইক্ষ্বাকুর চারি পুত্র বিমাতার চক্রান্তে তাড়িত হইয়া কপিলাবস্তুতে নবরাজ্য স্থাপন করেন, বুদ্ধদেব সেই বংশোদ্ভব। নবদ্বিপের অজেয়টোল মিথিলার শিষ্য কাণাশিরোমণি দ্বারা অধিষ্ঠিত। ব্রিজ নামক মিথিলার ক্ষত্রিয়বংশের ভাষা—ব্রিজবুলি বঙ্গ সাহিত্যের বহু পৃষ্ঠা জুড়িয়া আছে। মিথিলার পণ্ডিতগণ "এক বাংগালী, দোসর তোতরাহ"* বলিয়া যদি আমাদিগকে একটু গালি দেন, তাহা সহ্য করা আমাদের অনুচিত হইবে না।

বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস সমকালিক কবি, বসন্তকালে গঙ্গাতীরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে অনেক কবি পদ লিখিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাপতির ধর্ম্ম-বিশ্বাস কি ছিল জানা যায় নাই। তিনি 'দুর্গা-ভক্তি তরঙ্গিণী' লিখিয়াছিলেন ও শৈবধর্ম্মাবলম্বী শিবসিংহ রাজার প্রিয় সভাসদ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত ভাগবত খানা আছে—তাঁহার রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় পদাবলী ভক্তির সরস উৎস; একটি শিব বন্দনায় তিনি লিখিয়াছেন, হরি উৎকৃষ্ট চাঁপা ফুলের অঞ্জলি গ্রহন করেন, শিব তুমি সামান্য ধুতুরা ফুলেই প্রীত হও। তিনি বাহিরে যাহাই থাকুন তাঁহার হৃদয়টি বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুকূলে ছিল, একথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে।

বিদ্যাপতির কবিত্ব ঈশ্বর-প্রদত্ত সামগ্রী। তিনি ভগবত্ কৃপার সঙ্গে স্বীয়

* বিদ্যাপতি, কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণ, উপক্রমণিকা ৵।

শিক্ষার যোগ করিয়াছিলেন; সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য স্বভাব-দত্ত চক্ষু ও শিক্ষা-দত্ত চসমা উভয়ই ব্যবহার করিতেন, একটি রূপের আকৃতি দেখিলে পৃথিবীর নানা রূপের ছবি স্পষ্ট ভাবে মনে উদয় হইত,—তাই তাঁহার উপমা গুলি এত সুন্দর। নায়িকার ডাগর চোখ দুটি তিনি কত উপমায় ব্যক্ত করিয়াছেন—দেখুন (১) সলিলার্দ্র চক্ষু ঈষদ রক্তাভ হইয়াছে,—পদ্মদলে যেন ঈষদ সিন্দুরের লেপ পড়িয়াছে (২) চক্ষুর তারা যেন স্থির ভৃঙ্গের ন্যায়—মধুতে বিভোর হইয়া উড়িতে পারিতেছেনা। (৩) চোখের বঙ্কিম চাহনিতে কৃষ্ণ তারকা এক কোণে সরিয়া পড়িয়াছে, যেন মধুমত্ত ভ্রমরকে পবন ইন্দিবর হইতে ঠেলিয়া ফেলিতেছে।

এইরূপে উপমার সংখ্যা নাই; উপমা ভিন্ন কথা নাই। পৃথিবীর সুন্দর পদার্থ গুলি পৃথক হইলে ও তাহাদের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে; চাঁপা ফুলের ঘ্রাণে ও বেহাগ রাগিণীর কথা মনে পড়ে; এই সম্বন্ধ নির্ণয় করা বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত, কিন্তু কবি তাহা ধরিয়া ফেলেন, জগতের এই লতাফুলপল্লব ও নরনারীচিত্র এক তুলির আলেখ্য; সেই একত্বের গন্ধ অনুভব করিতে মনের একটা শক্তি আছে, চক্ষু কর্ণের ন্যায় তাহার নাম নাই, সেই শক্তি উপমা যোজনায় ব্যক্ত হয়। বিদ্যাপতির এই ইন্দ্রিয় অতি তীক্ষ্ণ ছিল; বৈদ্য যেরূপ সতত উপেক্ষিত তৃণপল্লব হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কার করেন, বিদ্যাপতি ও সেইরূপ এই পৃথিবীর অতি সচরাচর দৃশ্য হইতে উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। উপমার যশঃ ভারতবর্ষে একমাত্র কালিদাসেরই একচেটিয়া, যদি দ্বিতীয় একজনকে কিছুভাগ দিতে আপত্তি না থাকে, তবে বোধ হয় বিদ্যাপতির নাম করা অসঙ্গত হইবে না। বিদ্যাপতির দ্বিতীয় শক্তি,—সৌন্দর্য্যের একটি পরিষ্কার চিত্র আঁকিয়া দেওয়া। বিদ্যাপতির বর্ণিত রাধিকা,—কতকগুলি চিত্রপটের সমষ্টি। বয়ঃ সন্ধির ছবিখানা এইরূপ,—

রাধা কখনও বালিকা-সুলভ উচ্চহাস্য হাসিয়া ফেলেন, কখন ও নবাগত যৌবনের ভাবে ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি চাপিয়া রাখেন। কখন ও চমকিত হইয়া পাদ-বিক্ষেপ করেন, কখন ও তাঁহার গতি যুবতীর ন্যায় মৃদুমন্দ; নিজের শরীরে আনত দৃষ্টি করিয়া কখন ও বিভোর হইয়া তাহাই দেখেন, কখন ও বা তাহা বস্ত্রে ঢাকিয়া রাখেন। প্রেম-বিহারের কথা শুনিলে চক্ষু মৃত্তিকার দিগে নত করিয়া একাগ্র কর্ণে তাহাই শুনিতে থাকেন; কেহ তাহা লক্ষ করিয়া প্রচার করিলে কান্না ও হাসি মিশাইয়া গালি দেন। আয়না সম্মুখে রাখিয়া চুলবন্ধনাদি করার সময় সখীগণকে চুপে চুপে প্রেম সম্বন্ধে প্রশ্ন

করেন ও হৃদয়ে প্রেমের ভাব উপস্থিত হইলে চক্ষু মুদিত করেন। রসের কথা শুনিলে সংগীত-মুগ্ধ হরিণীর ন্যায় সেই দিগে আকৃষ্ট হন।*

আর একখানি ছবি লজ্জার।

"একদিন একখানা ছোট কাপড় পরিয়া আলুথালু ভাবে বসিয়া আছি। অলক্ষ্যে কৃষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। শরীর একদিগ ঢাকিতে অন্যদিক মুক্ত হইয়া পড়ে। লজ্জায় ইচ্ছা হইল ধরণী ফাটিয়া যাউক তাহাতে প্রবিষ্ট হই * * * * *
কি বলিব সখি, আমার জীবন যৌবনে ধিক, আজ আমার মুক্ত অঙ্গ শ্রীহরি দেখিলেন।

এই লেখাগুলি তুলিতে আঁকা ছবির মত। সুন্দরীর নানা ভঙ্গীর ছবি দেখিয়া কবি ফটো তুলিয়াছেন; তুলি দ্বারা ফলিত বর্ণ মুছিয়া যায় কিন্তু লেখনীর আঁকা ছবি মোছে না; তাই ৫০০ শত বৎসর পরে ও এই নারী-চিত্র গুলি সদ্য প্রস্ফুট মালতীর ন্যায় স্পষ্ট রহিয়াছে। এই রাধা জয়দেবের রাধার ন্যায়—শরীরের ভাগ অধিক, হৃদয়ের ভাগ অল্প। কিন্তু বিরহে পৌঁছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাইয়াছেন, তথা হইতে কবি কপালে তিলক কাটিয়া বৈষ্ণবভক্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ফ্রেমে-বাঁধা বিলাসকলাময়ী নায়িকার চিত্রপটখানা সহসা সজীব রাধিকা হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার উপমা ও কবিতার সৌন্দর্য্য চক্ষের জলে ভিজিয়া নবলাবণ্য ধারণ করিল। বিরহ ও বিরহান্তর মিলন বর্ণনায় বিদ্যাপতি বৈষ্ণব-কবিদিগের অগ্রগণ্য। কেহ কেহ বলেন চণ্ডীদাসের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তাঁহার কবিতায় এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল।

শ্রীহরি মথুরায় যাইবেন শুনিয়া রাধা জ্ঞান-হীনা, কৃষ্ণ আসিলে তাঁহার হাত দুখানি সযত্নে মস্তকে ধারণ করিয়া যেন রাধা নীরবে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল "আমার মস্তকে হাত দিয়া বল, যাইবে না।" কৃষ্ণ সেইরূপ শপথই করিলেন, রাধা তাহাই বেদবাক্যের মত বিশ্বাস করিল। বিদ্যাপতি-বর্ণিত রাধিকা বড় সরলা, বড় অনভিজ্ঞা। কৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন, শুষ্ক ও শীর্ণ কুসুমকান্তি ভূতলে লুটাইতেছে, সখীগণ

---

* পাঠক মহাশয় উদ্ধৃত অংশের রুচি ক্ষমা করিবেন। রুচির অনুরোধে আমরা অনুবাদের অনেক স্থল একটু একটু কোমল করিয়াছি। নিখুঁত সুরুচিসম্পন্ন রচনা বিদ্যাপতির পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ-মিলন, মান, প্রেম-বৈচিত্র প্রভৃতি অধ্যায়ে একরূপ দুষ্প্রাপ্য।

কৃষ্ণ আসিবেন বলিয়া আশ্বাস দিতেছে, মৃত্যুশয্যায়শয়ানা কাতরে বলিতেছেন,—

চন্দ্র করে নলিনী লতা শুকাইয়া গেলে বসন্ত ঋতু আসিলেই বা কি হইবে ?

বাস্তবিক তখন ও তাঁহার সেই 'বিদলিত-নাল' নলিনী-লতার একই অবস্থা।

এই দুঃখের পরিসমাপ্তি সুখে। বিরহের দুঃখের পর মিলনের সুখ বর্ণনায় বিদ্যাপতির ন্যায় গাঢ় প্রেমের কথা পদ্য-সাহিত্যে অল্পই আছে। রাধিকা চন্দ্রকিরণে কোকিলের কুহুস্বরে পাগলিনী হইয়া ছিলেন,—এখন বলিতেছেন,—সেই কোকিল এখন লক্ষ ডাক ডাকুক, লক্ষ চাঁদ উদিত হউক, পাঁচটিফুলবাণের স্থলে লক্ষ ফুলবাণ নিক্ষিপ্ত হউক।

কৃষ্ণ আসিবেন—প্রাণবঁধুকে প্রণাম করিবেন, রাধা এই সুখের আশায় মুগ্ধা।

"কি কহ বরে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥"

প্রভৃতি পদের হর্ষে মহাপ্রভু পাগল হইয়া এক প্রহর কাল নৃত্য করিয়াছিলেন। "জনম অবধি" পদ বহুবার উদ্ধৃত হইয়াছে; এখানে আর উঠাইব না। ছবি-অঙ্কন-নিপুণ, প্রেমাহ্লাদ বর্ণনায় কৃতার্থ, উপমা ও পরিহাস রসিকতায় অত্যুৎকৃষ্ট বিদ্যাপতি অনেকগুলি স্বাভাবিক গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ পাঠক তাহার মনোমুগ্ধকর উপমা পড়িয়া প্রীত হইবেন, তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর পাঠক তাঁহার প্রেমের বিহ্বলতা ও গাঢ়তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রেমিক ও ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিবেন। কিন্তু আমরা বিদ্যাপতি হইতে বড়, খাঁটি প্রেমিক আড়ম্বর-হীন আর একটি কবির সন্নিহিত হইতেছি,—সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্য ঘাটিলে ও যাঁহার একটি অশ্রুর মূল্য হইবে না, যাঁহার কৃতিপয় অশ্রুজলসিক্তপদ কুসুমের সুরভির ন্যায় প্রকৃতি আপনা আপনি যার উদ্ঘাটন করিয়া প্রচার করিতেছে—শিক্ষার কর্ষন আবশ্যক হয় নাই;—যিনি গীতি কবিতার সরস অক্ষরে কণ্টকাকীর্ণ কুসুমের ন্যায় সুধা ও বিষ মিশ্রিত প্রেমের কথা গাঁথিয়া গিয়াছেন—কাব্যক্ষেত্রে সেই চণ্ডীদাসপ্রভু কর্ম্মক্ষেত্রে চৈতন্যপ্রভুর ন্যায় অন্য এক

প্রেমাবতার। বিদ্যাপতির কবিতা টীকা টিপ্পনী দিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু চণ্ডীদাসের পদ যিনি নিজে আস্বাদ করিতে না পারিবেন, তাঁহার কাছে পণ্ডিত হইলে বিদ্যাপতির কথায় বলা যাইতে পারে,—

"কাচ কাঞ্চন না জানয়ে মূল।
গুঞ্জা রতন করই সমতুল॥
যো কছু কভু নাহি কলা রস জান।
নীর ক্ষীর দুহুঁ করই সমান॥"

গ। চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ ১৩৮০ খৃঃ অব্দে নান্নুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেন্দুবিল্ব ও বিসপী হইতে নান্নুর বড় তীর্থ; চণ্ডীদাসের নিবাস-ভূমি পবিত্র নান্নুর-পল্লী এখনও আছে,—পাগল চণ্ডীর স্বর্গীয় অশ্রুসিক্ত পবিত্র বাশুলী দেবীর মন্দির এখনও আছে। সেই পল্লী ও মন্দিরের নিভৃত নিকেতনে প্রেমের যে মধুর মধুর লীলা হইয়াছিল,—এ জগতে তাহার তুলনা নাই; প্রেমিকের নিকট ক্ষুদ্র নান্নুর-পল্লী দ্বিতীয় বৃন্দাবন তুল্য সুদৃশ্য; কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতি-লেখকের স্মৃতি বহন করিতে সেই স্থানে কোন সমাধি স্তম্ভ নাই—এ আক্ষেপ আমাদের ইংরেজী শিক্ষার দরুণ হয়; নতুবা আমাদের দেশের লোক অন্যরূপে স্মৃতি রক্ষা করিতে অভ্যস্ত ছিল,—সমাধি-স্তম্ভ এদেশের সামগ্রী নহে; তাহারা ঘরে ঘরে মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিত, প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া পুণ্যশ্লোক মহাজনগণের নাম ভক্তিভরে উচ্চারণ করিত ও শিশুগণকে বলিতে শিখাইত।

পাঠক ক্ষমা করিবেন, ইতিহাসলেখকের স্বমতটি আড়ালে রাখিয়া বিষয়টি বর্ণনা করা উচিত, আমি সেই নিয়ম রক্ষা করিতে পারিতেছি না। একটী বিষয় বক্তব্য এই,—চণ্ডীদাসের কবিতার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট না হইলে আমি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য আলোচনা করিতাম না। সুতরাং তাঁহার কথা লিখিতে নানা অসম্বদ্ধ কথা আসিয়া পড়িতেছে।

নান্নুর বীরভূম জেলার অন্তর্গত,—সাঁকুলিপুর থানার অধীন, সিউরি হইতে পূর্ব্বাংশে ১২ ক্রোশ। বীরভূম জেলায় অনেকগুলি মুনির তপোবন আছে; বক্রেশ্বর আদি উষ্ণ প্রস্রবন, মৌরক্ষী, অজয়, সাল, হিংলা, দ্বারিকা প্রভৃতি নদ নদী পাহাড়ের সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া ছুটিয়াছে। বীরভূমের

বেলফুল বড় বড়, শ্রীমতীগোলাপসুন্দরীরা ও তাহাদের সৌন্দর্য্য, অবয়ব ও সুরভির নিকট লজ্জা পাইবেন। স্বভাবের সুরম্য নিকেতন বীরভূম—জয়দেব ও চণ্ডীদাসের জন্মভূমি। তাঁহাদের হৃদয় ও সেই বড় বড় বেল ফুলের ন্যায় সুন্দর ও বড় ছিল, ইতিহাস এ কথা স্বীকার করিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের পিতা 'বিশালাক্ষীদেবীর' পূজক ছিলেন, তজ্জন্যই বোধ হয় পুত্রের নাম 'চণ্ডীদাস' রাখা হইয়াছিল; এখনও নান্নুর গ্রামে বাশুলী-দেবী অধিষ্ঠিত আছেন ও তাঁহার পূজা নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। চণ্ডীদাসের পিতার মৃত্যুর পর তিনিও উক্ত দেবীর পূজক নিযুক্ত হন। উক্ত দেব-মন্দিরের সেবিকা রামমণি (নরহরির মতে তারা)* ধুবনী কবির হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রেম জাগাইয়া দিয়াছিল; এই সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প আছে; যাহা ঐতিহাসিক ভিত্তিতে দাঁড়াইতে না পারিবে, এরূপ অসার গল্প লিখিয়া পাঠকগণের মধ্যে এল্যানাস্কারের ন্যায় ভাবুক শ্রেণীর মনোরঞ্জন করিতে ইচ্ছা নাই; বিদ্যাপতির সম্বন্ধে ও এইরূপ অনেক গল্প পাঠ করা গিয়াছে।

রামীকে ভালবাসিয়া তিনি লোক লজ্জা ও লাঞ্ছনার একশেষ পাইয়াছিলেন, এরূপ অনেকগুলি পদে পাওয়া যায়। যাহা হউক এবিষয় লইয়া বিলম্ব করা প্রয়োজনীয় বোধ করি না। কালে চণ্ডীদাসের ভূপ্রোথিত ইতিহাস কেহ উত্তোলন করিতে পারিলে হীরা, চুনি, মুক্তা দিয়া তাহা খরিদের যোগ্য হইবে।

চণ্ডীদাসের বর্ণিত রাধিকাকে প্রথম যখন তিনি দেখাইতেছেন তখনই উন্মাদিনীর বেশ; প্রেমের হাওয়ায় তিনি ফুটিয়া রহিয়াছেন। স্বীয় নিবিড় কৃষ্ণ কুন্তল আহ্লাদে একবার খুলিতেছেন, একবার দেখিতেছেন,—তাহার মধ্যে কৃষ্ণরূপের মাধুরীটি আছে; করযোড়ে মেঘপানে তাকাইতেছেন, নয়নের তারা চলিতেছে না,—মেঘের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া পড়িতেছে,—কারণ কৃষ্ণের বর্ণ মেঘের ন্যায়; একদৃষ্টে তিনি ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠ দেখিতেছেন, সেখানেও চক্ষু কৃষ্ণরূপের অনুসন্ধান করিতেছে,—সব পরিচয় এইরূপ।

* শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু ভদ্র মহাশয়ের সংস্করণে চণ্ডীদাসের যে জীবনী প্রকৃত হইয়াছে তাহাতে ইহার নাম "রামতারা" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (৮৫ পৃঃ)। এই নামই বোধ হয় ঠিক, তাহা হইলে নরহরির 'তারা ধুবনী' বুঝিতে কোনও গোল হয় না।

তাহার পর প্রেমের বিহ্বলতা, কত বিনয়, কত অনুনয়, মধুমাখা ক্রোধ, সেই ক্রোধে কাঠিন্যমাত্র নাই, ফুলদলে সেই ক্রোধের স্ফূর্তি,—মানের পরই মানভঙ্গ, গালি দিয়া,—আঘাত করিবার চেষ্টা করিয়া নিজে আহত হইয়া আসা,—কত কাতর অশ্রুর সম্পাত, কত দুঃখের নিবেদন, কত কাতরোক্তি; প্রেম করিয়া লোক কত দুঃখী হয়,—বন্দরে যাইয়া যেন ডিঙ্গা মিলে না, সুরধুনী-তীর হইতে যেন শুষ্ককণ্ঠে ফিরিয়া আসিতে হয়,—সেই দুঃখ চণ্ডীর কবিতায় ছত্রে ছত্রে। তথাপি সেই কষ্টের মধ্যেই কষ্ট বহন করিবার যোগ্য উপকরণ আছে,—কষ্টের মধ্যেই কষ্টের ঔষধ সুখ আছে।

"যথা তথা যাই আমি যতদূর পাই।
চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই॥"

সেই চাঁদ মুখের কথা বলা যায় না। বলিতে গেলে সুখে দুঃখে সুধা বিষে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সেই অশ্রুতে সুখ দুঃখ জড়িত,—প্রভাত পদ্মের ন্যায় দুটি চক্ষু আলো পাইয়া জাগে, কিন্তু নৈশ-শিশির ভারাক্রান্ত হইয়া মলিন হয়,—কোন্‌টি পুলকাশ্রু কোন্‌টি শোকাশ্রু, কোন্‌টি প্রাতঃশিশির কোন্‌টি নৈশ-হিম-কণা তাহা নিশ্চয় বলা যায় না।

"গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি,
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে,
সব শ্যামময় দেখি॥
দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পুরয় তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥

তাঁহার প্রসঙ্গেই কাঁদিয়া ফেলেন, বড় সুখ হয়,—সে নাম শুনিতে বড় সুখ হয়, চক্ষে আপনিই জল পড়ে; আবার এই সুখ পাছে পরে দেখে,—পৃথিবী ত সুখের বাদী, গভীর সুখ পৃথিবী বোঝে না,—তাই নানাপ্রকারে সেই পুলক ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াও তাহা রোধ করা যায় না। এই সুখের মধ্যে ও বিষাদের ছায়া আছে, না হইলে সুখ অপূর্ব্বসুখ হইত না; না ভাঙ্গাইতেই ভাঙ্গিবার ভয়;—

"এ হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥"

ভালবাসার দুঃখের প্রতিশোধ,—অভিমান; কিন্তু তাহা আত্মবঞ্চনামাত্র—

"এক কর্ণ মনে আমি কৃষ্ণ নাম শুনব।
আর এক কর্ণ বলে আমি বধির হইয়া রব—ও নাম শুনব না।"

ইহাই চূড়ান্ত সীমা। চণ্ডীদাসের মান করিবার ও সাধ্য নাই; দশ ইন্দ্রিয় মুগ্ধ, মন মান করিবে কিরূপে? স্বীয় শরাসন মন্ত্রমুগ্ধ, শর নিক্ষেপ করা অসাধ্য,—

"যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়।
আন পথে ধাই তবু কাণু পথে যায়॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম।
যাঁর নাম নাহি লব লয় তার নাম॥
এ ছার নাসিকা মুঞি কত করু বন্ধ।
তবুত দারুণ নাশা পায় শ্যাম গন্ধ॥
সে কথা না শুনিব করি অনুমান।
পর সঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ॥
ধিক রহুঁ এ ছার ইন্দ্রিয় আদি সব।
সদা যে কালিয়া কাণু হয় অনুভব॥"

ইহা অপূর্ব্ব তন্ময়ত্ব।

আমরা চণ্ডীদাসের কবিতা বেশী উঠাইব না। যে পাঠক প্রেমিক তিনি হৃদয় নিভৃতে সেই পদ-কুসুমগুলি তুলিয়া অশ্রুসিক্ত করিয়া সুখী হউন। মিষ্ট দ্রব্যের যেরূপ স্বাদ ভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই, এই গীতিগুলির উৎকর্ষের ও পাঠ ভিন্ন অন্য প্রমাণ হইতে পারে না।

একটি কথা বলিয়া উপসংহার করিব, কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির যশে চণ্ডীদাসের যশ কিছু ঢাকা পড়িয়াছে। তাহা হওয়া বিচিত্র নহে, কালিদাসের যশে ভবভূতি ঢাকা পড়িয়াছেন, ভারতচন্দ্রের যশে কবিকঙ্কণ ঢাকা পড়িয়াছেন, কতক দিনের জন্য পোপের যশে সেক্ষপীয়র ঢাকা পড়িয়াছিলেন, চারু-চিত্রপটখানা দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হয়,—কিন্তু মানস সৌন্দর্য্য ও গরিমার পট সেরূপ সহজে আয়ত্ত হইবার বিষয় নহে।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ন্যায় শিক্ষিত ছিলেন না,—ইহাই সাধারণ মত। লেখা পড়া পুষ্পের ন্যায়, ফল জন্মিলে পুষ্পের বিলয় হয়; শাস্ত্র ভাব কি, ভক্তির নিকট পৌঁছাইতে চেষ্টা করে; যিনি নিজে ভাবুক বা ভক্ত তিনি শাস্ত্রের আয়নায় প্রতিবিম্বিত প্রকৃতির মূর্ত্তির প্রতি কেনই বা লক্ষ্য করিবেন;—প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ন্যায় উপমা প্রয়োগ করেন নাই,—সুন্দরের স্বভাব ভঙ্গীই গহনা হইতে বেশী আকর্ষক; উপমা কবির একটি শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া বর্ণিত আছে সত্য,—কিন্তু যিনি ভাবটি নিজের তুলিতে আঁকিতে পারেন না, তিনি উপমার অঙ্গুলী সঙ্কেতে গৌণবস্তু দ্বারা মুখ্য বস্তুর আভাস দিতে চেষ্টা করেন। তাই উপমার রূপ বর্ণনা হইতে জীবন আঁকিয়া

রূপ বর্ণনা উৎকৃষ্ট। এই অংশে কালিদাস হইতে সেক্‌পীয়র শ্রেষ্ঠ,—বিদ্যাপতি হইতে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ।

চণ্ডীদাসের দুএকটি গানে ভাগবত পড়ার আভাস আছে,—"কেহবা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে চুলাতে রাখিয়া বেসালি" প্রভৃতি পদ দেখুন।

৫। কাব্যেতিহাসের সূত্রপাত-শাখা।

ক। শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গল অথবা গৌড়-কাব্য।

খ। রাজ-মালা।

এই অধ্যায়াংশে বেশী কিছু লিখিবার নাই। মেদিনীপুর ময়নাগড়ে লাউসেন রাজার ভগ্ন-প্রাসাদের অবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। অজয়নদের তীরে ইছাই ঘোষের বাড়ীর রাশীকৃত ইষ্টকাবলী এখনও পড়িয়া আছে। এসব চাঁদসদাগরের নিবাস স্থানের ন্যায় কল্পিত রাজ্য নহে; গৌড়-ইতিহাসের প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজগণের সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই। পঞ্জিকায় কলিযুগের রাজচক্রবর্ত্তিগণের লিষ্টিতে লাউসেনের নাম দৃষ্ট হয়, হাণ্টার সাহেব তাঁহার 'এনালস্ অব রুরাল বেঙ্গল' নামক পুস্তকে ইছাই ঘোষের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই দুইটি ঐতিহাসিক বীরকে ধর্ম্মমঙ্গলকাব্য, কল্পনার গাঢ় তুহিনে আবৃত করিয়া উপস্থিত করিয়াছে;—কল্পনার নানাবিধ উজ্জ্বলবর্ণ-বিশিষ্ট কুয়াসার চাপে সত্যের জীবনটুকু একবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু তথাপি ইহার গোড়ায় একটুকু সত্য আছে, এই জন্য আমরা ইহা এই স্থানে সন্নিবিষ্ট করিলাম। প্রকৃতপক্ষে গৌড়ইতিহাস এখন আমরা যে অবস্থায় পাইতেছি, তাহা পদ্মপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যের মত। উহা আশ্রয় করিয়া কবিগণ চণ্ডীদেবীর বিজয়কেতু উত্থিত করিয়াছেন। প্রাচীনকালের দুইজন বীরকে প্রচলিত বিশ্বাস ও প্রবাদের থানা হইতে উত্তোলিত করিয়া শিব দুর্গার প্রিয়সেবকরূপে পরিণত করা হইয়াছে, সুতরাং এখনকার শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গলের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক অল্প।

হাকন্দপুরাণ নামক লুপ্ত গ্রন্থে এই ইতিহাসের প্রথম প্রচার হয় বলিয়া উল্লিখিত আছে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন বাঁকুড়ায় ময়ূর-ভট্ট প্রণীত গৌড়কাব্য এখনও প্রচলিত আছে,—ইহাই দ্বিতীয় গ্রন্থ,

আমরা তাহা পাই নাই। খেলারাম প্রণীত গ্রন্থই বোধ হয় ধর্ম্মমঙ্গলের তৃতীয় পুস্তক; শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় এই পুস্তকের উদ্ধার করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে পুস্তকখানা পাইয়াছেন তাহার শেষের অনেকাংশ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং দ্বিতীয় একখানা পুস্তক না পাওয়া পর্য্যন্ত খেলারামের কাব্য ছিন্নচিত্র কি ভগ্নবিগ্রহের ন্যায় ব্রিটিস মিউজিয়ামে রাখিবার যোগ্য হইবে।

খেলারামের পুস্তক ১৫২৭ খৃঃ অব্দে রচিত হয়; কবি তাহা নিম্নলিখিত পংক্তি কয়েকটীতে উল্লেখ করিয়াছেন;—

"ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।*
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন॥
হে ধর্ম্ম এ দাসের পুরাও মনস্কাম।
গৌড়কাব্য প্রকাশিতে মাকে খেলারাম॥
তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ পূর্ণ হয়।
অষ্ট মঙ্গলায় দিব আত্ম পরিচয়॥"

তাঁহার শেষ অধ্যায় (অষ্টমঙ্গলা) পাওয়া যায় নাই; সুতরাং আত্মবিবরণটি নষ্ট হইয়াছে। খেলারামের কবিতা সরল ও সরস; কিছু নমুনা এই;—

"স্থিত শৈলেশ্বর শিব বক্রের অঞ্চলে।
সুরম্য সরসী এক তার মাঝে বলে॥
কমল কুমুদ আদি নানা ফুল দল।
বিকশিয়া সুখে তার নীল উজ্জ্বল॥
শুন বাছা লাউসেন বলিয়ে তোমায়।
এইরূপ দিও, কেন্দ্রে জেগুন তলায়॥"

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, ময়ূরভট্টের পূর্ব্বে রূপরাম নামক আর একজন কবি ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য লিখিয়াছিলেন; কলিকাতার পশ্চিম ও দক্ষিণাংশে উক্ত পুস্তক এখনও প্রচলিত আছে। তাহা হইলে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতা কবিগণ সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য ঐক্য, এই ৪জন কবির মধ্যে ৩জনের নামেই 'রাম' আছে, যথা,—খেলারাম, রূপরাম, ঘনরাম।

খ। রাজ-মালা।

ত্রিপুরার মহারাজা ধর্ম্মমাণিক্যের সময় (১৪০৭-১৪৩৯ খৃঃ) রাজ-মালা বঙ্গীয় পদ্যে লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। ত্রিপুরার মহারাজগণ বঙ্গভাষার

---

* ভুবন=১৪; বায়ু=৪৯। শরের বাহন—বসু=পৌষমাস। ১৪৪৯ শক পৌষমাস। এইসব কবিতা শ্রীযুক্ত ভক্তিনিধি মহাশয় আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

কিরূপ উৎসাহ বর্দ্ধক ছিলেন ইহা আমরাই আতীরমান হইবে, প্রায় ৫০০ বৎসর গত হইল রাজসভায় বঙ্গভাষা গৃহীত হইয়াছিল। এসিয়াটিক সোসাইটির জারন্যালে একবার এই রাজমালার সারাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের অন্যান্য রাজাগণও যদি এই পথ অনুসরণ করিয়া স্বীয় বংশের ইতিহাস সংকলনে যত্নপর হইতেন, তবে বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের কল্পনার একটি বৃহৎ ক্রীড়াকাননে পরিণত হইত না। যে সময় রাজ-মালা রচিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় বংশাবলী স্বল্পায়তনে দেখান জন্য একটি সংক্ষিপ্ত রাজমালা ও প্রস্তুত হইয়াছিল—আমরা তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি,—

"যযাতি রাজার পুত্র দ্রুহ্যু নাম যার।
তান বংশে দৈত্য রাজা চন্দ্র বংশ সার॥
তাহান তনয় রাজা ত্রিপুর নাম ধর্ম্মে।
তস্য পত্নী গর্ভে ত্রিলোচন রাজা জন্মে॥
তাহান তনয় হৈল দক্ষিণ ভূপতি।
তস্য পুত্র তৈদক্ষিণ রাজা চারুমতি॥
তস্য পুত্র সুদক্ষিণ ছিল মহীপাল।
তান পুত্র হয় দক্ষিণ নৃপতি বিশাল॥
তস্য পুত্র ধর্ম্মতর রাজ-নীতি অতি।
তান পুত্র ধর্ম্মপাল হৈল নরপতি॥
তস্য পুত্র সুধর্ম্ম ছিলেন মহারাজা।
তান সুত তরঙ্গ সুখে পালে প্রজা॥
তস্য পুত্র দেবাঙ্গদ হইল মতিমান।
তান পুত্র নরাঙ্গিত নৃপতি আখ্যান॥"

ইহা বঙ্গে ইতিহাস লেখার সূত্রপাত। ইহার বিকাশ বৈষ্ণব-সাহিত্যের চৈতন্য-ভাগবতের ন্যায় ঘটনার উৎকৃষ্ট সমাবেশযুক্ত ইতিহাসে ও চরিতামৃতের ন্যায় অপূর্ব্ব ভক্তি-প্লুত দর্শনাত্মক ইতিহাসে দৃষ্ট হইবে। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় চরিত-শাখা মাত্র বিকাশ পাইয়াছে। রাজত্বের ইতিহাস কি রাজনীতির আলোচনা বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যে দুষ্প্রাপ্য; যাহা কিছু পাওয়া যায়,—রাজমালায়ই তাহার সুরু, রাজমালায়ই তাহার শেষ।

আমরা যে সব কবিগণকে গৌড়ীয়যুগ অথবা শ্রীচৈতন্য-পূর্ব্ব সাহিত্যের অন্তর্গত করিলাম তাঁহাদের কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যের সমকালিক হইয়া পড়িলেন। চৈতন্য প্রভুর পূর্ব্বে সাহিত্যের যে নানাবিধ উদ্যম হইতেছিল, আমরা এই অধ্যায়ে তাহার সুরু ও ক্রম-বিকাশ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যদিও উল্লিখিত কবিগণের মধ্যে কেহ কেহ চৈতন্য প্রভুর সময়ে আসিয়া পড়িলেন, তাঁহাদের কেহই তাঁহার প্রভাবান্বিত নহেন ও ইঁহাদের সময়ে ও চৈতন্য প্রভু অবতার বলিয়া সাধারণের নিকট গৃহীত হন নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত কবিগণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, এস্থলে তাঁহাদের সময় ও গ্রন্থাবলীর সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি,—

	নাম	কাব্য রচনার কাল	রচিত গ্রন্থের নাম।
১।	কৃত্তিবাস	১৩৮৫—১৩৯২ খৃঃ (কংস নারায়ণের কাল)	১। রামায়ণ, ২। শিব রামের যুদ্ধ, ৩। যোগধ্যার বন্দনা।
২।	সঞ্জয়	সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসের সমকালে।	মহাভারত।
৩।	বিদ্যাপতি	১৪৪৬—১৫০৬ খৃঃ,	১। পদাবলী, ২। পুরুষ পরীক্ষা, ৩। শৈব সর্ব্বস্বসার ৪। দানবাক্যাবলী, ৫। বিবাদসার ৬। গয়াপত্তন, ৭। গঙ্গাবাক্যাবলী, ৮। দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী। পদাবলী ছাড়া সবগুলি পুস্তকই সংস্কৃতে রচিত।
৪।	চণ্ডীদাস	১৪০৩ খৃঃ*	পদাবলী।
৫।	মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ)	১৪৭৩—১৪৮০ খৃঃ†	১। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়। ২। লক্ষ্মী চরিত্র।
৬।	কাণাহরিদত্ত	১৪৫০ খৃঃ অব্দ অথবা তন্নিকটবর্ত্তী কাল	পদ্মপুরাণ।
৭।	বিজয়গুপ্ত	১৪৭৮ খৃঃ‡ (ইনি হুসেন সাহের উল্লেখ করিয়াছেন।)	ঐ
৮।	নারায়ণদেব	সম্ভবতঃ বিজয় গুপ্তের স[illegible]।	ঐ

* "বিধুর নিকট নে[illegible]পঞ্চবাণ
নবহুঁ নবহুঁ রস, ইহু পরিমাণ।" চণ্ডীদাস।

† "তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হল সমাপন।।" শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।

‡ "ঋতু শূন্য বেদশশী পরিমিত শক।
সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক।" বিজয় গুপ্ত।

আমরা যে কারণে বিজয় গুপ্তকে আরও পূর্ব্ব সময়ের কবি মনে করি, তাহা নিশ্চিতরূপে স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত তারিখই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম।

৯। দ্বিজজনার্দ্দন——————ঐরূপ কোন সময়————মঙ্গলচণ্ডী উপাখ্যান।

১০। রতিদেব——————————ঐ——————মৃগলব্ধ।

১১। শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর পণ্ডিত—১৪০৭—১৪৩৯ খৃঃ——রাজমালা।

১২। খেলারাম——————১৫২৭ খৃঃ——————ধর্ম্মমঙ্গল অথবা গৌড়কাব্য।

১৩। কবীন্দ্র পরমেশ্বর————১৪৯৫—১৫২৬ খৃঃ———মহাভারত

(হুসেন সাহার সময়)

১৪। শ্রীকরনন্দী——————ঐ——————অশ্বমেধপর্ব্ব।

এই কবিগণের মধ্যে কবীন্দ্রপরমেশ্বর ও শ্রীকর-নন্দীর অনুবাদিত মহাভারত পরোক্ষভাবে সম্রাট হুসেন সাহারই উৎসাহের ফল; বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ ও বহুসংখ্যক বৈষ্ণব গ্রন্থে হুসেন সাহার যশ ও কীর্ত্তি বর্ণিত আছে। তিনি অন্যধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও হিন্দুদিগের প্রতি অত্যন্ত উদার ও বঙ্গভাষার উৎসাহবর্দ্ধক বলিয়া গণ্য ছিলেন। এই সম্রাটের নামানুসারে গৌড়ীয় যুগের মধ্যে এক খণ্ডযুগ চিহ্নিত করিয়া তাহাকে "হুসেনী সাহিত্যের কাল" আখ্যাদান করা অনুচিত হইবে না। উপরি উদ্ধৃত ১৪ জন কবির মধ্যে বিদ্যাপতি মিথিলা—বিসপীর, চণ্ডীদাস বীরভূম—নান্নুরের, খেলারাম সম্ভবতঃ হুগলী জেলার ও মালাধরবসু কুলীনগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। অবশিষ্ট ৯ জন পূর্ব্ববঙ্গের কবি। ইঁহাদের মধ্যে বিজয়গুপ্ত বরিশাল ফুলশ্রীগ্রামের, নারায়ণদেব ময়মনসিংহের, রাজমালালেখকগণ ত্রিপুরার এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর শ্রীকর-নন্দী, ও রতিদেব চট্টগ্রামের অধিবাসী। অপর দুইজনকে পূর্ব্ববঙ্গবাসী বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া গেল না। বঙ্গদেশের প্রত্যেক স্থলেই ভাষাকাব্য রচিত হইয়াছিল, কোন প্রদেশেই একবারে প্রতিভাশূন্য মরু ছিল না। আরণ্যকুসুম ও গ্রাম্যকবিতা সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধান হয় নাই, হইলে বহুকালের আবদ্ধ ধূসরবর্ণ তুলট কাগজের গোর হইতে আমরা প্রাচীন কবিগণের আরও কতগুলি কঙ্কাল উত্তোলন করিতে পারিব, কে বলিতে পারে?

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্মের উত্থানের নানাবিধ চেষ্টাই বঙ্গভাষা বিকাশের প্রথম এবং প্রধান কারণ। যে সে পুস্তক লিখিলেই তাহা সাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইত না। কেবল পুস্তকের বিষয় ধর্ম্মপ্রসঙ্গ

হওয়া আবশ্যক ছিল এমন নহে, প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত লেখক না হইলে কেহ প্রতিভাবলে কি শরীরের বলে দাঁড়াইতে পারিতেন না। এইজন্য প্রাচীন বঙ্গীয় লেখকগণের অনেককেই শঠতার সাধারণ মার্গ অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিতে হইত। দেবাদেশে কাব্য রচনায় হাত দিয়াছেন, একথা ঘোষণা করা সাহিত্যের ব্যবসাদারী ছিল। সমাজের শাসনে প্রতিভা স্বীয় শক্তিতে দাঁড়াইতে সাহসী হইত না। কৃত্তিবাস লিখিয়াছিলেন,—"কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে" তাঁহার সঙ্গে দল বাঁধিয়া অসংখ্য লেখক 'স্বপ্ন' কি 'বরের' দোহাই দিয়া কাব্যের মুখপাত আরম্ভ করিয়াছেন। 'কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলিন গ্রামে বাস। স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস।'—মালাধরবসু লিখিয়াছেন। 'বিজয় গুপ্ত রচে গীত মনসার বরে।'—ইহাঁর স্বপ্নের কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। 'পাঁচালী সঞ্জয় রচিল দেববলে।'—(বে, গ, পুঁথি ৪৫১ পত্র) সঞ্জয় লিখিয়াছেন। পরবর্ত্তীসময়ে কবি-কঙ্কণের "চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে" পদ সকলেই জানেন। কবি কৃষ্ণরাম স্বপ্নে ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণের রায়ের মারফৎ যে আদেশ পাইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাঁর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিলে পাঠকের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিত ও বাধ্য হইয়া কাব্যখানাকে ভাল বলিতে হয়। স্বপ্নে কবির নিকট আদেশ এই,—

"তোমার কবিতা যার মনে নাহি লাগে। সবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে।।"

কিন্তু এই স্বপ্নময় কবিতাকাননে ভারতচন্দ্রের স্থান সকলের উপরে; ভগবতী মজুমদারের নিকট ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন,—

"জ্ঞানবান হবে সেই আমার কৃপায়। সেই এই অষ্টমঙ্গলার অনুসারে।
এই গীত রচিবার স্বপ্ন কব তায়॥ অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে॥
কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে। ডিউসাঁই নীলমণি কণ্ঠআভরণ।
রায় গুণাকর নাম দিবেক তাহারে॥ এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন॥"

দেবীর অপার লীলাগুণে কাব্যের উৎপত্তি, বিকাশ ও গায়েন কর্ত্তৃক তৎপাঠ, সমস্তই স্বপ্ননিয়ন্ত্রিত।

পূর্ব্বোক্ত কবিগণের মধ্যে হয়ত চিন্তাধিক্যবশতঃ কেহ প্রকৃতই স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু এই তঞ্চকের দলে পতিত সত্যভাষী সাক্ষপক্ষীটি ও কুসঙ্গ হেতু বন্দী হইবেন ও মিথ্যুকের সাজা পাইবেন।

বঙ্গের বড় বড় কবিগণ ও স্বপ্ন কি দেবাদেশের কথা না বলিয়া কাব্য লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু বৈষ্ণবগণ প্রাচীন সংস্কারগুলি দলন

করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিভা সত্যের সরল পথ আবিষ্কার করিয়া স্বাধীনতার মুক্ত রাজ্যে বিহার করিয়াছিল। তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিনয়-মাখা; প্রত্যাদেশের ঝুঁট গিল্টি তাঁহারা দেখান নাই। ঐ সব আদেশগর্ব্বিত লেখকগণের সঙ্গে সাক্ষাতের পর নরোত্তম দাসের,—"শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ হৃদয়েতে ধরি। চৈতন্যের হাটে নিত্য ঝাড়ু গিরি করি।" বৃন্দাবন দাসের,—"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান।" কিম্বা কৃষ্ণ দাস কবিরাজের,—"মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়লালস। বৈষ্ণবাজ্ঞা বলি করি এতেক সাহস।" প্রভৃতি পড়িয়া দেখুন; সরল কথা আর ফুলমালা আপনিই সুরভিময়।

পঞ্চগৌড়ের বিষয় ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, এই পঞ্চগৌড়ের মধ্যে মিথিলাই বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। মিথিলার ভাষা 'ব্রিজবুলি' বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অধ্যায় গঠন করিয়াছে, মিথিলার সংস্কৃত টোল নবদ্বীপের শিক্ষা-গুরু, এসব ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। মৈথিল অক্ষর (তিরুটেঅক্ষর) বঙ্গদেশে গৃহীত হইয়াছিল।* মিথিলার পরে কান্যকুব্জ বঙ্গদেশের সভ্যতা-গঠনে সহায় করিয়াছে; কনোজ বঙ্গদেশকে পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থরূপ সুবর্ণমুষ্টি দান করেন; কিন্তু এই খানেইএ ঋণের শেষ নহে। 'পঞ্চালী' নামক গীত পঞ্চালেই (কনোজে) উদ্ভূত হওয়া সম্ভব; এই 'পঞ্চালী' গীতের আদর্শ লইয়া বঙ্গভাষার প্রথম গীতগুলি রচিত হইয়াছিল। সারস্বত প্রদেশের শকাব্দা বঙ্গদেশে গৃহীত হয়। এইরূপে দেখা যায় আর্য্যজাতির এই পঞ্চশাখা পূর্ব্বে সন্নিকটবর্ত্তী ছিল; ইঁহাদের সমস্তের ইতিহাস না জানিলে একশাখার উৎকৃষ্ট ইতিহাস লেখা সম্ভব হয় না। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে হিন্দুস্থানী, মৈথিলী, ও উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দের সঙ্গে বাঙ্গলা শব্দের ঐক্য দৃষ্ট হয়; ইহার কোন ভাষা অপর কোনটি হইতে উদ্ভূত হয় নাই,—কিন্তু একজাতির এই ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চ শাখা, সে সময়ে পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্ত্তী ছিল, এইজন্য এই সাদৃশ্য। আমি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের 'ব্রিজ-বুলি' চিহ্নিত অধ্যায়ের কথা বলিতেছি না; 'ব্রিজবুলি'

---

* ত্রিহুতের অক্ষরের একটী বিশেষ ভাব এই যে 'ব'এর নিচে সর্ব্বত্রই শূন্য আছে (See Grierson's Maithil Grammar J. A. S. Extra No. 1880) আমরা প্রাচীন অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথিতে 'ব'এর নিচে শূন্য এবং পেট কাটা 'ব' পাইয়াছি।

মৈথিলভাষার অনুকরণে বাঙ্গলায় মিশানো এক নূতন সৃষ্ট ভাষা,—উহা মনুষ্যের উক্তি নহে, লেখনীর উক্তি। বঙ্গসাহিত্যের ব্রিজবুলিচিহ্নিত অংশ বাদ দিলেও খাঁটি বাঙ্গলা যে সব পুস্তক আছে, তাহাতে হিন্দী, মৈথিল প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে সেকেলে বাঙ্গলার অধিকতর নৈকট্য দৃষ্ট হয়। নিম্নে কতকগুলি শব্দের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে ;—

মেত্রেন, জেত্রুকে, ভুখা, বহুয়া (বড়) পইতার (প্রত্যয় করে) সুবোধিয়া, সজলা, গোখড়ি, বামন (ব্রাহ্মণ) জোম, আকিরা, (মা, চ গা,) ; সাসিরাল, বাউরী মজাই, শিকাই, বড়ি (বড়), টুটি, পাকনা, কাড়ু, সোয়াস্তি (বিজয় গুপ্ত) ; বহিন, গুতিল, এড়া (কৃত্তিবাস) কয়ে, কৈনু, গেহা, খাইলু, শকুনিয়া, করিলেত, যায়ত, পড়িলেত, খাইবেত ইত্যাদি, মোহর (আমার) চাহসি, কহসি, করসি ইত্যাদি, নিয়ড়ে, কাহা (কোথায়), বুনি বন, বাও (বাতাস) খেলাও, এহি বিহা, চিহ্নি (চেনা) নিঁদ, কেহ্নে, পাকায় (সঞ্জয়, কবীন্দ্র, শ্রীকর-নন্দী প্রভৃতি) ইহা ছাড়া 'পরদেশক লাগিয়া' 'জলক লাগিয়া' (মা, চ, গা,) 'ঘরকে গমন' (কৃত্তিবাস) 'কাঁধকে রমাল' (শ্রীকৃষ্ণ বিজয়) প্রভৃতি পদেও হিন্দীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।*

শুধু ভাষার ঐক্য নহে, পরিচ্ছদাদিতেও উত্তর পশ্চিমের ভ্রাতাদের সঙ্গে তখন অধিকতর নৈকট্য ছিল ; বিজয় গুপ্তের বর্ণিত সিংহলরাজ চাঁদসদাগরের নিকট পট্টবস্ত্র পাইয়া তাহা বাঙ্গালীভাবে পরিতে শিখিতেছেন,— "একখান কাছিয়া পিন্ধে, আর একখান মাথায় বান্ধে, আর একখান দিল সর্ব্বগায়।" মা মরিয়াছেন খেতুরি রাজাকে বলিতেছে, 'কার জন্তে পাগড়ি রাখিছ মস্তকের উপর' মাণিক চাঁদের গানে (৩৫২ শ্লোক) এইসব বর্ণনায় মাল কোঁচা মারা পাগড়ি মাথায় ঠিক খোট্টার ছবিটি জাগিয়া উঠিতেছে ? 'লম্বোদর' 'নাভি সুগভীর' প্রভৃতি বর্ণনায় বোধ হয় খোট্টাদের মত বাঙ্গালীরা ও উন্মুক্ত উদর ও নাভি দেখাইয়া প্রশংসিত হইতেন। এইরূপ বস্ত্রপরিহিত

* উদ্ধৃত শব্দগুলির মধ্যে 'গুতিল' শব্দ এখনও মৈথিলভাষায় প্রচলিত আছে (See Grierson's Maithili Grammar J. A. S. Extra No. 1880) কয়ল, খোলেল প্রভৃতি উড়িয়া ভাষায় ব্যবহৃত হয় ; 'শকুনিয়া', প্রভৃতি শব্দ হিন্দীর অনুরূপ ; এস্থলে বলা যাইতে পারে সম্ভবতঃ খোট্টার মুখে বল্লালদিগের নাম 'লক্ষনিয়া' শুনিয়া আবুল ফজেল যে নাম লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে 'লাক্ষ্মণেয়', নাম ব্যাকরণের সাহায্যে সৃষ্ট হইয়া বঙ্গইতিহাসে প্রচলিত হইয়াছে। আমরা উদ্ধৃত শব্দ সংগ্রহে চণ্ডীদাস কি অন্য কোন ব্রিজবুলি-অধিকৃত লেখকের সাহায্য গ্রহণ করি নাই।

স্বামীর পার্শ্বে কাঁচুলিআঁটা রমণীই শোভা পায়, প্রত্যুত বাঙ্গালী নারীর পরিচ্ছদও খোট্টারদোকানে ক্রীত।—স্ত্রীলোকের কাঁচুলি পরার রীতি কৃত্তিবাস, গুণরাজ খাঁ, বিজয় গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাস হইতে আরম্ভ করিয়া কবিকঙ্কণ প্রভৃতি অনেক কবিই বর্ণন করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজের সময়ও এ রীতি একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছিল না;—"রাজ্ঞী ও রাজবধূ ও রাজকন্যারা কার্পাস বা কোষের শাটি পরিতেন, কিন্তু প্রায় সমস্ত শুভ কর্ম্মোপলক্ষে পশ্চিমোত্তর দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের ন্যায় কাঁচুলি, ঘাগরা ও ওড়না পরিধান করিতেন। (ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত ৩৫ পৃঃ) আমরা বৈষ্ণব কবির পদেও পাইয়াছি—"নীল ওড়ণার মাঝে মুখ শোভা করে। সোণার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে।" (প ক, ত, ১৩৭৭) এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে,—"কটি তটে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ভাল সাজে। রতন মঞ্জরী রাঙ্গা চরণেতে সাজে।" এইসব নরনারীগণ যে দুএকটি হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিবেন কিম্বা ব্রজবুলীর ন্যায় অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি করিয়া পদ্য লিখিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে?

উড়িয়া, মান্দ্রাজী, এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন দেশের অধিবাসীর ন্যায় বাঙ্গালী পুরুষগণও পূর্ব্বে দীর্ঘকেশ রক্ষা করিতেন; তাঁহারা দীর্ঘকেশ বাঁধিয়া রাখিতেন এবং কখনও তদ্দ্বারা বেণী গ্রথিত করিতেন; রাধার সখীগণ শ্রীশ্যাম চাঁদকে বলিতেছেন,—"আজি কেন পিঠে দোলে বেণী।" (চণ্ডীদাস) শ্রীচৈতন্য দেবের কেশ মুণ্ডনের সময় শিষ্যগণ বিলাপ করিতেছে,—"কেহ বলে না দেখিয়া সে কেশ বন্ধন। যেমতে রহিবে এই পাপিষ্ঠ জীবন॥ কেহ বলে সে সুন্দর কেশে আরবার। আমলকী দিয়া কিবা করিব সংস্কার॥" (চৈ, ভা. মধ্যম খণ্ড) "গলায় রামের সৈন্ত নাহি বাঁধে কেশ।" (কৃত্তিবাস) "পরম সুন্দর আলাইর দীর্ঘ মাথার চুল। জ্ঞাতিগণ ধরি দিল গান্ধুড়ির ফুল॥" (বিজয় গুপ্ত।)

শুধু ভাষা ও পরিচ্ছদাদিতে নহে, আহারে ব্যবহারেও সেই নিকটবর্ত্তিতা প্রতীয়মান হইবে। ভারত চন্দ্র মহাদেবের মুখে প্রচার করিয়াছেন,—"ক্ষুধে কুসুম্ভায় আজি হয়েছে বাসনা।" বঙ্গবাসীর সংস্করণের বিস্তৃত টীকায় এই 'কুসুম্ভার' অর্থ লেখা হইয়াছে, 'একরূপ সামগ্রী'। এখন বাঙ্গালীর 'কুসুম্ভা' অর্থ জ্ঞাত হওয়ার সুবিধা নাই, কিন্তু রাজপুতনা এবং অন্যান্য নিকটবর্ত্তী প্রদেশে এই 'কুসুম্ভা' ভক্ষণ এখনও একটি বিশেষ আমোদজনক ব্যাপার; উহা আফিঙ্গের দ্বারা প্রস্তুত হয় এবং কুসুম্ভা ভক্ষণের জন্য নিমন্ত্রণ একটা উৎসবরূপে গণ্য হয়। এইরূপ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের নানা পার্শ্ব হইতে উত্তরপশ্চিমবাসীদিগের সঙ্গে আমাদের নিকট সম্বন্ধের সাক্ষ্য পাওয়া

যায়। খোট্টা, মৈথিল, উড়িয়া, বাঙ্গালী—এক বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা, ক্রমে শাখাগুলি ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছে; ভাষাও সাহিত্যের মানচিত্রে এই ক্রম দূরবর্ত্তিতার চিত্র চিত্রিত আছে, তদ্দৃষ্টে লুপ্তপ্রায় সম্বন্ধের স্মৃতি জাগরিত হয় এবং মনে অপূর্ব্ব আনন্দ বোধ হয়।

বঙ্গদেশে সমাগত আর্য্যজাতির শাখা আবার দুই উপশাখায় বিভক্ত হইল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ভাষা এখন যত দূরবর্ত্তী, পূর্ব্বে তত দূর ছিল না। পূর্ব্ব এক অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, 'করিমু' ও 'করিবু' এই দুইরূপ ক্রিয়ার ব্যবহারই প্রাচীন সাহিত্যে দৃষ্ট হয়; ডাকের বচনে 'করিবু' ক্রিয়া পাওয়া গিয়াছে; মাণিক চাঁদের গানে ও সেরূপ ক্রিয়া অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়,—"ফুল গোঁঠেকে দেখিয়া ফুল না পাড়িবু। পাখী গোঠেক দেখিয়া ডিমা না মারিবু। পরার স্ত্রী দেখিয়া হাস্য না করিবু॥" (৫৩৩ শ্লোক) "তুমি হবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা। রাঙ্গা চরণ বেড়িয়া লবু পলায়ে যাবু কোথা॥ (১৭৩ শ্লোক) পশ্চিম-বঙ্গের সাহিত্যে 'করিমু' প্রভৃতি ক্রিয়ার বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়,—

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তয়িমু নাম সংকীর্ত্তন। ভক্তি দিয়া নাচায়িমু ভুবন॥ আপনি করিমু ভক্তি অঙ্গীকার। আপনি আচারি ভক্তি শিখামু সবার॥" চৈ, চ, আদি ৩য় পরিচ্ছেদ।

চণ্ডীদাস ও গুণরাজ খাঁ ও এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই দুইরূপ ক্রিয়াই পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল কিন্তু বোধ হয় কালে 'করিমু' হইতে 'করিবু' ক্রিয়ার সাপক্ষে পশ্চিম বঙ্গের রুচি প্রবল হইয়া গেল, করিব (কর্ম্ম) 'খাব' 'যাব', ইত্যাদির প্রচলন হইল। পূর্ব্ববঙ্গে 'করিমু' 'করুম' ইত্যাদি রূপ গৃহীত হইয়া প্রচলিত হইল; কিন্তু উক্ত প্রদেশের নিতান্ত মফস্বলে 'করিবাম', 'খাইবাম' ইত্যাদিরূপ ও লক্ষিত হয়। নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণের উদ্ধৃতাংশে সেইরূপ ক্রিয়ার প্রয়োগ দৃষ্ট হইবে। পশ্চিমবঙ্গেও যে কোনকালে সেইরূপ ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল তাহার আভাস আছে। 'করিবাঙ' 'যাইবাঙ' 'বলিবাঙ' প্রভৃতি শব্দ চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি পুস্তকে প্রায়ই দৃষ্ট হয়। কেতকা-দাস ও ক্ষেমানন্দ পশ্চিম বঙ্গের লেখক বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, উক্ত দুই গ্রন্থকারকৃত মনসার ভাষা হইতে একটি ছত্র উঠাইতেছি,—

"অবলা বলেন আমি দিবাম এই বর। সাত ডিঙ্গার ধন হয়ে চৌদ্দ ডিঙ্গা ভর॥" কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দের ভাসান আপার চিৎপুর রোড, ২৮৫ সংখ্যক বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। পৃঃ ৩৫।

পূর্ব্ববঙ্গ-প্রচলিত 'আছিল' শব্দ পশ্চিমের অনেক পুঁথিতেই পাওয়া যায়; সুতরাং এইসব ক্রিয়াপদগুলি পূর্ব্বকালে বঙ্গের দুই অংশেই কতক

পরিমাণে প্রচলিত ছিল; কালক্রমে কিছু কিছু রূপান্তরিত হইয়া শব্দগুলি এক এক আকারে এক এক স্থানে বদ্ধমূল হইয়াছে।

করসি, করেন্ত, বোলেন্ত ইত্যাদি ক্রিয়া পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়; পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন পুঁথিতে ও সেরূপ ক্রিয়া একবারে দুষ্প্রাপ্য নহে; আমরা শ্রীকৃষ্ণবিজয় হইতে পিবন্তি, চৈতন্য চরিতামৃত হইতে যান্তি ও ডাকের বচন হইতে খায়সি, পূজসি প্রভৃতি ক্রিয়ার উদাহরণ দিয়াছি। (১৩,৪০পৃষ্ঠা) অন্যান্য শব্দের আলোচনা করিলে দেখা যায়, পূর্ব্ববঙ্গের অনেক গুলি শব্দই কতক পরিমাণে প্রাচীন রূপ রক্ষা করিয়াছে; প্রাকৃতের 'ও'—(ओ)-প্রিয়তা পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুঁথি গুলিতে দৃষ্ট হয়, যথা:—

শব্দ		পূর্ব্ববঙ্গের পুঁথিতে প্রাপ্ত রূপ।	শব্দ		পূর্ব্ববঙ্গের পুঁথিতে প্রাপ্ত রূপ।
মা ...	(মাতা) ...	মাও।	গাঁ ...	(গ্রাম) ...	গাঁও।
পা ...	(পদ) ...	পাও।	ছা ...	(ছানা) ...	ছাও।
ঘা ...	(ঘাত) ...	ঘাও।	দা ...	... ...	দাও।
না ...	(নৌকা) ...	নাও।	ভাব ...	... ...	ভাও।
রা ...	(রব) ...	রাও।	বা ...	(বাত) ...	বাও।
গা ...	(গাত্র) ...	গাও।	তা ...	(তাপ) ...	তাও।

এই সব শব্দের কোন কোনটি পশ্চিমের প্রাচীন পুঁথিতে ও পাওয়া যায়, যথা—'নাট গীত সুখে যায়, রূপার দোলায় ফেলায় পাও। (খনা।)

প্রাচীন সাহিত্য পাঠে বঙ্গবাসীদিগের সঙ্গে উত্তরপশ্চিমের শাখাগুলির ও পূর্ব্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের উপশাখাদ্বয়ের বর্ত্তমান সময়াপেক্ষা অধিকতর নিকট সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই দূরবর্ত্তিতা যদি ক্রমে প্রসারিত হইতে থাকে, তবে কালে আমরা সম্পূর্ণ পৃথক জাতির ন্যায় হইয়া দাঁড়াইতে পারি। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে বিবাহাদি বন্ধন দ্বারা এক জাতীয়তা ও একভাষা রক্ষিত থাকা সম্ভব, কিন্তু অন্যান্য দেশের সঙ্গে সেরূপ সামাজিক বন্ধন রোধ হইয়া যাওয়াতে আশঙ্কার কারণ না আছে, এমত নহে। এই বিচ্ছিন্নতাগ্রস্ত জাতীয় জীবনের একমাত্র আশা— সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন; সেই শাস্ত্র হস্তে লইয়া উড়িয়া, খোট্টা, মৈথিল,— পঞ্চগৌড় ছাড়িয়া—পঞ্চদ্রাবিড়ের সঙ্গেও আমরা একতা সূত্রে বদ্ধ হইতে পারি। পূর্ব্ব-পুরুষদিগের প্রসঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন জাগরিত হয়,—বহু এক হইয়া যায়।

'বৌদ্ধ যুগ' অধ্যায়ের রচনায় সংস্কৃতের প্রভাব চিহ্ন নাই। এই অধ্যায়ের সাহিত্য অনেকটা মার্জ্জিত, সংস্কৃতের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে চেষ্টিত। মানিকচাঁদের গানে বর্ণিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের যে কয়েকটি নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃতের সংস্রব-রহিত, যথা—অদুনা, পদুনা, খেতুরি, মেনা, ময়নামতি। চণ্ডীদাস শ্যামলা, বিমলা, মঙ্গলা ও অবলা, শ্রীরাধার প্রতিবেশিনী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এসব নাম সংস্কৃতের মত। কিন্তু বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে সংস্কৃত ও অসংস্কৃত নাম উভয়ই পাওয়া যায়,—লখিন্দরের বিবাহ বাসরে এয়োগণের কতকগুলি নাম সংস্কৃত ভাবাপন্ন, যথা—কমলা, বিমলা, ভানুমতি. রোহিণী রমণী, তারাবতী, সুনন্দা, সুভদ্রা, রুক্মিণী, তিলোত্তমা, সরস্বতী, চন্দ্ররেখা, কৌশল্যা. কুমারী, বামা, চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্ররেখা, দুর্লভা, অনুপমা, রত্নমালা, জাহ্নবী. চন্দ্রকলা, রঙ্গিণী, মলয়মালা, জয়মালা, বিজয়া, ভবানী, শিবানী, মাধবী, মালতী, বগলা, সরলা। কিন্তু তখন ও অসংস্কৃত প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই, অন্যান্য এয়োগণের নাম ও গুণরাশি উভয়ই হাস্যোদ্দীপক—উদ্ধৃতাংশের মধ্যে মধ্যে দু একটী সংস্কৃত নাম আছে,—একজন এয়ো আইল তার নাম রাধা। ঘরে আছে স্বামী তার যেন পোষা গাধা।। আর এক এয়ো আইল তার নাম রাই। মস্তকে আছয়ে তার চুল গাছ দুই।। আর এক এয়ো আইল তার নাম সরু। গোয়াল ঘরে ধোঁয়া দিতে খোঁপা খাইল গরু।। আর এয়ো আইল তার নাম কুই। দুই গালে ধরে তার শুদ মণ দুই।। আর এক এয়ো আইল তার নাম শশী। মুখে নাই দন্ত গোটা ওষ্ঠে দিয়ে মিশি।। আর এক এয়ো আইল তার নাম আই। দুই গাল চওড়া চওড়া নাকের উদ্দেশ নাই।। আর এক এয়ো আইল তার নাম চুয়া। ঘর হৈতে বাহিরিতে শিরে ধরে টুয়া"।। (বিজয় গুপ্ত)। বেহুলা, লখাই, নেড়া, সমাইওকা, সয়েবেণে, ফুল্লরা, খুল্লনা এসব নাম ও সংস্কৃতের মত নহে। 'বেহুলা' বিপুলার অপভ্রংশ হইতে পারে, কারণ প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে বেহুলার স্থলে বিপুলা পাওয়া যায়; কিন্তু অন্য নামগুলি সংস্কৃতভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয় না। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ফুল্লরা, খুল্লনা প্রভৃতি শব্দ ও সংস্কৃতের সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন;* পাণ্ডিত্য বলে অপরাজিতাকেও পারিজাত প্রমাণ করা যাইতে পারে—সেই ব্যাখ্যা অসঙ্গত না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে হৃদবোধ হয় না। কুলজি গ্রন্থগুলি অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে ১৯। ২০ পুরুষ পূর্ব্বে অধিকাংশ নামই অসংস্কৃত ছিল; এখনও

† বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ১০৭পৃঃ।

বহুসংখ্যক প্রাচীন গ্রামের নামের সঙ্গে সংস্কৃতের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। সে গুলি বৌদ্ধাধিকার ও প্রাকৃতিক যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; এই অধ্যায়-বর্ণিত-সাহিত্যে সংস্কৃতের দিকে রুচি প্রবল লক্ষিত হয়; অনুবাদগ্রন্থ ও সংস্কৃতের অনুশীলন দ্বারা প্রাকৃতের আবর্জ্জনা মার্জ্জিত হওয়ার চেষ্টা আরম্ভ হইল; কিন্তু তখনও বঙ্গগৃহের মনোমোহিনীগণের নাম 'ছুই' 'রুই' 'কুই' 'আই' প্রদত্ত হইত। এখন সংস্কৃতের পূর্ণ আধিপত্যের কালে কোনও ললনার এবম্বিধ নামাকরণ করিলে তাহার বিবাহ ঘটা—ও বিবাহান্তে সুরুচিসম্পন্ন স্বামীর পত্র লেখা উভয়ই কৃচ্ছ্রসাধ্য হইবে। কবিকঙ্কণের সময় তাবার কলুষ সম্পূর্ণরূপে নাশ হইয়াছে, এয়োগণের নাম সমস্তই সংস্কৃত—এবং বৈষ্ণবাধিকারের প্রভাব ব্যঞ্জক। যথা,—বিমলা, চাঁপা, কমলা, ভারতী, পার্ব্বতী, সুবর্ণরেখা, লক্ষ্মী, পদ্মাবতী, বল্লভা, দুর্ব্বা, রম্ভা, সুভদ্রা, যমুনা, চরিত্রা, তুলসী, শচী, রাণী, সুলোচনা, হীরা, তারা, সরস্বতী, মদন-সুন্দরী, চিত্ররেখা, সুধা, রাধা, দয়া, মন্দোদরী, কৌশল্যা, বিজয়া, গৌরী, সুমিত্রা, যশোদা, রোহিণী, রাধা, কাদম্বরী।

এই অধ্যায়ের আলোচিত পুস্তকগুলিতে আমরা নানারূপ শব্দ পাইয়াছি, তাহাদের কতকগুলি প্রচলিত নাই; কতকগুলি ভিন্নার্থ পরিগ্রহ করিয়াছে; ৪র্থ অধ্যায়োক্ত শব্দগুলির ও কতক এই সর্গের সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, অন্যান্য শব্দ কয়েকটী দেওয়া যাইতেছে।*

বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে—ভোল—বিভোর (অতিকামে হৈয়া ভোল। শ্রীফল পাছে দিল কোল।) আসোয়াস্থ—অসুস্থ; আগল—দক্ষ, অগ্রসর; শাসিয়াল—তেজস্বী (শাসিয়াল যর তুমি বিবাদে আগল) চোপা—মুখ; উদাসিনী—অনাথা (শিবের কুমারী আমি উদাসিনী নহি;) নবগুণ—নগুণ, উপবীত; (দন্ত-ভ্রূকুটী করে, নবগুণ তুলি ধরে) সম্বিধান,—অবধান, মনোযোগ; খিটে—খুঁটিয়া তোলা; ছামনিতে—সম্মুখে; বড়ি—বড়; ধাই—মাতা; মাই—মাতা; অর্থান্তর—চেষ্টা, শ্রম, বিপদ (বহু অর্থান্তর সেই পুষ্পের কারণ); মেলানি—বিদায়; গোহারি—কাতর প্রার্থনা; বাহুড়িয়া—ফিরিয়া; পাকনা—পক্ব; পাঁচে—চিন্তা করে; আচাভুয়া—নির্ব্বোধ; ঠান—ভাব; সহিলা ও সইলা—সখীত্ব; † ভাণ্ডালে—ভাঁড়ালে; পরিপাটী—কারিগরী (কার সাধ্য বুঝিতে পারে দেবের পরিপাটী) টনক—শক্ত (টনক করি ধরি মুখে দিল এক মুঠ)

---

* আমরা উদ্ধৃত শব্দের অধিকাংশই ষষ্ঠ অধ্যায়-বর্ণিত প্রায় তাবত কাব্যেই পাইয়াছি, একাধিকবার তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বিধায় কেবল এক কবির নাম নির্দ্দেশ করিলাম।

† বোধ হয় এই সহিলা ও সইলা হইতে 'সল্লা' (পরামর্শ) শব্দ আসিয়াছে।

সোসর—তুল্য; ভেজেলা—হৃষ্টপুষ্ট; অবস্থা—কষ্ট, সম্ভাবনা—সম্পত্তি; (সম্ভাবনা কেবল ধনদ।) সুজীত—শ্রীযুত, সানে—ইঙ্গিতে, (হাত সানে বলে সবে মিলিটেক খাও) তিতা—আর্দ্র *কৃত্তিবাসী রামায়ণে,—সন্তোক—যৌতুক, নিবড়ে—অতীতে, ভোকে—ক্ষুধায় লোহ—অশ্রু, ওর—সীমা, রড়—দৌড় কোঙর—পুত্র। সঞ্জয়কৃত মহাভারতে,—আক্ষি—আমি, তুক্ষি—তুমি, মোহর—আমার, সমাইরে—সকলকে, আগুয়াণ—অগ্রসর, সুসারিত—শ্রেষ্ঠ, যুয়ায়—যোগ্য হয়, কেনি—কেন, পুনি পুন, বিনি—বিনে, খেরি—খেলা, হনে—হইতে, আপু—আপন। কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দীর অনুবাদে,—সম্ভ্রম—ভয়, সন্ধিধান—মনোযোগ, সমে—সহিত, ("গুণ সমে কাটি পড়ে হাতের কোদণ্ড"—শ্রীকর নন্দী), পাড়িমু—ফেলাইব ("ভীষ্ম দ্রোণ কাটিয়া পাড়িমু রথ হৈতে," কবীন্দ্র), উপালন্ত—উপর। নারায়ণদেবের পদ্মপুরাণে,—খাখার—অপযশ, একেশ্বর—একাকী, কথা—কোথায়, এড়িয়া—ত্যাগ করিয়া। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে,—† চেটোনেটো—অল্প বয়স্ক বউগণ, টীট‡—ধূর্ত্ত, অখলা—সরলা, উতরোল—উৎকুণ্ঠিত, ভালে—ভাগ্যে, ("ভালে সে নাগরী, হয়েছে পাগলী") আরন্ত—হরিদ্রা, বড়ু—ব্রাহ্মণ পুত্র, (কিন্তু বটু শব্দের অপভ্রংশ হইলে ছাত্র), দে—দেহ, টাগ—কথা, আকুতে—আগ্রহে, লেহ—স্নেহ, ওদন—অন্ন, গতায়তি—যাতায়ত। পরিবাদ—নিন্দা। রাঢ়দেশপ্রচলিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় রেড়ো শব্দ বহুল; ক্ষীরোদ বাবু সাহিত্য পত্রিকার যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন,—(সাহিত্য ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা), তাহাতে সাছ (বোধ হয় আরোগ্য), রাকাড়ে—শব্দে, আউদর—এলোথেলো, গোকান—পুত্র,—

* চৈতন্ত ভাগবতে ও তিতা শব্দ আর্দ্র অর্থে ব্যবহৃত পাইয়াছি, যথা স্নানান্তে "তিতা বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচী নন্দন।" (মধ্যম খণ্ড) আরও কয়েক স্থলে এরূপ পাওয়া গিয়াছে। এই "তিতা" র ক্রিয়া—'তিতিল' (সিক্ত হইল) সচরাচরই দৃষ্ট হয়। সুতরাং 'তিতা' শব্দের সঙ্গে 'তিক্ত' শব্দের সংশ্রব লক্ষিত হয় না, উহা সিক্ত শব্দের অপভ্রংশের স্থায় বোধ হয়। কিন্তু চণ্ডীদাসের "তিতা কৈল দেহ মোর ননদী বচনে" পদে তিতা শব্দ তিক্তের অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

† এস্থলে হিন্দী ভাবাপন্ন শব্দ উদ্ধৃত হইল না।

‡ এই 'টীট' শব্দ গোবিন্দ দাসের পদে (প, ক, ত,—৬২৫ নং) বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে, বিদ্যাপতির পদাবলীতে (জগবন্ধু বাবুর সংস্করণ ৭৭পৃঃ) কবি আলোয়ালকৃত পদ্মাবতীতে ("কোথাতে আছিল দেখি হেন যোগী টীট" ৯৬ পৃঃ) অন্যান্য পুস্তকে পাইয়াছি; বোধ হয় এই শব্দ হইতে 'টীটকারি' 'টীটপনা' ও "টেটন" প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে, কিন্তু মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ কোন কোন স্থলে 'ট' এর টান ভুলক্রমে পড়িয়া যাওয়াতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কোন কোন নূতন সংস্করণে 'টীট' শব্দ স্থলে 'ঢীট' প্রযুক্ত হইয়াছে।

প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়; সম্ভবতঃ এগুলি কবি নিজে ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের হস্তলিখিত ২৫০ বৎসরের প্রাচীন শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে ঐসব শব্দ নাই, পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন লেখকগণকে পূর্ব্ববঙ্গের লোকগণ নিজদের সুবিধার জন্য কতকটা বাঙ্গাল করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু মিথিলার বিদ্যাপতি বঙ্গদেশে যতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন, উঁহারা ততদূর হন নাই।

পূর্ব্বোক্ত শব্দগুলি ছাড়া,—কাটিণী—খড়ি, সমাধান—সেবা, বুলে—অনুসন্ধান করে সাবহিতে—সাবধানে, সারি—নিন্দাবাদ প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। বিজয় গুপ্তের পদ্ম-পুরাণে 'বাপু' শব্দ সর্ব্বত্রই সন্তান কর্ত্তৃক পিতার প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা (শিবের প্রতি পদ্মা)—"পদ্মা বলে বাপু তুমি সংসারের সার। ঝির অপমান বাপু না দেখ একবার।। ধন্বন্তরীর প্রতি শিষ্যগণ,—"শিষ্যসব বলে বাপু এ কোন বিধান। কার হাতে পাইলা বাপু হেন অপমান।।" বেহুলা পিতার প্রতি,—"বেহুলা বলেন বাপু শুন নিবেদন। স্বপ্ন দেখিয়া আমি করেছি রোদন।।" এখনকার ঐতিহাসিক উপ-হাসের লক্ষ্য 'বাবু' বোধ হয় এই 'বাপু' শব্দেরই অপভ্রংশ হইবেন। ত্রিপুরা জেলার উজানচর নামক স্থানে 'মা' কে 'মাইঞা' বলিয়া থাকে, আমরা এই অধ্যায়ে 'মাই' শব্দ পাইয়াছি; এই 'মাই' ও 'মাইঞা' হইতে বোধ হয় কন্যা বোধক 'মেয়ে' শব্দ আগত হইয়াছে। 'বাপু' ও 'মেয়ে' শব্দ একই কারণে অপত্যার্থে পরিণত হইয়াছে; পূর্ব্বে উহারা পিতৃ মাতৃ বোধক ছিল। 'লোকগুটি' 'বানগোটা' প্রভৃতি ভাবে 'গুটি' ও 'গোটা' অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়,—'লোকটি', 'বানটা' বোধ হয় এই ভাবে উৎপন্ন।

বিভক্তি সম্বন্ধে এই প্রাচীন সাহিত্যের জঙ্গল হইতে সাধারণ নিয়মের মত কোন পরিষ্কার বস্তু উদ্ধার করা বড়ই দুরূহ। এখনও বঙ্গদেশের নানা প্রদেশে নানারূপ বিভক্তি কথায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু রচনার জন্য একমাত্র নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সময় প্রাদেশিক বিভিন্নতা দূর করা ও ভাষার একীকরণ জন্য কোন সাধরণ সূত্র নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; নানারূপ অসম উপাদান হইতে সমভাব সূত্র সঙ্কলন করা ব্যাকরণের কাজ,—বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ইংরেজাধিকারে সঙ্কলিত হইয়াছে; সুতরাং এই সময়ের বহু পরে ও বিভিন্নরূপ বিভক্তি ও ক্রিয়া প্রচলিত ছিল। আমরা এই অধ্যায়ে,—

পুষ্করিণী হনে (ও হন্তে)—পুষ্করিণী হইতে, বিষ্ণুক উদ্দেশে—বিষ্ণুর উদ্দেশে, ভক্তিএ—ভক্তিদ্বারা,

ভোগক চাহিয়া—ভোগকিথে চাহিয়া, বিধিএ নির্ব্বিল—বিধি নির্ব্বাণ করিল, প্রণাম করিল সেনকাজে—সেনকাকে প্রণাম করিল, তুমিএ—তুমিতে, তাহার—তাঁহার, মোহর—আমার, মোক—আমাকে, তাক—তাহা, তাতে—তাহাকে, বাণিজোয়ে চলে—বাণিজ্যে চলে, এই সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুঁথি গুলিতে পাইয়াছি; 'কে' স্থলে 'ক' একরূপ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, যথা,—সর্প যেন খাইয়া যায় মারিতে গরুড়ক। সেইমত চাহ তুমি মারিতে অর্জ্জুনক।।" (৮৩ পৃঃ)

বহুবচন 'সব' 'গণ' ও 'আদি' শব্দ দ্বারা গঠিত হইত,—তুমি সব, আমি সব রাক্ষসেরগণ, মৃগাদি প্রভৃতি বহুবচন বোধক শব্দ ও তাহাদের পরবর্ত্তী রূপান্তরের বিষয় পূর্ব্বে এক অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। পশ্চিম বঙ্গের পুস্তক গুলিতে,—ঘরকে গমন, পাণিকে ধায়, জলেকে গেল, কাঁধকে রুমাল, আমা—আমাকে, শুনে গৌড়েশ্বরে—শুনে গৌড়েশ্বর, তিহ—তিনি, আমিহ—আমি, মুঞি—আমি প্রভৃতিরূপ পাওয়া যায়।

ক্রিয়া সম্বন্ধে 'আমি' শব্দের পর 'দৈহা' 'কঁরো' 'করিল' প্রভৃতি শব্দ অনেক প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায়; ক্রিয়ার কর্ত্তা নির্দ্ধারণ করিতে শুধু অর্থই পথ প্রদর্শক; এই অধ্যায়ের উদ্ধৃত রচনা হইতে পাঠক নমুনা খুঁজিয়া লইবেন; কোন কোন পুস্তকে নিতান্ত প্রাকৃত ক্রিয়া ও দৃষ্ট হয় যথা,—মনে হয় চাঁদের হয় পুত্র থাম। (বিজয় গুপ্ত) তৎপর করসি, খায়ন্তি, পিবন্তি ও উভয় প্রদেশের রচনায় অনেক পাওয়া গিয়াছে ও তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে একবার লিখিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় 'হের' ক্রিয়া এখন দেখা অর্থেই ব্যবহৃত হয়; কিন্তু পূর্ব্বকালে বোধ হয় হের অর্থ ছিল—'এখানে' 'হের দেখ' এই দুই শব্দ অনেক স্থলেই একত্র ব্যবহৃত হইতে দৃষ্ট হয়। ত্রিপুরার নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখে "এার" অর্থ "এইখানে" শুনিয়াছি; এই দুই শব্দ 'অত্র' শব্দের সঙ্গে কোন ও রূপে সংশ্লিষ্ট হইতে পারে। বঙ্গভাষার প্রাচীন সাহিত্যের ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন করা সেতু বন্ধের ন্যায় গুরুতর ব্যাপার, কাষ্ঠবিড়ালের মত ক্ষুদ্রশক্তি অনুসারে আমি ইতস্ততঃ কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত দ্বারা সাহায্য করিতে সমর্থ হইলেই নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

এই অধ্যায় বর্ণিত পুস্তকগুলি গীত হইত; মনসার ভাসান, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি পুস্তক অষ্টাহ গান হইত। অষ্টমঙ্গলা অর্থাৎ শেষপালায় গ্রন্থকার আত্ম বিবরণ প্রদান করিতেন; এই পুস্তকগুলির সমস্তটিতেই বিবিধ রাগ রাগিণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ ইংরেজী সাহিত্যবেত্তা, সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ ৺ উমাচরণদাস মহাশয়ের সাহায্যে শ্রীযুক্ত জগবন্ধুভদ্র মহাশয় বিদ্যাপতি ও

চণ্ডীদাসের সর্ব্বপ্রথম যে সংস্করণ প্রণয়ন করেন, তাহাতে উক্ত দুই কবির গানগুলির রাগ রাগিণী, উৎকৃষ্ট ভাবে আলোচিত হইয়াছে; তাহাদের মতে "উভয়ের (বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের) রাগ রাগিণীর সংখ্যা (সাধারণগুলি একবার মাত্র ধরিয়া) মোট ৯০টি দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ৩১টি বিশুদ্ধ ৫৯টি বিমিশ্র।" (৮৩পৃঃ) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ মহাশয় লিখিয়াছেন,—"পদাবলীর সুরতাল সম্বন্ধে নানা মুনির নানামত। একজন যে পদ 'ধানশ্রী' তে গেয় লিখিয়াছেন আর একজন সেই পদই বসন্ত রাগে গেয় স্থির করিয়াছেন। আবার অন্য পুঁথিতে সেই পদেই কল্যাণী রাগ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।"* এইসব গান সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, পূর্ব্বকালে 'ধানশ্রী' 'শ্রীরাগ' 'নটনারায়ণ' 'গুর্জ্জরী' প্রভৃতি ওস্তাদি ধরাণের রাগরাগিণীতে সংগীতের অনুশীলন হইত, এখন জাতীয় ভাবের মৃদুতায় রুচি—ভৈরবী, ঝিঁঝিঁট প্রভৃতি মধুর রাগিণীরদিগে হেলিয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে ও পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিমের লোকের সঙ্গে আমাদের বেশী নৈকট্য ছিল।

চণ্ডীদাসের ভণিতা যুক্ত রাধা ও কৃষ্ণের লীলা বর্ণনার কয়েক পত্র আমরা প্রাচীন হস্তলিখিত বহীর স্তূপ, হইতে পাইয়াছিলাম; দুর্ভাগ্য বশতঃ দুই দিন পরেই তাহা হারাইয়া যায়। চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণ কীর্ত্তন' নামক পুস্তকের কথা শুনিয়াছি, তাহা পাই নাই। এই অধ্যায়ের রচনা পয়ারের নিয়ম দ্বারা ব্যাখা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমরা 'ক্ষৌণী কল্পতরু শ্রীমান দীন দুর্গতি বারণ। (কবীন্দ্র) ও "তথাপিহ বেদনা না জানিয়া। সত্বরে গিয়া পার্থেরে ধরিল দুই করে সাপটিয়া (শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধ)।" এইরূপ পদ অনেক স্থলেই পাইয়াছি।

চণ্ডীদাসের রচনার অনেক স্থলেই ব্রিজবুলির মিশাল দৃষ্ট হয়; এই 'ব্রিজবুলি'† পবিত্র ব্রজভূমির ভাষা নহে। এ সম্বন্ধে এখনও অনেকের ভুল আছে। "ব্রিজবুলি" মৈথিল ভাষার অনুকরণ। চণ্ডীদাসের রচনায় 'ব্রিজবুলির' অনুকরণে শব্দসম্প্রসারণক্রিয়া অনেক স্থলে লক্ষিত হয়, যথা—ধরম, করম, পরকার, পরসঙ্গ, স্বতন্তর, পরতাপ, ভরমে, সিনান, বজর, সরবস।

পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের রমণীগণের পরিচ্ছদ একরূপ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে কণ্ঠে সুবর্ণের হার, কর্ণে কুণ্ডল, নাসায়

* বিদ্যাপতি কাব্য বিশারদ মহাশয়ের সংস্করণ পৃঃ ১৮০।

† 'ব্রিজ' শব্দ বর্জ্জি (বর্জ্জিতব্য) শব্দের রূপান্তর।

গজমতি, হস্তে বালা, কঙ্কণ, কটিতটে ক্ষুদ্রঘণ্টী, গলে মকরী প্রভৃতি কতক পরিমাণে পরিচিত অলংকারের উল্লেখ পাই। চণ্ডীদাস মন্নতাড়ল (কোন্তা রমণীরা এখনও গলে পরিয়া থাকেন) নামক একরূপ ভূষণের নাম করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের লেখক বিজয় গুপ্ত, হস্তে সুবর্ণ বাউটি, সুবর্ণ ঘাগরা ও শিলমণি কাচ, কণ্ঠে হাসলী, কর্ণে সোণার মদন কড়ি, পদে পিত্তলের খাড়ু ও লোটন খোঁপা নামক একরূপ খোঁপার উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাষা ও সামাজিক জীবনের আদিস্তর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হয় না; ইতিহাস কতকদূর লইয়া যাইয়া অঙ্গুলী সংকেত করিয়া বিদায় হয়। কিন্তু প্রকৃতি হইতে এই গুপ্ত তত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করা যায়। প্রকৃতিতে বটবৃক্ষ ও বটবীজ উভয়ই মিলে; পাহাড়ের পাষাণ বক্ষস্থ ক্ষীণ যজ্ঞসূত্রের ন্যায় স্বচ্ছ জল রেখা ও শ্যামল তটান্তবাহী স্ফীত গঙ্গাধারা উভয় দৃশ্যই প্রকৃতির মানচিত্রে সুলভ। আদি, উদ্যম, বিকাশ প্রকৃতি দেখাইয়া থাকেন। বাঙ্গলা ভাষা ও সমাজের আদি খুঁজিতে বঙ্গের নিতান্ত মফঃস্বলে পল্লীগ্রামের ছবিখানা দেখিয়া আসুন। বাউটী, মন্নতাড়ল প্রভৃতি যে সব গহনা আমরা নামে মাত্র অবগত আছি, যে সব দুরূহ অপ্রচলিত শব্দ লইয়া আমরা নানামত প্রকাশ করিতেছি, কোন অজ্ঞাত পল্লীর কৃষকবধূ হয়ত এখনও সেইসব গহনা পরিয়া, দুরূহ শব্দ পরম্পরায় মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছে; আমরা আঁধারে তীরক্ষেপ করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি দেখাইতেছি মাত্র।

পূর্ব্বকালে বাঙ্গালীরা ডিঙ্গা সাজাইয়া সমুদ্রে যাতায়াত করিত; কোন দীর্ঘ যাত্রার প্রাকালে স্ত্রীর সন্তান হওয়ার সূচনা লক্ষ্য করিলে তাহাকে একখানা মঞ্জুরীপত্র দিয়া যাইত। সমুদ্রে গমনাগমনের জন্য বোধ হয়, পূর্ব্ববঙ্গের নাবিকগণ উৎকৃষ্ট ছিল; কবিকঙ্কণ, ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস ইহারা তাবতেই সমুদ্রের পথে 'বাঙ্গাল মাঝি' দিগকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাস করিয়াছেন। এখনও এদেশের জাহাজের শারং ও খালাসীগণের অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গের লোক, মাঝিদিগের তত্ত্বাবধায়ক গাবুর নিযুক্ত থাকিত; ইহারা 'সারি' গাইয়া মাঝিদিগকে কার্য্যে আকৃষ্ট রাখিত ও মাঝিরা কার্য্যে শ্লথ হইলে তাহাদিগকে "ডাঙ্গা" দিয়া প্রহার করিত। ডিঙ্গা গুলির মধ্যে বাণিজ্যের উপযুক্ত নানাবিধ দ্রব্য থাকিত ও কোন কোন

বান্নায় হাট মিলিত। ("তার পিছে চলে ডিঙ্গা নাম চন্দ্রপাট। যাহার উপরে চাঁদ মিলায়েছে হাট।" বিজয় গুপ্ত)। এই বাণিজ্য-ব্যাপারে বিলক্ষণ লাভ ছিল,—"মুলার বদলে দিল গজদন্ত।" (বিজয় গুপ্ত) কি "শুক্তার বদলে মুক্তা দিব, ভেড়ার বদলে ঘোড়া।" (ক, ক, চ)। প্রভৃতির মধ্যে কবি-কল্পনার অতিরঞ্জন থাকিলেও সমুদ্র বাহিয়া ভিন্ন দেশে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইতে পারিলে বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইত। আশঙ্কা নৌকা জল মগ্ন হওয়ার। নাবিকগণ সমুদ্রে ঢেউ উঠিলে তৈল নিক্ষেপ করিয়া ঢেউ নিবারণ করিত; ঝাঁকে ঝাঁকে জোঁক উঠিয়া ডিঙ্গা আক্রমণ করিলে তাহারা "ক্ষারচূন" ছড়াইয়া ফেলিত; শঙ্খ উঠিয়া ডিঙ্গার গতি প্রতিরোধ করিলে মৎস্য মাংস কাটিয়া দিত, গন্ধে শঙ্খ গুলি পলাইয়া যাইত। এই সব বর্ণনায় কত দূর সত্য আছে, তাহার বিচারক আমরা নহি। তবে বোধ হয় গল্প শুনিয়া কবি অনেক কথা লিখিয়াছিলেন,—যে ইংলণ্ড বাণিজ্যের জন্য এত প্রসিদ্ধ, ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সেই ইংলণ্ডের অনেক শিক্ষিত লোকেরা ও সমুদ্রের অপর পারে কবন্ধাকার মনুষ্য ও এন্থ্রোপাগী নামক জীবের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিত, সেই সময়ে ইংরেজের শ্রেষ্ঠ কবি এ কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

বাণিজ্যজাত দ্রব্য লইয়া কবিগণ অনেক আমোদ-জনক ঘটনার প্রসঙ্গ করিয়াছেন; সিংহলের রাজা নারিকেল দেখিয়া ভয় পাইতেছেন ও সেবককে তাহা প্রথম খাওয়ার আদেশ করাতে সে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া স্ত্রী পুত্রের নিকট বিদায় লইতেছে। তাম্বুল-রঞ্জিত-অধর দৃষ্টে সিংহলীগণ অনুমান করিতেছে,—"কোতয়ালের মুখ দেখি বলে সর্ব্বলোকে। অজ্ঞ ঠাঁই এড়ি তোমার মুখ ধরে জোঁকে।" (বিজয় গুপ্ত)।

সরিষাতে যাঁহারা তালফলের অবয়ব দেখাইতে পারেন, সেই সব কবিগণের কল্পনার অনুবীক্ষণে প্রতিবিম্বিত পট হইতে আমরা সমুদ্রবাহী ডিঙ্গা গুলির অবয়ব ও অন্যান্য তথ্য উদ্ধার করিতে পারিলাম না।

এই সময়ে বঙ্গে শিল্প-জাত দ্রব্যের উন্নতি খুব বেশী হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না; উৎকৃষ্ট 'ঢাকাই'—এই সময়ের আর ও ২০০ বৎসর পরের সামগ্রী। 'পাটের পাছড়া' সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে প্যাটের পাছড়াকে পাটের খনি বলিত, গাএন একখানা পাটের খনি পাইলেই কৃতার্থ হইতেন,—"বিজয় গুপ্ত বলে গায়েণ গুণমণি। মনসা জন্মিলরে পাছেথে দেও খনি।" এই খনির মধ্যে বিশেষ নিপুণতা কিছুই ছিল না, ইহার একমাত্র

গৌরব, খুব শক্ত হইত। সিংহল-রাজ বঙ্গদেশের খনি বস্ত্রে লইয়া প্রশংসা করিতেছেন,—"মোর দেশে একজাতি জন্ম কত আছে জাতি;—বুনিতে অনেক দিন লাগে। কেবল পীরের কাম, বস্ত্র বড় অনুপাম, প্রাণ শক্তি টানিলে না ভাঙ্গে।" (বিজয় গুপ্ত।)

স্ত্রীলোকগণের কাঁচুলী নির্ম্মাণে অপেক্ষাকৃত অধিকতর শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইত; কাঁচুলীতে সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি সূতায় আঁকিয়া উঠান হইত; এই অধ্যায়-বর্ণিত পুস্তকগুলিতে এবং পরবর্ত্তী সময়ে কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আমরা কাঁচুলীর লম্বা লম্বা ব্যাখ্যা পড়িয়াছি। ভাস্কর ও স্থপতি বিদ্যার অবনতি হইতেছিল, তাহার প্রমাণ এই, যাহা কিছু সুন্দররূপে গঠিত ও সুচারুরূপে অঙ্কিত, তাহাতেই বিশ্বকর্ম্মার কর্ত্তৃত্ব কল্পিত হইত, সুতরাং মনুষ্য সমাজে তাহার অনুশীলন হইতেছিল বলিয়া বোধ হয় না।

এই সময়ের কাব্যাদিতে বদল দ্বারা বাণিজ্য নির্ব্বাহ হওয়ার প্রথা দৃষ্ট হয়; কিন্তু সাধারণতঃ বাজারে বট, বুড়ি, কাহণ প্রভৃতি ভাবে নির্দ্দিষ্ট কড়ি দ্বারা দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হইত। মাটি কাটা ও কোন দ্রব্য ওজন জন্য 'পুরুষ' * একরূপ মাপ ছিল,—উহা এখনকার গজ কাটির ন্যায় হইবে। যাহা সেকালে কড়ি দ্বারা হইয়াছে, এখন তাহা তাম্র ও রজত ভিন্ন পাওয়া যায় না। রৌপ্যের স্থলে স্বর্ণ প্রবর্ত্তিত হইলে কড়ির জিনিষ আমরা সোণা দিয়া কিনিব; আমরা যে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে ধাবিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা এখন বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ের সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা চাঁদের চরিত্রে ক্ষাত্রেয় দৃঢ়তা দেখাইয়াছি, কিন্তু বঙ্গদেশের মৃদু আবহাওয়ায় শালতরুর বীজ বপন করিলে তাহাতে কুসুম লতার উৎপত্তি না হইলেই সৌভাগ্য। এই চাঁদের চরিত্র বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন লেখকগণের তুলিতে যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কবিগণ তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই; তাঁহাদের হস্তে চাঁদবেণে একটি হাস্যরসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার দৃঢ়তার মহত্ব কবিগণ অনুভব করেন নাই, কাষ্ঠ কেলাইয়া বালকের ন্যায় হাতে তালি দিয়া তামাসা দেখিয়াছেন। কাল কেতুকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম ভীমের

* "মাটি খানি কাটি ফেলে এক যে পুরুষ"—বিজয় গুপ্ত।
"পুরুষ সাতেক মোর হারালো কাগজ।" ক, ক, চ।

ন্যায় শারীরিক শক্তিসম্পন্ন কল্পনা করিয়া ও বীরত্বের জগতে একটি মোমের পুতুলের ন্যায় নম্র করিয়া ফেলিয়াছেন। বীরত্বের উপকরণ এই ক্ষেত্রে না ফেলিয়া নদীর জলে ফেলাও শ্রেয়:। বাঙ্গালী উত্তরপশ্চিম হইতে আর্য্যতেজ অবশ্যই আনিয়াছিল, পঞ্চগৌড়েশ্বরগণের মহিমান্বিত রাজশ্রী ও সিংহলবিজয় প্রভৃতি অস্বীকার করিবার বিষয় নহে; কিন্তু সেই বিক্রম ক্রমে সুকুমার ভাবে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল,— মালকোঁচা ফুলকোঁচা হইয়া গিয়াছিল; এটি এদেশের গুণ, ফোর্ট উইলিয়মের প্রদেশে থাকা নিরাপদ নহে, কালে কুঞ্জ-কুটীরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। বাঙ্গলা রামায়ণ ও মহাভারতে সীতা-বিলাপ, তরণী ও সুধন্বার কৃষ্ণ-ভক্তি অভাবনীয় সুধা ঢালিয়া দিয়াছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ফুলমালায় আবৃত হইয়া পড়িয়াছে।

মাণিকচাঁদের গান হইতে দৃষ্ট হয়, প্রেমের কথা বঙ্গদেশে ব্যর্থ হয় নাই; চণ্ডীদাসের গীতি প্রেমের সরস এবং নির্ভীক উক্তি; যে সমাজে ব্রাহ্মণ ও ইতরবর্ণের অধিকার স্বর্ণ ও লৌহের ভিন্ন ভিন্ন রেখায় নির্দ্দেশিত, সেই সমাজের ক্ষুদ্র একজন পূজক ব্রাহ্মণ "শুন রজকিনী রামি। ও দুটি চরণ, শীতল দেখিয়া শরণ লইলাম আমি॥ তুমি রজকিনী, আমার রমণী, তুমি হও পিতৃ মাতৃ। ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমার ভজন, তুমি বেদ মাতা গায়ত্রী।" এইরূপ বন্দনা দ্বারা আশ্চর্য্য নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন, একথা লিখিতে তিনি সমাজের ভয় পান নাই; কারণ প্রেমের বলে পিপীলিকা মত্ত হস্তীকে দলন করিতে পারে। একথা লিখিতে তিনি লজ্জিত হন নাই,—কারণ এ প্রেমে 'কামগন্ধ নাই'—ইহা উপাসনা, ধর্ম্ম, নির্ম্মলতম বৃত্তির খেলা,—ইন্দ্রিয় বিভাগের উচ্চে; ইহা স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণ গৌরবান্বিত হইয়াছেন। তিনি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন নাই।

এই প্রেম তুলনা ও উপমা রাজ্যের উপরে, চণ্ডীদাস পূর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের উপমাগুলির গিল্টি দেখিয়া ভুলেন নাই,—"ভানু কমলে বলি সেহ হেন নহে। হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥ চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা। সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥ কুসুমে মধুপে কহি সেহ নহে তুল। না আইলে ভ্রমর, আপনি না যায় ফুল॥ কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে। ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥" উপমায় ইহা ক্ষতিগ্রস্থ হয়; ইহার তুল্য আছে স্বীকার করিতে হয়।

এই প্রেমের পট খানা উজ্জ্বল করা জাতীয় জীবনের ব্রত হইয়া উঠিল; যাহা চণ্ডীর ভাষায় অত্যন্ত গভীরভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা সাধনার ধন করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত করিতে শত শত বৈষ্ণব অগ্রসর হইলেন। প্রাতঃশিশির-সিক্ত প্রকৃতির সজল পট ভাস্করে যেরূপ শুভ্র হইয়া স্থায়ী প্রভা প্রাপ্ত হয়, এই অশ্রুসিক্ত পদাবলী অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আরও গাঢ় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে; যাঁহার জীবন্ত লীলায় এইসব গীতি সার্থক হইয়াছে, তিনি নরহরি, বাসুদেব প্রভৃতি কবিগণের বন্দনার ফুল পল্লবযুক্ত স্বর্ণ ফ্রেমে বাঁধা একখানা দেব মূর্ত্তির ন্যায় আমাদের নিকট উদয় হইয়াছেন; উৎকৃষ্ট তুলিকর অঙ্কিত ধ্রুব, প্রহ্লাদ হইতে আমরা সেই ভক্তির ছবিখানা ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছি। বঙ্গভাষায় রামায়ণ মহাভারত, ভাগবত অনুবাদিত হইয়াছিল, তথাপি ভাষাগ্রন্থলেখকগণ নিজেরা ও ইহাকে অগ্রাহ্য করিতেন,—'সহজে পাঁচালী গীত নানা দোষময়' বিজয়গুপ্ত লিখিয়াছেন। কবীন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ তাঁহার অনুবাদ-পুস্তকে দেন নাই, কারণ "পাঁচালীতে উপযুক্ত নহে যোগ্য বাদ।"

কিন্তু পরবর্ত্তী অধ্যায়ের সাহিত্য শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভায় মহিমান্বিত; পাঁচালী গীত তখন শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য বা নবদ্বীপের ১ম যুগ।

১। শ্রীচৈতন্যদেব ও এই যুগের সাহিত্য।
২। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন।
৩। পদাবলী-শাখা।
৪। চরিত-শাখা।

(১)

চণ্ডীদাসের দুইটি গীতি এইরূপ ;—

(ক) আজু কেগো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যাম রায়॥
ইহার গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল॥
* * * *
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন্ দেশে॥

(খ) কাল কুসুম করে, পরশ না করি ডরে,
এবড় মনের মনোব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই, সকল লোকের ঠাঁই,
কাণাকাণি শুনি এই কথা॥
* * * *
সই লোকে বলে কালা পরিবাদ,
কালার ভরমে হাম, জলদে না হেরি গো,
ত্যজিয়াছি কাজলের সাধ।
চণ্ডীদাস ইথে কহে, সদাই অন্তর দহে,
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে, তনু মন চুরি করে,
না চিনিয়ে কালা কিবা গোরা॥

প্রথম পদটি পদকল্পলতিকায় বড় সুন্দরভাবে যোজিত হইয়াছে; রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পীতবস্ত্র পরিয়া বাঁশী হস্তে দাঁড়াইয়াছেন, চণ্ডীদাস রাধিকার গৌর বরণের কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু প্রথম গীতির "এরূপ হইবে কোন্ দেশে?" ও দ্বিতীয় গীতের "না চিনি যে কাল কিবা গোরা" দুইটি ছত্র পড়িয়া স্বপ্নের কথার ন্যায় একটা অলীকভাব মনে হইয়াছিল,—যেন ভাবী ঘটনা যেরূপ সম্মুখে ছায়া পাত করে, পরম সুন্দর চৈতন্য-দেব ও তেমনি তাঁহার রূপের ছায়া প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে প্রেমিককবির মনে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন; সেই রূপের পূর্ব্বাভাস পাইয়া আহ্লাদে চণ্ডীদাস পক্ষীর ন্যায় অস্পষ্ট কাকলি দ্বারা তাঁহার আগমনী গান করিয়াছিলেন।

"এরূপ হইবে কোন্ দেশে ?" প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশে; তখন চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন না। চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতির মিলন হইয়াছিল, চৈতন্য-প্রভু আর রামানন্দরায়ের মিলন হইয়াছিল, কিন্তু চণ্ডীদাস আর চৈতন্যপ্রভুর মিলন হইলে তদপেক্ষা অপূর্ব্ব হইত। গীতির প্রেমোন্মাদ ও জীবনের প্রেমোন্মাদ—গোলাপের সুঘ্রাণ ও পদ্মের সুঘ্রাণ মিশিয়া যাইত। চণ্ডীদাসের বর্ণিত পূর্ব্বরাগ, রাধিকার ব্যাকুল বিরহ, মধুর প্রেম ও দিব্যোন্মাদ গৌরহরি স্বজীবনে দেখাইয়াছেন; যদি গৌরহরি না জন্মিতেন তবে শ্রীরাধার "জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর।" কৃষ্ণ অঙ্গ ভ্রমে কুসুম লতা আলিঙ্গন, এক দৃষ্টে ময়ূর ময়ূরী কণ্ঠ নিরীক্ষণ ও নব পরিচয়ের সুমধুর ভাবাবেশ কবির কল্পনা হইয়া যাইত। ভাবের উচ্ছ্বাসজাত এই ভ্রমময় আত্ম-বিস্মৃতি আজ শুষ্কযুগে কবি কল্পনা বলিয়া উপেক্ষিত হইত। কিন্তু গৌরহরি শ্রীমদ্ভাগবত ও বৈষ্ণব-গীতি সমূহের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন,—দেখাইয়াছেন এই বিরাট শাস্ত্র ভক্তির ভিত্তিতে, নয়নের অশ্রুতে, চিত্তের প্রীতিতে দণ্ডায়মান। এই শাস্ত্রের শোভা স্বরূপ পূর্ব্বরাগ, বিরহ, সম্ভোগ মিলন ইত্যাদি যে সব লীলা রসের ধারা ছুটিয়াছে, তাহা কল্পনা নহে, আস্বাদ-যোগ্য ও আস্বাদিত হইয়াছে; প্রেমের আশ্চর্য্য স্ফূর্ত্তিতে শ্রীগৌরের দেহ কদম্ব প্রায় হইয়াছে, সমুদ্র ঢেউ যমুনা লহরী হইয়াছে, চটক পর্ব্বত গোবর্দ্ধন হইয়াছে ও পৃথিবী কৃষ্ণময় হইয়াছে; এই অপূর্ব্ব ভক্তি ও প্রেমের উপকরণ দিয়া শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী সৃষ্ট; তিনি আয়েসা কি কুন্দনন্দিনী নহেন, তাঁহার বিরহের এক কণিকা কষ্ট বহন করিতে পারে, তাঁহার সুখের এক লহরী ধারণ করিতে পারে, এরূপ নারীচরিত্র পৃথিবীর কাব্যোদ্যানে নাই।

এই অধ্যায়ের চরিতশাখা পদাবলী দ্বারা বুঝিতে হইবে, পদাবলী চরিতশাখা দ্বারা বুঝিতে হইবে এবং উভয়ই গৌরহরির লীলারস দ্বারা বুঝিতে হইবে; তাহা কিরূপ দেখাইতে চেষ্টা করিব;—চণ্ডীদাস প্রেমের অজ্ঞান অবস্থা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন;—"তুলাখানি দিল নাসিকা মাঝে। তবে সে বুঝিল শোয়াস আছে।" সার্ব্বভৌমের গৃহে যখন চৈতন্যপ্রভু অজ্ঞান তখন "সূক্ষ্মতুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল। ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হল।" (চৈ, চ, মধ্যখণ্ড ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ);—শ্রীরাধিকা তমাল দেখিয়া "বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল," ([illegible] ৩১ শ্লোক) ও মেঘ দেখিয়া "চাহে মেঘ পানে, না চলে নয়নের তারা,"

(চণ্ডীদাস) কৃষ্ণ ভ্রমে উন্মাদিনী হইয়াছেন; শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনও সেইরূপ ভ্রমময়;—"চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে, ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে।।" "যাহা নদী দেখে তাহা মানয়ে কালিন্দী। মহাপ্রেম বশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি॥" (চৈ, চ, মধ্যম খণ্ড ১৭ পরিচ্ছেদ)।—"তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া। কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইয়া॥" (গোবিন্দ দাসের করচা)। "বন দেখি ভ্রম করে এই বৃন্দাবন চৈ, চ, ১৭ পঃ)। এরূপ অসংখ্য স্থল আছে। শ্রীরাধিকাকে চেতন করিতে বলা হইত;—"উঠ উঠ রাধে বিনোদিনী, দেখ দেখ কৃষ্ণ গুণমণি॥" (দিব্যোন্মাদ)। চৈতন্য দেবের প্রতিও সেই ব্যবস্থা, "যখন বা হয় প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত। কর্ণমূলে সবে হরি বলে অতি ভীত॥" (চৈ, ভা, মধ্য খণ্ড)। রাধিকা কৃষ্ণ নাম শুনিলে বক্তার পদে ক্রীত হইতেন, "অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়। যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়।। পায় ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়। সোণার পুতলী যেন ভূতলে লোটায়॥ (চণ্ডীদাস) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এইরূপ কতবার কৃষ্ণ নাম শুনিয়া বক্তাকে পদে ধরিয়াছেন, আলিঙ্গন করিয়াছেন, "কৃষ্ণ অনুরাগে সদা আকুল হৃদয়। শুনিলে কৃষ্ণের নাম অশ্রুধারা বয়॥ যদি কেহ রাধে বলি উচ্চ শব্দ করে। অমনি অশ্রুর ধারা ঝর ঝর ঝরে॥ প্রাণ কৃষ্ণ বলি যদি দৈবে কেহ ডাকে। ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন তাহাকে॥" (গোবিন্দ দাসের করচা।) শ্রীরাধিকা "শুনয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি। কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥" (চণ্ডীদাস)। চৈতন্য দেবও "গদাধরে দেখি প্রভু করয় জিজ্ঞাস। কোথা হরি আছেন শ্যামল পীতবাস॥ সে আর্ত্তি দেখিতে সর্ব্ব হৃদয় বিদরে। কি বলিব প্রভুর বচন নাহি স্ফুরে॥ সম্ভ্রমে বলিল গদাধর মহাশয়। নিরবধি আছেন হরি তোমার হৃদয়॥ হৃদয়ে আছেন হরি বচন শুনিয়া। আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া॥ (চৈ, ভা মধ্যমখণ্ড); কৃষ্ণ-প্রেম-মগ্না রাধিকা ভূপৃষ্ঠে নখাঙ্কন করিয়া কৃষ্ণ নাম লিখিয়া সুখী হইতেন, "ভরমে তোমার নাম ক্ষিতি-তলে লিখি।" (চণ্ডীদাস)। চৈতন্য দেবও "ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ আকৃতি। চাহিয়া রোদন করে ভাসে সব ক্ষিতি॥" (চৈ, ভা, মধ্য)। রাধিকার হাসি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিভোর, "হাস, হাস, নয়ন জুড়াক চন্দ্রমুখি। এ বোল বলিতে পিয়ার ছল ছল আঁখি॥" চৈতন্যদেব রত্নগর্ভের মুখে ভাগবত পাঠ শুনিয়া,—"বোল বোল বলে বিশ্বম্ভর। গড়াগড়ি যায় প্রভু ধরণী উপর। বোল বোল বলে প্রভু, পড়ে বিশ্বম্ভর। উঠিল সমুদ্র কৃষ্ণ-সুখ মনোহর॥ লোচনের জলে হৈল পৃথিবী সিঞ্চিত। অশ্রু কম্প পুলকাদি ভাবের উদিত। (চৈ, ভা, মধ্যখণ্ড)

প্রস্ফুট কদম্ব পুষ্পের ন্যায় প্রেম-রোমাঞ্চিত দেহ, শিশির-স্নাত পঙ্কজের ন্যায় প্রেমাশ্রুপূর্ণ চক্ষু এই ছবিখানা শ্রীচৈতন্য দেবের। ইঁহার প্রেমের

অনন্ত আনন্দের যৎকিঞ্চিৎ চণ্ডীদাসের পদে পাওয়া যায়, অপরাপর কবিগণ তটস্থ দর্শকের ন্যায় উঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া গীতি রচনা করিয়াছেন; পদ কল্পতরু প্রভৃতি পুস্তক চৈতন্য দেবের অলৌকিক প্রেমের আভাস দিতে চেষ্টিত; তাঁহার লীলা কাহিনী যাঁহারা জ্ঞাত নহেন তাঁহারা এণ্ড্রোমেকি, জুলিয়েট, ডাইডোর সঙ্গে বৈষ্ণব কবি-অঙ্কিত রাধিকাকে একস্থলে দাঁড় করিবেন; এই ভয়ে এতগুলি দৃষ্টান্ত খুঁজিয়াছি। বৈষ্ণব পদাবলী, উপন্যাস বা ইন্দ্রজালের ন্যায় অলীক বোধ হইতে পারে কিন্তু উহা খাঁটি সত্য; ভক্তের চক্ষে মেঘে কৃষ্ণ ভ্রম হইয়াছে, তারপর "কেন মেঘ দেখে রাই এমন হলি।" প্রভৃতি কথার উদ্ভব হইয়াছে। কেবল চৈতন্যদেব নহেন, এই দলে আরও ভক্ত ছিলেন, যাঁহাদের কথা স্বপ্নের ন্যায় অলীক বোধ হয়; "মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অকথ্য কথন। মেঘ দরশন মাত্র হয় অচেতন॥ (চৈ,ভা,)

এই অধ্যায়ের গ্রন্থরাশি যাঁহার নয়নাশ্রুর নির্ম্মলবিন্দুনিঃসৃতধর্ম্ম দ্বারা উজ্জ্বল হইয়া অবর্ণনীয় সুন্দর ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে, ক্ষুদ্র বঙ্গভাষা যাঁহার পবিত্র স্পর্শে গঙ্গা ধারার নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গে পদাবলী সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলাম; এস্থলে সংক্ষেপে তাঁহার জীবন বর্ণনা করিব।

শ্রীচৈতন্যদেব।

যে নবদ্বীপ একদা পলায়নপর হিন্দু রাজার একখানা মলিন আলেখ্য দ্বারা ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছিল, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেই নবদ্বীপ তিনটি শ্রেষ্ঠ পুরুষের চিত্রপট উপহার দিয়া স্বীয় ঐতিহাসিক ত্রুটি উৎকৃষ্ট ভাবে সংশোধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল; ইঁহারা রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও শ্রীচৈতন্যদেব। প্রথম দুইজন শাস্ত্র চর্চ্চাকারী দিগের মধ্যে রাজা উপাধি পাইবার যোগ্য; শেষোক্ত জন ও অল্পবয়সে সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শুকপত্রের ন্যায় সেই শিক্ষা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া সদ্য-বিকশিত উৎকৃষ্ট মনুষত্ব বা দেবত্ব দেখাইয়াছিলেন। প্রথম দুইজনের সমকক্ষ আছে; কিন্তু তৃতীয় জন ইতিহাসে একা।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজধানী নবদ্বীপ একটি বিরাট পাঠশালায় পরিণত হইয়াছিল; মল্ল যুদ্ধের দিনগতে তথায় তর্ক যুদ্ধই প্রশংসা অর্জ্জনের পন্থা বলিয়া নির্ণিত হইয়াছিল। এই সময়ে নবদ্বীপের পরিসর অতিশয় বৃহৎ ছিল। আতোপুর, শিমলিয়া, মাজিতাগ্রাম, বামণপোখেরা, হাটডাঙ্গা, চাঁপাহাট, রাতুপুর, বিদ্যানগর, মাউগাছি, রাহুপুর, বেলপেখেরা, মায়াপুর, প্রভৃতি বহুসংখ্যক পল্লী ইহার অন্তর্গত ছিল, নরহরির অতিরঞ্জিত বর্ণনায় ইহার বসতি অষ্ট ক্রোশ ব্যাপক বলিয়া উল্লিখিত আছে।* উক্ত পল্লী সমূহ ব্যতীত গন্ধবণিক্যপাড়া, তাঁতিপাড়া, শাঁখারিপাড়া, মালাকারপাড়া প্রভৃতি চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত দেখিতে পাই।

নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল তখন হিন্দুস্থানে অদ্বিতীয়; দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রের ও সে স্থানে বিশেষরূপ চর্চ্চা হইতেছিল। এসব সত্ত্বেও নবদ্বীপবাসী স্বল্প সংখ্যক লোকের কিছু বাসনা অপূর্ণ থাকিয়া যাইত; মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরী ও ষষ্ঠীর পূজা, যোগীপাল, গোপীপাল, মহীপালের গীত, এবং পশুরক্ত ও মদ্য দ্বারা আর্দ্র যজ্ঞস্থলী দেখিয়া তাঁহারা আক্ষেপ করিতেন; হরিভক্তিহীন নবদ্বীপের অর্থ ও বিদ্যা সমৃদ্ধি তাঁহাদের নিকট সিন্দুর হীন রমণী-ললাটের ন্যায় বৃথা মনে হইত। তাঁহারা পৃথিবীতে ভক্তির অভাব দেখিয়া ব্যথিত চিত্তে অশ্রুপাত করিতেন; এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য অগ্রগণ্য; প্রবাদ আছে ইঁহাদের অভাব পূরণ করিতে শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হন।

বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তখন এই কয়েকটি বৈষ্ণব আবির্ভূত হন,— ইঁহারা চারিদিগে ভক্তির অপূর্ব্ব কথা প্রচার করিবেন, কিন্তু এক সময়ে নবদ্বীপে ইঁহাদের সকলের মিলন হয়। শ্রীহট্টে—শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীবাস, শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ও মুরারি গুপ্ত। চট্টগ্রামে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও চৈতন্য-বল্লভ দত্ত। বুড়নে হরিদাস ও রাঢ়দেশে একচক্রাগ্রামে শ্রীনিত্যানন্দ। ইঁহারা দীপশলা; কিন্তু চৈতন্য দেব দীপ; চৈতন্যদেব আবির্ভূত না হইলে ইঁহারা জ্বলিতে পারিতেন কিনা কে বলিবে?

শ্রীচৈতন্যের জীবনে অনেক অদ্ভুত ঘটনা বর্ণিত আছে; এক দিনে আম্র বীজ বপন ও তাহা হইতে বৃক্ষ ও ফলোদগম, স্পর্শ মাত্র কুষ্ঠরোগীর আরোগ্য,

* ভক্তি রত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গ।

সুদর্শন চক্রকে আহ্বানমাত্র পাওয়া হইতে উক্ত চক্রের উদয়, ষড়ভুজ প্রকাশ ইত্যাদি। এ সব সত্য কি মিথ্যা সে সম্বন্ধে কোন ও মত প্রকাশ করিতে আমি সাহসী নহি। এই সব প্রকৃত হইলেই বা ইহাদের কি মূল্য, তাহা বুঝিতে পারি না; তাঁহার জীবনে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা আরোপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তাঁহার নয়নাশ্রুর ন্যায় কোনটিই অলৌকিক নহে; যে প্রেমে তাঁহার শরীর কদম্বকোরকের ন্যায় কণ্টকিত হইয়াছে ও অর্দ্ধ নিমিলিত চক্ষুপুট হইতে অজস্র অশ্রুবিন্দুপাত হইয়াছে, সেই প্রেমের ন্যায় তাঁহার জীবনে কিছুই অপূর্ব্ব কি মনোহর হয় নাই। চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি পুস্তকে তাঁহার আলেখ্য এই ভাবে লিখিত আছে,—

জন্ম ও শৈশব।

চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃঃ) নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বাড়ী শ্রীহট্ট; নবদ্বীপে পড়িতে আসিয়াছিলের, অত্যন্ত সুবোধ সুশ্রী ও গুণী বলিয়াই বোধ হয় নবদ্বীপের নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শ্রীহট্ট বাসী যুবক জগন্নাথের নিকট স্বীয় গুণবতী কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ দিয়াছিলেন; শচীর গর্ভে ৮ কন্যা ও ২পুত্র জন্মে; কন্যা সবটীরই অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমে শাস্ত্র চর্চ্চায় বিবৃত বিশ্বরূপযুবক বিবাহরূপ জটিল প্রশ্ন দ্বারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং জগন্নাথ মিশ্র নিজে সুপণ্ডিত হইয়াও দ্বিতীয় পুত্র নিমাইর পড়াশুনা বন্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তি এইরূপ,—"এই যদি সর্ব্বশাস্ত্রে হবে গুণবান্। ছাড়িয়া সংসার সুখ করিবে পয়ান॥ অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাই। মূর্খ হৈয়া ঘরে মোর থাকুক নিমাঞি॥" (চৈ, ভা, আদি।)

শৈশব-কালে জগন্নাথ মিশ্রের এই দ্বিতীয় বালকটি নবদ্বীপে বড় শান্ত শিষ্ট বলিয়া পরিচিত হন নাই। ইনি গঙ্গা-স্নানকারী ভক্তিমান ব্রাহ্মণগণের উপর বিশেষ উৎপীড়ন করিতেন, অভিযোগ গুলি এইরূপ,—একজন বলিতেছে,—"সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া। ডুব দিয়া লৈয়া যায় চরণ ধরিয়া॥" (চৈ, ভা, আদি)। "কেহ বলে মোর শিব-লিঙ্গ করে চুরি। কেহ বলে মোর লয়ে পলায় উত্তরী॥" (চৈ, ভা, আদি)।

গঙ্গার ঘাটে বালিকাগণের মাথায় ওকড়ার বীচি ফেলিয়া দিতেন, দীর্ঘ কৃষ্ণ-কেশ জালের দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া উক্ত বীচির নির্গমনে

অনেক গাছি নষ্ট না হইয়া যাইত না। শিশু চৈতন্যপ্রভু তামাসা দেখিতেন; এইসব অভিযোগকারী বালিকাদের মধ্যে কাহারও বিষম ভক্তও ছিল। "কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে।" (চৈ, ভা আদি)।* প্রভুর বয়স তখন পঞ্চবর্ষমাত্র, ইহা স্মরণ করিলে অভিযোগের গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস হইবে সন্দেহ নাই। একদিন নিমাই রন্ধনের বর্জ্জিত হাড়ির উপর বসিয়া পাগলামির এক নব অবয়ব প্রকট করিলেন; মাতা কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইলে শিশু উত্তর করিলেন,—"প্রভু বলে মোরে তোরা না দিস পড়িতে। ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিব কি মতে। মূর্খ আমি না জানি যে ভাল মন্দ স্থান। সর্ব্বত্র আমার এক অদ্বিতীয় স্থান।" (চৈ, ভা, আদি) এই উত্তরের সবটুক খাটি সত্য কিম্বা ইহার মধ্যে লেখকগণের কিছু মুন্সীয়ানা আছে ঠিক বলিতে পারি না, যেরূপ ভাবেই হউক শিশুটির সুখকর উপদ্রব হইতে গ্রামবাসীদিগকে মুক্তি দেওয়া একসময়ে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। তখন মাতাপিতা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে গঙ্গাবাস পণ্ডিতের টোলে পড়িতে পাঠাইয়া দিলেন।

নিমাই ছাত্র ও নিমাই অধ্যাপক।

'কি মাধুরী করি প্রভু ক, খ, গ, ঘ বলে।' বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন; নিমাইর পড়া শুনার ইতিহাস প্রকৃতই বড় মধুর। যে একাগ্রতায় শচীর পাগল ছেলে পাগলামী করিয়াছে, সেই একাগ্রতায় শচীর দুরন্ত ছেলে পড়া শুনা লইয়া পাগল হইল।

"কিবা স্নানে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে। নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে।।" আপনি করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী। ভুলিয়া পুস্তক রসে সর্ব্ব দেবমণি।।" "না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক একক্ষণে।" "পুঁথি ছাড়িয়া নিমাঞি না জানে কোন কর্ম্ম। বিদ্যারস ইঁহার হয়েছে সর্ব্ব ধর্ম্ম।।" "একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়। আরবার উলটিয়া সবারে ঠেকায়।।" চৈ, ভা, আদি।

এইরূপ একাগ্রতার বলে নিমাই শীঘ্রই ব্যাকরণশাস্ত্রে অদ্বিতীয়

---

* এইসব কাহিনীতে ভাগবতের সঙ্গে মিল রাখিবার কিছু কিছু চেষ্টা আছে, এজন্য এইসব কথায় ঐতিহাসিকত্বে আমরা খুব বিশ্বাসপরায়ণ হইতে পারি নাই; বালিকারা নানারূপ অভিযোগ করিয়া শেষে বলিতেছে,—

"পূর্ব্বে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার। সেইমত তোমার পুত্রের ব্যবহার।।" চৈ, ভা, আদি।

হইয়া উঠিলেন। কিন্তু নিমাই এখনও সেই পাগল ছেলে, সে শ্যাম-ধামীর লীলারস বড় মধুর—উহা তাঁহার উদ্দাম ও স্ফূর্ত্তি পূর্ণ প্রকৃতির সহজ খেলা—উহা নির্ম্মল জলস্রোতের ন্যায় আনন্দদায়ী, তাহাতে সরলতা বিম্বিত। নব যুবক তাঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও শিক্ষার ধনু লইয়া বড় বড় অধ্যাপকদিগের পাঠশালা লক্ষ্যে তীর ছুড়িতে লাগিলেন; মুরারিগুপ্ত বয়সে বড়, তাঁহাকে তর্কে হারাইয়া নিমাই বলিতেছেন;—

"প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়। লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী দৃঢ় কর॥ ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি। কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥" চৈ, ভা আদি।

গদাধর পণ্ডিতকে পথে পাইয়া,—

"হাসি দুই হাত প্রভু রাখিলা ধরিয়া। ন্যায় পড় তুমি আমা যাও প্রবোধিয়া॥ জিজ্ঞাসহ গদাধর বলিল বচন। প্রভু কহে বল দেখি মুক্তির লক্ষণ॥" চৈ, ভা, আদি।

এইরূপে পথিকদিগকে পর্য্যস্ত আক্রমণ করিয়া পরাভবব্যঞ্জক হাস্য ও শ্লেষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নদীয়ার বড় বড় পণ্ডিত এই তরুণ যুবকের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দেখিয়া প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। নিমাই যে টোল স্থাপন করিলেন, তাহাতে অসংখ্য ছাত্র পড়িতে আসিল। তাঁহার অপূর্ব্ব সুন্দরমূর্ত্তি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য সেই টোলের গৌরব অশেষরূপে বাড়াইয়া দিল। কিন্তু তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অনতিক্রান্ত বিংশ বর্ষ মাত্র।

কেশবকাশ্মীর নামক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন; তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির গৌরবে নবদ্বীপ বাসীগণ ভীত হইলেন; কিন্তু তরুণ নিমাই হাস্যমুখে গঙ্গাতীরে তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বলা মাত্র তিনি গঙ্গার সেই সময়ের শোভা বর্ণন করিয়া একটি স্তোত্র রচনা করিলেন; শ্লোকগুলির সুন্দর উপমা, সহজ ভাব শ্রোতৃবর্গের মন মুগ্ধ করিল; কিন্তু নিমাই সেই শ্লোকগুলির প্রত্যেকটি হইতে অলঙ্কারের দোষ বাহির করিয়া দিগ্বিজয়ীর অখণ্ডঅভিমান-স্ফীত মুখমণ্ডল খর্ব্ব ও মলিন করিয়া দিলেন; তাঁহার প্রথম ছত্রের ভবানী-ভর্ত্তৃ শব্দে 'বিরুদ্ধমতি দোষ', 'বিভবতি' শব্দের পরে 'ক্রমভঙ্গদোষ' শ্রীলক্ষ্মী শব্দে 'পুনরুক্তবদাভাস', ইত্যাদি। যিনি ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তিতে অসাধারণরূপ কৃতী তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত

ছিলেন একথা দিগ্বিজয়ী কখন ও মনে ভাবেন নাই। তাই [illegible] বলিয়াছিলেন ;—

"ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলংকার। তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার।। চৈ, চ, আদি।

কিন্তু এবার তাঁহার আটোপ বৃথা হইল ; প্রভু তাঁহার রত্নমুষ্টির ন্যায় কবিতাটিকে যখন ছাইমুষ্টির ন্যায় শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে প্রতিপন্ন করিলেন, তখন দিগ্বিজয়ী তাঁহার অহঙ্কারের পুচ্ছ গুণ্ঠিত করিয়া কোন পথে পলায়নপর হইলেন, কেহ তাঁহাকে আর দেখিল না।

এই তরুণ বয়সে প্রবীণ শিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিতটির দুরন্তপনার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। শ্রীহট্টীয়াগণ দেখিলে নিমাই ব্যঙ্গ করিতেন ; তিনি খাঁটি নদেবাসীর সন্তান হইলে শ্রীহট্টবাসীদের ততদূর দুঃখ হইত না। ময়ূরের পুচ্ছ শরীরে সংলগ্ন করিলেই ময়ূর উপাধি পাওয়া যায় না, শ্রীহট্টবাসীগণের এইজন্য একটু ন্যায্য কষ্ট হইত ;—

"শ্রীহট্টীয়াগণ বলে হয় হয় হয়। তুমি কোন দেশী . তাহা কহ মহাশয়।। পিতৃ মাতৃ আদি করি তাবত তোমার। বল দেখি শ্রীহট্টে জন্ম না হয় কাহার। চৈ, ভা, আদি।

কিন্তু রহস্যপ্রিয় পণ্ডিতমহাশয় এসব যুক্তি শুনিতে প্রস্তুত নহেন। "তাবৎ শ্রীহট্টীয়ারে চালেন ঠাকুর। যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর।। মহাক্রোধে কেহ লই যায় খেদারিয়া। লাগালি না পায় যায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া।।" চৈ, ভা, আদি।

কিন্তু যে স্থলে এই যুবাবয়সে তাঁহার চাঞ্চল্য না থাকা শ্রেয়ঃ ছিল, সে স্থলে তিনি সংযত ছিলেন ;—

"এই মত চাপল্য করেন সব সনে। সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টি কোণে।। সবে পরস্ত্রী মাত্র নাহি উপহাস। স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন এক পাশ।।" চৈ, ভা আদি।

কিন্তু ধর্ম্ম না থাকিলে হিন্দুস্থানে রূপ বৃথা—বিদ্যা বৃথা। সকলেই নিমাইকে ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে যাইত ; রহস্যের স্রোতে ধর্ম্ম কথা ভাসাইয়া দিয়া নিমাই হাসিতেন ; ঈশ্বরপুরী পরমবৈষ্ণব, তাঁহাকে ধর্ম্মে মতি লওয়াইতে নিত্য নিত্য কত শ্লোক পাঠ করিতেন, কিন্তু নিমাই তাঁহার শ্লোক হইতে ব্যাকরণের দোষ বাহির করিতে নিপুণ ছিলেন। "প্রভু কহে এ ধাতু আত্মনেপদী নয়।" ব্যাকরণের অতলগর্ভে ধর্ম্মের কথা গুলির গঙ্গা প্রাপ্তি হইত। কিন্তু তাঁহার বাহিরের এই রহস্য-প্রিয়তা প্রকৃত ধর্ম্ম হীনতার পরিচায়ক ছিল না। তিনি ব্যঙ্গ করিয়াও [illegible]

গদাধরকে দেখিলে মনে মনে আহ্লাদিত হইতেন ও ঈশ্বরপুরীকে দেখিলে পাগল হইতেন।

এই যুবকের হৃদয় শরদভ্রের ন্যায় নির্ম্মল ও শরৎ সেফালিকার ন্যায় পবিত্র ছিল; ইঁহার চাপল্য—স্বচ্ছ উদ্দাম প্রকৃতির হর্ষময়—রসপূর্ণ খেলা—তাহা সকলের প্রীতি উৎপাদন করিত; এই নির্ম্মল ও পবিত্র প্রাকৃতিক উপাদানে সরস ভক্তি কিরূপ কার্য্যকরী হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যটন করিতে গেলেন। ইতি পূর্ব্বেই তিনি বঙ্গের সর্ব্বত্র একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া নামে পরিচিত ছিলেন; পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাকে যথেষ্ট আদরের সহিত অর্চ্চনা করিয়া বলিলেন,—
"উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিপ্পনী। লই, পড়ি, পড়াই শুনহ দ্বিজমণি॥" চৈ, ভা, আদি।
ইহা দ্বারা জানা যায় নিমাই পণ্ডিতের টীকা বঙ্গদেশের টোলগুলিতে প্রচলিত হইয়াছিল।* তিনি পূর্ব্ববঙ্গের কোন্ কোন্ স্থল ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই; চৈতন্য ভাগবতকার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি পদ্মানদীর তীর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপ ফিরিয়া আসিয়া চৈতন্যদেব সঙ্গীগণের নিকট পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার অনুকরণ করিয়া হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু একটি প্রফুল্ল পুতুলের ন্যায় যখন জননী দেবীর চরণে প্রণত হইলেন, তখন প্রত্যাগত কুমারের মুখ দেখিয়া শচী ঠাকুরাণী কাঁদিয়া ফেলিনেন। নিমাই জানিতে পারিলেন সর্পদংশনে তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হইয়াছে। নবীন পণ্ডিত মাতাকে প্রবোধ দিলেন, বিষ্ণু প্রিয়া দেবীর পাণীগ্রহণ করিয়া সেই প্রবোধ সম্পূর্ণ করিলেন; কিন্তু নিজে বোধ হয় প্রবোধ পান নাই। পিতৃপিণ্ড প্রদানার্থ গয়া যাত্রা করিলেন; এবার তাঁহার চিত্ত শোক দ্বারা দ্রব হইয়াছিল, তীর্থ স্থানে যাইয়া ঈশ্বরপুরীর ভক্তির উচ্ছ্বাস দর্শনে নিমাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, ভক্তিময় ঈশ্বর পুরীর মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে একখানা দেব ছবির ন্যায় অপূর্ব্ব বোধ হইল; ঈশ্বর পুরীর জন্মস্থান কুমারহট্ট গয়া হইতেও শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া বোধ হইল;—"প্রভু বলে কুমারহট্টেরে

* চৈতন্যপ্রভুর ব্যাকরণের টীকার কথা অনেক স্থলেই পাওয়া যায়, যথা—"দিনে দিনে ব্যাকরণে হৈয়া চমৎকার। ব্যাকরণে করয় টিপ্পনী আপনার॥" ভক্তি রত্নাকর, ১২ তরঙ্গ।

নমস্কার। শ্রীঈশ্বরপুরী যে গ্রামে অবতার।। * * ঈশ্বর পুরীর জন্ম স্থান। এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ।।” (চৈ, ভা, আদি)। বলিয়া নিমাই অশ্রুনেত্রে কুমারহট্টের ধূলিরেণু দুর্লভ সামগ্রীর ন্যায় উত্তরীয় অঞ্চলে বাঁধিতে লাগিলেন।

ইহার পর আর এক দৃশ্য; সে দৃশ্য চিত্রে অঙ্কিত হওয়ার উপযুক্ত। স্ত্রীবিয়োগকাতর শিক্ষাভিমানী যুবক গয়ায় অঞ্জলি দিতে দাঁড়াইয়াছেন; যে চরণ হইতে ভগবতী গঙ্গা নিঃসৃত, যে চরণে বলি দলিত, যে চরণ-রেণু ধারণ করিতে শুক সন্ন্যাসী, নারদ বৈরাগী, যোগেশ্বরগণ তপোরত—সেই চরণ দেখিতে দেখিতে নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গীগণের যত্নে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, তখন অজস্র নয়নাশ্রু ফুল্লারবিন্দগুচ্ছের ন্যায় সেই শ্রীচরণ উদ্দেশে বর্ষিত হইতেছিল, কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি পথ দেখিতে পান নাই, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সঙ্গীগণকে বলিলেন,—“তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি আর সংসারে যাইব না; আমি প্রাণেশ্বরকে দেখিতে মথুরায় চলিলাম।”

এই অপূর্ব্ব ভক্তিউচ্ছ্বসিত পূর্ব্বরাগের আবেশময় যুবককে সঙ্গীগণ নানা উপায়ে প্রত্যাবর্ত্তিত করিলেন; গৃহে আসিয়া নিমাই সেই পাদপদ্মের কথা বলিতে পারেন নাই,—বলিতে যাইয়া অশ্রুসিক্তকণ্ঠে কথা স্থগিত হইয়াছে; ‘কি দেখিয়াছি’ বলিতে উদ্যত হইয়া একবার শ্রীমানপণ্ডিত আবার গদাধরের কণ্ঠ জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভাষায় ব্যক্ত হয় নাই—তাঁহার মুক্তাদামসম উজ্জ্বল অশ্রুজলে ব্যক্ত হইয়াছিল।

এই প্রেমোন্মত্ত বালককে শচীদেবী পুত্রবধূর রূপ দ্বারা গৃহে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,—“লক্ষ্মীরে আনিয়া প্রভুর নিকটে বসায়। দৃষ্টিপাত করিয়া ও প্রভু নাহি চায়।। কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ। দিবানিশি শ্লোক পড়ি করয় ক্রন্দন।।’, চৈ, ভা, আদি।

ইহার পর কাঁটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ ও সন্ন্যাস অবলম্বন অচিরে সম্পন্ন হইল; তখন তাঁহার বয়স ২৪ মাত্র। (১৫০৯ খৃঃ)।

গয়া গমন অবধি তাঁহার ইতিহাস স্বতন্ত্ররূপ। এরূপ অনির্ব্বচনীয়

সৌন্দর্য্যজড়িত ছবি ইতিহাস যুগ যুগান্তর পরে একবার প্রকটিত করেন। বক্তৃতার গুণে নহে, রূপ দেখাইয়া চৈতন্যদেব পৃথিবী মোহিত করিলেন; শিশিরধৌতকুসুমসৌরভ বক্তৃতা দ্বারা উপলব্ধি করাইতে হয় না; চৈতন্যদেব স্বীয় ভক্তিময় অশ্রুসিক্ত মূর্ত্তিখানা দ্বারে দ্বারে দেখাইয়াছেন, যে দেখিয়াছে সেই ভুলিয়াছে; সত্যবাই লক্ষ্মীবাই—বেশ্যাদ্বয় তাঁহাকে প্রতারিত করিতে যাইয়া কাঁদিয়া পদে স্মরণ লইয়াছে; ভীলপন্থ, নরোজী প্রভৃতি দস্যুগণ তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া কাঁদিয়া পায় ধরিয়াছে। হরিনাম করিতে করিতে অঙ্গ পুলকিত ও চক্ষু মুদিত হইয়াছে, তখন সেই চক্ষু ফাটিয়া অতি মনোহর মুক্তাদাম পতিত হইয়াছে, তমালকে জড়াইয়া কাঁদিয়াছেন; কদম্ব বৃক্ষ দেখিয়া অজ্ঞান হইয়াছেন; বিষ্ণুর উদ্দেশে যে ভোগ প্রদত্ত হইয়াছে সেই ভোগের অন্ন খাইতে চক্ষু, জলে আর্দ্র হইয়াছে ও একএকটি অন্ন অমৃত জ্ঞানে খাইয়া পাগল হইয়াছেন; বেঙ্কট নগরের নিকট এক বৃক্ষতলে চারিদিন চারিরাত্র পাগলের মত হরি হরি বলিয়া কাঁদিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, এই সময়ের মধ্যে আহার, নিদ্রা, বাহজ্ঞান কিছুই ছিল না। যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি বিদ্বেষযুক্ত ভাব লইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেও তাঁহার অপূর্ব্ব গৌরবর্ণ কান্তিতে বিদ্যুৎলহরী, অশ্রুসিক্ত মুখখানায় আশ্চর্য্য ভক্তির ছটা দেখিয়া কাঁদিয়া 'হরি বোল' বলিয়াছে। সত্যই যমুনা ভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন; পুণানগরে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল—"তোমার হরি ঐ পুষ্করিণীতে আছেন" তখন চৈতন্য জলে ঝাঁপ দিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই মূর্ত্তি ধ্রুব, প্রহ্লাদের প্রতিচ্ছায়া।

এই অপূর্ব্ব মনুষ্যটিকে দেখিয়া জাতীয় জীবনে যে বিস্ময় ও প্রেম জন্মিয়াছিল,—তাহা অলৌকিক উচ্ছ্বাসময়। শ্রীবাসঅঙ্গনে সারারাত্রি চৈতন্যদেব সঙ্গীগণ সহ হরিনাম কীর্ত্তনে উন্মত্ত ছিলেন, নিশি কিরূপে ভোর হইল তাহা তাঁহারা জানেন নাই। এই অপূর্ব্ব সম্মিলনের সুখ উপভোগের বস্তু, ভাষায় ব্যক্ত হওয়ার যোগ্য নহে,—"চমকিত হৈয়া সবে চারিদিকে চায়। নিশি পোহাইল বলি কান্দে উভরায়। কোটি পুত্রশোক ও এত দুঃখ নহে। যে দুঃখে বৈষ্ণব সব অরুণেরে চাহে।" চৈ, ভা, মধ্য খণ্ড। অদ্বৈতগোঁসাই বলিয়াছিলেন,—"শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়। তথাপি প্রভুর নিন্দা সহন না

যায়।।" লোকবৃন্দের ভক্তি এতদূর হইয়াছিল,—"যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে। সে মৃত্তিকালয় লোকে গর্ত্ত হয় পথে।।" চৈ, চ, মধ্য, ১ম পঃ। চিরসঙ্গী গোবিন্দ-ভৃত্য পুরীতে চৈতন্যদেবের নিকট হইতে শান্তিপুর পত্র লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইলে, দুদিনের বিচ্ছেদ ভাবিয়াই ব্যাকুল হইয়াছিল। 'এই বাক্য শুনি মোর চক্ষে বারি বহে। প্রভুর বিরহবাণ প্রাণে নাহি সহে।। (করচা।) হরি-দর্শনেচ্ছু অশ্রুপূর্ণ চক্ষুদ্বয় দ্বারা যেদিকে চাহিয়াছেন, সেইদিকে কুসুমগুচ্ছ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে,—'বিশাল নয়নে যেইদিগে যবে চায়। সেইদিগে নীলপদ্ম বরষিয়া যায়।।', (গোবিন্দ দাসের করচা)। পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দ দাস "যঁহি যঁহি তরল বিলোচন পড়ই। তঁহি তঁহি নীল উৎপল ভরই।।"—পদে এই মূর্ত্তির আবেশময় প্রতিবিম্ব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণনাগুলিতে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন নাই। আমরা অলৌকিক শক্তির স্ফুরণ দেখি নাই, যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা উপমা ও অলঙ্কার ভিন্ন কথা কহিতে পারেন নাই, তাই পৃথিবীর ধর্ম্মকাব্যগুলি রূপকথার ন্যায় বোধ হয়।

বাঙ্গালী নবদ্বীপের ছেলেটির রূপে গুণে এখনও মোহিত রহিয়াছে, এখনও সেই স্মৃতিতে সদ্যঃজাত প্রিয় বালকের মুখ চুম্বন করিয়া তাহাকে 'নবদ্বীপচন্দ্র' 'নগরবাসী' 'নদেবাসী' প্রভৃতি নাম দিয়া ৪০০ বৎসর পূর্ব্বের শিশুটির প্রতি প্রগাঢ় ভালাবাসা জানাইয়া থাকে।

তাঁহার জীবনে ধর্ম্মনীতি।

ফুলের মৃদুতা মেয়েলী গুণ; "মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়। পুষ্পসম কোমল কঠিনবজ্রময়।।"* কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি।—পৌরুষ ভিন্ন পুরুষ হয় না, ফুলভারানতাব্রততীজড়িত দেবদারুর ন্যায় প্রকৃত পুরুষ নানা কোমল গুণ বেষ্টিত হইয়া স্বীয় চরিত্রের অনমনীয়ত্ব অখণ্ডভাবে স্থাপন করেন। চৈতন্যদেবের চরিত্রে কোমলত্ব ও পৌরুষ মিশিয়া গিয়াছিল। একদিক হইতে সেই চরিত্রের ভক্তি, প্রেম ও বিনয় ফুল্লপুষ্পের ন্যায় মনোহর দেখায়, অন্যদিক হইতে সে চরিত্রের দৃঢ়ত্ব বিস্ময় উৎপাদন করে; একদিকে পাহাড়ের ন্যায় ঋজু বিরাট, অন্যদিকে অলি গুঞ্জরিত ফুলময়। কিন্তু তাঁহার বিনয় ও প্রকৃত বীররসে পুষ্ট—উহার মৃদুতায় ও দৃঢ়তা আছে;

* "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।" উত্তরচরিতম্‌।

গঙ্গার ঘাটে তিনি লোক পরিচর্য্যায় নিযুক্ত;—"তোমা সব সেবিলে সে কৃষ্ণ ভক্তি পাই। এতবলি কারু পায় ধরে সেই ঠাঞি॥ নিজাড়য়ে বস্ত্র কারু করিয়া যতনে। ধুতি বস্ত্র তুলি কার দেনত আপনে॥ কুশ গঙ্গা মৃত্তিকা কাহার দেন করে। সাজি বহি কোন দিন চলে কার ঘরে॥" (চৈ, ভা, মধ্য।) তিনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণগণ শূদ্রজাতির উপর পরিচর্য্যার ভার দিয়া অনেক দিন হয় হস্তের পুণ্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন,—তাই এ বিনয় বীরের যোগ্য।

কিন্তু এই মৃদু ফুল-সম ব্যক্তি কোনও সময় বজ্রবৎ কাঠিন্য দেখাইতেন; তাঁহার নির্ম্মল প্রীতিতে যদি কেহ বিলাসের পঙ্ক মিশাইতে যাইত, তখন এই মধুর প্রেমবিগলিত ছবি একটি উজ্জ্বল বজ্রময় মূর্ত্তিতে পরিণত হইত। জগদানন্দ একটি তুলার বালিস তাঁহার জন্য রাখিয়াছিল, তজ্জন্য "জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে" বলিয়া তিনি তাঁহাকে অশেষরূপ ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, এক ব্যক্তি এক হাড়ি সুগন্ধি তৈল তাঁহাকে উপঢৌকন দিয়াছিল, প্রভুর আদেশে সেই তৈলহাড়ি আঙ্গিনায় ভগ্ন করিতে হইল। হরিদাস স্ত্রীলোকের নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিল, "প্রভু কহে সন্ন্যাসী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥" (চৈ চ অন্ত্যখণ্ড)। চৈতন্য তাহার মুখ আর দেখেন নাই। সনাতন ধনীর পুত্র, তিন টাকা মূল্যের একখানা ভোটকম্বল গায় দিয়া আসিয়াছিল, কৌপিনসার চৈতন্যদেব নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে নানাপ্রকার সদালাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু "ভোট কম্বলের পানে প্রভু চাহে বারে বার।" সুতরাং তাঁহার ভোটকম্বল ত্যাগ করিতে হইল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন যে দিন মুখ হইতে বহির্গত হইল, সেদিন সমস্ত নবদ্বীপবাসী শোকোন্মত্ত ভাবে স্নেহের বাহুদ্বারা তাঁহাকে জড়াইয়া রাখিতে চাহিল, তাঁহার শোকক্ষিপ্ত মাতা দ্বাদশ দিন উপবাস করিলেন, "দ্বাদশ উপাসে আই করিলা ভোজন।" (চৈ, ভা, মধ্য)। নির্ম্মম সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমন করিতে যাওয়ার সময় শত শত লোক তাঁহার সঙ্গে যাইতে পাগল প্রায়, কাহারও অশ্রুজল লক্ষ্য না করিয়া একমাত্র ভৃত্য সঙ্গে চৈতন্য চলিয়া গেলেন। রামানন্দরায়ের বাড়ীতে বিষ্ণু-মন্দির পরিষ্কার করিতে বহুবিধ লোক নিযুক্ত কিন্তু শেষে দেখা গেল উপবাস-ক্ষীণ কৃষ্ণবিরহে ছিন্নদেহ চৈতন্যের আহৃত বোঝাই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এই কষ্টসহিষ্ণু কৌপিনধারী সত্যবাক্য

বিষয়নিস্পৃহ ব্রাহ্মণবালক সেই প্রাচীন ঋষিগণেরই বংশধর, যুগে যুগে সেই ব্রহ্মনিষ্ঠাপূর্ণ শোণিতের বিশুদ্ধতা হিন্দু সমাজে এইভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে।

সময় আছে যখন আরাধ্য ও আরাধক এক হইয়া যায়; ভাগবতে তদবস্থায় গোপীগণ নিজকে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রম করিতেছেন; গোপীগণ,—"সকলেই কৃষ্ণাত্মিকা হইয়া পরস্পর আমিই এই কৃষ্ণ' এই প্রকার কহিতে লাগিলেন" (ভাগবত, ১১ম স্কন্ধ, ৩০ অঃ, ৩ শ্লোক)। জয়দেব ও রাধার এই অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, "মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা। মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥" বিদ্যাপতির গীতে ও সেই কথার পুনরুক্তি আছে "অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে, সুন্দরী ভেল মাধাই॥" ইহাই যোগীর "সোহং", খ্রীষ্টের "আমি এবং আমার পিতা এক।" এইরূপ মুহূর্ত্ত চৈতন্যদেবের জীবনে ও হইত বলিয়া বর্ণিত আছে। যদি ফুল্লপদ্মে ভ্রমর পতিত হইলে হর্ষ-উচ্ছ্বসিত পদ্ম স্বীয়দল মুদিত করিয়া ভ্রমরকে সম্ভোগ করে, তখন অন্তঃপ্রবিষ্ট ভ্রমরযুক্ত পদ্মটি যেরূপ পূর্ণ আনন্দের চিত্র হইয়া দাঁড়ায়, চৈতন্যপ্রভু ও সেইরূপ যাঁহাকে খুঁজিতেন তাঁহাকে সময়ে সময়ে হৃদয়ে পাইয়া মুদিত হইতেন, তখন তাঁহার ছবি অমানুষী প্রফুল্লভাব ধারণ করিয়াছে—বাঞ্ছিতের আলিঙ্গনে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া তখন "মুঞি সেই মুঞি সেই কহি কহি হাসে।" (চৈ, ভা, মধ্য)। সেই সময় তাঁহার মূর্ত্তি সাধারণ মনুষ্য হইতে স্বতন্ত্র হইত, তখন তাঁহার শরীরের দিব্যপ্রভা দর্শনে বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য ও তুলসি চন্দন দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়াছেন।

কিন্তু ঐ ভাব অল্প-কালব্যাপক, তদবসানে চৈতন্যদেবের বাহ্যজ্ঞান হইয়াছে, তখন তাঁহাকে যে ঈশ্বর সম্বোধন করিয়াছে, তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্য হইতে উড়িষ্যায় প্রত্যাগত হইলে বাসুদেব সার্ব্বভৌম গললগ্নকৃতবাস ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ঈশ্বর জ্ঞানে তাহার বন্দনা পাঠ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "প্রভু কহে সার্ব্বভৌম আর কথা কহ। আতাল পাতাল কথা কেন বা বলহ॥" (গোবিন্দের কড়চা) রামানন্দ রায় তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলাতে চৈতন্যদেব সবিনয়ে উত্তর করিলেন, "প্রভু কহে আমি মানুষ আশ্রমে সন্ন্যাসী। কায়মন বাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি। শুক্লবস্ত্রে মসী বিন্দু যৈছে না লুকায়। সন্ন্যাসীর অল্পছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়। * * * পূর্ণিতের দুগ্ধের কলস। সুরাবিন্দু পাতে কেহ তাহে না করে পরশ॥" (চৈ, চ [illegible])।

এক গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বিষ্ণুমন্দিরে তাঁহার পাদোদক পান করিয়াছিল, প্রভুর অসন্তোষহেতু সেই ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। চণ্ডীপুরে ঈশ্বর ভারতী তাঁহাকে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া সম্বোধন করাতে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীবাসঅঙ্গনে হরির নামে সংকীর্ত্তন না করিয়া 'চৈতন্যজয়' বলিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করায় তিনি বিরক্ত হইয়া তাহা স্থগিত করিয়া দিলেন। বাহুল্য ভয়ে আর উদাহরণ দিব না, এরূপ অনেক স্থলেই পাওয়া যাইবে। তাঁহার মতে বিনয়ী জগতে দুর্লভ, তিনি অহঙ্কারীকে বিনয় দ্বারা পরাজয় করিয়াছেন; বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সঙ্গে প্রথম দর্শনের পর বৃদ্ধঅধ্যাপক চৈতন্যদেবকে অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করার জন্য ভর্ৎসনা করিলেন এবং প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন এবয়সে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার নাই; তদুত্তরে "প্রভু কহে শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়। সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিও নিশ্চয়॥ কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া। বাহির হইনু শিখা সুত্র মুড়াইয়া॥ সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি। কৃপাকর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥" (চৈ, ভা, মধ্য।) তুঙ্গভদ্রাবাসী ঢুণ্ডিরাম তীর্থ তাঁহার সঙ্গে বিচার করিতে চাহিলে চৈতন্যদেব "মুরখ সন্ন্যাসী মুহি কিছু নাহি জানি" বলিয়া তাঁহাকে 'জয়পত্র' লিখিয়া দিতে চাহিলেন। চণ্ডীপুরে ঈশ্বরভারতীকে ও রামেশ্বরতীর্থে একযোগীপণ্ডিতকে ও তিনি এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন; কিন্তু এইসব পণ্ডিতগণ সকলেই তাঁহার নয়নাশ্রুশিক্ত হরির নাম শুনিয়া, তাঁহার ব্যাকুল উন্মত্ততা দেখিয়া করযোড়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন; আর যেখানে তিনি ইচ্ছাক্রমে তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন তখন অবলীলাক্রমে সমস্ত দর্শন ও ন্যায়ের যুক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া সর্ব্বশেষ উন্মত্তবৎ হরি নামের কথা কহিতে কহিতে উপদেশ শেষ করিতেন, তখন কদম্বকোরকের ন্যায় অঙ্গ পুলকিত হইত ও হরি নাম বলিতে বলিতে কাঁদিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন; বড় বড় পণ্ডিত তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান, প্রতিভা ও যুক্তির প্রবলমুখে যখন তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে উদ্যত, তখন সহসা বিস্ময়স্ফারিতনেত্রে তাঁহারা অভিনব সৌন্দর্য্যজড়িত ভক্তিময় এই দেবরূপ দেখিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া কৃতার্থ হইতেন, লজ্জা বোধ করিতেন না। চৈতন্যদেব ২০ বৎসরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ১৮ বৎসর নীলাচলে বাস করেন, ৬ বৎসর দাক্ষিণাত্য, বৃন্দাবন, গৌড় প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনে ব্যয় করেন।

৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে (১৫৩৩ খৃঃ আষাঢ়ের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে, রবিবার দিনে) তাঁহার অপূর্ব্ব লীলার অবসান হয়।

অদ্য ৪০০ বৎসর পরে পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিমান ও স্পর্দ্ধা সহকারে অগ্রসর নবযুবক সমাজে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করিতে নিজকে অসমর্থ ও হীনবল মনে করিতেছেন, সেই সময়ের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তনয় সমাজের মস্তকে ও চরণে—ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে সেই সমবেদনাসূচক প্রীতি জাগাইয়া দিয়াছিলেন। প্রেমের অভয় পতাকা উড্ডীন করিয়া "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ" বলিয়া বেড়াইয়াছিলেন; ইতর জাতির অন্ন গ্রহণ করিলে সামাজিক খর্ব্বতা হউক কিন্তু হরিভক্তির দাওয়া লুপ্ত হয় না,—"প্রভু বলে যেজন ডোমের অন্ন খায়। কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্বথায়॥" (চৈ, ভা, অন্তখণ্ড) "মুচি যদি ভক্তিসহ ডাকে কৃষ্ণধনে। কোটী নমস্কার করি তাহার চরণে॥" (গোবিন্দের করচা)। দেবরূপী মনুষ্য মনুষ্য জাতির সম্মান বুঝিয়াছিলেন এবং শ্রেণীবিশেষে সমস্ত মনুষ্য জাতির প্রাপ্য মর্য্যাদা সীমাবদ্ধ নহে, একথা বিনয় সহকারে কিন্তু অটল বীরত্বের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পৌরাণিক ব্যক্তিগণ ব্যতীত ইদানীং কালের মনুষ্যগণের ও জীবনচরিত লিপিবদ্ধ হইতে পারে, ইহা সে সময় হিন্দু-সমাজের বিশ্বাসের কথা ছিল না; সমাজ পিঞ্জরে আবদ্ধ পুতুলগণ শাস্ত্রের শ্লোক বলা অভ্যাস করিয়াছিল কিন্তু নিজের নৈসর্গিক বুলি ভুলিয়া গিয়াছিল। চৈতন্যদেবের প্রভাবে শ্লোকপরম্পরানিয়ন্ত্রিত যন্ত্রবৎ মনুষ্য জীবনে এক অভিনব প্রাণশক্তির সঞ্চার হয়; পুরুষোচিত সরলতা ও উদ্যম সহকারে মনুষ্য চরিত্র পুনরায় গঠিত হয়, তাই জীবন-চরিত সাহিত্য এই সময়ে বঙ্গভাষার এক নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দেয়। নরহরির ন্যায় কত ব্রাহ্মণ অসংখ্য প্রণিপাত সহকারে নরোত্তমের ন্যায় শূদ্রের জীবন আখ্যান বর্ণন করিয়া ধন্য হইয়াছেন;—ইহা বঙ্গসমাজের নব সামগ্রী। সাহিত্যের প্রতিবিম্বে ফলিত তাৎকালিক সমাজে চৈতন্যদেবের চরিত্রের এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্যের রশ্মিপাত দৃষ্ট হয়। সাহিত্য ও সমাজের উন্নতির কথা ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে, তিনি ধর্ম্মজগতে চিরকালের জন্য এক অপূর্ব্ব বস্তু রাখিয়া গিয়াছেন,—যাহার অফুরন্ত সুধা যুগ যুগান্তরের জন্য হিন্দুর

উপভোগার্থ সঞ্চিত থাকিবে, উহা তাহার চিরস্মারক নাম মহাত্মা প্রচার, কলিযুগের নব গায়িত্রী—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

পদাবলি-সাহিত্য।

আমরা পুনর্ব্বার পদাবলি-সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি; বলা নিষ্প্রয়োজন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ব্যতীত বঙ্গীয় তাবৎ পদকর্ত্তাই চৈতন্য প্রভুর সমকালিক অথবা পরবর্ত্তী। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পদসমুদ্র ও পদকল্পতরু অবলম্বন করিয়া পদ সংখ্যা সমেত একটি কবি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন; আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

	কবি	পদ সংখ্যা।		পদ	পদ সংখ্যা।
১।	বিদ্যাপতি ...	১৫০	২০।	কানু দাস ...	১৩
২।	শ্যামানন্দ ...	৭	২১।	আত্মারাম দাস ...	৪
৩।	গৌরমোহন ...	১	২২।	জগমোহন দাস ...	২
৪।	গোকুল দাস ...	১	২৩।	শিবাই দাস ...	৫
৫।	নন্দন দাস ...	১	২৪।	চূড়ামণি দাস ...	১
৬।	বিন্দুদাস ...	২	২৫।	কৃষ্ণকান্ত দাস ...	২৯
৭।	শিবরায় ...	১	২৬।	ঘনরাম দাস ...	১৪
৮।	যদুপতি ...	১	২৭।	নৃসিংহ দেব ...	৪
৯।	রঘুনাথ ...	১	২৮।	বিপ্রদাস ঘোষ ...	৬১
১০।	গোপাল ভট্ট ...	১	২৯।	মাধব দাস ...	[illegible]
১১।	সদানন্দ ...	১	৩০।	যাদবেন্দ্র ...	৩
১২।	যদুনাথ দাস ...	১৭	৩১।	নবচন্দ্র দাস ...	২
১৩।	গোপীকান্ত ...	১	৩২।	বলাই দাস ...	৩
১৪।	বলরাম দাস ...	১৩১	৩৩।	ধরনী দাস ...	১
১৫।	বিশ্বম্ভর দাস ...	২	৩৪।	বসু রামানন্দ ...	৯
১৬।	রাধামাধব ...	১	৩৫।	মথুর দাস ...	১
১৭।	মাধবী দাস ...	১৭	৩৬।	গোবর্দ্ধন দাস ...	[illegible]
১৮।	বলদেব ...	১	৩৭।	জ্ঞানদাস ...	[illegible]
১৯।	[illegible]প্রমোদ দাস ...	২	৩৮।	আত্মারাম দাস ...	১

	পদ	পদ সংখ্যা।
৩৯।	সুন্দর দাস ...	২
৪০।	শ্যাম দাস ...	২
৪১।	কালী কিশোর ...	১১৯
৪২।	গোবিন্দ দাস ...	৪৫৮
৪৩।	উদ্ধব দাস ...	১০২
৪৪।	গৌর দাস ...	২
৪৫।	দৈবকীনন্দন দাস ...	৪
৪৬।	শঙ্কর দাস ...	৪
৪৭।	রামকান্ত ...	১
৪৮।	বাসুদেব ঘোষ ...	১৩৪
৪৯।	রাধামোহন ...	৪২৮
৫০।	দ্বিজনন্দ ...	১
৫১।	পুরুষোত্তম ...	১২
৫২।	শচীনন্দন দাস ...	৩
৫৩।	ভুবন দাস ...	১
৫৪।	শিবানন্দ ...	৩
৫৫।	চন্দ্রশেখর ...	৩
৫৬।	রসময় দাস ...	২
৫৭।	মধুসূদন ...	৫
৫৮।	যদুনন্দন ...	৯৫
৫৯।	গোবিন্দ ঘোষ ...	১২
৬০।	রামচন্দ্র দাস ...	৪
৬১।	চণ্ডীদাস ...	১১৯
৬২।	মুরারি গুপ্ত ...	৫
৬৩।	মাধব ঘোষ ...	৮
৬৪।	রায় রামানন্দ ...	১৫
৬৫।	নরোত্তম দাস ...	৮৭
৬৬।	নরহরি দাস ...	৮১
৬৭।	বল্লভ দাস ...	২৬
৬৮।	বসন্ত দাস রায় ...	৪১
৬৯।	অনন্ত দাস ...	৪৭
৭০।	চম্পতি ঠাকুর ...	১৬

	পদ	পদ সংখ্যা।
৭১।	লোচন দাস ...	২০
৭২।	গোপাল দাস ...	৫
৭৩।	কৃষ্ণদাস কবিরাজ...	২২
৭৪।	শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ ...	৫
৭৫।	গদাধর ...	৩
৭৬।	বৃন্দাবন দাস ...	৩৩
৭৭।	বংশীবদন দাস ...	৩৪
৭৮।	সুবল ...	২
৭৯।	মাধবাচার্য্য ...	৫
৮০।	কবিরঞ্জন ...	৯
৮১।	রাধাসিংহ ভূপতি	৪
৮২।	জগন্নাথ দাস ...	৯
৮৩।	সিংহ ভূপতি ...	৭
৮৪।	বৈষ্ণব দাস ...	২৭
৮৫।	শ্রীনিবাস ...	৩
৮৬।	বীরনারায়ণ ভূপতি	২
৮৭।	মনোহর দাস ...	৪
৮৮।	পরমেশ্বর দাস ...	১
৮৯।	বসন্ত রায় ...	১০
৯০।	দ্বিজ ভীম ...	১
৯১।	হরেকৃষ্ণ দাস ...	২
৯২।	লক্ষ্মীকান্ত দাস ...	১
৯৩।	ব্রজানন্দ ...	১
৯৪।	হরিদাস ...	৭
৯৫।	মোহন দাস ...	২৭
৯৬।	গৌরী দাস ...	৭
৯৭।	পরমানন্দ দাস ...	১১
৯৮।	গৌরসুন্দর দাস ...	৩
৯৯।	হরি বল্লভ ...	৪
১০০।	রাধাবল্লভ ...	১৯
১০১।	শিবরাম ...	২২
১০২।	[illegible] দাস ...	৪

পদ	পদ সংখ্যা।	পদ	পদ সংখ্যা।
১০৩। রামচন্দ্র দাস* ...	২	১১০। প্রেম দাস ...	৩১
১০৪। দীনহীন দাস ...	৩	১১১। ভূপতি নাথ ...	৪
১০৫। রাম দাস ...	২	১১২। রসিক দাস ...	৩
১০৬। কাণাদাস ...	৪	১১৩। হরেরাম দাস ...	২
১০৭। নয়নান্দ দাস ...	২৫	১১৪। নরানন্দ ...	১
১০৮। জগদানন্দ দাস ...	৪	নাম শূন্য ...	২৮৭
১০৯। চৈতন্য দাস ...	১৫		

পদকল্পলতিকা, গীতচিন্তামণি প্রভৃতি সংগ্রহপুস্তকে আরও কতকগুলি নাম বেশী পাওয়া যায়; এস্থলে আমরা আর একটি ক্ষুদ্র তালিকা প্রদান করিলাম।

কবি	পদ সংখ্যা।	পদ	পদ সংখ্যা।
১১৫। রাম রায় ...	১	১৩১। কান্ত ...	১
১১৬। আনন্দ দাস ...	১	১৩২। গিরিধর ...	১
১১৭। মুরারি দাস ...	১	১৩৩। দ্বিজ রাজেন্দ্র ...	২
১১৮। গুপ্ত দাস ...	৫	১৩৪। শশি শেখর ...	৩
১১৯। প্রসাদ দাস ...	২	১৩৫। দ্বিজ হরিদাস ...	২
১২০। বিজয়ানন্দ দাস ...	১	১৩৬। দ্বিজ গঙ্গারাম ...	৩
১২১। দীন ঘোষ ...	১	১৩৭। শিবা সহচরী ...	১
১২২। নৃপতি সিংহ ...	১	১৩৮। দুঃখিনী ...	২
১২৩। রামানন্দ দাস ...	১	১৩৯। তুলসী দাস ...	১
১২৪। গোপীরমন দাস ...	১	১৪০। প্রেমানন্দ দাস ...	৫
১২৫। জ্ঞানহরি দাস ...	২	১৪১। নয়নানন্দ ...	১
১২৬। বীর বল্লভ ...	১	১৪২। শ্যামচাঁদ দাস ...	১
১২৭। বীরচন্দ্র কর ...	১	১৪৩। বীর হাম্বির ...	২
১২৮। নরসিংহ দাস ...	১	১৪৪। জয়কৃষ্ণ দাস ...	১
১২৯। কামদেব ...	১	১৪৫। মহেশ বসু ...	১
১৩০। প্রতাপ নারায়ণ ...	১		

ইহা ছাড়া ৯ জন মুসলমান কবির পদ পাওয়া গিয়াছে।

এই দুই তালিকা সম্পূর্ণ কিম্বা বিশুদ্ধ নহে। পদ সমুদ্র গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই; এখনও অনেক গীতি-সংগ্রহ পুঁথি কাষ্ঠচাপে আবদ্ধ

* এই নাম দিতিতে দুইবার পাইতেছি, ৬০ সংখ্যক নাম দেখুন।

দশায় আছে; তাহাদের একটা সদগতি হইলে অনেক লুপ্ত কবির পদ পাওয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যায়। ইহা ছাড়া প্রদত্ত তালিকায় এক কবির নামে স্থানে স্থানে ২, ৩ কি ততোধিক কবির পদ পরিচিত হইয়াছে,—নিম্নলিখিত 'গোবিন্দগণ' বিখ্যাত পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসের নামের আড়ালে পড়িয়া যাইতে পারেন * ; দাস শব্দের সাধারণতন্ত্রে স্বাতন্ত্র্য সূচক উপাধিগুলি লুপ্ত হওয়াতে পদদ্বারা তাঁহাদের পরিচয়ের পথ রুদ্ধ হইয়াছে,—

(১) গোবিন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী—ইনি চৈতন্যের অনুচর ও নবদ্বীপবাসী। (২) শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র যাজিগ্রাম নিবাসী গোবিন্দ আচার্য্য। ইনি "গতিগোবিন্দ" নামে পরিচিত; ('জয় জয় শ্রীগতি গোবিন্দ রসময় জয় তছু ভকত সমাজ" পদকল্পতরু)। (৩) গিরীশ্বর দত্তের পুত্র গোবিন্দ দত্ত। (৪) কুলীনগ্রামবাসী গোবিন্দ ঘোষ; ইনি মধ্যে মধ্যে 'দাস' উপাধি গ্রহণ না করিয়া 'ঘোষ' সংজ্ঞা দ্বারাও ভণিতা দিয়াছেন; ("গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই। যা সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি" চৈ, চ)। (৫) কাশীশ্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্য উৎকলবাসী গোবিন্দ। (৬) প্রসিদ্ধ করচা লেখক গোবিন্দ কর্ম্মকার।

বলরাম দাস ও ৪।৫ টী স্বতন্ত্র ব্যক্তির নাম বলিয়া বোধ হয়।

(১) মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য হইতে আগমন সময় পুরীতে এক বলরামদাসকে শিঙ্গা বাজাইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে দেখা যায়। ("রাম শিঙ্গা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত। বলরাম দাস আসে হয়ে পুলকিত।" গোবিন্দের করচা)। বৈষ্ণব বন্দনায় ৩ জন বলরামের নাম উল্লিখিত আছে। (২) "সংগীতকারক বন্দো বলরাম দাস। নিত্যানন্দধর্ম্মে যার সুদৃঢ় বিশ্বাস॥" (৩) কানাই খুটিয়া বন্দো বিশ্বের প্রচার। জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যার॥" বৈষ্ণব বন্দনা (৪) "বন্দো উড়িয়া বলরামদাস মহাশয়। জগন্নাথ বলরাম যস্য যার হয়।" (৫) প্রেমবিলাস রচক নিত্যানন্দ দাস ও "বলরাম" নামে পরিচিত। (৬) নরোত্তমবিলাসে 'পূজারি বলরাম' নামধেয় নরোত্তম ঠাকুরের একজন শিষ্য দেখা যায়। (৭) উক্ত পুস্তকে 'বলরাম কবিরাজ' নামক অপর এক 'বিজ্ঞ' ব্যক্তির উল্লেখ আছে। (৮) পদকল্পতরুর ভূমিকায়—"কবিনৃপ বংশজ ভুবনবিদিতযশ জয় ঘনশ্যাম বলরাম।" পাওয়া যায়। (৯) অদ্বৈত আচার্য্যের এক পুত্রের নাম বলরাম ছিল। এই বলরাম সম্প্রদায়ের ৯ জনই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না। সম্প্রতি শিশির বাবু স্বীয়কৃত সুন্দর সুন্দর পদে 'বলরাম দাস' ভণিতা দেওয়াতে এই বলরাম সমস্যা কালে আরও জটিল হইবে বলিয়া বোধ হয়।

* পূর্ব্বকালেপ্রায় প্রত্যেক বৈষ্ণবই পদ রচনা করিতেন; সুতরাং ইঁহারা তাদৃশ পদকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ না করিলেও পদকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

(১) যদুনন্দনচক্রবর্ত্তী * ও (২) যদুনন্দনদাস উভয়েই পদ কর্ত্তা সুলেখক; চক্রবর্ত্তী অনেক স্থলে 'দাস' সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন, ইঁহার বাড়ী কাটোয়া, ইনি গদাধরের শিষ্য ও চৈতন্ত প্রভুর চরিত লেখক, ("যদুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চর্য্য।—দীনপ্রতি চেষ্টা যৈছে না কহিলে নয়। বৈষ্ণব মণ্ডলে যার প্রশংসাতিশয়॥ যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত্র। দ্রবে দারু পাষাণাদি শুনি যার গীত॥" ভক্তিরত্নাকর)।

(১) শ্রীখণ্ড নিবাসী নরহরি সরকার চৈতন্ত প্রভুর পার্ষদ ও বৈষ্ণব সমাজে একজন পরিচিত পদকর্ত্তা। (২) জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রসিদ্ধ চরিত-লেখক, ইনি ও একজন পদকর্ত্তা—ইঁহার দ্বিতীয় নাম ঘনশ্যাম।

এইরূপ অনেক স্থলেই বহুবিধ নাম পাওয়া যায়, অথচ এক নাম দ্বারাই পদকর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন; এবিষয়ে যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত, তাঁহারা সুবিচার দ্বারা মৃত কবিগণের আত্মার সম্যক তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ স্থল। সুতরাং প্রদত্ত কবি-তালিকা বিশুদ্ধ নহে; উহা এখন ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই; লুপ্ত কবিগণের উদ্ধার কার্য্য শেষ হইতে বিলম্ব আছে; তাহা ছাড়া শাস্ত্রীমহাশয় পদকল্পতরু হইতে মুসলমান কবিগণের নাম বাদ দিয়াছেন; মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণ লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা কৌতুকাবহ বিষয়, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ১২৯৯ সনের ভাদ্রের সাহিত্যে দুইজন কবির উল্লেখ করিয়াছিলেন, অল্পদিন হয় শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় সর্ব্বসমেত ৯ জন বৈষ্ণব কবির পদ প্রকাশ করিয়াছেন, ইঁহাদের নাম ও পদ সংখ্যা এই,— (১) "সৈয়দ মর্ত্তুজা ৪; (২) নসির মামুদ ২, (৩) আকবর সাহা ১, (৪) ফকির হবির ১, (৫) সালবেগ ১, (৬) কবীর ১, (৭) সেখলাল ১, (৮) ফতন ১, (৯) সেকভিক ১।

শাস্ত্রী মহাশয়ের তালিকায় বিদ্যাপতির পদ সংখ্যা ১৫০ ও চণ্ডীদাসের পদ সংখ্যা ১১০ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণে বিদ্যাপতির ১৮৬ টি পদ, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সংস্করণে চণ্ডীদাসের ১৯৬টি পদ প্রদত্ত হইয়াছে।

বৈষ্ণবযুগের চরিত-শাখা সাহিত্য অতি সুবিস্তার; বড় বড় মহাজনগণের জীবন বর্ণনায় প্রাসঙ্গিক নানা কবির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে; এই ঐতিহাসিক অরণ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকৃততত্ত্ব সংগ্রহ করা অতি কঠিন কার্য্য; শুধু 'দাস' শব্দের বাহুল্য দ্বারা কাঠিন্য বৃদ্ধি হইয়াছে, এমত নহে

* যদুনন্দন চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীর নাম ছিল লক্ষ্মী; ইঁহার দুই কন্যা শ্রীমতী ও নারায়ণী দেবীকে নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র বিবাহ করেন।

কেহ কেহ বিদ্যাপতিকে 'বিদ্যাবল্লভ' লিখিয়া ফেলিয়াছেন। * শ্যামানন্দপুরী নিজকে "দুঃখিনী" ও শিবানন্দ আপনাকে "শিবাসহচরী" বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন। † পাঠক মেয়েলী নাম পাইয়া স্ত্রী কবির খোঁজ করিতে করিতে দেখিবেন, ভক্তির ইন্দ্রজালে পুরুষগণ স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতিতে প্রতিভাত হইয়াছেন।

পদকর্ত্তাগণের জীবন-চরিত সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় নাই; বড় বড় কবিগণের জীবনের অতি যৎকিঞ্চিৎ বিবরণই পাওয়া যায়; কবিগণের সুন্দর পদগুলি আছে, প্রকৃতির বাগানে কুসুম রাশির ন্যায় তাহারা অসংখ্য; মনুষ্যের সুন্দর কর্ম্ম ও তরুর ফুল্ল ফুল একই নিয়মে উৎপাদিত। বৃক্ষ ও মনুষ্য উপলক্ষ্য মাত্র;—আমরা প্রকৃত কর্ত্তাকে না পাইয়া উপলক্ষ্যে কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া থাকি; আপাততঃ এইরূপ দর্শনের সহায়তা গ্রহণ করিয়া কবিগণের জীবনি না পাওয়ার ক্ষোভ জনিত দুঃখ হইতে সান্ত্বনা লাভ করা যাউক।

এ স্থলে আমরা প্রসিদ্ধ কয়েকজন পদকর্ত্তা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ দিতেছি। এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ চৈতন্য-সহচর পরমভাগবত চিরঞ্জীবসেনের পুত্র ও শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও কবি দামোদরের দৌহিত্র। চিরঞ্জীব সেন শ্রীখণ্ডের নরহরিসরকারের শিষ্য ও তাঁহার বাড়ী কুমারনগর ছিল; কিন্তু তিনি দামোদরের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্রীখণ্ডে আসিয়া বাস করেন। উত্তরকালে তাঁহার পুত্রদ্বয় পুনরায় কুমারনগরে পৈত্রিক বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন কিন্তু উক্ত স্থানের বৈষ্ণবদ্বেষী শাক্তগণ দ্বারা উৎপীড়িত হওয়াতে পদ্মা-পারস্থিত তেলিয়া বুধরী গ্রামে বাড়ী করেন।

গোবিন্দদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ নরোত্তম ঠাকুরের সুহৃদ ও স্বয়ং প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি ছিলেন। রামচন্দ্রের বাঙ্গলা পদ পদকল্পলতিকায় আছে কিন্তু তিনি বাঙ্গলা ভাষায় প্রসিদ্ধি লাভ করার উপযোগী কোন গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া আমরা নিশ্চয় প্রমাণ পাই নাই, তাঁহার স্মরণদর্পন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য পুস্তক নহে, শুনিয়াছি 'বঙ্গজয়' নামক মহাপ্রভুর পূর্ব্বরঙ্গ

* গীতচিন্তামণি দেখুন।

† পদকল্পলতিকা।

ভ্রমণ সম্বন্ধে তাঁহার একখানা বড় ঐতিহাসিক পদ্যগ্রন্থ আছে, আমরা তাহা পাই নাই। যাহা হউক রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহার সাময়িক বৈষ্ণব সমাজের ভূষণ ছিলেন, কিন্তু ভাষা কবিতার স্বাভাবিক পথ অবলম্বন করাতে তৎকনিষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজের খ্যাতি অতীত ও বর্ত্তমান ব্যাপক হইয়া রহিয়াছে। তিনি স্বীয় কবিতার সরস মাধুরী বিতরণ করিয়া বঙ্গীয় যুবকগণের চিরসুহৃদরূপে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তদপেক্ষা পণ্ডিত রামচন্দ্র কবিরাজ বাঙ্গলা লেখার চেষ্টা না করাতে এখন প্রাচীন ইতিহাসের অচিহ্নিত পত্রে মগ্ন প্রায়।

প্রেম বিলাস, ভক্তি রত্নাকর, নরোত্তম বিলাস, সারাবলি অনুরাগবল্লী প্রভৃতি বহুবিধ পুস্তকে গোবিন্দ কবিরাজ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক বিবরণ আছে; দুঃখের বিষয় ঐ সব বিবরণে তাহার জীবনের কতিপয় স্থূল ঘটনা মাত্র অবগত হওয়া যায়। তাঁহার কবিতা হইতেই তাহার হৃদয়ের সুকুমারত্ব ভাব-প্রবণতা ও অন্তঃ জীবনের পট ধারণা করিয়া লইতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত পুস্তকগুলিতে তিনি খেতুরীর মহোৎসবে, তেলিয়া বুধরীতে, ও বৃন্দাবনে কখনও পথিক কখনও পাচকের তত্ত্বাবধায়ক, কখনও বা প্রশংসিত কবিরূপে সহসা দর্শন দিয়া নিবিড় জনতার অরণ্যে হারা হইয়া যাইতেছেন; ইতিহাস ক্ষুদ্র আলো-প্রক্ষেপে তাঁহার অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে নির্ব্বাণ পাইতেছে, আমরা তাঁহার ধারাবাহিক জীবন-চরিত জানি না।

এরূপ কথিত আছে তিনি ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শাক্তছিলেন, তৎপর গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়া বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে আদিষ্ট হন; তদনুসারে অনুমান ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি আর ও ৩৬ বৎসর জীবিত ছিলেন; তিনি এই অবশিষ্ট জীবন বৈষ্ণব সমাজের প্রীতি ও সম্মান সহকারে অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়; উভয় ভ্রাতাই 'কবিরাজ' উপাধিলাভ করিয়াছিলেন, গোবিন্দ দাসের পদসমূহ কাঁচাগড়িয়া নিবাসী চৈতন্য-সহচর দ্বিজ হরিদাসের পুত্র সুগায়ক ও পদকর্ত্তা গোকুল দাস ও শ্রীদাস দ্বারা বৈষ্ণব মণ্ডলীতে সর্ব্বদা গীত হইত ও গীতগুলিতে মুগ্ধ হইয়া বীরচন্দ্র প্রভু ও জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব সমাজের আচার্য্যগণ কবিকে ক্রোড় দিতেন। শেষ বয়সে কবিকে বুধরীগ্রামে স্বীয় পদ-সংগ্রহ কার্য্যে ব্যস্ত দেখা যায়, "নির্জ্জনে বসিয়া দ্বিজ পদরত্নগণে। করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে॥ (ভক্তিরত্নাকর ১৪ তরঙ্গ)।

১৫৩৭ খৃঃ * অব্দে শ্রীখণ্ডে গোবিন্দ দাসের জন্ম ও ১৬১২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। ভাষায় রচিত পদছাড়া তিনি সংস্কৃতে "সংগীতমাধব" নামক নাটক ও 'কর্ণামৃত' নামক কাব্য রচনা করেন। ভক্তি রত্নাকরে "সংগীত মাধবের" অনেক শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। এস্থলে আর একটী কথা বলা উচিত, বিদ্যাপতির কয়েকটি পদে গোবিন্দদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর পদসমুদ্রের স্বকৃত টীকায় ইহার একটি সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন ;—

"বিদ্যাপতিকৃতত্রিচরণগীতং লব্ধা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজেন চরণৈকং কৃত্বা পূর্ণং কৃতং।" †

পূর্ব্বএকপত্রে ৯ বার বলরামদাসের উল্লেখ করিয়াছি; ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহেন। পদকর্ত্তা বলরাম দাস উক্ত ৯ স্থলের অন্ততঃ ৪ টির উদ্দিষ্ট কবি বলিয়া বোধ হয়। প্রেম-বিলাসের লেখক নিত্যানন্দের অপর নাম বলরাম দাস। ইনি শ্রীখণ্ডের কবিরাজ বংশীয়, বৈদ্যজাতীয় কবি। পদকল্পতরুর কবি-বর্ন্দনায় পদকর্ত্তা বলরাম দাসকে "কবিনৃপবংশজ" (কবিরাজ) বলা হইয়াছে ; এই "বলরাম কবিরাজ" নরোত্তম বিলাস প্রভৃতি পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছেন, ইনিই বৈষ্ণব বন্দনায় "সংগীতকারক" ও "নিত্যানন্দশাখাভুক্ত" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। প্রেম-বিলাসরচক বলরামদাস ও বৈদ্য এবং স্পষ্টতই নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত। সুতরাং 'পদকর্ত্তা বলরাম দাস ও প্রেম-বিলাস রচক অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে। ‡ বলরাম দাসের পিতার নাম আত্মারাম দাস

* শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর মতে ১৫২৫ খৃঃ (সাহিত্য ১২৯৯ আশ্বিন)।

† এক কবির পদের সঙ্গে অন্য কবির ভণিতা দেওয়ার পদ্ধতি আরও অনেক স্থলে দেখা যায়, যথা—"গোবিন্দ দাস কহয় মতিমন্ত। ভুলল যাহে বিজরাজ বসন্ত॥" "রাম পাদের পহুঁ সুন্দর রসবর গৌরীদাস নাহি জানে। অখিল লোক যত ইহ রসে উনমত জ্ঞানদাস উপগানে।" (পদকল্প লতিকা)।

‡ গৌরভূষণ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় অনুমান করেন, ইঁহারা দুইজন এক ব্যক্তি নহেন। কারণ বলরামের পদ প্রাঞ্জল, প্রেম বিলাসের রচনা কুটিল। নরহরির নরোত্তম বিলাস ও ভক্তি রত্নাকরের ভাষা সাদা সিধা গদ্যের ন্যায় কিন্তু তৎকৃত পদাবলি কবিত্বময়; বৃন্দাবন দাসের পদ ও ভাগবতের রচনা এক কবির লেখার মত শুনায় না। আমরা এসম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় গৌরভূষণ মহাশয়ের মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

ও মাতার নাম সৌদামিনী ; পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ পুস্তকে আত্মারাম দাস কৃত কয়েকটি পদ পাওয়া যায়।

জ্ঞানদাস সম্বন্ধে অতি অল্প বিবরণই পাওয়া যায় ; বীরভূম জেলার একচক্রাগ্রামে (মাল্লারপুর ষ্টেশনের নিকট) নিত্যানন্দ প্রভুর পিতৃগৃহ ছিল ; তাঁহার দুই ক্রোশ পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রাম ; তথায় 'মঙ্গল ঠাকুরের' বংশ বলিয়া একটি গোঁসাই বংশ আছে। এই বংশেই জ্ঞান দাস জন্ম গ্রহণ করেন ; ইনি নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত ; শ্রীখেতুরীর উৎসবে ইঁহাকে উপস্থিত দেখা যায়, সুতরাং ইনি গোবিন্দ দাস, বলরামদাস প্রভৃতির সমকালিক কবি। কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞান দাসের একটি মঠ এখনও আছে, পৌষ মাসের পূর্ণিমায় সেখানে প্রতিবৎসর মহোৎসব ও সেই সঙ্গে তিনদিন ব্যাপিয়া মেলা হয়। গদাধরের শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্ত্তীর কথা ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে ; ইনি সুকবি ছিলেন কিন্তু মালিহাটির বৈদ্য বংশজ কবি যদুনন্দন দাস তাঁহার অপেক্ষা বেশী যশস্বী। পদ কল্পতরুর বন্দনায় ইহার সম্বন্ধে লিখিত আছে,—"প্রভু সুতা চরণ সরোরুহ মধুকর জয় যদুনন্দন দাস।" প্রভু অর্থে শ্রীনিবাস আচার্য্য ; যদুনন্দন শ্রীনিবাসকন্যা হেমলতার আদেশে ১৬০৭ খৃঃ অব্দে কর্ণামৃত গ্রন্থ রচনা করেন ; গোবিন্দ লীলামৃতের অনেক স্থলে ও ইনি "শ্রীল হেমলতার" গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র সুবলচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য, যদুনন্দন 'কর্ণামৃত' নামক ঐতিহাসিক পদ্যগ্রন্থ, কৃষ্ণদাসকবিরাজের গোবিন্দ লীলামৃত ও রূপগোস্বামীর বিদগ্ধ মাধব নাটকের পয়ারানুবাদ সঙ্কলিত করেন। কিন্তু পদকর্ত্তা বলিয়াই ইঁহার যশঃ স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরুষোত্তমের গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস ইনি নবদ্বীপের কুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন, ইঁহার পিতার নাম গঙ্গাদাস ; ইনি গোবিন্দদেবের মন্দিরের (বৃন্দাবনে) পূজারি ছিলেন। ১৭১২ খৃঃ অব্দে ইনি বংশীশিক্ষা গ্রন্থ রচনা করেন, কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন। পদকর্ত্তা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রসিদ্ধ সূর্য্যদাস সরখেলের * ভ্রাতা ; গৌরীদাসের বাড়ী কালনা শান্তিপুরের নিকট অম্বিকাগ্রাম ; ইনি চৈতন্যদেবের অনুচর ছিলেন,

* ইঁহার দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীদেবীকে নিত্যানন্দ প্রভু বিবাহ করেন।

কথিত আছে চৈতন্যদেবের স্বহস্ত-লিখিত গীতাগ্রন্থ ইঁহার নিকট রক্ষিত ছিল। চৈতন্য প্রভুর তিরোধানের পর ইনি নিম্বকাষ্ঠে চৈতন্যবিগ্রহ গঠন করিয়া নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। প্রসিদ্ধ ভক্ত সদ্গোপকুল-ভূষণ শ্যামানন্দ নবদ্বীপ ভ্রমণকালে ইঁহাকে উক্ত বিগ্রহ পূজায় নিযুক্ত দেখিয়াছিলেন। রায়বসন্ত নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। ইনি শেষ বয়সে বৃন্দাবনবাসী হইয়া ছিলেন। জীব গোস্বামীর পত্র লইয়া গৌড়ে একবার শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট আসিয়াছিলেন; ভক্তি রত্নাকরে উল্লিখিত আছে "হেনই সময় বিজ্ঞ শ্রীবসন্ত রায়। পত্রী লৈয়া আইল তেহোঁ আচার্য্য সভায়।।" (১৪ তরঙ্গ)। এই বিজ্ঞ ব্যক্তিকেই বোধ হয় নরহরি পুনর্ব্বার নরোত্তম-বিলাসে বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন, "জয় জয় মহাকবি শ্রীবসন্ত রায়। সদা মগ্ন রাধা কৃষ্ণ চৈতন্য লীলায়।" ১২ বিলাস। সুতরাং ইহাকেই পদকর্ত্তা 'দ্বিজবসন্তরায়' বলিয়া বোধ হয়। যশোহর নিবাসী কায়স্থ "রায় বসন্তের" নাম ইদানীং প্রবন্ধাদিতে পাইয়া থাকি, কিন্তু কোনও প্রাচীন পুস্তকে উক্ত পদকর্ত্তা সম্বন্ধে প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। শ্রীখণ্ডের নরহরিসরকার মহাপ্রভুর একজন অনুচর ছিলেন; ইনি নীলাচলে চৈতন্যদেবের অতি অনুরক্ত সঙ্গী ছিলেন; কথিত আছে নরহরি চির-কৌমার-ব্রত পালন করেন। নরহরি সরকার প্রসিদ্ধ লোচন দাসের গুরু ও 'চৈতন্য মঙ্গল' রচনার উপদেষ্টা ছিলেন। একটি সংস্কৃত বন্দনায় জানা যায়, নরহরির বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর ও তাঁহার পিতার নাম নারায়ণ ছিল। নরহরি গৌর লীলার পদ রচনার প্রবর্ত্তক বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে আদৃত; ইহার পথ অনুসরণ করিয়া বাসুদেব ঘোষ যশস্বী হইয়াছেন। নরহরি সরকার ১৫৪০ খৃঃ অব্দে গুপ্ত হন। বসু রামানন্দ কুলীনগ্রামের প্রসিদ্ধ মালাধর বসুর পৌত্র; ইনি দ্বারকা নগরী হইতে নীলাচল পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। কথিত আছে মহাপ্রভু ইহাকে মিত্র সম্বোধন করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ রায়রামানন্দ উড়িষ্যা রাজ প্রতাপরুদ্রের একজন উচ্চতন কর্ম্মচারী ছিলেন; ইনি বিখ্যাত 'জগন্নাথবল্লভ' নাটক রচনা করেন; চৈতন্যদেব ইহার দর্শনেচ্ছায় নিজে বিদ্যানগর গিয়াছিলেন। ইনি রসিক ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে প্রসিদ্ধ। ১৫৩৩ খৃঃ অব্দের মাঘমাসে রায়রামানন্দের তিরোধান হয়। নরহরিচক্রবর্ত্তীই

পদকর্ত্তা ঘনশ্যাম বলিয়া পরিচিত কিন্তু "কবি নৃপ বংশজ ভুবন-বিদিত কল জয় ঘনশ্যাম বলরাম।" পদ কল্পতরুর এই শ্লোক দ্বারা জানা যায়, ঘনশ্যাম নামে অপর একজন পদ-কর্ত্তা কবিরাজ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তি-নিধিমহাশয় অনুমান করেন, এই ঘনশ্যামই পদকর্ত্তা; নরহরি চক্রবর্ত্তীর অপর নাম ঘনশ্যাম হইলেও তিনি শেষোক্ত নামে কোন ও পদ রচনা করেন নাই। * ভক্তি রত্নাকরে "ঘনশ্যাম" ভণিতার পদ পাঠ করিলে এইমত সমর্থন করা যায় না।

এইসব পদকর্ত্তা ছাড়া বিষ্ণুপ্রিয়াঠাকুরাণীর শিষ্য বংশীবদন ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য বুধরীর নিকটস্থ রাধানগরবাসী বংশীদাস, বংশীদাসের পুত্র চৈতন্য দাস, অদ্বৈতশিষ্য পরমেশ্বর দাস, রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য হরিরাম আচার্য্য প্রভৃতি পদকর্ত্তা উল্লেখ যোগ্য। বন বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ রাজা বীর হাম্বির † ও মানভূমের রাজা নৃসিংহ দেব পদকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত। নীলাচলবাসী শিখি-মাহিতীর ভগ্নী (প্রসিদ্ধ ৩½ রসিক ভক্তের ½ জন) মাধবীর পদ ও পদকল্পতরুতে পাওয়া যায়।

এস্থলে বলা উচিত যাঁহারা বড় বড় গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন অথবা যাঁহাদের রচিত পদাপেক্ষা ভক্তিরসময় জীবনই বেশী সুরভিময়, যথা,—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস, ত্রিলোচন দাস ও নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি গ্রন্থকার ও শ্রীনিবাস আচার্য্য; নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজন,—তাঁহাদের প্রসঙ্গ পরে প্রদত্ত হইবে।

এই যুগের পদকর্ত্তাগণ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি হইতে নিম্নে স্থান পাইবার যোগ্য, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকটি উৎকৃষ্ট কবি আছেন; এই দলে গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, বলরাম দাস, রায়শেখর, ঘনশ্যাম, রায়বসন্ত, যদুনন্দন, বংশীবদন এবং বাসুঘোষ শ্রেষ্ঠ। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেম ভিন্ন অন্যভাব নাই কিন্তু গোবিন্দ দাস প্রভৃতির পদে প্রেমের সঙ্গে ভক্তি মিশ্রিত হইয়াছে, ভক্তির সঙ্গে নির্ম্মলতা প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু মাদকতার হ্রাস হয়; প্রেমেতে অঙ্কিত মূর্ত্তি আলিঙ্গন করিলে প্রাণ জুড়ায়, ভক্তিতে অঙ্কিত মূর্ত্তির পদ স্পর্শ করিতে পারিলে কৃতার্থ জ্ঞান হয়,

* ভক্তিনিধি মহাশয় এইমত প্রকাশ করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছেন।

† ভক্তি রত্নাকরে ইঁহার দুইটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

সুতরাং প্রেম অপেক্ষা ভক্তিতে উদ্দিষ্টছবি একটু দূরে স্থাপিত হয়। ভক্ত তাঁহার আরাধ্যকে না পাইলে আবার তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন, প্রেমিকের মত তাঁহার রাগ ও মান করিবার শক্তি নাই—কিন্তু আত্ম সমর্পণের ইচ্ছা আছে। নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে প্রেম অপেক্ষা তপস্যার কথা বেশী আছে:—

"যাঁহা পঁহু অরুণ চরণে চলি যাত। তাঁহা তাঁহা ধরণী হইএ মঝু গাত॥ যো সরোবরে পঁহু নিতি নিতি নাহ। হামভরি সলিল হোই তথি মাহ॥ যো দরপণে পঁহু নিজ মুখ চাহ। মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথিমাহ॥ যো বীজনে পঁহু বীজই গাত। মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদুবাত॥ যাঁহা পঁহু ভরমই জলধর শ্যাম। মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥ গোবিন্দ দাস কহ কাঞ্চন গোরি। সো মরকত তনু তোহে কিএ ছোড়ি॥"

বৈষ্ণবকবিগণের প্রেম পণ্যদ্রব্য নহে। দানই এ প্রেমের ধর্ম্ম, দানেই এ প্রেমের সুখ; প্রতিদান চাহিয়া এ উদ্যানে কেহ প্রবেশাধিকার পায় না, ফুলের সুরভি বিনামূল্যে বিতরিত হয়; চাঁদের জ্যোৎস্না, মলয় সমীর ক্রয় বিক্রয়ের সামগ্রী নহে; প্রাতঃ সূর্য্য রশ্মি শীতকালে কত মধুর, কিন্তু শাল বনাতের মত তাহার মূল্য নাই; বনের কুন্দ যুথি, জাতি, গোলাপ, গৃহ-সুন্দরীগণ হইতে কম সুন্দর নহে কিন্তু উহাদের পণে বিক্রয় হয় না; এ প্রেমও তেমনই অমূল্য। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় প্রেমিক এ প্রেম-ভরে উন্মত্তভাবে যাহা খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহা প্রতিদান নহে,—

"মো যদি সিনান লাগিলা ঘাটে, আর ঘাটে পিয়া নায়। মোর অঙ্গের জল, পরশ লাগিয়া, বাহু পসারিয়া রয়॥ বসনে বসন লাগিবে বলিয়া একই রজকে দেয়, আমার নামের একটি আখর, পাইলে হরিষে লেয়॥ ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে বলিয়া, ফিরয় কতই প্যাকে। আমার অঙ্গের বাতাস যেদিকে সে দিন সে মুখে থাকে॥ মনের কাকুতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে, পায়ের সেবক রায়শেখর কিছু জানে অনুমানে।"

এই অপূর্ব্ব ব্রতের এই অপূর্ব্ব কথা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে প্রেম ও সৌন্দর্য্য পূজার বিশেষকাল দেখা দিয়াছিল; বিরল-ক্রম নগর-রাজিতে বসন্তের সৌষ্ঠব এখন বিকাশ পায় না; এখন বসন্ত বনে আসে—কোকিলের জন্য, রক্ত-কিশলয়ের জন্য, বনকুরঙ্গ ও কুরঙ্গীর জন্য; মনুষ্য সমাজে এখন বিজ্ঞানের শীতল বায়ু কবিত্বের ফুল-পল্লব সংহার করিয়া সত্যের ভঙ্গি পঞ্জর দেখাইতেছে; এখনকার প্রেমের কবিতা পঞ্চদশ-শতাব্দীর স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত; সেরূপ মধুর কথা এখন আর

লেখা হইবে না; সেইসব স্বপ্নময় চিত্র লেখা বিজ্ঞানের শীতল নীহারিকা-জড়িত হইয়া এখন চির অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, এই ফুলতরুপল্লবগুচ্ছ-মণ্ডিত পৃথিবী পূর্ব্বে ও যেরূপ, এখন ও অবশ্য সেইরূপ সুন্দর আছে—কিন্তু আমরা ইহাকে সুন্দর দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

পদকর্ত্তাগণের মধ্যে গোবিন্দ দাস বিদ্যাপতির অনুসরণ করিয়াছেন. তাঁহার রচিত পদে বিদ্যাপতির রস-পূর্ণ উচ্ছ্বাসের অপ্রস্ফুট প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে; মৈথিল কবির পদে অনুভবের তীব্রত্ব ও উদ্দীপনাশক্তি বেশী কিন্তু গোবিন্দের পদে স্বার্থত্যাগ ও পবিত্রতা অধিক, কবিত্বের হিসাবে গোবিন্দ বিদ্যাপতি হইতে নিম্নে দাঁড়াইবেন কিন্তু বহু নিম্নে নহে। বিদ্যাপতি যেরূপ গোবিন্দ দাসের আদর্শ, চণ্ডীদাস সেইরূপ জ্ঞান দাসের আদর্শ; জ্ঞানদাসের কতকগুলি পদ চণ্ডীদাসের চরণ-ভাঙ্গা; তাহা মিষ্টত্বে মনোহর ও ভাবসম্বন্ধে মূলের ঈষৎ ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া বলিয়া গ্রহণ করা যায়; জ্ঞানদাস বর্ণিত নায়কের প্রেম-প্রকাশ-চেষ্টা নানা বিচিত্র বর্ণ পাতে সুন্দর এবং সেই সৌন্দর্য্য সততই নির্ম্মল অশ্রুজলে উজ্জ্বল হইয়াছে। বলরামদাস কাঁহাকে ও আদর্শ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, চণ্ডীদাসের ন্যায় এই কবি ও স্বভাবের সংস্করণ, চণ্ডীদাসের ন্যায় সরল বক্তা কিন্তু ততদূর গভীর নহেন। তাঁহার পদ সরল প্রেমের সুন্দর অভিব্যক্তি। গোবিন্দ দাস ও জ্ঞানদাসে, জ্ঞানদাস ও বলরাম দাসে শক্তির পার্থক্য আছে; যে ক্রমে এই সমালোচনা লিখিত হইল, এ পার্থক্য সেই ক্রমে, কিন্তু তাহা কেশ প্রমাণ।

বৈষ্ণব কবিগণের পদ প্রথম সংগ্রহ করেন, বাবা আউল মনোহর দাস; হুগলী জেলায় বদনগঞ্জে ইঁহার সমাধি আছে; কথিত আছে ইনি জ্ঞানদাসের বন্ধু ছিলেন ও যোগবলে অতি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন; ইঁহার রচিত সংগ্রহের নাম পদ-সমুদ্র। * খৃষ্টীয়ষোড়শ শতাব্দীর শেষে এই সংগ্রহ

* পদ সমুদ্র পুঁথি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হারাধনদত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট আছে; কলিকাতার কোন লোকানদার ২০০০, টাকা মূল্যে এই গ্রন্থসত্ব খরিদ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তিনিধি মহাশয় তাহা দেন নাই; বৃদ্ধ বয়সে তিনি এই পুস্তক নিজের তত্ত্বাবধানে ছাপাইয়া সাধারণের বিতরণ করিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প; এখন তাঁহার বয়স ৭২; স্বয়ং এত বড় পুস্তকের মুদ্রণ বিনা সাহায্যে করেন, এরূপ অর্থ সঙ্গতি নাই,—কিন্তু এই

সঙ্কলিত হয়। ইহার পদ-সংখ্যা ১৫০০০; বোধ হয় পদসমুদ্রের অব্যবহিত পরেই শ্রীনিবাসআচার্য্যের পৌত্র রাধামোহনঠাকুর পদামৃতসমুদ্র সঙ্কলন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরু প্রণয়ন করেন। পদকল্প-লতিকা গৌরীমোহনদাসকৃত; গীতচিন্তামণি হরিবল্লভকৃত; গীতচন্দ্রোদয় নরহরিচক্রবর্ত্তীকৃত; পদচিন্তামণিমালা প্রসাদদাসকৃত; ইহা ছাড়া লীলাসমুদ্র, পদার্ণবসারাবলী, গীতকল্পতরু, প্রভৃতি বহুবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ আছে।

পদ-সমুদ্র অতি বিরাট গ্রন্থ,—রিচার্ডসনের সিলেক্‌সনের ন্যায়। ছাপা হইলে উহা বড় বড় পুস্তকাগারে শোভা পাইতে পারে। রাধামোহন ঠাকুরের সংগ্রহপুস্তকের অনেকাংশ তিনি স্বকৃত পদ দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন. কতকগুলি বাঙ্গলাপদ ও ব্রিজবুলির সংস্কৃত টীকা এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। গৌরমোহনদাসের সঙ্কলন দৃষ্টে বোধ হয়, ভাল ভাল পদ ঘ্রাণমাত্রে পরিচয় পাওয়ার শক্তি ইঁহার বেশ ছিল, পদ-সন্নিবেশ ও বড় সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু সংগ্রহকারকের দৃষ্টি গাঢ়ভাবাপেক্ষা সুললিত শব্দটির উপর বেশী এবং পুস্তকখানা বড় ক্ষুদ্র; মাত্র ৩৫১ পদে সম্পূর্ণ। মোটের উপর বৈষ্ণব দাসের সংগৃহীত পদ-কল্পতরুই ব্যবহার পক্ষে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার পদ সংখ্যা ৩১০১; পদামৃতসমুদ্র ইহা হইতে অনেক ছোট পুস্তক, অথচ সংগ্রাহক তন্মধ্যে ৪০০ টির ও অধিক স্বকৃত পদ দিয়াছেন, বৈষ্ণবদাস স্বীয় বিরাট সংগ্রহে মাত্র ২৭টি স্বকৃত পদ দিয়াছেন, সে কয়েকটি পদ ও বন্দনা-সূচক সুতরাং সংগ্রহগ্রন্থে অপরিহার্য্য। বৈষ্ণবদাস এই সংগ্রহ সঙ্কলন করিতে যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা প্রবীন ব্যক্তির উপযুক্ত। পদকল্পতরু ৪ শাখায় বিভক্ত; প্রথম শাখায় ১১ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ২৬৫। দ্বিতীয় শাখায় ২৪ পল্লব, মোট পদ-সংখ্যা ৩৫১। তৃতীয় শাখায় ৩১ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ৯৬৫; চতুর্থ

* পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ ভিন্ন তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের আর লক্ষ্য নাই। বঙ্গদেশে বঙ্গভাষার উন্নতি কল্পে এইরূপ লোক দেখা যায়—ইহা ভাবী উন্নতির শুভ চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়; এই কার্য্য অর্থাভাবে অসম্পূর্ণ থাকিলে তাহা আমাদের জাতীয় মনস্তাপের কারণ হইবে; যে ধনাঢ্য ব্যক্তি এই সাধু কার্য্যে সহায় হইবেন, বঙ্গদেশের সাহিত্যে তাঁহার সেই বদান্যতার কথা চিরদিন উল্লিখিত থাকিবে।

শাখার ৩৬ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ১৫২০। ইহার কোন্ পল্লবে কত পদ তাহা ও পুস্তকের শেষভাগে নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রকাশিত পদকল্পতরু অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়; বৈষ্ণব দাস তৎকৃত সূচীপত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ৪র্থ শাখার ২৬ পল্লবে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে উক্ত পল্লবটি বর্জ্জিত হইয়াছে; এরূপ আরও কয়েক স্থল স্পষ্টতই অসম্পূর্ণ দেখা যায়। সূচিনির্দ্দিষ্ট ৩১০১ পদের মধ্যে মুদ্রিত পুস্তকে মাত্র ৩০৩০টি পদ দৃষ্ট হয়। যে অংশটুকু ঐতিহাসিক, হিন্দুস্থানবাসীগণের তাহা লুপ্ত করিবার একটা বিশেষ শক্তি আছে। পদকল্পতরুর আগাগোড়াই সুন্দর সুন্দর পদবিশিষ্ট নহে। হোমার ও মধ্যে মধ্যে নিদ্রালস হন, বৈষ্ণব কবিগণের প্রতিভায় ও বিরামচিহ্ন আছে, অনেক স্থল পুনরাবৃত্তি-দোষ-দুষ্ট; কিন্তু পদকল্পতরুর প্রতি পত্রেই এমন দুএকটি ছত্র বা পদ আছে, যাহা পড়িলে বোধ হয় কবি বাগ্দেবীর কলম কাড়িয়া লইয়া তাহা লিখিয়াছেন, পাঠকের নয়নাশ্রুর উপর সেই সব পদের অখণ্ড আধিপত্য।

বিদেশী ভাবাপন্ন পাঠক বর্ণমালানুক্রমে পদগুলি সন্নিবিষ্ট হয় নাই, দেখিয়া বিরক্ত হইতে পারেন। পূর্ব্বে লিখিয়াছি এই পদাবলীসাহিত্য ভালবাসার বিজ্ঞান; ভালবাসারহস্যের এরূপ গূঢ়ভেদ আর কোনও দেশের সাহিত্যে নাই। লতা যে ক্রম ও কৌশলে তরুকে জড়াইয়া বশীভূত করে, এই বিজ্ঞানে সেই ক্রম লিখিত হইয়াছে। প্রেমের নানা লীলা হইতে অলঙ্কার-শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ সূত্র রচনা করিয়াছেন; অলঙ্কার গ্রন্থে ৩৬০ রূপ নায়িকা-ভেদ বর্ণিত আছে; এই ভেদপ্রকাশকসূত্রে এক একটি চিত্র নির্দ্দেশক রেখাপাত করা হইয়াছে, সেই রেখার উপর কবিগণ তুলি দ্বারা সজীব বর্ণ ফলাইয়াছেন; এই সূত্রগুলি অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সূত্রের ন্যায় কঠোর নহে, যুবকগণ তৎপাঠে আনন্দ অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই; যথা,—নায়িকা স্বীয় সৌন্দর্য্য-দর্পে মানিনী হইয়া কর্ণোৎপল দ্বারা নায়ককে তাড়না করিতেছেন, এই চিত্র প্রগল্‌ভার; তমালকুঞ্জে অধীরা নায়িকা প্রণয়ী-সঙ্গ অপেক্ষায় পত্রকম্পনে আশান্বিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছেন এই চিত্রের নাম বাসকসজ্জা; এই অপেক্ষা যখন আক্ষেপে পরিণত হইতেছে, তখন বিপ্রলব্ধা; মানিনী খণ্ডিতায় বিষাদও রোষ-স্ফীতা; প্রোষিত ভর্ত্তৃকা-ভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এখানে মান ও ক্রোধ অশ্রুজলে মগ্ন; এখানে নায়িকার মূর্ত্তি

বড়ই সুন্দর, কারণ "যা কান্তায়াঃ মুখে চিরায় বিরহে সা মাধুরী মাধুরী।" এইরূপ আরও অসংখ্য সূত্র আছে।

বঙ্গীয় পদসমূহে এইসব লীলাময় ভাব ভক্তি দ্বারা ধৌত হইয়া স্বর্গীয় ভালবাসার উপাদান হইয়াছে, তাহাদের উর্দ্ধোন্মুখ গতি ও নিষ্কাম আবেগ বিলাসকলা হইতে স্বতন্ত্র।

বলা নিষ্প্রয়োজন সংগৃহীত পদগুলি পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা এস্থলে পদকল্প-লতিকা হইতে সংগ্রহ নৈপুন্যের কিছু নমুনা দিতেছি; পাঠক দেখিবেন, সংগ্রাহক নানা কবির পদ নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া কেমন সুন্দরভাবে যোজনা করিয়াছেন, বিন্যাস-কৌশলে একখানা সম্যকভাবের চিত্র কেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, নানা কবির বর্ণ দ্বারা যেন একই বর্ণ ফলিত হইয়াছে;—

মুরলী শিক্ষা।

কামোদ। বহুদিনের সাধ আছে হরি। বাজাইব মোহন মুরলী। তুমি লহ মোর নীল সাড়ী। তব পীতধরা দেহ পরি॥ তুমি লহ মোর গজমতি। মোরে দেহ তোমার মালতী॥ ঝাঁপা খোঁপা লহ খসাইয়া। মোরে দেহ চূড়াটি বাঁধিয়া॥ তুমি লহ সিন্দুর কপালে। তোমার চন্দন দেহ ভালে॥ তুমি লহ কঙ্কণ কেওড়ি। তোড় তাড়বালা দেহ পরি॥ তুমি লহ মোর আভরণ। মোরে দেহ তোমারি ভূষণ॥ শুন মোর এই নিবেদন। শুনি হরষিত বৃন্দাবন॥ ১॥

কানেড়া॥ মুরলী করাও উপদেশ। যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ॥ কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম। কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলি লয় আমার নাম॥ কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি। কোন্ রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ূরিনী। কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয় পারিজাত। কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ॥ কোন্ রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এক কালে। কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে॥ কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়। একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায়॥ জ্ঞান দাস কহে হাসি হাসি। রাধা মোর বলি বাজিবেক বাঁশী। ২॥

কামোদ। কৌতুকে মুরলী শিখে রসবতী রাধা। মদন মোহন মনোমোহিনীর সাধা॥ প্রেমরঙ্গে শ্যাম-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। মুরলী পূরয় রাই ত্রিভঙ্গ হইয়া বিনা তন্ত্রে, বিনা মন্ত্রে কত ফুক দেই। বাজে বা না বাজে বাঁশী পিয়ামুখ চাই॥ রাধার অধরে বেণু ধরে বনমালী। পানি পঙ্কজ ধরি লোলয় অঙ্গুলি। কানু কোলে কলাবতী কেলির বিলাসে। দুহুঁকরূপ দেখি শিবানন্দ ভাষে॥৩॥

বেহাগ। আজু কে গো মুরলী বাজায়। এত কভু নহে শ্যাম রায়॥ ইহার গৌরবরণে

করে আলো। চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল। তাহার ইন্দ্রনীলকান্ত তনু। এত নহে নন্দ সুত কানু। ইহার রূপ দেখি নবীন আরতী। নটবর বেশ পাইল কতি। বনমালা গলে দোলে ভাল। এনাবেশ কোন্ দেশে ছিল। কে বানাইল হেনরূপ খানি। ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী। নীল উয়লী নীলমণি। হবে বুঝি ইহার সুন্দরী। সখীগণ করে ঠারাঠারি। কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী। কোথা গেল কিছুই না জানি। আজু কেনে দেখি বিপরীত। হবে বুঝি দোহার চরিত। চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে। এরূপ হইবে কোন্ দেশে॥ ৪॥

পদের অতল রত্নাকর হইতে ভিন্ন ভিন্ন নামাঙ্কিত এই চারিটি রত্নের উদ্ধার করিয়া এরূপ সুন্দর সমন্বয় করাতে সংগ্রাহক একটি উৎকৃষ্ট মণিকারের সম্মান পাইবার যোগ্য।

পদাবলী সাহিত্য হইতে আমরা বিদায় গ্রহণ করিতেছি; বঙ্গদেশের ভক্তির অবতার চৈতন্যদেবের জীবন একটি গীতির ন্যায়; এদেশের গীতি-কবিতাই উৎকৃষ্ট কবিতা; যে জাতি উদ্যমপূর্ণ, উন্নতি পথে ধাবিত, তাঁহাদের মধ্যে পুরুষকারের চিত্র জীবন্ত; সে দেশে নরনারীজীবন নাটকীয় চরিত্রের গূঢ়সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বে ব্যক্ত হয়; রামায়ণে ও মহাভারতে একদা হিন্দুর সেইরূপ চরিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু অবস্থার ক্রীড়াশীলচক্রে পতিত ছিন্ন ভিন্ন জাতির অশ্রুই সম্বল; সেই অশ্রু কথনও দুঃখ জ্ঞাপক হইয়া মর্ম্মস্পর্শী হয়, কথনও বা ভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া গীতি-কবিতার মৃদু উপাদানের মধ্যে ও এরূপ মহত্ব ও সৌন্দর্য্যের ছায়া দেখাইতে পারে, যাহাতে সেই দুঃখে দয়া করার অধিকার হয় না, সে দুঃখ ধনাঢ্য দুঃখ নামে বাচ্য হইবার যোগ্য হয়।

এই গীতি কবিতাগুলি আমরা ইংলণ্ডের ও আমেরিকার সাহিত্য প্রদর্শনীতে লইয়া দেখাইতে পারি, আত্মগরিমার রাজ্যে, আত্মবিসর্জ্জনের কথা শুনাইয়া মুগ্ধ করিতে পারি।

(ক) গোবিন্দদাসের করচা।

(খ) চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত।

(গ) ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, প্রেমবিলাস প্রভৃতি।

(ক) গোবিন্দদাসের করচা।

মহাপ্রভুর মহিমান্বিত আদর্শ হইতে বঙ্গসাহিত্যে জীবন-চরিত লেখার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। মনুষ্যের নৈসর্গীক চরিত্র এক সময়ে শাস্ত্রীয় যবনিকার আড়ালে পড়িয়াছিল, তাই চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে শাস্ত্রীয় অনুবাদ ও শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুর অবতারণা হয় নাই। মাহাপ্রভু নিজের সুন্দর ছবি দেখাইয়া বুঝাইলেন, মনুষ্য-মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যপাতেই শাস্ত্র উজ্জ্বল হয় ও মনুষ্য শাস্ত্র হইতে মহত্তর। পুস্তকে যে সকল ভাব ও চরিত্রের কথা বর্ণিত হয়, মহাজনগণের জীবনে তাহা জীবন্তভাবে ক্রিয়া করে।

জীবন-চরিত সাহিত্যের সূত্রপাত হইল; বঙ্গদেশীগণ পৌরাণিক চরিত্রগুলির দেবদত্ত অমানুষী শক্তির বিষয় অবগত হইয়া মানুষীগুণের প্রতি অবহেলা করিতে শিখিয়াছিল; সরলতা দয়া-ভক্তি-রঞ্জিত ছবিই প্রকৃত পূজনীয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অমানুষী বিরাটত্ব বা বহুলত্ব প্রকৃত শোভা বা মহত্ব দান করিতে পারে না—একথা বাঙ্গালী জনসাধারণ তখনও ভাল করিয়া বুঝে নাই; তাই চৈতন্যদেবের ভক্তের মধ্যে অনেকে তাঁহার চরিত্রে অলৌকিক বর্ণপাত করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন সুতরাং শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ চৈতন্যদেবের জীবনের অমানুষী প্রভাব প্রতিপন্ন করিতে অক্ষম হন নাই।* সে সময়ে ধর্ম্ম প্রচারের

* ১০০ বৎসর হইল কবি প্রেমানন্দ দাস চৈতন্যদেবের অবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যে সব প্রমাণ উদ্ধার করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইসব প্রমাণসহ কবির স্বহস্তলিখিত কাগজ খানা আমি পাইয়াছি; তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—বামনপুরাণে ব্যাসং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—"অহমেব কচিৎব্রহ্ম সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়িষ্যে কলৌপাপহতান্নরান্।" বায়ুপুরাণে, "দিবিজাভুবিজায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তিরূপিনঃ। কলৌ-সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥" মৎস্য পুরাণে, "শুদ্ধগৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গো গঙ্গাতীরসমুদ্ভবঃ। দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলি-যুগে॥" এইরূপে গরুড় পুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, দেবীপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বাল্মীকিপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, বৃহৎযামল প্রভৃতি অনেক পুরাণের নাম করিয়া শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; এসব প্রেমানন্দদাস উদ্ধৃত করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত পুরাণগুলির নবসংস্করণে সেগুলি খুঁজিয়া না পাইলে পাঠক আমাকে দায়ী করিবেন না।

জন্য সেরূপ করা আবশ্যক ছিল। চৈতন্যদেবের জীবন সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গীগণের কেহ কেহ নোট রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই নোট ও জনশ্রুতি অবলম্বনে ও তাঁহার কোন কোন সঙ্গীর কথিত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও পরে কৃষ্ণদাস চরিতামৃতের ন্যায় উজ্জ্বল ভক্তিমিশ্র দর্শনাত্মক চরিতাখ্যান প্রণয়ন করেন। নোট গুলিকে সাবেকী বাঙ্গলায় করচা বলিত; ইহাদের মধ্যে মুরারি গুপ্তের করচা খানা বিশেষ প্রসিদ্ধ, কিন্তু উহা সংস্কৃতে লিখিত সুতরাং এপ্রবন্ধে উল্লেখ যোগ্য নহে।

করচা লেখকগণের মধ্যে গোবিন্দদাস একজন। ইনি উচ্চ-শিক্ষিত ছিলেন না; যে দুই বৎসরের বৃত্তান্ত লইয়া ইনি স্বীয় পুস্তক লিখিয়াছেন, সে দুই বৎসর ইনি দিবা রাত্র মহাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিয়াছেন, কখনও সঙ্গ-বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার লেখায় এমন একটু সারল্যমাখা সত্য-প্রিয়তা আছে, যাহাতে করচাখানা ফটোগ্রাফের ন্যায় সুন্দর ও বিশুদ্ধ হইয়াছে। মনুষ্য-বর্ণিত ইতিহাস কখনও পূর্ণ ও অবিসম্বাদীভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, তবে গোবিন্দের করচায় ঐ সব গুণ বহুল পরিমানে দৃষ্ট হইবে।

এই পুস্তকের রচনা নানাবিধ গুণান্বিত; যাঁহার চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তি ও বিস্ময়ের ভাবমণ্ডিত অশ্রুসিক্ত অনুচর এই উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার এরূপ প্রেমমধুর চিত্র-লেখা আর কোনও পুস্তকে লিখিত হয় নাই। বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাসকবিরাজ মহাপ্রভুকে দেখেন নাই; জনশ্রুতি, ভক্তগণের বর্ণিত বৃত্তান্ত ও করচার প্রতিবিম্ব হইতে তাঁহার উজ্জ্বল ছবি উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দ তাঁহার রূপ অনুক্ষণ দর্শন করিয়াছেন ও সেই রূপমাধুরী অনুক্ষণ ধ্যান করিয়াছেন; তাঁহার করচা স্বভাব হইতে এক পর্য্যায় অন্তর কিন্তু পরবর্ত্তী চরিতগুলি স্বভাব হইতে দুই বা বহুপর্য্যায় দূরে; গোবিন্দ যে ছবিখানা দেখিতে পাইতেন, তাহা শাস্ত্রজ্ঞানের অনুজ্জ্বল কৃত্রিমতায় জড়িত হইয়া রূপান্তরিত হয় নাই। অশিক্ষিত সরল ভৃত্য প্রভুর থরম দুইখানা স্কন্ধে করিয়া কিছু প্রসাদ ভক্ষণের লালসায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেন; তিনি বাগ্দেবীর বরে চির-যশস্বী হইয়া ব্যাস ও বাল্মীকির কলমের উত্তরাধিকারী হইবেন, এইরূপ কোন অহঙ্কারের ছায়া তাঁহার রচনার আবেগপূর্ণ সারল্য আবৃত

করিতে পারে নাই; আমরা নানা কারণে এই পুস্তকখানা চৈতন্যদেব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া অনুমান করি।

১৫০৮ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানস্থ কাঞ্চননগরবাসী শ্যামদাসকর্ম্মকারের পুত্র গোবিন্দকর্ম্মকার স্ত্রীকর্ত্তৃক 'মূর্খ', 'নির্গুণ' প্রভৃতি মধুর শব্দে তিরস্কৃত হইয়া অতিরাগে গৃহত্যাগী হন। পরবর্ষের মাঘ মাসের প্রথমার্দ্ধে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সুতরাং সন্ন্যাস গ্রহণের কিঞ্চিদধিক একবর্ষ পূর্ব্বে গোবিন্দ চৈতন্যপ্রভুকে প্রথম দর্শন করেন, তখন প্রভু স্নানার্থ গঙ্গাতীরে; গোবিন্দ দেখা মাত্র মুগ্ধ হইল।

"কটিতে গামছা বাঁধা অপূর্ব্ব দর্শন। সঙ্গে এক অবধূত প্রসন্ন বদন॥ * * * অবশেষে আইলা তথি অদ্বৈত গোঁসাই। এমন তেজস্বী মুই কভু দেখি নাই॥ পক্ককেশ পক্ক দাড়ী বড় মোহনিয়া। দাড়ী পড়িয়াছে তার হৃদয় ছাড়িয়া॥ * * * আশ্চর্য্য প্রভুর রূপ হেরিতে লাগিনু। রূপের ছটায় মুঞি মোহিত হইনু॥ * * * ঘাটে বসি এই লীলা হেরিনু নয়নে। কি জানি কেমন ভাব উপজিল মনে॥ কদম্ব কুসুম সম অঙ্গে কাঁটা দিল। থরথরি সব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল॥ ঘামিয়া উঠিল দেহ তিতিল বসন। ইচ্ছা অশ্রুজলে মুঞি পাখালি চরণ॥"

প্রভুর দর্শনেই গোবিন্দ পূর্ব্বরাগের ভাবাবেশ অনুভব করিলেন। চৈতন্যদেব গোবিন্দকে আশ্রয় দিলেন; গোবিন্দ পেটুক ছিলেন বলিয়া কাহারও ধারণা হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পেটুকের ততদূর সারল্য থাকা সম্ভবপর নহে; গোবিন্দের যে ভাব যখন মনে হইয়াছে অকপটে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন; অনেক সাধু মহাজন ও সে ভাবে আপনাকে পাপী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদের স্বকীয় কঠোর সমালোচনা যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করা নিষ্ঠুরতার কার্য্য; গোবিন্দের সম্বন্ধে ও সেই কথা বলা যাইতে পারে। দামোদরতীরবাসী কাশীমিশ্রের বাটীতে তিনি "অষ্টখানা কদলার ভাজি" ও নারায়ণ গড়ে "পাঁচ গণ্ডা লাড়ু" খাইয়া ছিলেন; ইহা বোধ হয় বড় একটা অলৌকিক পেটুকত্বের পরিচায়ক নহে। গোবিন্দ যখন যাহা দেখিয়াছেন, তাহা দেখিতে দেখিতে নোট করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনেক কথায়ই নূতন নূতন চিত্র লক্ষিত হয়;—চৈতন্য-প্রভুর বাড়ী সম্বন্ধে :—

"গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর। পাঁচখানা বড় ঘর দেখিতে সুন্দর॥ শান্তমূর্ত্তি শচীদেবী অতি খর্ব্বকায়। নিমাই নিমাই বলি সদা ফুকরায়॥ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী

হন প্রভুর ঘরণী। প্রভুর সেবায় ব্যস্ত দিবস রজনী। লজ্জাবতী বিনয়িনী মৃদু মৃদু ভাষ। মুই হইলাম গিয়া চরণের দাস।"

গোবিন্দের করচা হইতে আমরা চৈতন্যদেবের একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া নিম্নে প্রদান করিলাম। ফুটনোটে আমরা স্থানগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য দিয়া যাইতেছি।

কণ্টকনগর (কাঁটোয়া) হইতে বর্দ্ধমান; কাঞ্চননগরে গোবিন্দের স্ত্রী তাঁহাকে ফিরাইয়া লইতে আসে; দামোদর নদ পার হইয়া কাশী মিত্রের বাটীতে অবস্থান; তথা হইতে হাজিপুরে, হাজিপুর হইতে মেদিনীপুরে; এস্থলে কেশবসামন্ত নামক ধনী ব্যক্তি মহাপ্রভুকে কটূক্তি করে; মেদিনীপুর হইতে নারায়ণ গড়ে, তৎপর জলেশ্বরে, সুবর্ণরেখা পার হইয়া হরিহরপুরে, হরিহরপুর হইতে বালেশ্বরে সেস্থান হইতে নীলগড়ে, বৈতরণী নদী পার হইয়া মহানদীর তীরে গোপীনাথদেব ও সাক্ষী গোপাল দর্শন, নিংরাজের মন্দির দর্শন, ইহার পর আঠারনালায় জগন্নাথের মন্দিরের ধ্বজা দর্শনে চৈতন্য প্রভুর উন্মত্তাবস্থা, পুরীগমণ। ৩ মাস কাল পুরীতে অবস্থানের পর ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ চৈতন্যপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হন। পুরী হইতে গোদাবরীতীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা করেন।* তথা হইতে ত্রিমন্দনগরে† গমন করিয়া তুঙ্গভদ্রাবাসী ঢুণ্ডিরামতীর্থকে ভক্তি পথে প্রবর্ত্তিত করেন। ত্রিমন্দ হইতে সিদ্ধবটেশ্বর গমন করেন‡

* চৈতন্য চরিতামৃতে ও লিখিত আছে চৈতন্যদেব গোদাবরী তীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; রামানন্দের বাড়ী বিদ্যানগর গোদাবরী হইতে অনেক উত্তরে; রাজকার্য্যোপলক্ষে রামানন্দের গোদাবরীতীরে থাকা সম্ভব। পুরী হইতে গোদাবরী অনেক দক্ষিণে। এই দুইএর মধ্যে কোন্ কোন্ দেশ চৈতন্যদেব অতিক্রম করেন করচায় তাহা নির্দ্দিষ্ট নাই। গোদাবরীর কোন শাখা তখন উত্তরদিকে প্রবাহিত ছিল কি না জানা যায় না।

† 'ত্রিমন্দ' শিশির বাবুর অমিয়নিমাইচরিতে ত্রিমদ বলিয়া উল্লিখিত দৃষ্ট হয়, কিন্তু চৈতন্য চরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর ও চৈতন্যভাগবতে উহা ত্রিমল্ল বলিয়া অভিহিত; বেঙ্কট ভট্ট ও ত্রিমল্ল ভট্ট দুই সহোদরের নাম অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থই পাওয়া যায়, বেঙ্কট ও ত্রিমল্ল দুইটি নিকটবর্ত্তী স্থানের নামানুসারেই ভ্রাতৃদ্বয় উক্তরূপে অভিহিত হইয়া থাকিবেন; "ত্রিমল্লই" প্রকৃত নাম বলিয়া বোধ হয়; উহা হায়দ্রাবাদ নগরের নিকটস্থ আধুনিক "ত্রিমলঘেরী" বলিয়া বোধ হয়।

‡ সিদ্ধ বটেশ্বর ('সিদ্ধবটেশ্বরম') কাডোপ্পানগরের নিকটবর্ত্তী ও পান্নার নদীর তীরস্থ।

এই স্থানে তীর্থরাম নামক ধনী সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই নামক বেশ্যাদ্বয় দ্বারা চৈতন্যপ্রভুকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন, পরে তাঁহার প্রভাবে নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ৭ দিন বটেশ্বরে থাকিয়া ২০ মাইল ব্যাপক এক জঙ্গল অতিক্রম করেন, তৎপর মুন্নানগরে* গমন, মুন্না হইতে বেঙ্কটনগরে,† শেষোক্ত স্থানে তিন দিন থাকিয়া বগুলাবনে পন্থভিল নামক দস্যুকে ভক্তিদান করেন, তৎপর এক বৃক্ষতলে ৪ দিবস হরি নাম করিতে করিতে উন্মত্তাবস্থায় কর্ত্তন, তৎপর গিরীশ্বরে দুই দিবস যাপন, গিরীশ্বর হইতে ত্রিপদীনগরে,‡ তথা হইতে পানানরসিংহ দর্শন, বিষ্ণুকাঞ্চীতে¶ গমন ও তথা হইতে কালতীর্থ ও সন্ধিতীর্থে প্রবেশ,—তৎপর §চাইপল্লীনগরে, সেস্থান হইতে নাগরনগরে‖ ও নাগর হইতে তাঞ্জোরে** গমন করেন,

* মুন্নানগরের নাম পোষ্টালগাইডে পাইলাম না; বড় ও ভাল মানচিত্রে মুর্ণা নামক নদী মাম্রাজের নিকটে দৃষ্ট হয়; এই নদীর তীরে মুন্নাগ্রাম অবস্থিত ছিল (হয়তঃ এখনও আছে) বলিয়া বোধ হয়।

† বেঙ্কট নগর পাওয়া গেল না; বোম্বের নিকট বেঙ্কট নগর আছে কিন্তু ইহা সে "বেঙ্কট" কখনই হওয়া সম্ভব নহে; এক নামের অনেকগুলি স্থান সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়; এই করচানির্দ্দিষ্ট ত্রিপাত্র নগর ও নাগরনগর আমরা দুই দুই পৃথক স্থানে পাইয়াছি; বেঙ্কটনগর ও মুন্নানগর সিদ্ধবটেশ্বর ও ত্রিপদী নগরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থলে অবস্থিত থাকা সম্ভব; এই দুই স্থানের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ৬০ মাইল। গিরীশ্বরও ত্রিপদীনগরের নিকটবর্ত্তী বলিয়া বর্ণিত আছে।

‡ ত্রিপদীনগর হইতে চৈতন্যদেবের ভ্রমণের রেখা অতি শুদ্ধরূপে অনুসরণ করা যায়; পুরী হইতে ত্রিপদীনগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশের মধ্যে কোন কোন স্থান পাওয়া গেল না এবং অন্যান্য স্থান সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য একেবারে শুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিতে সাহস হয় না, কিন্তু ত্রিপদী হইতে চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী পর্যটনের সঙ্গে বর্ত্তমান মানচিত্রের রেখায় রেখায় মিল পড়িয়া যাইতেছে। ত্রিপদী নগর মাম্রাজ হইতে ৪০ মাইল উত্তর পশ্চিমে।

¶ পানানরসিংহ প্রভৃতি ছোট ছোট স্থান দর্শন করিয়া চৈতন্য "বিষ্ণুকাঞ্চীপুরে" গমন করেন, ইহা আধুনিক "কাঞ্জিভরম" (কাঞ্চীপুরম্); কাঞ্জিভরম ত্রিপদী হইতে প্রায় ৪৭ মাইল দক্ষিণে।

§ কাঞ্জিভরম হইতে চাইপল্লী (আধুনিক ত্রিচিনপল্লী অথবা ত্রিচাইপল্লী) প্রায় ১২৫ মাইল দক্ষিণে।

‖ ত্রিচাইপল্লী হইতে নাগরনগর ৪৫ মাইল পূর্ব্বে, ও সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। বোম্বের উপকূলে তুঙ্গনদীর তীরবর্ত্তী এক নাগরনগর (বেদনুরের সমীপবর্ত্তী) আছে, ইহা সেই স্থান নহে।

** তাঞ্জোর,—নাগর হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে।

তথা হইতে চণ্ডালু পর্ব্বত পার হইয়া পদ্মকোটে,* তার পর ত্রিপাত্র নগরে,† সেই স্থান হইতে ৩০০ মাইল ব্যাপক এক জঙ্গল অতিক্রম করেন, ইহাতে একপক্ষ ব্যয়িত হয়, জঙ্গল পার হইয়া রঙ্গধামে‡ নৃসিংহ মূর্ত্তি দর্শন করেন, রঙ্গধাম হইতে রামনাথ নগরে¶ ও রামনাথ হইতে রামেশ্বরে গমন করেন। তথা হইতে মাধ্বীবনে প্রবেশ করেন ও তাম্রপর্ণী পার হইয়া কন্যা কুমারীতে উপস্থিত হন। কন্যাকুমারী হইতে "ত্রিবঙ্কু"§ দেশে প্রবেশ করেন; এই দেশ পর্ব্বতবেষ্টিত ও ইহার সেই সময়ের রাজা রুদ্রপতি অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ত্রিবঙ্কু হইতে পয়োষ্ণি‖ নগরে, তথা হইতে মৎস্যতীর্থ, কাচাড়, ভদ্রানদী, নাগপঞ্চপদী অতিক্রম করিয়া চিতোলে** গমন করেন। চিতোল হইতে চণ্ডপুর, গুর্জ্জরীনগর,†† ও পরে পূর্ণনগরে‡‡ প্রবেশ করেন, পূর্ণনগর তখন (দাক্ষিণাত্যের নবদ্বীপ) অর্থাৎ শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্র স্থান ছিল। পূর্ণনগর হইতে পটাশনগরে, তথা হইতে জিজুরীনগরে, গমন করেন; এই স্থলে খাণ্ডবাদেবের পরিচারিকা অভাগিণী মুরারিদের বিবরণ দেওয়া আছে। তৎপর চোরানন্দী বনে নারোজী নামক ব্রাহ্মণদস্যুকে সন্ন্যাস গ্রহণে প্রবর্ত্তিত করেন; মুলানদী পার হইয়া নাসিকে, নাসিক হইতে ত্রিমুক ও দমননগর এবং তাপ্তীনদী অতিক্রম করিয়া ভঁরোচ নগরে¶¶ প্রবেশ; ভঁরোচ হইতে বরদা, তথায় নারোজির

* পদ্মকোট—তাঞ্জোর হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণে।

† ত্রিপাত্র—পদ্মকোট হইতে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে; পদ্মকোট হইতে প্রায় ১২৫ মাইল উত্তরে আরকটের নিকট অপর এক 'ত্রিপাত্র' নগর আছে; ইহা সেটি নহে।

‡ রঙ্গধাম,—ইহা আধুনিক শ্রীরঙ্গম, ত্রিপাত্রের দক্ষিণ পশ্চিমে; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে এই স্থানকে শ্রীরঙ্গপটম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৭৬ পৃষ্ঠা।) কিন্তু শ্রীরঙ্গপটম ত্রিপাত্র হইতে প্রায় ৩০০ মাইল উত্তরে; পরবর্ত্তী স্থানগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে শ্রীরঙ্গমকেই রঙ্গধাম বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়।

¶ রামনাথ—সমুদ্রের উপকূলে, রামেশ্বরের অতি নিকটে।

§ ত্রিবঙ্কু—ত্রিবাঙ্কুর।

‖ পয়োষ্ণি—আধুনিক পনোনি।

** চিতোল—বোধ হয় আধুনিক চিতোলদুর্গ, ইহা মহীশূরের উত্তর সীমান্তে।

†† গুর্জ্জরী—গুজরাট নহে, ইহা হায়দ্রাবাদ রাজ্যের মধ্যে।

‡‡ পূর্ণ—পুনা; এখনও তন্নিকটবর্ত্তী নদীর নাম পূর্ণ রহিয়াছে।

¶¶ নাসিক—নাসিক, ত্রিমুক (বোধ হয় আধুনিক ত্রিম্বক) ও দমননগর পরস্পরের সন্নিকটবর্ত্তী।

মৃত্যু, আহামদাবাদের ঐশ্বর্য্য বর্ণন; শুভ্রামতী নদী অতিক্রম করেন,* এস্থলে কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দ ও গোবিন্দচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ও তাঁহারা চৈতন্যদেবের সঙ্গী হন। ঘোগা নামক গ্রামে গমন,† বারমুখী বেশ্যার উদ্ধার; জাফরাবাদ পরে সোমনাথ গমন।‡ সোমনাথের পরে জুনাগড়ে, গৃনার পাহাড় অতিক্রমণ, ১লা আশ্বিন দ্বারকায় গমন, ১৬ই আশ্বিন দ্বারকা হইতে নর্ম্মদাতীরে দোহদনগরে, তথা হইতে কুক্ষি, আমঝোড়া, মন্দুরা, দেওঘর (বৈদ্যনাথ নহে) চণ্ডীপুর, রায়পুর, বিদ্যানগর, রত্নপুর গমন ও মহানদী পার হইয়া স্বর্ণগরে প্রবেশ, তথা হইতে সম্বলপুর, দাসপাল নগর ও আলালনাথ আগমন—এই স্থান হইতে পুরীতে উপস্থিত হন।¶

এই করচার মধ্যে পাঠক ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক নানা তত্ত্ব পাই-বেন; ইহাকে 'নোট' সংজ্ঞা দেওয়া উচিত নহে; করচা, কাব্য বা ইতিহাসের রেখাপাত মাত্র; ইহা একখানা বিস্তৃত চরিতাখ্যান। উৎকৃষ্ট শিল্পী কর্ম্মকার বহুমূল্যমণিখচিত স্বর্ণময় দেব-বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিলে যতদূর সুন্দর হইতে পারে, গোবিন্দকর্ম্মকারের লেখনী-নির্ম্মিত চৈতন্যমূর্ত্তি তাহা হইতে ও সুন্দর হইয়াছে। সিদ্ধ বটেশ্বরে তীর্থরাম নামক ধনী ব্যক্তি চৈতন্যদেবকে পরীক্ষা করিতে যাইয়া নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই স্থলটি উদ্ধৃত করিতেছি;—

এই দুই স্থানের মধ্যে কালতীর্থ, সন্ধিতীর্থ, পঙ্কতীর্থ প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়, এইসব তীর্থ এখন জাগ্রত অবস্থায় কি না বলা যায় না।

* ভঁরোচ—তাপ্তী নদীর নিকট আধুনিক মানচিত্রে ব্রুয়াচ নগর।

† আহমদাবাদ নগর ও শুভ্রামতি নদী—মানচিত্র দেখুন।

‡ ঘোগা—পোষ্টালগাইড দেখুন।

¶ সোমনাথ হইতে সমস্তস্থানই মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়া যায়; রামানন্দ রায়ের বাড়ী বিদ্যানগর রায়পুর ও রত্নপুরের মধ্যে অবস্থিত থাকা সম্ভব। রায়পুর ও রত্নপুর ভারতবর্ষের যে কোন মানচিত্রে পাওয়া যাইবে; উহারা সেন্ট্রাল প্রভিন্সের অন্তবর্ত্তী; স্বর্ণগড়ের এখনকার নাম রায়গড়। গোবিন্দের স্থান নির্দ্দেশগুলি এরূপ বিশুদ্ধ যে মানচিত্র অনুসরণ করিতে করিতে তাঁহাকে স্বতঃই সাধুবাদ দিতে প্রবৃত্তি হয়; এই বৃত্তান্তে নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে চৈতন্যদেব পুরী হইতে পূর্ব্ব উপকূলের সমস্ত দক্ষিণাংশ ক্রমে পরিভ্রমণ করিয়া পশ্চিম উপকূলে ক্রমে গুজরাট পর্য্যন্ত দর্শন করেন, গুজরাট হইতে নর্ম্মদা ও বিন্ধ্যগিরীর সমসূত্রপথে প্রায় এক সরলরেখায় পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ তিনি দাক্ষিণাত্য অভিমুখে রওনা হন ও ১৫১১ খৃষ্টাব্দের ওসরা মাঘ পুরীতে প্রত্যাগমন করেন; সুতরাং এই ভ্রমণ কার্য্য ১ বৎসর ৮ মাস, ২৬ দিনে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল।

"হেনকালে আইল সেথা তীর্থ ধনবান্। দুইজন বেশ্যা সঙ্গে আইলা দেখিতে। সন্ন্যাসীর ভারিভুরি পরীক্ষা করিতে॥ সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্যাদ্বয়। প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয়॥ ধনীর শিক্ষায় সেই বেশ্যা দুইজন। প্রভুরে বুঝিতে বহু করে আয়োজন॥ তীর্থরাম মনে মনে নানা কথা বলে। সন্ন্যাসীর তেজ এবে হরে লব ছলে॥ কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে। সত্যবালা হাসি মুখে বসে প্রভু পাশে॥ কাঁচলি খুলিয়া সত্য দেখাইলা স্তন। সত্যরে করিলা প্রভু মাতৃ সম্বোধন॥ থরথরি কাঁপে সত্য প্রভুর বচনে। ইহা দেখি লক্ষ্মী বড় ভয় পায় মনে॥ কিছুই বিকার নাই প্রভুর মনেতে। ধেঁয়ে গিয়া সত্যবালা পড়ে চরণেতে॥ কেন অপরাধী কর আমারে জননী। এইমাত্র বলি প্রভু পড়িলা ধরণী॥ খসিল জটার ভার ধুলায় ধূসর। অনুরাগে থরথর কাঁপে কলেবর॥ সব এলোথেলো হলো প্রভুর আমার। কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখি আর॥ নাচিতে লাগিলা প্রভু বলি হরি হরি। লোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি॥ গিয়াছে কৌপীনথুলি কোথা বহির্বাস। উলাঙ্গ হইয়া নাচে ঘন বহেশ্বাস॥ আছারিয়া পড়ে নাহি মানে কাঁটা খোচা। ছিড়ে গেল কণ্ঠ হৈতে মালিকার গোছা॥ না খাইয়া অস্থিচর্ম্ম হইয়াছে সার। ক্ষীণ অঙ্গে বহিতেছে শোণিতের ধার॥ হরি নামে মত্ত হয়ে নাচে গোরারায়। অঙ্গ হতে অদভুত তেজ বাহিরায়॥ ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল। চরণ তলেতে পড়ি আশ্রয় লইল॥ চরণে দলেন তারে নাহি বাহ্যজ্ঞান। হরি ব'লে বাহুতুলে নাচে আগুয়াণ॥ সত্যরে বাহুতে ছাঁদি বলে বল হরি। হরি বল প্রাণেশ্বর মুকুন্দ মুরারি॥ কোথা প্রভু কোথায় বা মুকুন্দ মুরারি। অজ্ঞান হইল সবে এইভাব হেরি॥ হরি নামে মত্ত প্রভু নাহি বাহ্যজ্ঞান। ঘাড়ি ভাঙ্গি পড়িতেছে আকুল পরাণ॥ মুখে লালা অঙ্গে ধুলা নাহিক বসন। কণ্টকিত কলেবর মুদিত নয়ন॥ ভাব দেখি যত বৌদ্ধ বলে হরি হরি। শুনিয়া গোরার চক্ষে বহে অশ্রুবারি॥ পিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিল। ইহা দেখি তীর্থরাম কাঁদিয়া উঠিল॥ বড়ই পাষণ্ড মুই বলে তীর্থরাম। কৃপা করি দেহ মোরে প্রভু হরিনাম॥ তীর্থরাম পাষণ্ডেরে করি আলিঙ্গন। প্রভু বলে তীর্থরাম তুমি সাধুজন॥ পবিত্র হইনু আমি পরশে তোমার। তুমিত প্রধান ভক্ত কহে বারেবার॥"

এইমন্ত্রে নরোজি, ভীলপন্থ দস্যুদ্বয় ও বারমুখী বেশ্যা পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল; যে গ্রামে চৈতন্যদেব গমন করিয়াছেন, সে গ্রামের লোক তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই,—গুর্জ্জরীনগরে তাঁহার প্রেমময় মূর্ত্তির এইরূপ একটি প্রতিচ্ছায়া প্রদত্ত হইয়াছে,—

"এত্তবলি কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাক দিল। সে স্থান অমনি যেন বৈকুণ্ঠ হইল॥ অনুকূল বায়ু তবে বহিতে লাগিল। দলে দলে গ্রাম্যলোক আসি দেখা দিল॥ ছুটিল পদ্মের গন্ধ বিমোহিত করি। অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌরহরি॥ প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন। ঝর ঝর করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ॥ বড় বড় মহারাষ্ট্রী আসি দলে দলে। শুনিতে লাগিল নারী মিলিয়া সকলে॥ পশ্চাৎভাগেতে মুই দেখি তাকাইয়া। শত শত কুলবধূ আছে

দাঁড়াইয়া॥ নারীগণ অশ্রুজল মুছিছে আঁচলে। ভক্তিভরে হরি নাম শুনিছে সকলে॥ অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিয়া। হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুদিয়া॥"

এই মনুষ্য-দেবটির ভক্তির পূর্ণআবেগের সময় আশ্চর্য্য একরূপ প্রতিভা-দীপ্তি শরীরে প্রকাশ পাইত; অনুচর গোবিন্দ ও সেইরূপ ভীত হইয়া দর্শন করিত,—

কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই। এমন আশ্চর্য্যভাব কভু দেখি নাই॥ কৃষ্ণহে বলিয়া ডাকে কথায় কথায়। পাগলের ন্যায় কভু ইতি উতি চায়॥ কি জানি কাহারে ডাকে আকাশে চাহিয়া। কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া॥ উপবাসে কেটে যায় দুই একদিন। অন্ন না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ॥ একদিন গুহা মধ্যে পঞ্চবটী বনে। ভিক্ষা হতে এসে মুই দেখি সঙ্গোপনে॥ নিথর নিঃশব্দ সেই জনশূন্য বন। মাঝে মাঝে বাস করে, দুই চারিজন॥ ঝিম ঝিম করিতেছে বনের ভিতর। চক্ষু মুদি কি ভাবিছে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥ অঙ্গ হৈতে বাহির হইছে তেজ রাশি। ধ্যান করিতেছে মোর নবীন সন্ন্যাসী। এইভাব হেরি মোর ধাঁধিল নয়ন।"

বাঙ্গালী এই জলপ্লাবিত শস্যশ্যামল প্রদেশে খরের ঘরে কোনরূপে দীর্ঘ জীবনটি কাটাইয়া দেয়; উত্তরে হিমাদ্রি, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বিন্ধ্য,—নিকটবর্ত্তী প্রকৃতির এই মহান আলেখ্য বাঙ্গালীকে মাতৃ ভূমির ক্রোড় হইতে বড় ভুলাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। এদেশের উর্ব্বর ক্ষেত্ররাশি অকাতরে শস্য দান করিত, উদর স্বচ্ছন্দে পূর্ত্তি করিয়া বঙ্গবীরগণ বাড়ীর চতুঃসীমানায় ভ্রমণ ও নিয়মিতরূপে রজনীপাত করিতেন। রণক্ষেত্রে যাইতে সিপাহীর যে আগ্রহ পাঠশালা, গোশালা কিম্বা তদ্রূপ নিকটবর্ত্তী অন্য কোন কর্ম্মশালা হইতে বাঙ্গালীর স্বমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তনের তদ্রূপই আগ্রহ,—ইহা তাঁহার ঐতিহাসিক দুর্নাম। এইদোষে বঙ্গীয় প্রাচীন কাব্যে স্বভাবের মহিমান্বিত পট চিত্রিত হয় নাই। বাইরণ, স্কট কি ওয়ার্ডসোয়ারর্থের রচনায়, কোথাও ক্লিটামনাসের উজ্জ্বল ও ভীতিকর চিত্র, বজ্রনাদী ঝরণার শব্দে প্রতিশব্দিত জাঙ্গফ্রে ও আপিনাইনের তুষার ধবল উদাসকান্তি, কোথাও লকলেমন, লককেট্রিন প্রভৃতি পাহাড়-বেষ্টিত তড়াগের সুন্দর ও বিস্ময়কর কান্তি, কোথাও টিনটারণের স্বচ্ছ নীলোজ্জ্বল সলিলের গতির বর্ণনায় যে অভিনব মহত্বমিশ্র সৌন্দর্য্যের আভা পড়িয়াছে,—ঈষৎ উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বাঙ্গালীর তাহা হইতে শতগুণ শোভা ও মহিমান্বিত প্রকৃতির মূর্ত্তি, কিন্তু গৃহস্থ বাঙ্গালী ভ্রমণ

কার্য্যে নিতান্তই অপারগ ছিল, তাই প্রাচীন সাহিত্যে ভেরাণ্ডার থাম ও জবাপুষ্পের বর্ণনা ভিন্ন কোন বড় ছবির অঙ্কন প্রায়ই দৃষ্ট হয় না; কিন্তু গোবিন্দের প্রকৃতিবর্ণনায় বঙ্গীয় প্রাচীনসাহিত্য দুর্লভ রূপের প্রভা পড়িয়াছে; ঘরের নিরুদ্ধ বায়ু সেবন অভ্যস্ত বাঙ্গালী ঘরের বাহির হইয়া প্রকৃতির নব নব চিত্র দর্শন করিয়াছেন তাই তাঁহার লেখায় এক প্রফুল্ল নব সৌন্দর্য্যের বায়ু প্রবাহিত হইয়া চিত্রগুলি স্ফূর্ত্তিশালী ও জীবন্ত করিয়াছে:—নীলগিরির বর্ণনাটি আধুনিক কবির রচনার ন্যায় সরল ও সুন্দরভাবে গ্রথিত।

কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরীরাজে। ধ্যানমগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে॥ কত শত গুহা তার নিম্নে শোভা পায়। আশ্চর্য্য তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায়॥ বড় বড় বৃক্ষ তার শির আরোহিয়া। চামর ব্যজন করে বাতাসে দুলিয়া॥ ঝর ঝর শব্দে পড় ঝরনার জল। তাহা দেখি বাড়িল মনের কুতূহল॥ পর্ব্বতের নিয়ড়েতে ঘুরিয়া বেড়াই। নবীন নবীন শোভা দেখিবার পাই॥ কত শত লতা বৃক্ষ করিয়া বেষ্টন। আদরেতে দেখাইছে দম্পতি বন্ধন॥ ময়ুর বসিয়া ডালে কেকারব করে। নানাজাতি পক্ষী গায় সুমধুর স্বরে॥ নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা। প্রকৃতির গলে যেন দুলিতেছে মালা॥ রজনীতে কত লতা ধগধগি জ্বলে। গাছে গাছে জোনাকি জ্বলিছে দলে দলে॥ ক্ষুদ্র এক নদী বহে ঝুরু ঝুরু স্বরে। তার ধারে বসি প্রভু সন্ধ্যা পূজা করা॥"

কিন্তু স্থানে স্থানে গম্ভীরতরভাবের ছায়া আছে, কন্যা কুমারীর বর্ণনায়,

"তাম্রপর্ণীপার হয়ে সমুদ্রের ধারে। প্রভু—কন্যাকুমারী চলিল দেখিবারে॥ কেবল সিন্ধুর শব্দ শুনিবার পাই। পর্ব্বত কানন দেশ নাহি সেই ঠাঁই॥ হুঁ হুঁ শব্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরন্তর। কি কব অধিক সেথা সকলি সুন্দর॥ দেখিবার কিছু নাই তথাপি শোভন। সেখানে সৌন্দর্য্য দেখে শুদ্ধ যার মন॥"

কবির চিত্তে প্রকৃতি অলক্ষিতভাবে একটি অস্পষ্ট, নিগূঢ় উচ্চভাব বিম্বিত করিয়া দিয়াছিল।

গোবিন্দের করচার আর একগুণ, ইহাতে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার মালিন্য নাই, এই অনাবিল রচনা সর্ব্বত্র সুরুচিসঙ্গত ও সুস্বাদু; পরবর্ত্তী লেখকগণের বৈষ্ণবী বিনয় ও স্থলে স্থলে সাম্প্রদায়িকতার মিশ্রণে দুষ্ট হইয়াছে; কিন্তু যাঁহার নাম করিয়া সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছিল, তিনি নিজে অসংশ্লিষ্ট ও অসম্প্রদায়িক ছিলেন; তাঁহার প্রিয় অনুচরের লেখায় ও অসম্প্রদায়িক উদারতার প্রীতিফুল্লভাব শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সকলের মনোরঞ্জন করিবে।

গোবিন্দদাসের করচায় চৈতন্যদেবের উপদেশগুলির মনোহারীত্ব নষ্ট হইয়াছে; অশিক্ষিত ভৃত্য হইতে আমরা তাহা প্রত্যাশা করিতে পারি না। যে উপদেশ শ্রবণে শত শত লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে উপদেশ গোবিন্দের লেখনীতে ভালরূপ ফোটে নাই। রামানন্দরায়ের সঙ্গে আলাপ ও দাক্ষিণাত্যের বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গে চৈতন্যপ্রভুর বিচার উচ্চ শিক্ষার অভাবে গোবিন্দ লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই; কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেইসব স্থলে থাকিলে উপযুক্ত বিবরণ পাওয়া যাইত।

গোবিন্দদাসের করচা পড়িয়া মনে হয় সেকালে ও "অস্ত্রহাতা বেড়িগড়া" অপেক্ষা কর্ম্মকারশ্রেণীর মধ্যে ও কেহ কেহ উৎকৃষ্টতর ব্যবসায়ের জন্য যোগ্যতা দেখাইতেন; সমাজের অস্থায়ী সীমাবন্ধনী কোন কালেই মানব প্রকৃতির প্রকৃত সীমাবন্ধনী বলিয়া গণ্য হয় নাই।*

* ৪১০ গৌরাঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় মুদ্রিতগোবিন্দদাসেরকরচা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, হস্তলিখিত করচার কতকাংশ হারাইয়া গিয়াছে, পুস্তকপ্রকাশক জয়গোপালগোস্বামী মহাশয় অপর কোথা হইতে সেই অংশ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সমস্ত জাল। তাঁহার মতানুসারে জাল অংশ ৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপক। নিম্নলিখিত কারণগুলিহেতু তিনি এই অংশ জাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।(১) তাঁহার দৃষ্ট যে কয়েক পৃষ্ঠা হারা গিয়াছে তন্মধ্যে সংগৃহীত অংশের স্থলে স্থলে ঐক্য থাকিলেও কোন কোন অংশে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। (২) প্রকাশিত পুস্তকে চৈতন্যপ্রভুকে গোবিন্দের স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করিতে দেখা যায় কিন্তু জাল-"লেখকের এ কাণ্ডজ্ঞান নাই যে স্ত্রীলোককে সম্ভাষণ করা দূরে থাকুক সন্ন্যাস অবস্থায় প্রভুর স্ত্রীলোকের মুখ পর্য্যন্ত দেখা নিষিদ্ধ।" (৩) কাশীমিত্রের বাড়ীতে প্রভু "উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার করিলেন।" এরূপ বর্ণিত আছে,—কিন্তু মতি বাবু বলেন "সন্ন্যাসগ্রহণের পর তিনি অন্নভোজন একরূপ পরিত্যাগ করেন, কেবল নাসিকা দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন।" (৪) প্রকাশিত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে সন্ন্যাসের পর চৈতন্যপ্রভু পূর্ব্বদিকে রওনা হন কিন্তু কোন কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁহার পশ্চিমদিকে যাত্রার কথা লিখিত হইয়াছে। (৫) গোবিন্দের পেট ফুলিলে চৈতন্যপ্রভু তাঁহার পেটে শ্রীহস্ত বুলাইয়াছিলেন একথা মতিবাবুর মতে অবিশ্বাস্য।

আমরা দুঃখের সহিত বলিতেছি মতি বাবুর সহিত এসম্বন্ধে আমরা ঐকামত হইতে পারি না। তিনি গোবিন্দদাসের যে করচা দেখিয়াছিলেন তাহার পূর্ব্বাংশের সঙ্গে প্রকাশিত গ্রন্থের স্থলে স্থলে অনৈক্য হওয়াই উহার জাল হওয়ার কারণ হইতে পারে না। যে লেখক ঐ স্থল নকল করিয়াছেন তিনি কায়স্থকে কামার বলিয়া একটি কাল্পনিক বংশাবলী

(খ) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত।

পরবর্ত্তী চরিত-সাহিত্য চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে রচিত, তখন নিম্বকাষ্ঠে গৌরীদাস পণ্ডিত চৈতন্য বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাঁহাকে

প্রস্তুত করিবেন কেন? মতি বাবু এইরূপ করার কারণ অনুসন্ধান করিয়াও কিছু পান নাই, তিনি লিখিয়াছেন "লেখক কি অভিপ্রায়ে এই অলীক অংশটুকু লিখিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না।" দ্বিতীয়তঃ প্রকাশিত পুস্তকের প্রথমাংশের রচনা ও পরবর্ত্তী রচনা স্পষ্টতঃই এক লেখনীর ঘ্রাণ বিশিষ্ট, কি ভাব কি ভাষায় কোনরূপ অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। বল্লালের দীঘি, চৈতন্যপ্রভুর বাড়ী, দেবা নাপিতের দ্বারা শির মুণ্ডন প্রভৃতি বর্ণনায় সরল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় অনুসন্ধিৎসু চক্ষুর দৃষ্টি ব্যক্ত হয়; তাহা কল্পনার সৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও নূতন নূতন তত্ত্বজ্ঞাপক; এসম্বন্ধে পাঠকমহাশয় নিজে পড়িয়া বিচার করিবেন। বর্ত্তমান অংশ যে কোন প্রাচীন পুঁথি হইতেই নকল করা হউক না কেন তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়; মতি বাবুর দৃষ্ট কয়েক পৃষ্ঠা কি ছিল তাহা এখন পাওয়া যাইবার সম্ভব নাই,—কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া তুলনায় সমালোচনা করা চলে না।

(২) গোবিন্দের স্ত্রীর সহিত চৈতন্যপ্রভু কথা বার্ত্তা বলেন, মতি বাবু ইহাতে অসঙ্গতি দেখেন; কিন্তু করচার পরবর্ত্তী অংশ তিনি ত সম্পূর্ণরূপ প্রামাণিক মনে করেন, তাহাতে চৈতন্যপ্রভু সত্যবাই, লক্ষ্মীবাই, বারমুখী বেশ্যা ও অভাগিনী মুরারিগণের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলিলেন কিরূপে? কেবল কথাবার্ত্তা নহে, 'সত্যেরে বাহুতে ছাঁদি বলে বল হরি'—পদে প্রভু যে বেশ্যাকেও নির্ম্মলভক্তিবিহ্বলতায় আলিঙ্গন দিয়াছিলেন, তাহা পর্য্যন্ত জানা যাইতেছে।

(৩) কাশীমিশ্রের বাড়ীতে প্রভু "উদরপূর্ত্তি" করিয়া জগন্নাথ-ভোগ খাইয়াছিলেন, মতি বাবু ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করেন। 'উদরপূর্ত্তি' করিয়া খাওয়ার কথা মুদ্রিত করচায় পাওয়া যায় না। চৈতন্যপ্রভুর "কেবল নাসিকা দ্বারা কিঞ্চিৎমাত্র আহার" করার বিষয় তিনি লিখিয়াছেন, এসম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতের প্রমাণে তাঁহার যুক্তি খণ্ডিত হইবে। প্রভু পুরীতে প্রসাদ খাইতেছেন, "তার অল্প লঞা প্রভু জিহ্বাতে যদি দিল। * * * কোটী অমৃতের স্বাদ পাঞা প্রভুর চমৎকার। সর্ব্বাঙ্গে পুলকনেত্রে বহে অশ্রুধার।" চৈ, চ অন্ত। বলা বাহুল্য এই অংশের সঙ্গে মুদ্রিত করচার বর্ণিত স্থলের চমৎকার সাদৃশ্য আছে।

(৪) সন্ন্যাসগ্রহণের পর চৈতন্যপ্রভু পূর্ব্বদিকে যাওয়ার কথা করচায় দৃষ্ট হয়,—ইহার সঙ্গে কোন কোন বৈষ্ণবগ্রন্থের অনৈক্য ঘটিয়াছে। এসম্বন্ধে মতি বাবু অপর স্থলে যে যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা এখানেও খাটিতে পারে। চৈতন্যচরিতামৃতাদিগ্রন্থ চৈতন্য-প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের ৭৫ ও তদূর্দ্ধকালের পরে রচিত হয় এবং সেইসব গ্রন্থকার অনেক "শুনাকথা" লিপিবদ্ধ করেন।

...র মন্তব্য সম্বন্ধে অবিশ্বাস্য কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

সাক্ষাৎ বিষ্ণু প্রতিপন্ন করিয়া পণ্ডিতগণ শ্লোক রচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন; ভক্তির যে একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে নির্ম্মিত হইয়া উহার ক্রোড়ে লুক্কায়িত ছিল, তাহা তখন উক্ত সমাজের সীমা অতিক্রম করিয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করিয়াছে; এই বিচ্ছিন্ন নব-উপাদান বিশিষ্ট সম্প্রদায়টির উপর হিন্দুসমাজের বিদ্বেষতরঙ্গ নিয়ত আঘাত করিতেছিল; আত্মরক্ষনশীল ক্ষুদ্র সম্প্রদায়টির সুন্দর বিনয়ধর্ম্ম অবিরত লোনাজল লাগিয়া তাই ক্রমে একটু ম্লান হইল।

বৈষ্ণবগণ নির্দ্দেশ করেন, ১৪২৯ শকে (১৫০৭ খৃঃ অব্দে) শ্রীনিবাসের (শ্রীবাসের ভ্রাতা) কন্যা নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন; তাহা হইলে চৈতন্যপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের দুই বৎসর পূর্ব্বে বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাব হয়; কিন্তু তিনি মহাপ্রভুকে দেখেন নাই বলিয়া বারংবার আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন,—"হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখন" (চৈ, ভা, আদি ১০ অঃ ও মধ্য ১ম ও ৮ম অঃ) তাঁহার দুই বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রভু নবদ্বীপেই ছিলেন, সুতরাং একথাটির ভাল সমন্বয় হয় না; তবে এরূপ হইতে পারে তিনি নিতান্ত শিশু বলিয়া এ আক্ষেপ করিয়াছেন; ১৫০৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হইয়া থাকিলে মহাপ্রভুর তিরোধানের সময় তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর ছিল; তিনি চৈতন্যপ্রভুর পরম ভক্ত চরিতলেখক, নীলাচলে যাইয়া তাঁহাকে দেখেন নাই কেন বলা যায় না। বৃন্দাবনদাস ৮২ বৎসর জীবিত ছিলেন, ১৫৮৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার অদর্শন হয়; এই দীর্ঘ জীবন তিনি বৈষ্ণবসমাজের পরম আদরে অতিবাহিত করেন, খেতুরির উৎসব-উপলক্ষে "বিজ্ঞবর" বৃন্দাবনদাস উপস্থিত ছিলেন; ১৫৩৫ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ মহাপ্রভুর তিরোধানের ২ বৎসর পরে তিনি 'চৈতন্যভাগবত' ও ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে 'নিত্যানন্দ বংশমালা' রচনা করেন। তিনি নিত্যানন্দের পরম ভক্ত শিষ্য ছিলেন, তাঁহার রচিত দুই পুস্তকেই বিদ্বেষীর প্রতি তীব্র কটাক্ষযুক্ত রোষদীপ্তভাষায় নিত্যানন্দ বন্দনা পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান জেলায় দেমুড়গ্রামে (মন্ত্রেশ্বর থানা) বৃন্দাবনদাস একটি মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপন করেন, উহা দেমুড় শ্রীপাঠ নামে এখন ও পরিচিত।

চৈতন্যভাগবতকে শ্রীমদ্ভাগবতের ছাঁচে ফেলিয়া গড়া হইয়াছে। শিশু চৈতন্য প্রভু অতিথি ব্রাহ্মণের উৎসর্গ করা অন্নাদি উচ্ছিষ্ট করিয়া দিতেছেন,—

তাঁহাকে পরক্ষণে শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারীরূপ দেখাইয়া বিমুগ্ধ করিতেছেন, কখনও শচী মাতাকে বিশ্বরূপ দেখাইতেন—তাঁহার পদাঙ্কে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন ধরা পড়িতেছে—এইসব স্থল ভাগবতের পুনরাবৃত্তিমাত্র। অতিক্রান্ত শৈশবে চৈতন্যদেব বিদ্যামুগ্ধ যুবক, পরে ভক্তির উজ্জ্বল দেবমূর্ত্তি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতার। তথাপি বৃন্দাবনদাস সততই চৈতন্যদেবকে ভাগবতের লীলাদ্বারা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, চৈতন্যলীলা হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলাই তাঁহার কল্পনায় স্পষ্টতররূপে মুদ্রিত ছিল, তাই তিনি শিষ্য বেষ্টিত চৈতন্যদেবকে "সনকাদি শিষ্যগণ বেষ্টিত বদরিকাশ্রমে আসীন নারায়ণের" সঙ্গে উপমা দিয়াছেন এবং দিগ্বিজয়ীর পরাজয় উপলক্ষে "হৈহয়, বাণ, নহুস, নরক, রাবণ" প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কল্পিত ঐক্যের কেশ-প্রমাণ সূত্র যথাসম্ভব সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করিয়াছেন ও চৈতন্যলীলার সঙ্গে কৃষ্ণলীলার রেখায় রেখায় মিল রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

আধুনিক ইতিহাস দর্শনের ছাঁচে ঢালা; গুইজো, বাকল্, ফ্রিজওয়েল ইতিহাস হইতে সূত্র সঙ্কলন করার চেষ্টা করিয়াছেন; ঘটনার তালিকা দিলেই ইতিহাস হয় না, কিন্তু জড় জগতের নিয়মগুলির ন্যায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মজীবন হইতেও নিয়ম সঙ্কলন করা ইতিহাসের বড় একটা কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রথা সর্ব্বত্রই উৎকৃষ্ট ও নিরাপদ কি না বলা যায় না; এইভাবে অনেক লেখক স্বীয় মনঃকল্পিত সূত্রের বর্ণে ঘটনারাশি বিবর্ণ করিয়া ফেলিতে পারেন; বড় বড় লেখকের সম্বন্ধে ও এ আশঙ্কা না আছে এমন নহে, কিন্তু তাঁহাদের ঐন্দ্রজালিক লেখারগুণে মিথ্যাসুন্দরী ও অনেক সময়ে সত্যের পোষাকে আসিয়া প্রতারণা করিয়া যায়। বৃন্দাবনদাস গীতার "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত"—আদি শ্লোক ও ভাগবতের একাদশ স্কন্দের যুগাবতার সম্বন্ধে অপর একটী শ্লোককে সূত্ররূপে ব্যবহার করিয়া চৈতন্যপ্রভুর অবতারের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। সাঙ্গোপাঙ্গের আবির্ভাব ও যুগপ্রয়োজন বেশ সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। চৈতন্যভাগবতের সুন্দর প্রারম্ভটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"কার জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটিগ্রামে। কেহ রাঢ় উড্র দেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে॥ নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ। নবদ্বীপে আসি হৈল সবার মিলন॥ নবদ্বীপে হইল প্রভুর অবতার। অতএব নবদ্বীপে মিলন সবার॥ নবদ্বীপ সম গ্রাম ত্রিভুবনে নাই। যথা

অবতীর্ণ হৈল চৈতন্য গোসাঞি॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে। কোন মহাপ্রিয়-বসে জন্ম অন্যস্থানে॥ শ্রীবাসপণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত। শ্রীচন্দ্র শেখরদেব ত্রৈলক্য-পূজিত॥ ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যার। শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার॥ পুণ্ডরীক বৈদ্যনিধি বৈষ্ণব প্রধান। চৈতন্য বল্লভদত্ত বাসুদেব নাম॥ চাটিগ্রামে হৈল তা সবার পরকাশ। বুড়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস। রাঢ়মাঝে এক একচক্রা আছে গ্রাম। যথা অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান॥ * * * নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈল ভক্তগণ। নবদ্বীপে আসি সবে হইল মিলন॥ নবদ্বীপ সম গ্রাম ত্রিভুবনে নাই। যথা অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥ অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা। সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥ নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবার পারে। এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে। ত্রিবিধ বৈসে একজাতি লক্ষ লক্ষ। সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ॥ সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে। বালকে ও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥ নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়। নবদ্বীপ পড়ি লোক সে বিদ্যারস পায়॥ অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়। লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥ রমাদৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে। ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥ কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার। প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥ দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনজন। পাতুলি করয় কেহ দিয়া বহুধন॥ ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়। এইমত জগতের ব্যর্থকাল যায়॥ যে বা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব। তাহারা ও না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব॥ শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে। শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবে মরে॥ না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন। দোষ বিনে কারো গুণ না করে কথন॥ যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী। তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥ অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়। গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥ গীতা ভাগবত যে জনাতে পড়ায়। ভক্তির বাখান নাই তাহার জিহ্বায়॥ বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ নাম। নিরবধি বিদ্যা, কুল করেন বাখান॥ * * * সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে। কৃষ্ণ পূজা কৃষ্ণ ভক্তি নাহি কারো বাসে॥ বাসুকী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে। মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥ নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল। না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥ কৃষ্ণ শূন্য মঙ্গল দেহের নাহি সুখ। বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ॥ * * * সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ। কোথাও না শুনে ভক্তি যোগের কথন॥ কেহ দুঃখে চায় নিজ শরীর ত্যজিতে। কেহ কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কাঁদিতে॥ অন্ন ভালমতে কার না রুচয়ে মুখে। জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে॥ ছাড়িলেন ভক্তগণ সব উপভোগ। অবতারের প্রভু হইলেন উদ্যোগ॥"

উদ্ধৃত স্থলটি সূত্রাংশে ও ঐতিহাসিক অংশে মন্দ হয় নাই। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সূত্রের পশ্চাতে ধাবিত হওয়া সর্ব্বদা নিরাপদ নহে। বৃন্দাবনদাস মধ্যে মধ্যে ভাগবতের সূত্রে এত বিভোর হইয়া

পড়িয়াছেন যে তাঁহার চৈতন্যপ্রভুর স্বরূপ দেখার অবকাশ হয় নাই।

চৈতন্যভাগবতে যে অলৌকিক বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, সেগুলি বৃন্দাবন দাসের উদ্ভাবনি-শক্তির উপর চাপাইয়া দেওয়া উচিত নহে। তিনি যেরূপ শুনিয়াছেন, সম্ভবতঃ সেই ভাবেই বর্ণনাকরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজের জন্ম এক অলৌকিকগল্পে জড়িত, সুতরাং অলৌকিকত্বে বিশ্বাস কতকটা তাঁহার প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছিল। ঘটনা বিশ্বাস করা বা পরিহার করা পাঠকের ইচ্ছাধীন, কিন্তু আমরা লেখককে কল্পনাশীল অথবা কপট বলিতে অধিকারী নহি।

বৃন্দাবনদাস অবৈষ্ণব সমাজকে লক্ষ্য করিয়া যে কটূক্তি করিয়াছেন তজ্জন্য সমালোচকগণ এক বাক্যে তাঁহাকে দোষী সাব্যস্থ করিয়াছেন। রুচি সকল সময় একরূপ থাকে না; সে কালের কটূক্তি পল্লীগ্রামের কৃষকের মোটাহলের ন্যায় অমার্জ্জিত অপভাষার কথায় প্রকাশ পাইত। সভ্যতার দোকানে অন্যান্য অস্ত্রের ন্যায় বিদ্বেষসূচক কথাগুলি ও মার্জ্জিত ও তীক্ষ্ণ করা হইয়াছে; কটূক্তি করার জন্য এইসব তীক্ষ্ণ অস্ত্র বৃন্দাবনদাসের আয়ত্ত ছিল না, সুতরাং তিনি রাগেরবশে প্রকৃতির অসংযতবাক্‌ একটা বড় দুর্দ্দান্ত শিশুর ন্যায় অকৃত্রিম ইতর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু বৃন্দাবনদাসেয় ভর্ৎসনাপূর্ণ রচনায় আমরা এক পক্ষের ক্রোধ চিত্রিত দেখিতেছি মাত্র; উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণ এখন সম্পূর্ণভাবে যবনিকার পশ্চাৎভাগে, তথাপি বৈষ্ণবসাহিত্য হইতে তাঁহাদের ভীষণ বিদ্বেষের কিছু কিছু পরিচয় না পাওয়া যায় এমন নহে; চৈতন্যভাগবতে ইহাদের উপহাস ও বিদ্বেষের কথা অনেকস্থলে উল্লিখিত আছে। ভক্তিরত্নাকরে দেখিতে পাই, সংকীর্ত্তন-কারীগণ এক রাত্রেই মরিয়া যায় এজন্য বৈষ্ণবদ্বেষী সম্প্রদায় কালীমন্দিরে যাইয়া মানসিক করিতেছে ও নরোত্তমদাসের শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া করতালি দিয়া ব্যঙ্গ করিতেছে; ইহারা চৈতন্যদাসের প্রবল বিষ্ণুভক্তি হেতু নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার দারিদ্র্য ও পুত্রহীনতা ব্যাখ্যা করিয়াছিল এবং "ইন্ধনমালা বলয়িত বাহু। পরধনহরণে সাক্ষাৎ রাহু॥ * * ভজনে বীর। কীর্ত্তনে পতনে মল্লশরীর॥" প্রভৃতি তীব্র নিন্দাযুক্ত শ্লোক রচনা করিয়াছিল। ইহাছাড়া ও বৃন্দাবনদাসের ক্রোধের গুরুতর কারণ বর্ত্তমান ছিল বলিয়া বোধ হয়, সম্ভবতঃ তাঁহার জন্ম লইয়া ইতরভাবের

পরিহাস চলিতেছিল চৈতন্যভাগবতে একস্থলে তাহার আভাস আছে,—"চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী॥ যারে যেই আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য। সেই আসি অবিলম্বে হয় উপসন্ন॥ এসব বচনে যার নাহিক প্রতীত। সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত॥" চৈ, ভা, মধ্য। বৈষ্ণবগণ বিনয়ের আদর্শ; "মৃদুনি কুসুমা-দপি" তাঁহাদেরই জীবনে প্রমাণিত। সমুচিত উত্তেজনার কারণ না থাকিলে তাঁহাদের বিনয়ভঙ্গ হয় নাই। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রথম উদ্যমকালে অত্যধিক নিপীড়ন নিবন্ধন অবশেষে মানবজাতির জন্য অঙ্গীকৃত প্রীতিরফুল ভাঙ্গিয়া শূল প্রস্তুত করিয়াছেন; মানুষ-রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ অত্যাচার সহ্য করিয়া যদি লেখনীমুখে মাত্র কিঞ্চিৎ ক্রোধের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা অমার্জ্জনীয় নহে।

বৃন্দাবনদাস ২৮ বৎসর বয়সে (১৫৩৫ খৃঃ অব্দে) ভাগবত রচনা করেন। এই বয়সে তাঁহার বিরাট ঘটনা রাশি আয়ত্ত করিয়া নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা জন্মিয়াছিল; তাঁহার রচনায় তরুণ বয়সোচিত কিছু কিছু দোষ আছে সত্য, কিন্তু নানা কারণে আমরা চৈতন্য-ভাগবতকে বঙ্গভাষার একখানা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করি; প্রাচীন বঙ্গদেশের যে কোন বিষয় লইয়া ইতিহাস রচনার প্রয়োজন হইবে, চৈতন্যভাগবত হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে তজ্জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক হইবে। চৈতন্যভাগবতের মূলবিষয়বর্ণনা হইতে ও প্রাসঙ্গিক আলোপাত বেশী আবশ্যকীয়। প্রসঙ্গ ক্রমে ইতস্ততঃ নানা বিষয় সম্বন্ধে এমন কি বৈষ্ণবদ্বেষী সমাজ সম্বন্ধে ও যেসব কথা উল্লিখিত আছে, তাহা কুড়াইয়া লইলে বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও লৌকিক ইতিহাসের এক একখানা মূল্যবান পৃষ্ঠা সংগৃহীত হইবে। ভক্তিমান পাঠক বিনয় সহকারে চৈতন্য-ভাগবত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে নয়নাশ্রুর মধ্য দিয়া ইহার এক সুন্দর রূপ দেখিতে পাইবেন; কঠোর, ক্রোধ-পূর্ণ প্রাচীন রচনার মধ্যে মধ্যে চৈতন্য-প্রভুর যে মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার বর্ণক্ষেপ প্রগাঢ় তুলি করের উপযুক্ত,—তাহা প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্থায়ী ও ছবির ন্যায় উজ্জ্বল; দৃষ্টান্তস্থলে চৈতন্যপ্রভুর গয়া গমন ও প্রত্যাগমনের বৃত্তান্তটি বারংবার পাঠ করুন।

চৈতন্য-ভাগবত ৩ খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে গৌরপ্রভুর গয়া গমন, পর্য্যন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মধ্যমখণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত ও অন্তখণ্ডে শেষলীলা বর্ণিত হইয়াছে। আদিখণ্ড পঞ্চদশ অধ্যায়ে, মধ্যমখণ্ড

ষড়বিংশ অধ্যায়ে ও শেষখণ্ডমাত্র অষ্টম অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। শেষ খণ্ডের এই অসম্পূর্ণতা পরসময়ে অন্য একজন শ্রেষ্ঠ লেখককে চৈতন্য জীবন বর্ণনায় প্রবর্ত্তিত করে; চৈতন্য-প্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিণত লেখনীতে দর্শনাত্মক সৌন্দর্য্যে জড়িত হইয়াছে, আমরা যথা সময়ে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। চৈতন্যভাগবত বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ আদরের দ্রব্য, এ আদর ভেকধারী বৈষ্ণব অপাত্রে প্রয়োগ করেন নাই; কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বয়ং সর্ব্বদা বৃন্দাবনদাসকে চৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্যভাগবত ও নিত্যানন্দবংশমালা ব্যতীত বৃন্দাবন দাস বহুসংখ্যক পদ রচনা করেন সেগুলি পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ-পুস্তকে পাওয়া যায়।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল।

লোচনদাস ১৪৪৫ শকে (১৫২৩ খৃঃ অব্দে) বৈদ্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেন; ইঁহার পূর্ণ নাম ত্রিলোচনদাস; লোচনদাসের বাড়ী কোগ্রাম বর্দ্ধ-মানের ১৫ ক্রোশ উত্তরে,—গুস্করা ষ্টেসন হইতে ৫ ক্রোশ দূরে। দুর্লভসার ও চৈতন্যমঙ্গলের ভূমিকায় তিনি এই ভাবে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন:—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস। মাতা শুদ্ধমতি সদানন্দী তাঁর নাম। যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ নাম॥ কমলাকরদাস মোর পিতা জন্মদাতা। শ্রীনরহরিদাস মোর প্রেম ভক্তিদাতা॥ মাতৃকুল পিতৃকুল, হয় এক গ্রামে॥ ধন্য মাতামহী সে অভয়াদেবী নামে। মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত। সর্ব্ব তীর্থ পূত তিঁহ, তপস্যায় তৃপ্ত॥ মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র। সহোদর নাই মোর, মাতামহের পুত্র॥ যথা যাই তথাই দুর্লল করে মোরে। দুর্লল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে॥ মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাল আখর। ধন্য সে পুরুষোত্তম চরিত তাহার॥"

চৈতন্যমঙ্গল তাঁহার ১৪ বৎসর বয়সের রচনা, এই পুস্তক তিনি তাঁহার গুরু নরহরি সরকারের আদেশে ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে রচনা করেন; বৈষ্ণবসমাজে এ পুস্তকখানা বেশ আদৃত কিন্তু চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃতের ন্যায় প্রামাণিক বলিয়া গণ্য নহে।

কথিত আছে কোন ঘটনা বশতঃ লোচনদাস তাঁহার স্ত্রীর সহিত চিরকাল ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করেন এ সম্বন্ধে গৌরভূষণ অচ্যুৎচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বলেন,—"গৌরভক্তগণের প্রভাব এইরূপই। ইন্দ্রিয় তাঁহাদের কাছে দন্তোৎ-পাটিত সর্পের ন্যায় খেলার বস্তু। দেখিতে সুন্দর কিন্তু দংশানর ক্ষমতা-রহিত।"

চৈতন্যভাগবত প্রথমতঃ 'চৈতন্যমঙ্গল' নামেই অভিহিত ছিল, কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যভাগবকে 'চৈতন্যমঙ্গল' নামেই উল্লেখ করিয়াছেন; কথিত আছে লোচনদাসের গ্রন্থের নাম "চৈতন্যমঙ্গল" রাখাতে বৃন্দাবনদাসের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ ঘটে; বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণীদেবী বৃন্দাবনের পুস্তকের নামের 'মঙ্গল' শব্দ উঠাইয়া তৎস্থলে "ভাগবত" করেন; এইভাবে দুই কবির বিবাদের মীমাংসা হয়।

চৈতন্য-প্রভুর তিরোধানের পর তাঁহার জীবন সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত হইয়াছিল; বৃন্দাবনদাস লেখনী দ্বারা ঘটনারাশি আয়ত্ত করিতে জানিতেন; তাঁহার বর্ণিত ঘটনার সুবিস্তার সমতটক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে অলৌকিকগল্পের উপলখণ্ড বাছিয়া ফেলিয়া পাঠক সত্যের পথ পরিষ্কার রাখিতে পারেন। কিন্তু লোচনদাসের পুস্তক অন্যরূপ, চৈতন্যপ্রভু সম্বন্ধে অলৌকিক গল্পগুলি তাঁহার কল্পনার চক্ষু হরিতবর্ণ করিয়া দিয়াছিল তিনি ঘটনা প্রকৃতবর্ণে ফলাইতে পারেন নাই; তাঁহার পুস্তক হইতে গল্পাংশ ছাকিয়া ফেলিয়া নির্ম্মল সত্যাংশ গ্রহণ করা একরূপ অসম্ভব। তাঁহার পুস্তক ইতিহাসের মলাট দেওয়া খাঁটি কল্পনার দ্রব্য।

বৃন্দাবনদাস যুগতবতারের প্রয়োজনীয়তা কেমন সুন্দরভাবে দেখাইয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। কিন্তু লোচনদাস গোলকধামে রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের কল্পিত কথোপকথন অবলম্বন করিয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চৈতন্যমঙ্গলের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কেবল দেবলীলা; মানুষী মহিমার শ্রেষ্ঠত্বই যে প্রকৃত দেবত্ব, বালক লোচন তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। চৈতন্যমঙ্গলে উপাখ্যানরাশির নিবিড় মেঘরাশি ভেদ করিয়া কচিৎ চৈতন্যদেবের নির্ম্মল দেব-হাস্যটুকু বিকাশ হয় কিন্তু তাহা পরক্ষণে ক্ষিপ্রভাবে আঁধারে লীন হইয়া যায়। সে ছবির প্রতি ভালবাসা আকৃষ্ট হওয়া মাত্র অলৌকিক ঘটনারাশির নিবিড় অরণ্যে মন পথহারা পান্থের ন্যায় একটু স্বাভাবিক পথে বহির্গত হইবার জন্য অবকাশ চায়।

চৈতন্যজীবন সম্বন্ধে চৈতন্যমঙ্গলকে আমরা প্রামান্যগ্রন্থ মনে করি না এবং বৈষ্ণবসমাজ ও সদ্বিবেচনার সহিতই ইহার স্থান চৈতন্যভাগবত

ও চৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চৈতন্য চরিতামৃত লেখক বহু সংখ্যকবার শ্রদ্ধারসহিত চৈতন্য ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু চৈতন্যমঙ্গলের সেরূপ উল্লেখ করেন নাই। ভক্তিরত্নাকরে নরহরি চক্রবর্ত্তী চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃত হইতে বহু সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু চৈতন্যমঙ্গলের উল্লেখ করেন নাই।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য হইলেও উহা একবারে নির্গুণ নহে; ৩০০ বৎসরকাল যাহা লুপ্ত হয় নাই, সে সামগ্রীর অবশ্যই আয়ুর্বল আছে। চৈতন্যমঙ্গলের রচনা বড় সুন্দর। লোচনদাসের লেখনী ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইয়াছিল কিন্তু তাহার গতি কবিত্বের ফুলপল্লবে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা সত্যের পথে ধাবিত হইয়া করুণ ও আদিরসের কুণ্ডে পড়িয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে; বৃন্দাবনদাসের সাদাসিদা রচনায় কিম্বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নানাভাষামিশ্রিত জটীল লেখায় কবিত্বের ঘ্রাণ নাই; এই দুই পুস্তক ইতিহাসের নিবিড় বন, প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ ও বৈষ্ণব ভিন্ন অপর কেহ ধৈর্য্যসহ এই ঘোর অরণ্য পর্য্যটনশ্রম স্বীকার করিবেন না; কিন্তু লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের অনেক স্থলে কবিত্বের সৌন্দর্য্য আছে; ইতিহাসের রেখাঙ্কিত প্রস্তরখণ্ডের নিস্ফল খোঁজে পাঠক বিরক্ত হইলে পথে পথে মাধবী ও কুন্দকুসুম কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁহার শ্রম অপনোদনে সাহায্য করিবে। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ-সংবাদে শোক-বিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ এইভাবে আঁকা হইয়াছে●,—

"চরণ কমল পাশে, নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে, নেহারয়ে কাতর নয়ানে। হিয়ার উপরে থুইয়া, বান্ধে ভুজ লতা দিয়া, প্রিয় প্রাণনাথের চরণে॥ দুনয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চীর, বুক বাহিয়া পড়ে ধার। চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে, বিষ্ণুপ্রিয়া পুছে আরবার॥ মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি, কাঁদ কি কারণে জানি, কহ কহ ইহার উত্তর॥ তুলিয়া হিয়ার পরে, চিবুক দক্ষিণ করে, পুছে বাণী মধুর অক্ষর। কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া. শুনিতে বিদরে হিয়া, পুঁছিতে না কহে কিছু বাণী। অন্তরে দগধে প্রাণ, দেহে নাই সম্বিধান, নয়নে ঝরয়ে মাত্র পানি। পুনঃ পুনঃ পুছে প্রভু, সম্বরিতে নারে তবু। কাঁদে মাত্র চরণ ধরিয়া॥ প্রভু সর্ব্ব কলা জানে, কহে বিষ্ণুপ্রিয়া স্থানে, অঙ্গবাসে বদন মুছিয়া॥ নানারূপে কথা ভাব, কহিয়া বাড়ায় ভাব, যে কথায় পাষাণ মুঞ্জরে। প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি, বিষ্ণুপ্রিয়া চান্দমুখী, কহে কিছু গদগদ স্বরে॥ শুন শুন প্রাণনাথ, মোর শিরে দেহ হাত, সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি। লোক মুখে শুনি ইহা, বিদরিয়া যায় হিয়া, আগুনেতে প্রবেশিব আমি॥ তো লাগি জীবন ধন, এরূপ যৌবন, বেশ লীলা রস কলা।

তুমি যদি ছাড়ি যাবে, কি কাজ এ ছাড় জীবে, হিয়া পোড়ে যেন বিষ জ্বালা। আমা হেন ভাগ্যবতী, নাহি হেন যুবতী, তুমি হেন মোর প্রাণনাথ। বড় আশা ছিল মনে, এ নব যৌবনে, প্রাণনাথ দিব তোমা হাতে॥ ধিক রহুঁ মোর দেহে, এক নিবেদন তোহে, কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে। গহন কণ্টক বনে, কোথা যাবে কার সনে, কেবা তুয়া যাবে সাথে সাথে॥ শিরীষকুসুম যেন, সুকোমল চরণ তেন, পরশিতে মনে লাগে ভয়। ভূমেতে দাঁড়াও যবে, প্রাণে মোর লয় তবে, হেলিয়া পড়এ পাছে পাএ॥ অরণ্য কণ্টক বনে, কোথা যাবে কোন স্থানে, কেমনে হাঁটিবে রাঙ্গা পায়॥ শ্রমময় মুখ ইন্দু, তাহে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু, অল্প আয়াসে মাত্র দেখি। বরিষা বাদল ধারা, ক্ষণে জল ক্ষণে খরা, সন্ন্যাস করণ বড় দুঃখী॥ তোমার চরণ বিনি, আর কিছু নাহি জানি, আমারে ফেলাহ কার ঠাঁই। * * * কি কহিব মুই ছার, আমি তোমার সংসার, সন্ন্যাস করিবে মোর তরে, তোমার নিছনি লইয়া, মরি যাব বিষ খাইয়া, সুখে তুমি বঞ্চ এই ঘরে॥ চৈ, ম, হস্তলিখিত পুঁথি।

কো গ্রামের নিকটবর্ত্তী কাঁকড়া গ্রামের (গুস্করা ষ্টেসনের নিকট) বিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গলগায়ক শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে লোচনের স্বহস্ত লিখিত চৈতন্যমঙ্গল আছে। প্রাণকৃষ্ণ বলেন "লোচনের আখর উঠানঝোড়া কএর মত।" লোচন যে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া চৈতন্যমঙ্গল লিখেন, তাহা এখনও আছে।

চৈতন্যমঙ্গলও ৩ খণ্ডে বিভক্ত কিন্তু ইহা চৈতন্যভাগবৎ হইতে অনেক ছোট,—চৈতন্যভাগবতের ⅓ অংশ হইবে। লোচনদাস ১৫৮৯খৃঃ অব্দে ৬৬ বৎসর বয়সে তিরোহিত হন, চৈতন্যমঙ্গল ভিন্ন ইঁহার 'দুর্লভসার' নামক অপর একখানা পুস্তক আছে; এতদ্ব্যতীত লোচনদাস বহুসংখ্যক সুমিষ্ট পদ রচনা করেন।

এস্থলে বলা আবশ্যক বটতলার ছাপা চৈতন্যমঙ্গল নিতান্ত অসম্পূর্ণ; উহাতে আত্মপরিচয়টি নাই এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য কতকগুলি স্থানও বর্জ্জিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে হস্ত-লিখিত পুস্তকে এই বিবরণটি পাওয়া যায়, তাহা বটতলার ছাপা পুস্তকে নাই।

"বৃন্দাবন কথা কহে ব্যথিত অন্তরে। সত্বরে উঠিয়া প্রভু জগন্নাথ দেখিবারে॥ ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহ দ্বারে। সঙ্গে নিজ জন যত তেমতি চলিল। সত্বরে চলিয়া গেল মন্দির ভিতরে॥ নিরখে বদন প্রভু, দেখিতে না পায়। সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিলা উপায়॥ তখনে দুয়ারে নিজ লাগিলা কবাট। সত্বরে চলিয়া গেল আষাঢ় [illegible]।

আষাঢ়মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে। নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে। সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর। বিশেষতঃ কলিযুগে সংকীর্ত্তন সার। কৃপাকর জগন্নাথ পতিত পাবন। কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ॥ এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়। বাহুভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়। তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে। গুঞ্জা বাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ। দেখিয়া সে কি কি বলি আইলা তখন। বিপ্রে দেখি প্রভু কহে শুনহ পড়িছা। ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা॥ ভক্তআৰ্ত্তি দেখি পড়িছা কহয় কথন। গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন। সাক্ষাৎ দেখিল গৌর প্রভুর মিলন॥ নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন। এবোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার। শ্রীমুখ চন্দ্রিমা প্রভুর না দেখিব আর॥"

এই বিবরণের সঙ্গে ভক্তিরত্নাকরে প্রদত্ত বিবরণের ঐক্য নাই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত।

চৈতন্য-চরিতামৃতরচক কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৪৯৬ খৃঃঅব্দে বৰ্দ্ধমান জেলার ঝামটপুরগ্রামে বৈদ্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেন।* তাঁহার পিতা ভগীরথ সামান্য চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা পরিবার ভরণ পোষণ করিতেন; কৃষ্ণদাসের যখন ৬ বৎসর বয়ঃক্রম তখন পিতার কাল হয়, কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ শ্যামদাস তখন ৪ বৎসরের শিশু; এই দুই শিশুপুত্র লইয়া মাতা সুনন্দার বড় ভাবিতে হয় নাই, তিনি ও স্বামীর মৃত্যুর কিছু দিন পরেই কালগ্রাসে পতিত হন। কৃষ্ণদাস ও শ্যামদাস পিতৃষসার গৃহে পালিত হন।

সুতরাং কৃষ্ণদাস শৈশব হইতেই কষ্টে অভ্যস্ত; কিন্তু একদিন ব্যতীত কষ্ট তাঁহাকে কখনই অভিভূত করিতে পারে নাই, সে দিন—জীবনের শেষ দিন; সে বড় শোচনীয় কথা, পরে বলিব। বালক কৃষ্ণদাস লিখিতে পড়িতে শিখিলেন কিছু সংস্কৃত পড়িলেন; জীবনে ভাগ্যের হাসিমুখ দেখেন নাই; প্রকৃতি তাঁহাকে বিমাতার চক্ষে দেখিয়াছিলেন; ধাতৃক্রোড়ে পালিত শিশুর ন্যায় তিনি প্রকৃতির অনাবৃত আঙ্গিনায় উপেক্ষিত ছিলেন;

* মুকুন্দদেব গোস্বামী নামক কৃষ্ণদাস কবিরাজের একজন শিষ্য তৎকৃত "আনন্দরত্নাবলী" নামক পুস্তকে কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে এই সমস্ত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। বিবর্ত্তবিলাস-প্রণেতা চৈতন্যচরিতামৃতের অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন করিতে যে সমস্ত আখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—তাহা আমরা পরিত্যাগ করিলাম।

কিন্তু সংযত-চিত্ত কৃষ্ণদাস সংসারের ভোগ সুখ তাচ্ছল্যের সহিত উপেক্ষা করিলেন, তিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই।

একদিন ঝামটপুরে 'মীনকেতন' রামদাস ভৃত্যের সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভু আগমন করেন; আজন্মদুঃখী কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব প্রভাবে মুগ্ধ হইলেন, ইহসংসার হইতে এক উৎকৃষ্ট সংসারের চিত্র তাঁহার চক্ষে পড়িল; শ্যামদাসের চপল বাগ্‌বিতণ্ডায় যখন একটু ক্ষুব্ধ হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করিলেন; নিঃসম্বল কৃষ্ণদাস ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা পাথেয় নির্ব্বাহ করিয়া তথায় উপনীত হন। যমুনার মৃদু-তরঙ্গ-নাদিত নীপিতরুমূল, শ্যামতমালাবৃতকুঞ্জ বৈষ্ণবের চিত্তে নানা উৎসে ভক্তির কথা সঞ্চরিত করে; কৃষ্ণদাস সংসারে প্রবেশ করেন নাই, তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল,—শুভ্রপুষ্পসম; সুতরাং যখন সনাতন, রূপ, জীব, রঘুনাথদাস, গোপালভট্ট ও কবিকর্ণপুর এই ছয় বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট ভাগবতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, তখন সেই নির্ম্মল চিত্তে ভক্তির কথা অতি প্রস্ফুট রেখায় চিরদিনের তরে মুদ্রিত হইয়া গেল; এই সময়ে তিনি সংস্কৃতে "গোবিন্দলীলামৃত" ও "কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী" প্রণয়ন করেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকায় ও কবিত্বশক্তি গোবিন্দ লীলামৃতে বৈষ্ণব সমাজে বিদিত হয়। ইহা ছাড়া তিনি বাঙ্গালা ভাষায় "অদ্বৈতসূত্র করচা," "স্বরূপ বর্ণন" প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন।

বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ "চৈতন্যভাগবত" রীতিমত প্রত্যহ সায়ংকালে একত্র হইয়া পাঠ করিতেন; কিন্তু উহাতে চৈতন্যপ্রভুর অন্তলীলা বিশেষরূপে বর্ণিত না থাকায় বৃন্দাবনবাসী কাশীশ্বর গোঁসায়ের শিষ্য গোবিন্দ গোঁসাই; যাদবাচার্য্য গোঁসাই, ভূগর্ভ গোঁসাই, চৈতন্যদাস, কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণদাস ও শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে চৈতন্যদেবের শেষজীবন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে অনুরোধ করেন,—তখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ শুভ্রকেশমণ্ডিত ৭৩ বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ, ধীরে ধীরে কালের অবশিষ্ট স্বল্পসংখ্যক সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর সন্নিহিত হইতেছিলেন; এ বিষম অনুরোধ প্রাপ্ত হইয়া তিনি একটু গোলে পড়িলেন; পূজক আসিয়া গোবিন্দজীর আদেশমাল্য হস্তে আনিয়া দিয়া গেল, তখন

সেই অনুরোধ আদেশের শক্তি লাভ করিল, তিনি আর এড়াইতে পারিলেন না।

কিন্তু দৃষ্টিশক্তি হারা হইয়াছে, লিখিতে বারংবার হস্ত কম্পিত হয়; বৃদ্ধ এই ব্যাপার সমাধা করিয়া যাইতে পারিবেন,—এ বিশ্বাস তাঁহার মনে স্থির থাকে না। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবৎ, মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের কড়চা এবং কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক মূলতঃ অবলম্বন করিয়া এবং শ্রীদাস, লোকনাথ গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিকট মৌখিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ৮৫ বৎসর বয়সে কৃষ্ণদাস প্রবল ও অমানুষী অধ্যবসায়ে ১৫৭২ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৮২ খৃঃ অব্দ এই নয় বৎসরের চেষ্টায় চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন।

চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যভাগবৎ ও চৈতন্যমঙ্গলসুলভ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ঘ্রাণ নাই; বৃন্দাবনের ঠাণ্ডা বায়ু ও নির্ম্মল আকাশের তলে ভক্তির অবতার চৈতন্যমূর্ত্তি কৃষ্ণদাসের চিত্তে যেরূপ নির্ম্মল ও সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, চৈতন্যচরিতামৃতে তাহার সুন্দর প্রতিলিপি উঠিয়াছে। গৌড়দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ ক্রমশঃ গাঢ় বিদ্বেষে পরিণত হইতেছিল ও উভয় পক্ষের ক্রোধোন্মত্ত যুবকগণ লেখনী ও জিহ্বার তীব্রতা দ্বারা পরস্পরকে তাড়না করিতেছিলেন; সুদূর বৃন্দাবনতীর্থে এই দলাদলির কলুষিত বায়ু বহে নাই ও অশীতিপর বৃদ্ধ সেইসবপ্রসঙ্গ অবগত থাকিলেও সেই সব চাপল্যে যোগ দিতে প্রবৃত্তি বোধ করেন নাই। বৃদ্ধের হৃদয়টি শিশুর ন্যায় সুকুমার ও বিনয়মাখা; আমরা কোন বিষয়ে পুস্তক লিখিলে তদ্বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী পুস্তকের দোষ গাহিয়া মুখবন্ধ করিয়া থাকি, কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত কোন কোন বিষয়ে চৈতন্যভাগবৎ হইতে অনেক উৎকৃষ্ট হইলেও কৃষ্ণদাস পত্রে পত্রে নারায়ণীসুত বৃন্দাবনের প্রশংসা করিয়াছেন, সেই প্রশংসোক্তি পড়িয়া আমরা তাঁহার নিজের বিনয়েরই অধিক প্রশংসা করিয়াছি। চৈতন্যপ্রভুর জীবনসম্বন্ধে গোবিন্দদাসের করচার পরে চৈতন্যচরিতামৃতই শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ; কিন্তু গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রবীণতাগুণে এই পুস্তক পূর্ব্ববর্ত্তী সকল পুস্তক হইতেই শ্রেষ্ঠ। চৈতন্য-ভাগবতের ন্যায় ইহাতে ঘটনার তত ঘন সন্নিবেশ নাই; বর্ণিত ঘটনাগুলির

মধ্যে মধ্যে অবকাশ আছে,—কিন্তু সেই অবকাশ, ছবির পশ্চাতে বিরাম-দৃশ্যের ন্যায় মূল ঘটনার সৌন্দর্য্য গাঢ়ভাবে স্পষ্ট করে। বৈষ্ণবোচিত সুন্দর বিনয়, ভক্তির ব্যাখ্যা, স্বচ্ছন্দে সংযত লেখনী দ্বারা বহুবিধ সংস্কৃতগ্রন্থ আলোড়ন ও প্রেমকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুসম্বদ্ধ করায় নৈপুণ্য,—এই বহুগুণ সমন্বিত হইয়া চৈতন্যচরিতামৃত এক উন্নত প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে ক্ষুদ্র লতাগুল্মপুষ্প হইতে দৃঢ় পাদপের বিচিত্র সমাবেশযুক্ত বৈভব প্রকটিত করিতেছে।

কেবল অন্ত্যলীলায় নহে, আদি ও মধ্যলীলার যে যে স্থান বৃন্দাবনদাস ভাল করিয়া লিখিতে পারেন নাই, কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেইসব স্থল বিচক্ষণ ভাবে পূরণ করিয়াছেন। দিগ্বিজয়ী ও রামানন্দ রায়ের সঙ্গে বিচার বর্ণনায় চরিতামৃতে পাণ্ডিত্যের একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। পুস্তকখানা সংস্কৃতশ্লোকে পূর্ণ, ইহার অনেক শ্লোক তাঁহার নিজের রচিত আর অনেকগুলি নানাবিধ সংস্কৃত পুস্তক হইতে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত।*

এই পুস্তকের মোট শ্লোক সংখ্যা ১২০৫১, তন্মধ্যে আদিখণ্ডে, ১৭ পরিচ্ছেদ

---

* চৈতন্যচরিতামৃতে কোন্ কোন্ সংস্কৃতগ্রন্থ হইতে প্রমাণ স্বরূপ শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধুভদ্র মহাশয় বর্ণমালানুক্রমে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, (অনুসন্ধান ; ১৩০২ সাল, ৫ম সংখ্যা।) তাহা এই ;—

(১) অভিজ্ঞান শকুন্তলা, (২) অমরকোষ, (৩) আদি পুরাণ (৪) উত্তরচরিত (৫) উজ্জ্বল নীলমণি (৬) একাদশী তত্ত্ব (৭) কাব্য প্রকাশ (৮) কৃষ্ণকর্ণামৃত (৯) কৃষ্ণসন্দর্ভ (১০) কূর্ম্ম-পুরাণ (১১) ক্রমসন্দর্ভ (১২) গরুড়পুরাণ (১৩) গীতগোবিন্দ (১৪) গোবিন্দলীলামৃত (১৫) গৌতমীয়তন্ত্র (১৬) চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (১৭) জগন্নাথবল্লভ নাটক (১৮) দানকেলিকৌমদী (১৯) নারদ পঞ্চরাত্র (২০) নাটকচন্দ্রিকা (২১) নৃসিংহপুরাণ (২২) পদ্যাবলী (২৩) পঞ্চদশী (২৪) পদ্মপুরাণ (২৫) পাণিনিসূত্র (২৬) বরাহপুরাণ (২৭) বিষ্ণুপুরাণ (২৮) বিদগ্ধমাধব (২৯) বিশ্বপ্রকাশ (৩০) বীরচরিত (৩১) বৃহৎগৌতমীতন্ত্র (৩২) বৃহন্নারদীয়পুরাণ (৩৩) ব্রহ্মসংহিতা (৩৪) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (৩৫) বৈষ্ণবতোষিণী (৩৬) বেদান্তার্ণব (৩৭) ভগবদ্গীতা (৩৮) ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু (৩৯) ভক্তিসন্দর্ভ (৪০) ভক্তিলহরী (৪১) ভাবার্থদীপিকা (৪২) ভারতী (৪৩) ভাগবতপুরাণ (৪৪) ভাগবতসন্দর্ভ (৪৫) মলমাসতত্ত্ব (৪৬) মহাভারত (৪৭) মনু সংহিতা (৪৮) যামুনাচার্য্যকৃতালকমন্দারস্তোত্র (৪৯) রামায়ণ (৫০) রঘুবংশ (৫১) রূপগোস্বামীর করচা (৫২) লঘুভাগবতামৃত (৫৩) ললিতমাধব (৫৪) স্তবমালা (৫৫) স্বাত্বতন্ত্র (৫৬) স্বরূপ গোস্বামীর করচা (৫৭) সাহিত্যদর্পণ (৫৮) সংক্ষেপভাগবতামৃত (৫৯) হরিভক্তিবিলাস (৬০) হরিভক্তি সুধোদয়।

শ্লোক সংখ্যা ২৫০০; মধ্যে ২৫ পরিচ্ছেদ, শ্লোক সংখ্যা ৬০৫১; ও অন্তে ২০ পরিচ্ছেদ শ্লোক সংখ্যা ৩৫০০। অন্তখণ্ডে মহাপ্রভুর যে সকল ভাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিগূঢ় ভক্তিরসাত্মক; আমরা গোবিন্দদাসের করচায় চৈতন্যপ্রভুর উদ্দাম পূর্ব্বরাগের প্রেমাবেশের লক্ষণ দেখিয়াছি, তখন তাঁহার ভাবের পূর্ণ আবেশ এক ক্ষণে হইয়াছে, পর ক্ষণে তিনি সুস্থ হইয়াছেন; তাঁহার মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের মধ্যে পরিষ্কার একটী ব্যবচ্ছেদরেখা অনুভব করা যায় কিন্তু চরিতামৃতের শেষখণ্ডে তাঁহার ভাবোন্মত্ততা ক্বচিৎ মাত্র ভঙ্গ হইয়াছে; তাঁহার জীবনে পূর্ব্বে যে ভাব মেঘান্তরিত আলো রেখার ন্যায় মধ্যে মধ্যে দীপ্তি প্রকাশ করিত, সেইভাব শেষে জীবনব্যাপক হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে; জাগরণ স্বপ্নে, জ্ঞান ভ্রান্তিতে তখন মিশিয়া গিয়াছে। এই ভাব-বিহ্বলতার ক্রমবিকাশ কৃষ্ণদাস অন্তখণ্ডে আঁকিয়াছেন। চৈতন্যপ্রভু কখন ও বিরহে জগন্নাথ-মন্দিরের গাম্ভীরায় সারারাত্রি মস্তক ঘর্ষণ করিয়া শোণিত-সিক্ত মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছেন, কখনও সলিল হইতে তাঁহার শিথিল অস্থি-বিশিষ্ট প্রেমের শেষ দশার আকৃতিটি উঠাইয়া লোকবৃন্দ কর্ণে হরিনাম বলিয়া চৈতন্য সঞ্চার করিতেছে; কখনও প্রভু জয়দেবের গান শুনিয়া উন্মত্তভাবে গায়িকা রমণীকে আলিঙ্গন করিতে কণ্টকবিদ্ধ পদে ছুটিতেছেন,—স্ত্রী পুরুষ ভেদ জ্ঞান তখন বিলুপ্ত হইয়াছে; রাত্রিকালে বহুবিধ লোক তাঁহাকে প্রহরীরূপে রক্ষা করিতেছে, তাহাদের ঈষৎ তন্দ্রাবেশ হইলে পাগলের ন্যায় জঙ্গলে ছুটিয়া অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছেন; শরীর বিশীর্ণ, চর্ম্মসার, "চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হৈয়া। দুঃখিত হইলা সবে প্রভুরে দেখিয়া॥" চৈ, চ, অন্ত। তাঁহার জাগরণ ও স্বপ্ন একইরূপ, "একদিন মহাপ্রভু করেছে শয়ন। কৃষ্ণরাস লীলা হয় দেখিলা স্বপন॥" । চৈ, চ, অন্ত। জাগরণেও ত নিত্য তাহাই দর্শন।

যদিও চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর ঠিক তিরোধানটি বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু এই ভক্তি বিহ্বলতার ক্রমবৃদ্ধিজনিত দেহতাচ্ছল্যে পরিণামের ছায়াপাত করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

শেষ সময়ে ও মা বলিয়া মধ্যে মধ্যে মনে হইত; আমাদিগের ধর্ম্মের কথা যেমন কোনও অতি শুভক্ষণে ছায়ার ন্যায় মনে হইয়া লয় হয়, চৈতন্যপ্রভুর ও সেইরূপ ইহসংসারের কথা ক্বচিৎ ছায়ার ন্যায় মনে

হইয়া লয় হইত; জগদানন্দকে বৎসর বৎসর নদীয়া পাঠাইতেন, একবার মার উদ্দেশে বলিয়াছিলেন,—"তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস। বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ॥ এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার। তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার।" চৈ, চ, অন্ত।

চৈতন্যচরিতামৃতের দোষ তাহার ভাষাটি; কবিরাজ ঠাকুর সংস্কৃতে সুদক্ষ থাকিলে ও বাঙ্গলার বড় নিপুণ ছিলেন না। বিশেষ বৃন্দাবনে দীর্ঘকাল থাকাতে তাঁহার বাঙ্গলাভাষায় বৃন্দাবনী এরূপ মিশিয়া গিয়াছিল যে একজন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোক কয়েকবর্ষ বাঙ্গলামুলুকে থাকিলে যেরূপ বাঙ্গলা কহে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষাটি ও মধ্যে মধ্যে তাহাই হইয়াছে। এই পুস্তক সংস্কৃত, বৃন্দাবনী ও বাঙ্গলা এই তিনরূপ পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে প্রস্তুত। কিন্তু গ্রন্থের সর্ব্বত্রই ভাষা এরূপ নহে মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার বাঙ্গলাও পাওয়া যায়; ভাষা সম্বন্ধে পরিশিষ্টে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। চরিতামৃত পরিপক্ক লেখনীর রচনা, উহা সর্ব্বত্রই সুমিষ্ট না হউক, মনের ভাব জ্ঞাপন করিতে উৎকৃষ্টরূপ উপযোগী।

৮৫ বর্ষ বয়সে ১৫৮২ খৃঃ অব্দে পুস্তক সমাধা করিয়া কবিরাজ এই কয়েকটি কথা লিখেন,—"আমি লিখি ইহ মিথ্যা করি অনুমান। আমার শরীর কাষ্ঠ পুতলী সমান। বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির। হস্তহালে মনোবুদ্ধি নহে আর স্থির॥ নানা রোগগ্রস্থ চলিতে বসিতে না পারি। পঞ্চরোগ পীড়া ব্যাকুল রাত্রিদিন মরি॥"

কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, প্রভৃতি লেখকগণ তাঁহাদের পুস্তকপাঠ ভবসিন্ধু পার হইবার একমাত্র সেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, "কাশীরাম দাস কহে শুনে পুন্যবাণ" ইত্যাদি ভাবের ভণিতাপাঠ অভ্যস্ত বাঙ্গালীপাঠক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য কৃষ্ণদাসের ভণিতায় বিনয়ের নূতন আদর্শ পাইবেন সন্দেহ নাই,—

"চৈতন্যচরিতামৃত যেইজন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করোঁ মুক্তি পানে॥" চৈ, চ, অন্ত।

কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন, জীবনে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সংসারের নানা বিচিত্র উপদ্রব সহ্য করিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি অকাতরে মাথায় বহিয়া যে দৃঢ় চরিত্রের বিকাশ পাইয়াছিল সে চরিত্রের শেষফল এই যে চরিতামৃত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ভবধামের অমৃত বলিয়া এখনও অনেকে

উপভোগ করেন; পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন "যেদিন এই পুস্তক পাঠ না হয় সে দিনই বিফল"*

এই পুস্তক লেখার পর তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সাধিত হইল—একথা মনে উদয় হইয়াছিল; এখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। জীব গোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই পুস্তক অনুমোদন করিলে কবিরাজের স্বহস্ত লিখিত পুঁথি গৌড়ে প্রেরিত হয়; কিন্তু পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বিরের নিযুক্ত দস্যুগণ পুস্তক লুণ্ঠন করে (১৫৮২ খৃঃ অঃ) এই পুস্তকের প্রচার চিন্তা করিয়া কৃষ্ণদাস মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলেন, সহসা বনবিষ্ণুপুর হইতে বৃন্দাবনে লোক আসিয়া এই শোকাবহ সংবাদ জ্ঞাত করাইল। অবস্থার কোন আঘাতে যে কৃষ্ণদাস ব্যথিত হন নাই আজ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠব্রত—মহাপ্রভুর সেবায় উৎসর্গ মহা পরিশ্রমের বস্তু অপহৃত হইয়াছে শুনিয়া কৃষ্ণদাস জীবন বহন করিতে পারিলেন না। জীবনপণে যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন তাহার শোকে জীবন ত্যাগ করিলেন,—

"রঘুনাথ, কবিরাজ শুনিলা দুজনে। আছাড় খাইয়া কাঁদে লোটাইয়া ভূমে॥ বৃদ্ধকালে কবিরাজ না পারে উঠিতে। অন্তর্দ্ধান করিলেন দুঃখের সহিতে॥" প্রেমবিলাস।

এই উপলক্ষে পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন "কবিরাজের অন্তর্দ্ধানের কথা লেখা উচিত নহে এবং আমাদের তাহা লিখিতে নাই, লিখিতে গেলে বুক ফাটে।"†

চরিতামৃতের ভাবী ব্যাপক যশের বিষয় কবিরাজ জানিয়া মরিতে পারেন নাই—শেষে দেশবিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই পুস্তকের সংস্কৃত টিপ্পনী প্রণয়ন করেন, বৈষ্ণবসমাজে এখনও এপুস্তক রীতিমত পূজিত হইয়া থাকে; কবিরাজ ইহার একটু পূর্ব্বাভাস জানিয়া মরিলে আমাদের দুঃখ হইত না;—তিনি উপযুক্ত বয়সেইত প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কবিরাজ প্রেমধর্ম্ম ও আরাধ্য ও আরাধকের সম্বন্ধ বিষয়ে যে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন,—তাহার দুইটি অংশ উদ্ধৃত হইল;—

(১) কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥ কামের

---

* নব্যভারত, ভাদ্র ১৩০০; ২৬৩ পৃঃ।

† নব্যভারত, ভাদ্র ১৩০০, ২৬২ পৃঃ। ভক্তিরত্নাকরের সঙ্গে এই বৃত্তান্তের অনৈক্য।

তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেমত প্রবল। লোকধর্ম্ম দেহধর্ম্ম বেদধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্ম সুখ মর্ম্ম। দুস্ত্যজ আর্য্য পথ নিজ পরিজন। স্বজনে করিব যত তাড়ন ভর্ৎসন। সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম সেবন। ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দৃঢ় অনুরাগ। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ। অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর। কাম অন্ধতমঃ প্রেমে নির্ম্মল ভাস্কর।"

চৈ. চ, আদি।

(খ) "মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন। মোর গীত বংশীস্বরে আকর্ষে ত্রিভুবন। রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ। যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ। মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধাঅঙ্গগন্ধ। যদ্যপি আমার রসে জগত সরস। রাধার অধররসে আমা করে বস। যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল। রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল। এইমত জগতের সুখ আমা হেতু। রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু। এইমত অনুভব আমার প্রতীত। বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন। আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান। পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন। মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন। কৃষ্ণআলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে। এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে। অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ। উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হয়ে অন্ধ। তাম্বুল চর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে। আনন্দ সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে। আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ। শতমুখে বলি তবু না পাই তার অন্ত। চৈ, চ, আদি।

চৈতন্যপ্রভুর বৃন্দাবন দর্শন বর্ণনায় প্রাচীন লেখক নবীন কবির স্ফূর্ত্তি দেখাইয়াছেন; তাঁহার পরিণত ইতিহাসের স্বচ্ছ ছায়ায় সেই দৃশ্যটী অতি সুন্দরভাবে বিম্বিত হইয়াছে; দেবদর্শকের পদার্পণে বৃন্দাবন দেবোদ্যানের ন্যায় সুন্দর হইয়া উঠিল, "প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ লতাগণ। অঙ্কুর, পুলক, মধু, অশ্রু বরিষণ। ফুল ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভু পায়। বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লৈয়া যায়।" উন্মত্ত ভক্তির আবেশে "প্রতি বৃক্ষলতা প্রভু করে আলিঙ্গন। পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পন।" তখন তাঁহার অশ্রুবিন্দু তরুফুলপল্লবের শিশিরবিন্দুর সহিত জড়িত হইয়া গেল; তাঁহার কণ্ঠের ব্যাকুল "কৃষ্ণ"-ধ্বনি বিহগকুল আকাশে প্রতিধ্বনিত করিল; "শুক শারিকা প্রভুর হাতে উড়ে পড়ে। প্রভুকে শুনায়ে কৃষ্ণের গুণ শ্লোক পড়ে।"

তুলিতে আঁকিতে পারিলে এখানে একটি উজ্জ্বল চিত্র সমাবেশের সুযোগ ছিল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত পুস্তকগুলি ছাড়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ "রসভক্তিলহরী

নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক বাঙ্গলায় রচনা করেন; ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নায়িকার লক্ষণ বর্ণিত আছে। * কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে তিরোহিত হন।

নরহরিচক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস ও নিত্যানন্দদাসের প্রেম-বিলাস প্রভৃতি।

পরবর্ত্তী চরিতসাহিত্যে চৈতন্য-প্রভুর পারিষদগণ ও অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্য-প্রভুর সমস্ত জীবনচরিত গুলিতেই প্রসঙ্গক্রমে নিত্যানন্দপ্রভুর বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে আমরা বৃন্দাবনদাসের "নিত্যানন্দ-বংশাবলী"র কথা উল্লেখ করিয়াছি। নিত্যানন্দ প্রভুর পিতামহের নাম সুন্দরামল্ল বাড়ুরী, পিতার নাম হরাই ওঝা ও মাতার নাম পদ্মাবতী—বাসস্থান বীরভূম জেলাস্থ একচক্রাগ্রাম, তিনি ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ অম্বিকাগ্রামের সন্নিকট শালিগ্রামনিবাসী সূর্য্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবী দেবীকে বিবাহ করেন; জাহ্নবীদেবীর নাম বৈষ্ণবসাহিত্যে সুপরিচিত। জাহ্নবীদেবীদ্বারা নিত্যানন্দের গঙ্গা নামে কন্যা ও বীরভদ্র নামক পুত্র লাভ হয়; ভগীরথ আচার্য্যের পুত্র মাধবাচার্য্য (মহাপ্রভুর পড়ুয়া) গঙ্গাদেবীর পাণীগ্রহণ করেন। অদ্বৈত আচার্য্যের পিতামহের নাম নৃসিংহ, পিতার নাম কুবেরপণ্ডিত, মাতার নাম নাভাদেবী ও পত্নীর নাম সীতাদেবী;—আদিম বাসস্থান শ্রীহট্টান্তর্গত নবগ্রাম, পরে শান্তিপুরে বসতি স্থাপন করেন। ইনি ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; শ্যামদাসপ্রণীত "অদ্বৈতমঙ্গলে", ঈশাননাগরপ্রণীত "অদ্বৈত প্রকাশে" ও লাউড়িয়াকৃষ্ণদাস প্রণীত "অদ্বৈতের বাল্যলীলাসূত্রে" ইহার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, পরন্তু সমস্ত বৈষ্ণব-সাহিত্য ব্যাপিয়াই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্যের সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। রূপসনাতন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অগ্রগণ্য ও মহাপ্রভুর পরমভক্ত পার্শ্বচর। ইঁহারা কর্ণাটাধিপ বিপ্ররাজের বংশোদ্ভূত। নিম্নে বংশাবলী প্রদান করিতেছি।

* এই পুস্তকের হস্ত-লিখিত একখানা প্রাচীন কাপি আমার নিকট আছে, অন্য কোথাও আছে বলিয়া জানি না।

বিপ্ররাজ
(কর্ণাটদেশের রাজা)
|
অনিরুদ্ধ
|
রূপেশ্বর
(ইনি রাজা হইতে তাড়িত হইয়া পৌরস্ত্য দেশের অন্তর্গত শেখররাজ্যে বাস করেন।)
|
পদ্মনাভ
(ইনি নৈহাটীতে বাড়ী করেন)

হরিহর
(ইনি রাজা হন)

পদ্মনাভের পুত্র: পুরুষোত্তম | জগন্নাথ | নারায়ণ | মুরারি | মুকুন্দ

মুকুন্দ
|
কুমারদেব
(ইনি বাকলাচন্দ্রদ্বীপে ফতেয়াবাদ নামক স্থানে বাস করেন।)

কুমারদেবের পুত্র:
সনাতন (১৪৮৮ খৃঃ—১৫৫৮খৃঃ)
রূপ (১৪৮৯খৃঃ—১৫৬৩ খৃঃ)
বল্লভ
|
জীবগোস্বামী

রূপ, সনাতন, ও জীবগোস্বামী বহুবিধ সংস্কৃতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন; ইঁহারা একদিকে শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব, অপরদিকে আশ্চর্য্য-প্রতিভাপন্ন কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃতে রচনা করাতে ইঁহারা আমাদের প্রসঙ্গ-বহির্ভূত হইয়াছেন।*

* সনাতন গোস্বামী 'দিক্ প্রদর্শিনী' নামক 'হরিভক্তি বিলাসের' টীকা, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্দের 'বৈষ্ণবতোষিণী' নামক টীকা, 'লীলাস্তব' ও 'টীকাসহ দুইখণ্ড ভাগবতামৃত' প্রণয়ন করেন। রূপগোস্বামী 'হংসদূত', 'উদ্ধব সন্দেশ', 'কৃষ্ণ জন্ম তিথি' 'গণোদ্দেশ দীপিকা' 'স্তবমালা' 'বিদগ্ধ মাধব' 'ললিতমাধব', 'দানকেলি কৌমুদী' 'আনন্দ মহোদধি', 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু', 'উজ্জ্বল নীলমণি', 'প্রযুক্তাখ্যাত চন্দ্রিকা', 'মথুরা মহিমা', 'পদ্যাবলী', 'নাটক চন্দ্রিকা', 'লঘু ভাগবতামৃত', 'গোবিন্দ বিরুদাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। জীব গোস্বামীর 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ', 'সূত্র মালিকা', 'কৃষ্ণার্চ্চদীপিকা', 'গোপাল বিরুদাবলী', 'মাধব-মহোৎসব', 'সঙ্কল্প কল্পবৃক্ষ', 'ভাবার্থ সূচক চম্পূ' প্রভৃতি ২৫ খানা সংস্কৃতগ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে সুবিদিত। ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ ভক্তিরত্নাকর প্রথম তরঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্যতীত বেঙ্কটভট্টের পুত্র গোপাল ভট্ট, মাধবমিশ্রের পুত্র গদাধর (১৪৮৬ খৃঃ—১৫৩৪ খৃঃ), সপ্তগ্রামবাসী গোবর্দ্ধনদাসের পুত্র রঘুনাথ দাস, শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর (চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক প্রণেতা) প্রভৃতি মহাপ্রভুর পার্শ্বচরগণের বৃত্তান্ত অনেক পুস্তকেই পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবসমাজে নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য ও গদাধর দাস একসময়ে যে সম্মানলাভ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ ও সেইরূপ শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এমন কি বৈষ্ণব সমাজে শ্রীনিবাস ও নরোত্তম মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলিয়া আদৃত। ইঁহাদের জীবন বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতে বহুসংখ্যক গ্রন্থকার লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এই বিরাট অধ্যবসায়চিহ্নিত কীর্ত্তির প্রান্তে দাঁড়াইয়া আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়; বটতলার কর্ম্মঠতা ও উদ্যম এই সাহিত্যের অতি নগণ্য অংশ মাত্র এপর্য্যন্ত মুদ্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। কীট, অগ্নি ও তাচ্ছল্যের হস্তে বৎসর বৎসর এই প্রাচীন কীর্ত্তিরাশি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। তাহাদিগকে উদ্ধার করার উপযুক্ত কোন আয়োজন এখন পর্য্যন্তও হয় নাই।

শ্রীনিবাসের পিতা গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তীর নিবাস গঙ্গাতীরস্থ চাখন্দিগ্রামে; গঙ্গাধর শেষে চৈতন্যদাস নাম গ্রহণ করেন; শ্রীনিবাসের মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া ও মাতুলালয় জাজিগ্রামে। নরোত্তমদাস পদ্মানদীর তীরস্থ গোপালপুরের কায়স্থরাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র, মাতার নাম নারায়ণী, ইনি বৃন্দাবনবাসী লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হন, নরোত্তম রাজপুত্র হইয়া ও রঘুনাথ দাসের ন্যায় সংসারত্যাগী হন, তাঁহার জেষ্ঠ্যতাতজ ভ্রাতা সন্তোষদত্ত (পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র) তৎস্থলে রাজা হন; এই সন্তোষ দত্তই শ্রীখেতুরীর ষড়বিগ্রহস্থাপন উপলক্ষে প্রসিদ্ধ উৎসব করিয়া সমস্ত বৈষ্ণব মণ্ডলীকে একত্রিত করেন।

শ্যামানন্দ দণ্ডেশ্বর গ্রামবাসী কৃষ্ণমণ্ডল নামক এক সদ্গোপের পুত্র, মাতার নাম দুরিকা। ছোট বেলা ইঁহাকে সকলে দুঃখী বলিয়া ডাকিত, তৎপর 'কৃষ্ণদাস' ও বৃন্দাবনে বাস-কালে 'শ্যামানন্দ' আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহার দীক্ষাগুরুর নামে হৃদয়চৈতন্য।

খৃষ্টীয় ষোড়শশতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ-

মধ্যে এই তিনজন প্রেমবীর বৈষ্ণব সমাজে প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহাদের মধ্যে কেবল মাত্র শ্রীনিবাস ব্রাহ্মণ ছিলেন, নরোত্তমদাস শূদ্র হইলেও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কবি বসন্তরায় ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ছদ্মবেশী গঙ্গানারায়ণচক্রবর্ত্তী পক্কপল্লীর রাজা নৃসিংহের সমস্ত সভাপণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন। সেইসব পণ্ডিতগণ যে রাশীকৃত সংস্কৃতগ্রন্থ বহুসংখ্যক বাহকের স্কন্ধে চাপাইয়া তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেগুলি দ্বারা তাঁহারা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে সক্ষম হন নাই; সুতরাং বিচারজয়ী ব্রাহ্মণটি যে শূদ্রপ্রবরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজকে সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন, সদলে পক্কপল্লীরাজকে তাঁহার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

এই সাধু ভাগবতগণের জীবন বর্ণন করিতে যে সকল লেখক অগ্রসর হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভাগবতের টীকাকার প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র গঙ্গাতীরবাসী নরহরি চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তি রত্নাকর—রত্নাকর সদৃশই বিরাট, ও রত্নাকরের নিম্নে যেরূপ নানা মূল্যবাণ ও মূল্যহীন দ্রব্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে, এই পুস্তকে ও সেইরূপ নানা মূল্যবান ও মূল্যহীন কথার একত্র সমাবেশ হওয়াতে ইহা হইতে সার উদ্ধার করা একটু অধ্যবসায়শীল ও সহিষ্ণু পাঠকের কার্য্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সমস্ত পুঁথি আলোড়ন না করিলে ইহা হইতে কোন প্রয়োজনীয় বিষয় জানার পথ নাই; ভক্তিরত্নাকর পাঠারম্ভ ও নীবিড় অরণ্যে প্রবেশ একইরূপ ব্যাপার।

এই বৈষ্ণব ইতিহাস-সাহিত্য সম্বন্ধে এস্থলে প্রাসঙ্গিক একটি কথা বলা আবশ্যক। য়ুরোপে ইতিহাস লিখিতে হইলে, স্বাধীনতার জন্য বড় রকমের যুদ্ধ বিগ্রহ, বক্তৃতামালা উত্তেজিত জনসাধারণের দ্বারা শাসনের কঠিন বেলাভূমি ভঙ্গ করা, নবদেশ আবিষ্কারচিন্তায় প্রশান্তসাগরের শান্তি ভাঙ্গিয়া বর্ব্বরের পত্রাচ্ছন্ন কুটিরে লগুড়াঘাত, তাহাকে গুলির শব্দে চমৎকৃত করিয়া টিকি ধরিয়া টানাহেঁচরা করা, কতকগুলি ঘন্টি, শুক্তির শঙ্খ ও গুলি বারুদের ঘনীভূত ধুম্রপটলে স্বচ্ছ গ্রন্থ পত্র ছাইয়া ফেলা—ইহাই লেখনীর বিষয় হয়।

কিন্তু বৈষ্ণবেতিহাসের লক্ষ্য অন্যরূপ; শিরোবিমণ্ডিত, ভূলুণ্ঠিত, তুলসীমাল্যবিরাজিত বৈরাগীই এইসব গ্রন্থের নায়ক; খোলবাদ্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে লেখকগণের যেরূপ আগ্রহজনক বর্ণনা, বোধ হয় য়ুরোপীয় লেখকগণ ব্লুচার কি করটেজের যুদ্ধনীতির ও ততদূর প্রশংসা করিবেন না; কীর্ত্তনের কথা বলিতে গদগদভাবে লেখকগণ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়িয়া বর্ণনা দিয়াছেন—তাহা পাঠকের ধৈর্য্যের একরূপ অগ্নি পরীক্ষা। বর্ণিতগ্রন্থ সকলের নায়কগণ "অশ্রু কম্প স্বেদাদি ভূষিত" (ভক্তি রত্নাকর ৩য় অধ্যায়ে) হইলে তাঁহারা লেখকের চক্ষে দেবরূপী হইয়া দাঁড়ান। পাঠক অনুমান করিবেন না, আমি বিদ্রূপ করিতেছি। ভক্তির রাজ্যের স্বাদ বাহিরের লোক পায় না, এই সম্বন্ধে কবির উক্তি "অরসিকেতু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ।" আমার বক্তব্য এই যে বৈষ্ণবগণের নিকট এইসব পুস্তক ও তাহাদের প্রশংসার লক্ষ্য বিষয়—অমূল্য দ্রব্য, বাহিরের লোক অনধিকারী ও ততদূর স্বাদ পাইবেন না। কিন্তু ইতিহাস লেখক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ এইসব গ্রন্থের কীট ঝাড়িয়া, ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দ্বারা ক্ষুদ্র অক্ষর বড় করিয়া—লুপ্ত কথা কল্পনার দ্বারা গাঁথিয়া অগ্রসর হইলে অনেক লাভজনক মাল মসল্লা পাইতে পারিবেন, নানাদিক হইতে নানাপ্রকার ঐতিহাসিক চিত্রপট পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল হইয়া দাঁড়াইবে।

ভক্তি রত্নাকরে মোট পঞ্চদশ তরঙ্গ। প্রথম তরঙ্গে জীবগোস্বামীর পূর্ব্ব পুরুষগণের বিষয়, গোস্বামীগণের গ্রন্থ বর্ণন, ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃত্তান্ত; দ্বিতীয় তরঙ্গে শ্রীনিবাসের পিতা চৈতন্যদাসের কথা, ও তৃতীয় এবং চতুর্থ তরঙ্গে শ্রীনিবাসের শ্রীক্ষেত্রে গৌড়ে, ও বৃন্দাবনে গমন বৃত্তান্ত, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তরঙ্গে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রাঘবপণ্ডিতের ব্রজবিহার, রাগরঙ্গিনী ও নায়িকাভেদ বর্ণন ও শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ প্রভৃতির গোস্বামীগণকৃত গ্রন্থ লইয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা; সপ্তম তরঙ্গে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বির কর্ত্তৃক গ্রন্থ চুরি ও পরিশেষে বীরহাম্বিরের বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ; অষ্টমে শ্রীনিবাস রামচন্দ্রকে শিষ্য করেন; নবমে কাঁচাগড়িয়া ও শ্রীখেতুরি গ্রামের মহোৎসবের কথা; দশমে ও একাদশে জাহ্নবীদেবীর তীর্থাদি দর্শন বৃত্তান্ত; দ্বাদশে শ্রীনিবাসের নবদ্বীপ গমন ও ঈশানকর্ত্তৃক নবদ্বীপ বৃত্তান্ত বর্ণন; ত্রয়োদশে আচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পরিণয় ও

চতুর্দ্দশে বেরাকুলী গ্রামের সংকীর্ত্তন; পঞ্চদশতরঙ্গে শ্যামানন্দকর্ত্তৃক উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার লিখিত হইয়াছে। ৫ম অধ্যায়ে গ্রন্থকর্ত্তা রাগরাগিণী সম্বন্ধে সুদীর্ঘ শাস্ত্রীয় গবেষণা ও নায়কনায়িকাভেদ এবং প্রেমের লক্ষণ বিচার দ্বারা যে পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি চিরদিনই শিক্ষিত সমাজের পূজা পাইবেন। বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের তিনি যে সুবৃহৎ ও পরিষ্কার বর্ণের মানচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা কালের পৃষ্ঠায় এই দুই স্থানের ভৌগলিক তত্ত্ব চিরদিন অঙ্কিত করিয়া রাখিবে। ম্যাণ্ডিভাইলের হস্তে জেরুজেলেম ও হিউনসঙ্গএর হস্তে কুশীনগর হইতে ও নরহরির হস্তে নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনবেশী উজ্জ্বল হইয়াছে।

ভক্তিরত্নাকরে—বরাহ পুরাণ, পদ্মপুরাণ, আদিপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, স্কন্দ-পুরাণ, সৌরপুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত্‌ লঘুতোষিণী, গোবিন্দবিরুদাবলী, গৌর-গনোদ্দেশ দীপিকা, সাধন দীপিকা, নবপদ্য, গোপালচম্পু, লঘুভাগবত, চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক ব্রজবিলাস, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, মুরারিগুপ্তকৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিত, উজ্জ্বলনীলমণি, গোবর্দ্ধনাশ্রয়, হরিভক্তি বিলাস, স্তবমালা, সংগীতমাধব, বৈষ্ণবতোষিণী, শ্যামানন্দ শতক, মথুরাখণ্ড, প্রভৃতি বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; সংস্কৃত শ্লোক প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক কিন্তু উহা এদেশের প্রথানুযায়ী; নরহরি শুধু প্রথানুগামী নহেন, একটি নূতন প্রথার প্রবর্ত্তক। ভক্তি-রত্নাকরে চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত হইতে অনেক শ্লোক প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে—ইহা দ্বারা নরহরিই সর্ব্বপ্রথম ভাষাগ্রন্থকে সংস্কৃতের ন্যায় সম্মানিত করিয়া পৌরহিত্যে বরণ করেন। ভক্তিরত্নাকরে গোবিন্দদাস, নরোত্তমদাস, রায় বসন্ত প্রভৃতি বহুবিধ পদকর্ত্তার পদ সাময়িক প্রসঙ্গ সৌষ্ঠবার্থ উদ্ধৃত হইয়াছে—তিনি নিজেও অনেকগুলি স্বীয়পদ তন্মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন কোনটির ভণিতায় স্বীয় অপর নাম ঘনশ্যাম ব্যবহার করিয়াছেন। এই পুস্তক ব্যতীত নরহরি প্রক্রিয়া পদ্ধতি গৌরচরিতচিন্তামণি, গীতচন্দ্রোদয়, ছন্দঃসমুদ্র, শ্রীনিবাসচরিত, ও নরোত্তম-বিলাস রচনা করেন। এই অপরিসীম কর্ম্মঠতা ও পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তি বৈষ্ণব সাহিত্যের বিরাটরাজ্য হইতে প্রেমের জয় চিহ্নাঙ্কিত কেতু দ্বারা স্থায়ী যশের স্বর্গ স্পর্শ করিতেছে; নরহরি ইতিহাসের দৃঢ়মন্দির পদাবলীর

কোমল লতিকা দ্বারা বেষ্টন করিয়া পাষাণে কুসুম সৌরভ প্রদান করিয়াছেন।

নরোত্তম বিলাস বোধ হয় তাঁহার শেষ গ্রন্থ; এই পুস্তক খানায় ১২ বিলাসে নরোত্তমদাসের চরিত বর্ণিত হইয়াছে; ভক্তিরত্নাকর হইতে ইহা অনেক ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে নরহরির পরিণত শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে; ইহাতে শাস্ত্রজ্ঞান দেখাইবার ততদূর তীব্র আগ্রহ নাই কিন্তু আয়োজন পত্র গুছাইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করার শক্তি ভক্তিরত্নাকর হইতে অধিক লক্ষিত হয়।

সন্তোষ দত্ত খেতুরিতে ছয়টি বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষে যে মহা সমারোহ-জনক উৎসব করেন তাহাতে তাৎকালিক সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ডলী আহূত হন। এই ঘটনাটি বৈষ্ণবসাহিত্যের অনেক পুস্তকেই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে; এই উৎসব অতীত ইতিহাসের দুর্ণিরীক্ষ্য ও অচিহ্নিত রাজ্যের একটি পথ প্রদর্শক আলোস্তম্ভ স্বরূপ; ইহার প্রভাবে আমরা আগুন্তক অসংখ্য বৈষ্ণবের মধ্যে পরিচিত বড় বড় কয়েক জন লেখককে অনুসরণ করিতে পারি; ইঁহারা ছায়ার ন্যায় ত্বরিৎগতিতে আমাদের দৃষ্টি হইতে সরিয়া পড়িলেও সেই আভাস মাত্র সাক্ষাতেই আমরা তাঁহাদের উত্তরীয়বস্ত্রে ১৫০৪শকঅঙ্কিত একটি ছাপ দিয়া লইয়াছি। এই উৎসব উপলক্ষে অনেক বৈষ্ণবলেখকের সময় ধরা পড়িয়াছে।

নরহরির ইতিহাস রচনা সাদাসিদা,—গদ্যের ন্যায়; গদ্য লেখার প্রথা প্রচলিত থাকিলে ইনি বোধ হয় পদ্যছন্দে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেন না। রচনার নমুনা এইরূপ,—

"আচার্য্য অধৈর্য্য বাক্যে ধৈর্য্য প্রকাশিয়া। নরোত্তমে কৈলা স্থির যত্নে প্রবোধিয়া॥ প্রসাদী পাকান্ন সব লৈয়া ঘরে ঘরে। অতি শীঘ্র গেলেন সবার বাসা ঘরে॥ সকল মহান্ত প্রতি কহে বারে বার। কালি এ খেতরি গ্রাম হবে অন্ধকার॥ পদ্মাবতী পার হৈয়া পদ্মাবতী তীরে। করিবেন স্নান সবে প্রসন্ন অন্তরে॥ তথা ভুঞ্জিবেন এই প্রসাদী পাকান্ন। বুধরি গ্রামেতে গিয়া হইবে মধ্যাহ্ন। আগে যাইবেন গোবিন্দাদি কথোজন। সেই সঙ্গে পাক কর্ত্তা করিবে গমন॥ রামচন্দ্রাদি এসঙ্গে যাইবেন তথা। বুধরি হইতে তারা আসিবেন এথা॥" নরোত্তম বিলাস।

এই অনাড়ম্বর লেখক যখন পদ রচনা করিয়াছেন তখন তাঁহার লেখনী মুখ হইতে এক অতি মুগ্ধকর পুষ্পবাস নিঃসৃত হইয়াছে; তাঁহার পদ সমূহ সর্ব্বত্র সুপরিচিত। "গৌরচরিত চিন্তামণি" খানা নানামধুরালাপ

সম্বলিত রাগিণীতে পরিব্যক্ত একটি গানের ন্যায়; নিম্নে একটি স্থল উদ্ধৃত হইল;—

"নিশি গত শশিদরপ দুরে। অতিশয় দুঃখে চকোর ফিরে॥ পতিবিড়ম্বনলজ্জিত মনে। লুকাইল তারা গগন বনে॥ নদীয়ার লোক জাগিল ত্বরা। তেঁই বলি শেজ তেজহ গোরা॥ মোরে না প্রত্যয় করহ যদি। তবে পুছহ নরহরির প্রতি॥ * * * ময়ুর ময়ুরী পৃথক আছে। কেহো না আইসে কাহারো কাছে, বিরস হইয়া রৈয়াছে গাছে, তুমি না দেখিলে না নাচে তারা। ভ্রমর ভ্রমরী রুচির কুঞ্জে, ভুলি না বৈসয়ে কুসুম পুঞ্জে, কারে শুনাইব বলি না গুঞ্জে, ফিরয়ে বিপিনে ব্যাকুলপারা॥" ২য় কিরণ।

প্রেমবিলাসরচক নিত্যানন্দদাসের কথা ১৭১ পৃষ্ঠায় একবার উল্লেখ করিয়াছি; ইঁহার অপর নাম বলরামদাস,—ইনি শ্রীখণ্ডনিবাসী আত্মারামদাসের পুত্র, বৈদ্যবংশ সম্ভূত ও ইঁহার মাতার নাম সৌদামিনী। ইনি পিতা মাতার একমাত্র সন্তান।

প্রেম বিলাস ২০ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের কথাই মূলতঃ বর্ণিত হইয়াছে; প্রায় ৩৫০ বৎসর হয় নিত্যানন্দ দাস প্রেমবিলাস রচনা করেন; ভক্তিরত্নাকর হইতে ইহার রচনা জটিল; একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি:—

প্রভুদত্ত শেষ নিদর্শন।

"দুই মহাশয়ের গুণ যে লিখিত আছে। পশ্চাতে লিখিব তাহা থাকি তার পাছে॥ এবে লিখি যে হইল বিরহ বেদনা। দেখিয়া কি প্রাণ ধরে দীন হীন জনা॥ সনাতনের দশা দেখি রূপে চমৎকার। তুমি এমন হৈলে মরণ হইব সবার॥ প্রভুর দ্বিতীয় দেহ তুমি মহাশয়। তোমারে ব্যাকুল দেখি কার বাহ্য হয়॥ নানা যত্ন করি রূপে চেতন করাইল। দারুণ বিরহকম্প দ্বিগুণ বাড়িল॥ সেদিন হইতে সনাতন অস্থির হইল। গৌরাঙ্গবিরহ ব্যাধি দ্বিগুণ বাড়িল॥ চিন্তিত হইলা পাছে দেখি সনাতন। শূন্য পাছে গোবিন্দ করেন বৃন্দাবন॥ সম্বিত পাইয়া রূপ আসন লইয়া। ভট্টের নিকটে যান গৌরব করিয়া॥ দুই ভাই দুই দ্রব্য যত্ন করি বুকে। ভট্টের বাসাকে গেলা পাইয়া বড় সুখে॥ দিলেন আসন ডোর দণ্ডবৎ করি। পত্র পড়ি শুনাইলা পত্রের মাধুরী॥ পত্রের গৌরব শুনি মূর্চ্ছিত হইলা। আসন বুকে করি ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা॥ যত্নকরি শ্রীরূপ করেন কিছু স্থির। সনাতন দেখি ভট্ট হইলেন ধীর॥ সনাতন কহে ভট্ট শুন গোসাঞি। কথার কালে বসিবা আসনে দোষ নাঞি॥ প্রভুর আসনে আমি কেমনে বসিব। আজ্ঞা করিয়াছেন প্রভু কেমনে উপেক্ষিব॥ প্রভু আজ্ঞা বলবতী শ্রীরূপ কহিলা। গলে ডোর করি ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা॥"

১৭২ পৃষ্ঠায় যদুনন্দনদাসের 'কর্ণামৃত' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি,—ইহা আকারে চৈতন্যচরিতামৃতের অর্দ্ধেক হইবে; কর্ণামৃত ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত; এই পুস্তকে শ্রীনিবাসআচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার রচনা সম্বন্ধে গ্রন্থকার নিজে এই লিখিয়াছেন;—

"বুধুইপাড়াতে রহি শ্রীমতী * নিকটে। সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে॥ শকাব্দশত আর বৎসর উনত্রিংশে। † বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে॥ নিজপ্রভু-পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া। সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥"

প্রেম দাসের (অপর নাম পুরুষোত্তম) বংশী-শিক্ষার নাম ও ১৭২ পৃষ্ঠার আমরা একবার উল্লেখ করিয়া গিয়াছি; "বংশীশিক্ষা" আকারে যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দের তুল্যই হইবে। মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস এবং গৌরাঙ্গ পার্ষদ বংশীদাস ঠাকুরের জন্মাদিও তাঁহার শিক্ষাপ্রসঙ্গ বর্ণনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। প্রেমদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন ও তাঁহার উপাধি "সিদ্ধান্ত-বাগীশ" ছিল। ইনি "বংশী-শিক্ষা" ও স্বকৃত "চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ" সম্বন্ধে এই পরিচয় দিয়াছেন;—

"শকাব্দিতা ষোলশত চৌত্রিশ শকেতে। ‡ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক সুখেতে॥ লৌকিক ভাষাতে মুঞি করিনু লিখনে। ষোলশত অষ্টত্রিংশ শকের গণনে॥ ৡ শ্রীশ্রীবংশী-শিক্ষাগ্রন্থ করিনু বর্ণন। নিজ পরিচয় তথে শুন ভক্তগণ॥" বংশীশিক্ষা।

প্রায় ২০০ শত বৎসর হইল মহাপ্রভুর পিতামহ উপেন্দ্রমিশ্র বংশোদ্ভব জগজীবনমিশ্র "মনঃসন্তোষিণী" নামক একখানা ক্ষুদ্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন; ইহাতে মহাপ্রভুর শ্রীহট্টভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। জগজীবন মিশ্রের বাড়ী শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণগ্রামে অর্থাৎ যেখানে উপেন্দ্র মিশ্রের বাড়ী ছিল। জগজীবন মিশ্র মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরমানন্দ মিশ্র হইতে ৮ম পর্য্যায়ে উৎপন্ন; এইসব পুস্তক ছাড়া "মহাপ্রসাদ বৈভব", "চৈতন্যগণোদ্দেশ", "বৈষ্ণবাচার দর্পন" প্রভৃতি পুস্তক ও চরিত-শাখার অন্তর্গত। আরও রাশি রাশি পুস্তক রহিয়া গেল, তাহাদিগের নামোল্লেখ করিতে আমাদের শক্তি ও সময় নাই। এই নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ

* শ্রীনিবাসাচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী।

† ১৫২৯ শক অর্থাৎ ১৬০৭ খৃষ্টাব্দ।

‡ ১৬৩৪ শক অর্থাৎ ১৭১৩ খৃষ্টাব্দ।

ৡ ১৬৩৮ শক অর্থাৎ ১৭১৬ খৃষ্টাব্দ।

করিলে ধৈর্য্যহারা ও পথহারা হইতে হয়; যদিও এই পুস্তকসমূহের অনেকগুলিকেই কাল—কীট ও অগ্নির মুখে বৎসর বৎসর উপহার দিতেছেন এবং তাহাদের একঘেয়ে খোলের বাদ্য শুনিতে শুনিতে বিরক্ত হইয়া আমরাও কালের ধ্বংশ ক্রীড়ায় কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি বোধ করি না—তথাপি বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে মহতী শক্তিতে এই সুপ্রসার সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, যে অধ্যবসায়-সিন্ধু হইতে অবিরত এইরূপ সাহিত্যিক শক্তির প্রবল তরঙ্গ ও বুদ্বুদ উঠিয়াছে, সামাজিক জীবনে সেই বিরাট আন্দোলন ও কর্ম্মঠতার ব্যাপার দেখিলে মনে হয় না,—বঙ্গদেশীগণ শবের ন্যায় পড়িয়াছিল, বিদেশী শাসন কর্ত্তাগণের ভেরীধ্বনিতে এইমাত্র তাহারা হাই তুলিয়া জাগিয়া বসিয়াছে।

৭ম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

৭ম অধ্যায়ে বৈষ্ণব-সাহিত্যের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ সংক্রান্ত পুস্তকের আলোচনা করা হয় নাই,—স্থলে স্থলে উল্লেখ·মাত্র করিয়াছি; অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিষয়ক পুস্তক ও বিস্তর; স্বতন্ত্র হেডিং করিয়া ব্যাখ্যাশাখা ও অনুবাদ-শাখার আলোচনা করিতে গেলে গ্রন্থের পরিসর বড় বাড়িয়া যাইবে; তাই অধ্যায়ভাগে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিয়া এস্থলে সংক্ষেপে তাহাদিগের উল্লেখ করিয়া যাইতেছি।

আগরদাসের শিষ্য নাভাজীর আদত "ভক্তমাল" শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণদাসবাবাজী অনুবাদ করেন; ভক্তমালে বহুসংখ্যক বৈষ্ণব মহাজনগণের জীবন বর্ণিত হইয়াছে। আদত হিন্দী ভক্তমালগ্রন্থ নাভাজীর শিষ্য প্রিয়দাস স্বকৃত টীকা দ্বারা বিস্তারিত করিয়াছেন; কৃষ্ণদাস তন্মধ্যে আরও বহু সংখ্যক বৈষ্ণবের জীবনী সংযুক্ত করিয়া ও প্রিয়দাসের টীকার বিস্তার করিয়া গ্রন্থকলেবর দ্বিগুণ পরিমাণে বাড়াইয়াছেন; তিনি নিজে ভাল হিন্দী জানিতেন না, সুতরাং এই গ্রন্থ রচনা করিতে তাহার বিশেষ শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে; তিনি নিজেই তাহা লিখিয়াছেন;—

"গ্রন্থ হয় ব্রজভাষা সব বুঝি নহি। যেহেতু গৌড়ীর বাক্যে শ্রেণীমত কহি। রচনা পূর্ব্বক কহিবারে নাহি জানি। যথাশক্তি করযোড়ে মিলাইয়া ভণি। উপহাস কেহ নাহি করিহ ইহাতে। বৈষ্ণবের গুণগান করি যে তেমতে। অতএব টীকার অর্থ বুঝি আপনতে। রচিয়া কহিবমাত্র মন বুঝাইতে। যথা যথা প্রিয়দাস সংক্ষেপেতে অতি। বর্ণিলা না

প্রবেশয় সাধারণ মতি। সেই সেই কোন কোন স্থানে কিছু কিছু। বিস্তার করিয়া কহি তার পাছু পাছু।” ভক্তমালগ্রন্থ।

ভক্তমালের বঙ্গীয় অনুবাদের আকার চৈতন্যভাগবতের তুল্য।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে গুণরাজখাঁবিরচিত ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্দের অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছি। ষোড়ষ শতাব্দীর মধ্যভাগে অপর একজন বেশ প্রতিভাবান কবি ভাগবতের অনুবাদ করেন। ইঁহার নাম মাধবাচার্য্য, ইনি কান্যকুব্জ হইতে সমাগত ভট্টনারায়ণ বংশীয় ও তাঁহার অষ্টাদশ পর্য্যায়ে জন্ম গ্রহণ করেন। মাধবাচার্য্যের বাড়ী ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনানদীর তীরস্থ নবীনপুর (ন্যানপুর) গ্রাম, এই স্থান এখন গোঁসাইপুর বলিয়া পরিচিত। মাধবাচার্য্যের পিতামহের নাম ধরণীধরবিশারদ, পিতার নাম পরাশর ও একমাত্র পুত্রের নাম জয়রামচন্দ্র গোস্বামী। মাধবাচার্য্যের ‘শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলে’ লিখিত আছে মাধবাচার্য্যের পিতা মাতা বৃদ্ধাবস্থায় গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে বাস করেন, কিন্তু “চণ্ডীকাব্যে” মাধবাচার্য্য আত্ম-পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন ;—

“পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার। একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥ অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি। কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥ সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল। ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥ সেই মহানদী তটবাসী পরাশর। যাগ যজ্ঞে জপে তপে, শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥ মর্য্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু। আচারে বিচারে বুদ্ধে সম দেবগুরু॥ তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য। ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥ আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায় গান। তার দোষ ক্ষমাকর কর অবধান॥ শ্রুতিতালভঙ্গ অন্য দোষ না নিবা আমার। তোমার চরণে মাগি এই পরিহার॥ ইন্দু-বিন্দু বাণধাতা শক নিয়োজিত। দ্বিজ মাধবে গায় সারদা চরিত॥ সারদার চরণসরোজ মধু লোভে। দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হয়ে শোভে॥”

সুতরাং পিতা মাতার ‘তীর্থবাস’ সম্বন্ধে কৃষ্ণমঙ্গলের আত্ম পরিচয় ও এই আত্মপরিচয়ে একটু অনৈক্য আছে। মহাপ্রসাদ বৈভব ও মাধববংশ-তত্ত্ব প্রভৃতি পুস্তকে জানা যায় মাধবাচার্য্য মহাপ্রভুর পড়ুয়া ও মন্ত্রশিষ্য ছিলেন ; তাহা হইলে “ইন্দু বিন্দু বাণধাতা” অর্থাৎ ১৫০১ শক (১৫৭৯ খৃঃ) একটু কষ্টযুক্তি দ্বারা খাপ খাওয়াইতে হয়।

বিশেষ বৈষ্ণব হইয়া তিনি চণ্ডী মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে কেন গেলেন তাহাও একটি সমস্যা। সে সময়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে সমাজ ছিন্ন ভিন্ন

হইতেছিল ও গোড়া বৈষ্ণবগণ চণ্ডীর মূর্ত্তি দর্শন.ও পাপ বলিয়া গণ্য করিতেন। "বিল্বপত্র জবার ফুল। দেখতে মারেন চক্ষের শূল॥ কালী নাম শুন্‌লে কাণে হস্ত।" অপর স্থলে "হাট করেন না কালী গন্ধের হাটে।" (দাশরথী।) মাধবাচার্য্য শুধু চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—সুন্দরবনসেবী, ব্যাঘ্রারোহী দেবতা দক্ষিণ রায়েরও একপালা গান রচনা করিয়াছিলেন, (৬০ পৃষ্ঠা দেখুন)। এই সমস্যা দুইটিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, প্রথমত মাধবাচার্য্য শেষোক্ত দুইখানা পুস্তক বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গে রচনা করেন, তথায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ একরূপ ছিল না বলা যাইতে পারে, দ্বিতীয়ত মাধবাচার্য্য কীর্ত্তন ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, সুতরাং লোক মনস্তুষ্টি ও পসারের অনুরোধে তাঁহাকে সাময়িক রুচির দ্বারা লেখনীর গতির দিকনির্ণয় করিতে হইত। চণ্ডীকাব্য হইতে উদ্ধৃতাংশে দেখা যায় মাধবাচার্য্যের গানের দল ছিল এবং ভক্তিরত্নাকরের নবম তরঙ্গে "শ্রীমাধবাচার্য্য কীর্ত্তনিয়া" উপাধিযুক্ত নাম পাওয়া যায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন "তিনি কীর্ত্তন ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহার রচিত একখানা পুস্তকে তিনি সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যেন নানাজাতি হইতে আনীত তাঁহার গানের দলের বালকগণ উচ্চারণ শুদ্ধি লাভ করিতে পারে।"*

যাহা হউক মাধবাচার্য্য গৌরপ্রভু ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ধূয়ার পুষ্পমাল্য—দ্বারা তাঁহার চণ্ডীকাব্য খানা ও বেশ সাজাইয়াছেন; তাঁহার শক্তি উপাসনায় ও অবকাশমতে বৈষ্ণবমহিমা স্থাপিত হইয়াছে, চণ্ডীতে গৌর সম্বন্ধে পদ, যথা—"দেখনা গৌরাঙ্গ চাঁদের বাজার। ভক্ত তরিবার তরে, সুরধুনিতীরে, প্রেমময় রত্ন পসার॥ যত ব্রজসখীগণ, দেখ গিয়ে কৃষ্ণধন, চাঁদমুখ হের একবার॥"

মাধবাচার্য্যের ভাগবতের অনুবাদের কথাই এস্থলে বলা প্রয়োজন, কিন্তু মাধবাচার্য্য বঙ্গসাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখক, তাঁহার পরিচয় দুছত্রে সমাধা করা উচিত বোধ করি নাই, এইজন্য এই বাহুল্য।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্দের সারভাগ বেশ সুন্দরভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে; গৌরভূষণ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বলেন,

* "In one of his works he prays to Sarasvati that the boys of his party recruited from various castes, may acquire purity of pronunciation." Shastri's Old Bengali Literature.—P. 11.

"শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের পূর্ব্বে নানা স্থানে গুণরাজ খাঁ প্রণীত কৃষ্ণবিজয় গীত হইত, মাধবের কৃষ্ণমঙ্গল অচিরেই সেই স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল।"

কৃষ্ণমঙ্গল, চণ্ডীকাব্য ও দক্ষিণরায়ের উপাখ্যান ব্যতীত মাধবাচার্য্য সংস্কৃতে প্রেমরত্নাকর নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মাধবাচার্য্য হইতে বহু প্রাচীন লেখক প্রসিদ্ধ "লাউরিয়া কৃষ্ণদাস" বিষ্ণুপুরীঠাকুররচিত রত্নাবলীর বঙ্গীয় অনুবাদ রচনা করেন। আমরা অনুবাদ পুস্তকের মুখবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি;—

"শ্রীবিষ্ণুপুরী ঠাকুর ভকত সন্ন্যাসী। জীব নিস্তারিলা কৃষ্ণ ভকতি প্রকাশি॥ বিচারি বিচারি ভাগবত পয়োনিধি। বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী প্রকাশিলা নিধি॥ প্রতি অধ্যায় বিচারিয়া দ্বাদশ স্কন্দ। সার শ্লোক উদ্ধারিয়া করিলা প্রবন্ধ॥ নানান প্রকার শ্লোক ব্যাখ্যা করি সাধু। তাপিত জীবের তরে সিঞ্চিলেক মধু॥ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক ভাগবত। তা হইতে উদ্ধার করিলা শ্লোক চারিশত॥ বিষ্ণুপুরী ঠাকুর রচিল রত্নাবলী। কৃষ্ণদাস গাইলেক অদ্ভুত পাঁচালী॥"†

অনুবাদপুস্তকে কবিতার খেলা খেলিতে গেলে আসল বজায় থাকে না, আবার একবারে কবিত্ববিহীন হইলেও অনুবাদ কিংশুকের ন্যায় পরিত্যক্ত হয় সুতরাং ভাল একখানা অনুবাদ রচনা করা বড় বিষম ব্যাপার; কৃষ্ণদাসের হাতে অনুবাদটি মন্দ হয় নাই, সেকেলে ভাষায় যতদূর কুলাইয়াছিল, কৃষ্ণদাস ততদূর মার্জ্জিত রচনার আদর্শ দেখাইয়াছেন, স্বীকার করিতে হইবে যথা;—

"ভ্রমর রময়ে যেন কমলের মাঝে। মোর মন তেন রমোক তোমা পদাম্বুজে॥ যেই পুষ্প থাকয়ে কণ্টক অভ্যন্তরে। তাহাতে প্রবেশিয়া কি ভ্রমরা নাহি চরে॥ সহস্র বিপদ মোর থাকুক সর্ব্বক্ষণ। তোমা পদ কমল চিন্তায় যদি মন॥ সুবর্ণ মুকুট সাথে সেহ যেন ভার। যেইশিরে কৃষ্ণপদ না কৈল নমস্কার॥ জগন্নাথ মূর্ত্তি যেই না কৈল নিরীক্ষণ। ময়ূরের পুচ্ছ তার দুইটি নয়ন॥"

এখন "লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস" কে, তৎসম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি। শ্রীহট্টে লাউর নামে একটি স্থান আছে, ৪৫০ বৎসরের অধিক হইলে সেখানে দিব্যসিংহ নামক একজন হিন্দু রাজা ছিলেন। অদ্বৈত প্রভুর পিতা কুবের পণ্ডিত ইঁহারই মন্ত্রী; পরে কুবের গঙ্গাবাস হেতু সপরিবারে শান্তিপুরে

† এই গ্রন্থের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি ত্রিপুরেশ্বরের সেক্রেটরী বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ ঘোষ বি, এ মহাশয়ের নিকট আছে, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন।

আগমন করেন, ইহার ও পরে যখন অদ্বৈত ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, দিব্যসিংহ তখন অতি বৃদ্ধ, তিনি পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়া শান্তিপুরে বাস করেন। তাঁহারই বৈষ্ণবাবস্থার নাম কৃষ্ণদাস, পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি কৃষ্ণদাস অদ্বৈতের বাল্যলীলা বর্ণনা করেন, অদ্বৈত শিষ্য ঈশান-নাগর স্বীয় "অদ্বৈত প্রকাশে" উক্ত পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন যথা,—

"লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলা সূত্র। যে গ্রন্থ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র॥"

যতুনন্দন দাস কৃত "গোবিন্দলীলামৃতের" বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে; কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীয় গোবিন্দলীলামৃত পরিণত পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে সাজাইয়াছেন—যতুনন্দনদাসের অনুবাদটিতে আদত সৌন্দর্য্য বেশ ফুটিয়াছে; এই পুস্তকে শ্রীমতীরাধা ও তাঁহার সখীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মধুর মধুরলীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অনুবাদ পুস্তক আকারে চৈতন্য-মঙ্গলের তুল্য হইবে। ইহাছাড়া যতুনন্দন দাস রূপগোস্বামীর "বিদগ্ধমাধব" ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের "কৃষ্ণকর্ণামৃতের" অনুবাদ করেন। প্রেমদাসকৃত চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ের অনুবাদ, সনাতন চক্রবর্ত্তির ভাগবতের অনুবাদ, ও রসময়ের গীতগোবিন্দের অনুবাদ এইস্থলে উল্লেখ যোগ্য। গিরিধরের অনুবাদ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

ব্যাখ্যা-শাখায় ঠাকুর নরোত্তমদাসের "প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা", "সাধনভক্তি-চন্দ্রিকা", "হাটপত্তন", ও "প্রার্থনা" প্রভৃতি পুস্তকই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। "বিবর্ত্ত-বিলাসের" গ্রন্থকার নিজকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জনৈক শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ইহাতে গোপীভাবে ভজন সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে—ইহা কোন শঠবৈষ্ণবের লেখা; বৈষ্ণব সমাজ বিবেচনা করেন, "কর্ত্তাভজাদলের" কোনও লেখক এই ঘৃণিত কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈষ্ণবসমাজের স্কন্ধে কলঙ্ক চাপাইয়াছেন। কৃষ্ণদাস-বিরচিত "পাষণ্ডদলন" ও রামচন্দ্র কবিরাজ প্রণীত "স্মরণদর্পণ" এই শাখার অন্তর্গত। এইস্থলে বৃন্দাবনদাসের "গোপিকামোহন" কাব্যের উল্লেখ করা আবশ্যক; যে বৃন্দাবন "চৈতন্যভাগবত" রূপ অমর পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাঁহার লেখনী-প্রসূত "গোপিকামোহন" কাব্য ক্ষুদ্র হইলেও বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ আদরের সামগ্রী হইবে, সন্দেহ নাই; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিকাদের সম্বন্ধ এবং লীলাদি বর্ণিত হইয়াছে, ইহার বহু প্রাচীন, হস্তলিখিত একখানা পুঁথি আমার নিকট আছে।

আমরা আর পুস্তকের নাম করা আবশ্যক মনে করি না; এখনও এক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্বের হল চালনা হয় নাই, ভবিষ্যতে আরও অনেক বড় গ্রন্থ আবিষ্কৃত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যে সমস্ত পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছি তদ্বারাই যথেষ্টরূপে সাহিত্যের রুচি ও গতি নির্ণীত হইবে; সমুদ্রে ভ্রমণকারী যেরূপ প্রত্যহ লবনাম্বুর একইরূপ নীলবৃত্ত প্রত্যক্ষ করিয়া অগ্রসর হন, আমরাও সেইরূপ চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে যাহা কিছু ক্রমে পাইয়াছি, তাহাতে ন্যূনাধিক পরিমাণে একই আদর্শ ও একইভাবের বিকাশ দেখিয়া অগ্রসর হইয়াছি; নরহরি সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া লেখকগণ যে গাথা গাহিয়াছেন, তাহার প্রতিধ্বনি ক্রমে ক্ষীনতর হইয়া কোন্ কীটভুক্ত পুঁথির শেষ পংক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে কে বলিবে?

এই যুগের সাহিত্য হিন্দী উপকরণে বিশেষরূপ পুষ্ট হইতে দেখিতে পাই। এখন যেরূপ ইংরেজীভাষার রাজত্ব, বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবকালে তখন ছিল—বৃন্দাবনী ভাষার রাজত্ব। বৃন্দাবন এখনও বড় তীর্থ বলিয়া গণ্য, কিন্তু তখন বঙ্গের শিক্ষিত সমাজ ইঁহাকে ধরাতলে স্বর্গ বলিয়া গণ্য করিতেন,—শ্যামকুণ্ড কি রাধাকুণ্ড দর্শনার্থ তাঁহাদের যে উৎসাহ-পূর্ণ আগ্রহ ছিল এখন বিলাত যাইতে শিক্ষিতগণের তত আত্যন্তিক আগ্রহ নাই। এখন যেরূপ আমরা বাঙ্গলা কথার মধ্যে চারি আনা ইংরেজী মিশাইয়া মুক্তা বর্ষন করিয়া থাকি, তখন সেইরূপ বৈষ্ণবগণের বাঙ্গলা কথা চারি আনা বৃন্দাবনীর মিশ্রনে সিদ্ধ হইত। কোন কাব্য কি ইতিহাসে যে স্থলে কথাবার্ত্তা বর্ণিত হয়, সেইস্থলে গ্রন্থকর্ত্তা প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন; চৈতন্যচরিতামৃত নরোত্তম বিলাস প্রভৃতি পুস্তকে দৃষ্ট হইবে, যেস্থলে কথাবার্ত্তার উল্লেখ সেই থানেই বৃন্দাবনী ভাষার সমধিক ছড়াছড়ি হইয়াছে যথা—

"প্রয়াগ পর্য্যন্ত দুহেঁ তোমা সঙ্গে যাব। তোমার চরণ সঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব॥ ম্লেচ্ছদেশ কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাত। ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত। "চৈ, চ, মধ্য ১৮ পঃ।

হইলুঁ উদ্বিগ্ন বৃন্দাবিপিন দেখিতে। তাঁহা না হইল, গেলুঁ অদ্বৈত গৃহেতে। সবে মহাদুঃখী হৈলা আমার সন্ন্যাসে। সভা প্রবোধিলুঁ রহি অদ্বৈতের বাসে। সভা মনোবৃত্তি জানি নীলাচলে গেঁলু। তাঁহা কথোদিন রহি দক্ষিণ ভ্রমিলুঁ॥ নরোত্তম বিলাস।

এরূপ অসংখ্যস্থল প্রদর্শিত হইতে পারে; বৃন্দাবনীবুলি বাঙ্গালীর স্বভাববুলি না হইলেও ইহা তাহারা স্বভাবে পরিণত করিয়া লইয়াছিল।

বিদ্যাপতির মৈথিলপদের অনুকরণে যাঁহারা পদরচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে গোবিন্দদাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সাহিত্যের প্রথম স্ফুরণে কবির শুধু ভাব প্রকাশ করাই চেষ্টা হয়, প্রথম যুগের কবিগণ ভাষার প্রতি লক্ষ্য করেন না, কোনও রূপে ভাবটি প্রকাশিত হইলেই তাঁহাদের লক্ষ্য সার্থক হয়। ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে, পরবর্ত্তী কবিগণ ভাষাটিকে সাজাইতে চেষ্টা করেন; ভাব-যুগের অবসানে সাহিত্যে ভাষা-যুগ প্রবর্ত্তিত হয়; তখন মানুষের লক্ষ্য প্রকৃতির নগ্ন শোভা হইতে অপসারিত হইয়া অলঙ্কার শাস্ত্রের কৃত্রিম ফুলপল্লবের পশ্চাতে ধাবিত হয়; গোবিন্দদাসের ভাষায় বঙ্গমৈথিল-গীতের চরম বিকাশ, এমন কি বিদ্যাপতির ভাবপ্রধানপদও গোবিন্দের পদের ন্যায় মসৃণ নহে। গোবিন্দ দাসের (১) "কেবল কান্ত কথা, কহি কাঁদয়ে— কাম কলঙ্কিনী গোরী।" (২) "মুকুলিত মল্লী, মধুর মধু মাধুরী, মালতি মঞ্জুল মাল॥" (৩) "ও নব জলধর অঙ্গ। ইহ থির বিজুরীতরঙ্গ॥ ওবর মরকত ঠাম। ইহ কাঞ্চন দশবাণ॥ ও তনু তরুণ তমাল। ইহ হেম যুথি রসাল॥ ও নব পদমুনী সাজ। ইহ মত্ত মধুকর রাজ॥ ও মুখ চাঁদ উজোর। ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥ অরুণ নিবড়ে পুন চন্দ। গোবিন্দদাস রহ ধন্দ॥" প্রভৃতি পদ পড়িয়া প্রথম কর্ণই মুগ্ধ হয়, ভাব ও অর্থের কথা পরে মনে উদয় হয়।

গোবিন্দদাস বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে রোপিত বিদেশী ব্রিজবুলীকে চরম শোভা দান করিয়াছেন; তৎপর শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে ও বঙ্গ-মৈথিলের প্রতিধ্বনি হইয়াছিল কিন্তু তাহা ক্ষীণতর;—

"কাঁহেকো শোচ কর মন পামর। রামভজ, তুহুঁ রহনা দিনা। ইষ্ট কুটম্বক ছোড়দে আশ, এসংসার অসার, এক উহ নাম বিনা॥ যো কীট পতঙ্গক, আহার যোগাওত, পালক হায় উহি একজনা। কবি সত্য কহে, মন থির রহো। যিনি দিহাঁ দন্ত, সো দেগা চনা॥" (সত্যরাম কবি।) একযুগ ব্যাপী চেষ্টার বিকাশের পর বঙ্গমৈথিল সাহিত্যের উপর পটক্ষেপ হইয়াছে।

কিন্তু পদাবলীতে মৈথিল অনুকরণ যত সুন্দর হইয়াছে, কাব্য কি ইতিহাসে বৃন্দাবনী ভাষা ততদূর মিষ্ট হয় নাই। চৈতন্যভাগবতকার বঙ্গদেশেই জীবন যাপন করিয়াছেন, ও তাঁহার সময়ে বৃন্দাবনী বাঙ্গলার সঙ্গে গাঢ়ভাবে মিশে নাই, তাঁহার রচনায় তাই অনেক পরিমাণে খাঁটি বাঙ্গলার আদর্শ পাওয়া যায়; তাঁহার রচনার মধ্যে মধ্যেও বৃন্দাবনীসুরের আভাস একবারে

না পাওয়া যায় এমন নহে যথা—"সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবার পাও। তবে মুক্রি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াও॥" চৈ, ভা, আদি।

বৈষ্ণব সমাজের কথিত বাঙ্গলা তখন মিশ্রিত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহারা মুখে যাহা বলিতেন, লেখনীতে ও তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত এসম্বন্ধে দৃষ্টান্তস্থলীয়। দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে থাকাতে কবিরাজগোস্বামীর বাঙ্গলা বৃন্দাবনী দ্বারা এরূপ আবৃত হইয়াছিল, যে খাঁটি দেশী কথা অতি অল্প স্থলেই স্ফুট হইয়াছে, ইহা ছাড়া তাহার সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যে ও সহজ বাঙ্গলা রচনার অন্তরায় হইয়াছিল। একদিগে "গুহ্যাতিগুহ্য" "বাহ্যাবতরণ" "মহদনুভব" প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ ও অন্যদিগে "যবহুঁ", "কবহুঁ", "যৈছে", "তৈছে" "তিঁহ" প্রভৃতি বৃন্দাবনীবুলি তাঁহার কাব্যে জড়াইয়া বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহাদের দীর্ঘ ও ঘনসন্নিবিষ্ঠ ব্যূহের মধ্যে বঙ্গভাষার কোমল প্রাণ পীড়িত হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গলা, হিন্দী সংস্কৃত, এমন কি উর্দ্দু কথা পর্য্যন্ত কৃষ্ণদাস অব্যাধে ব্যবহার করিয়াছেন, ভাষার এই সাধারণ-তন্ত্রের হট্টগোলে বাঙ্গালীর সুর চেনা সুকঠিন ও চৈতন্যচরিতামৃতকে "বাঙ্গলাগ্রন্থ" উপাধি দিতে আমাদের বহুতর সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোক, অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ, বৃন্দাবনী 'যৈছে', 'তৈছে' ও উর্দ্দু 'নানা' 'মামু', 'চাচা', পথ হইতে পরিষ্কার করিয়া অতি কষ্টে বাঙ্গলা গ্রন্থটির জাতি রক্ষা করিতে হইয়াছে। নিম্নে কবিরাজ গোস্বামীর বহুরূপী রচনার কিছু কিছু নমুনা দিতেছি,—

(১) "বিবিধাঙ্গ সাধন ভক্তি বহুত বিস্তার। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ তার॥ গুরু পদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন। সদ্ধর্ম্ম শিক্ষা পৃচ্ছা সাধু মার্গানুগমন। কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ ত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস। যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্যুপবাস॥ ধাত্র্যশ্বত্থ গোবিপ্র বৈষ্ণব পূজন। সেবানামপরাদধি দূরে পূজন॥" চৈ. চ, মধ্য, ১২ পঃ।

(২) কহে তাঁহা কৈছে রহে রূপ সনাতন। কৈছে করে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন॥ কৈছে অষ্ট প্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন। তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ। অনিকেতন দুঁহে রহে যত বৃক্ষগণ। একৈক বৃক্ষের তলে একৈক রাত্রি শয়ন। করোয়া মাত্র কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস। কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম নর্ত্তন উল্লাস॥" মধ্য, ১৯ পঃ।

(৩) "ইবে তুমি শান্ত হৈলে আসি মিলিলাম। ভাগ্য মোর তুমি হেন অতিথি পাইলাম। গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় আমার চাচা। দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা। সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥" আদি ৭ পঃ।

বৃন্দাবনী ভাষার প্রভাব কালে লুপ্ত হইল; কৃত্রিম ভাষা ব্যবহার করিয়া কবি কতদূর ক্ষতি হইতে পারে, গোবিন্দদাস তাহা দেখাইয়াছেন,—কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও অনুচর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তিরোধানের পর বৃন্দাবনী ভাষা কেহ ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু হিন্দীর অধিকার গতেও বঙ্গ সাহিত্য-ক্ষেত্রে অন্য ত্রিবিধ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা রহিয়া গেল, তাহারা এই;—

(১) উর্দ্দূ,—আমরা প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যে ও কতকগুলি উর্দ্দূ শব্দের ব্যবহার দেখিয়াছি। উর্দ্দূ নবাবী আমলের ভাষা, ইহার প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে অবশ্যই কিছু আসিয়াছিল, কিন্তু রামেশ্বরী সত্যপীরোপাখ্যান ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবির কোন কোন রচনায় উর্দ্দূপ্রভাব অনেক পরিমাণে লক্ষিত হইলেও তাৎকালিক বঙ্গভাষায় সংস্কৃতের সাপক্ষে রুচির কোন ও মারাত্মক ক্ষতি হয় নাই। এখনও ইংরেজীর মুলুকে দুএকজন কবি "বুট পড়ি হুট করি যাবে ভাই যাও। হোটেলে কাটলেট সুখে খাবে যদি খাও। এলবার্ট ক্যাসনে কেশ ফিরাবে ফিরাও॥ ('দীনেশচন্দ্র বসু রচিত কবিকাহিনী।') প্রভৃতি পদে বিদেশী ভাষার শরণ লইলেও মাইকেল প্রভৃতি কবিগণের গুরুগম্ভীর সংস্কৃতের ধ্বনিতে সেইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ম্লেচ্ছস্বর ডুবিয়া গিয়াছে।

(২) খাঁটি বাঙ্গলা—ইহা কথিতভাষা, "মুখ রুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা" কি "ইন্দুবিন্দুতুষারসঙ্কাশা" প্রভৃতি কথা ঠিক কথিত ভাষা নহে। ইহাদিগকে বাঙ্গলা বলিতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এরূপ রচনা পোষাকী বাঙ্গলা। কথিত বাঙ্গলার প্রভাব মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবির রচনায় বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। যে চিত্রকর প্রকৃতি হইতে আলোকচিত্র উঠাইবেন, তিনি পৃথিবী ও স্বর্গ কেবল পুষ্প দিয়া ভরিয়া ফেলিতে পারেন না, তাঁহাকে শুষ্ক গুল্ম ও কুৎসিত গলিত পত্রেরও প্রতিচ্ছায়া উঠাইতে হইবে। খাঁটি বাঙ্গালী কবি এইজন্য কথিত অপভাষা খুটিয়া ফেলিয়া কেবল ললিত-লবঙ্গলতার মত মিষ্ট মিষ্ট কথার খোঁজ করিবেন না। মুকুন্দরাম ভিন্ন প্রায় সমস্ত কবিই ন্যূনাধিক পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ দ্বারা কাব্য পুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা তাহা পরে দেখাইব।

(৩) সংস্কৃত। বৃন্দাবনদাসের সাদাসিদা রচনার মধ্যেও "স্বানুভাবানন্দে"র ন্যায় দু একটি বড় সংস্কৃত কথা দৃষ্ট হয়। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালী কবি মনের উক্তিসম্বলিত গান রচনা করিতেন, ভাষাগ্রন্থগুলি সাধারণ লোকের

মনোরঞ্জনার্থে গানের পালা রূপে রচিত হইত; সংস্কৃতে ও পার্শীতে বড় বড় লেখার কাজ চলিত। কিন্তু বৈষ্ণবগণ বঙ্গভাষাকে বড় বড় ভাষার উচ্চমঞ্চ ঘেঁষিয়া স্থান লইতে সাহসী করিলেন; বৈষ্ণব লেখকগণ বিদ্বেষী পাষণ্ডীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া বাঙ্গলায় দর্শন ও ন্যায়ের সমস্ত তত্ত্ব সুগম করিলেন; বিরুদ্ধ পক্ষীয়গণের পাণ্টা উদ্যম চলিল, তাঁহারা নানাবিধ তন্ত্রাদি অনুবাদ করিয়া বৈষ্ণবদিগের প্রতিপক্ষতা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উভয় পক্ষের শাস্ত্রচর্চ্চা হেতু বঙ্গভাষা সংস্কৃতের ভিত্তির উপর সুদৃঢ়ভাবে স্থিত হইয়া এক নব নাট্যশালার ন্যায় পাতঞ্জল দর্শনের কথা হইতে কালিদাস ও জয়দেবের সুন্দর শব্দ-লালিত্যের বিচিত্র শোভা দেখাইল। কিন্তু বাঙ্গলা রচনায় সংস্কৃত খাপ খাওয়াইতে যাইয়া প্রথম উদ্যমেই বঙ্গীয় লেখকগণ কৃতি হন নাই, চৈতন্যচরিতামৃতের "স্বধর্ম্ম এলভাক পুমান প্রভু উত্তর দিল" অন্ত ২য় পঃ। "কর্ত্তুম-কর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ।" অন্ত ৯ পঃ। ও "দেহকান্ত্যা হয় তিঁহে অকৃষ্ণ বরণ" আদি, ১পঃ। প্রভৃতি স্থল দুর্ব্বোধ ও শ্রুতিকটু হইয়াছে, এমন কি অনেক পরে রামপ্রসাদ ও এ বিষয়ে অতি কৃপাযোগ্য ও শোচনীয় অযোগ্যতা দেখাইয়াছেন, তাহা যথাকালে লিখিব।

উর্দ্দু, কথিত বা খাঁটি বাঙ্গলা ও সংস্কৃতানুযায়ী বাঙ্গলা প্রভাবে বঙ্গসাহিত্য ত্রিবিধভাবে আন্দোলিত হইয়াছে; এই ত্রিশক্তির কোন না কোনটি বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন কবিগণ কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা অতঃপর দৃষ্ট হইবে।

আমরা ১৫ পৃষ্ঠায় একটি প্রাচীন কবির পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি বঙ্গ-ভাষা পূর্ব্বে প্রাকৃত সংজ্ঞায় অভিহিত হইত—এই যুগের সাহিত্যে অনেকস্থলেই বঙ্গভাষার 'প্রাকৃত' সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়; যথা,—"প্রাকৃতে লিখিয়া বুঝি এই মোর নাথ।" গোবিন্দলীলামৃত (যদুনন্দনদাসের অনুবাদ)। "ইহা বলি গীতার পড়িল এক শ্লোকে। প্রাকৃত প্রবন্ধে কহি শুন সর্ব্বলোকে।" লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, মধ্যখণ্ড। বঙ্গভাষা মাগধী প্রাকৃতের অন্তর্গত ছিল বলিয়া বোধ হয়, মাগধী বঙ্গীয় গীত পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আদৃত হইত ও উৎসবোপলক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল, (নরোত্তম বিলাস,—দ্বিতীয় বিলাস দেখুন)।

এই অধ্যায়ে বাঙ্গলা অপ্রচলিত শব্দগুলির অর্থসমেত তালিকা দিতেছি,

ইহাদের কতকগুলি ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়াছে, নানা পুস্তকেই এইসব শব্দ পাওয়া যায়, আমরা পাঠকের আলোচনার সুবিধার্থ পূর্ব্বের ন্যায় গ্রন্থ-বিশেষের নাম উল্লেখ করিলাম।

চৈতন্যভাগবতে,—দৃঢ়—প্রমাণ ("আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়, সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দৃঢ়" আদি)। ঠাকুরাল—প্রভাব ; ছিণ্ডে—ছিঁড়ে ; সমুচ্চয়—সংখ্যা ; বহি—ব্যতীত ; বিরক্ত—উদাসীন ; এই শব্দ প্রাচীন সাহিত্যের কোথাও "ভক্ত" অর্থে ব্যবহৃত দেখিতে পাই নাই—ইহার অর্থ সংসারঅনুরাগশূন্য ছিল, এখন ইহা অর্থচ্যুত হইয়াছে। উপস্থান—উপস্থিতি ; পরিহার—প্রার্থনা ; উপস্কার—মার্জ্জন, পরিস্কার ; সম্ভার—আয়োজন ; আর্য্য—রাগী ("বিপ্র বলে মিশ্র তুমি বড় দেখি আর্য্য")। কিন্তু স্থলে স্থলে ইহার অর্থ "পূজ্য" দেখা যায়। যথা—"বৈষ্ণবের গুরু তিনি জগতের আর্য্য।" চৈ, ম) উপসন্ন—উপভোগ বা উৎপন্ন ; পরতেক—প্রত্যক্ষ ; বাহ্য—বাহ্যজ্ঞান ; জুয়ায়—যোগ্য হয়, নিছনি মূল অর্থ, যাহা মুছিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, এই শব্দ স্থলে "নির্ম্মঞ্ছন" শব্দ ও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়, যথা "যাবক রঞ্জিত চরণ তলে, জীউ নিরমঞ্ছব গোবিন্দদাস। (প, ক, ত ১০৭১ পদ।) "বিশ্বম্ভর নির্ম্মঞ্ছন করে আয়োগণ", (লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, আদি)। চেষ্টা এইশব্দ অনেক স্থলেই "ভক্তির আবেগ" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কদর্থেন—ঠাট্টা করেন ; দৃঢ়—সুস্থ ("লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী দৃঢ়কর।" আদি) ; কোন্‌ভিতে কোন্‌দিকে ; রায়—রবে ; এনে—এখন ; সাধ্বস—সার্থক ; ভাবক—ক্ষণস্থায়ীভাব যুক্ত (Emotional) "বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবকের কর্ম্ম॥" চৈ, চ। কাকু—কাকুতি ; ব্যবসায় ব্যাবহার—'এইরূপ প্রভুর কোমল ব্যবসায়', আদি। প্রকৃত এই শব্দ সংস্কৃতের ন্যায় অনেক স্থলেই 'ইতর' ও 'সাধারণ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,—"প্রাকৃত লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। লোক শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর।" আদি ; অন্যত্র চৈতন্যমঙ্গলে "প্রাকৃত লোকের প্রায় হাসে বিশ্বম্ভর"। চৈতন্যভাগবতে "প্রাকৃত শব্দে ও যেবা বলিবেক আই। আই শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥" (মধ্য)। প্রাকৃত শব্দের এইরূপ অর্থ সংস্কৃতের অনুরূপ, যথা রামায়ণে "কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্। রুক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব॥" লঙ্কা ১১৮ ম সঃ। বিমরিষ—বিমর্ষ ; উদার—চিন্তাযুক্ত। প্রচণ্ডশব্দ এখন ভীতিজনক দ্রব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে কিন্তু চৈতন্যভাগবতে "প্রচণ্ড অনুগ্রহ" প্রভৃতি ভাবের ব্যবহার পাওয়া যায়। সম্পত্তি—সমৃদ্ধি ("নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবার পারে।" আদি) ; লঙ্ঘন—দংশন, চালেন—ঠেকাইয়া দেন ; কতি—কোথা। ওঝা শব্দ গৌরবজনক অর্থেই সর্ব্বদা ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়,—ইহা উপাধ্যায় শব্দের অপভ্রংশ ও পূর্ব্বে মূল শব্দের অর্থেই ব্যবহৃত হইত। আত্মসাৎ—এই শব্দ এখন অর্থচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে,—কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে সর্ব্বদাই ইহা ভাল অর্থে ব্যবহৃত হইত যথা—"ভক্তি দিয়া জীবে প্রভু কর আত্মসাৎ।" আখরিয়া—উৎকৃষ্ট হাতের লেখা যাহার। চৈতন্যচরিতামৃতে,—হাতসানি—

হস্তসঙ্কেত, লঘু—ক্ষুদ্র (যথা "লঘু পদচিহ্ন") ; পাতনা—তুষ ; ওলাহন—ভর্ৎসনা ; ভস্রকর—ভাল ব্যবহার কর (ভস্রকর ছাড় এই মলিন বসন।") ; তরজা—কুটসমস্যা ; নরোত্তম বিলাসে,—উমড়য়ে—কষ্টপায়, সঙ্গোপন—মৃত্যু ; হাতসানে—হস্তসঙ্কেতে, সমাধিয়া—বিবেচনা করিয়া; সমিহীত—ইচ্ছা; পদকল্প তরুতে,—রাতা—রক্তবর্ণ, "রাতা উৎপল, অধরযুগল" ২২ পদ) "নীরে নীরঞ্জন লোচন রাতা "২৮৯ পদ, "মেঘগণ দেখে রাতা "১৮০৪ পদ, কবিকঙ্কণে ও এই শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, যথা "কার সঙ্গে বিবাদ করি চক্ষু কল্লি রাতা")। বাউল উন্মত্ত, বৈরাগী ; পিছলিতে—ফিরাইতে ("পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি")। তিলাঞ্জলি এই শব্দ এখন "জলাঞ্জলি" যে স্থলে প্রযুক্ত হয়, সেইস্থলে ব্যবহৃত হইত। বুলে—ভ্রমণ করে, "সকল ফুলে ভ্রমর বুলে, কে তার আপন পর। চণ্ডীদাস কহে কানুর পীরিতি কেবল দুঃখের ঘর।" ৯১৪ পদ)। চৈতন্যমঙ্গলে,—প্রেমা—প্রেম ; সিলেহ—স্নেহ, মহু—মধু ; উচাট—উদ্বিগ্ন ; তোকানি মোকনি—জনরব। পীরিতি শব্দ পূর্ব্বে 'পীতি' অর্থে ব্যবহৃত হইত, যথা "পিতৃশূন্য পুত্রে মোর পীরিতি করিবে।" উমতি—উন্মত্ত ; সানাসানি—ইঙ্গিত ; নিবড়িল—সমাপ্ত করিল ; বহুধারী—বউ ("মোর ঘরে ছিল এই ঘরের ঈশ্বরী। আজি হৈতে তোর দাসী কোণের বহুয়ারী।") ; সায়—সাঙ্গ ; বৈদিনী—ব্যথিত (Spmpathisor) আর্ত্তি—কাতরতা ; আউটিয়া—আলোড়ন করিয়া।" ভক্তিরত্নাকরে,—তাড়ঙ্ক—কর্ণভূষণ, দাদুর—ভেক ; টোটা—বাগান ; সম্বাহন—সেবা ; না ভায়—ভাল লাগে না ; ওট—ওষ্ঠ, ("বাঁধুলী জিনিয়া রাঙ্গা ওট খানি হাস" এই "ওট" শব্দের অর্থে শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "অট্ট অট্ট হাস" ভক্তিরত্নাকর ৮৩৭ পৃঃ দেখুন)। ময়ঙ্ক—মৃগাঙ্ক।

বঙ্গভাষায় এই সময় নানা ছন্দঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পদ-কল্পতরু প্রভৃতি পুস্তকে কবিতাকে একটি পুষ্পিতা লতার ন্যায় নানাছন্দে প্রবাহিত হইয়া সৌন্দর্য্য-জাল বিস্তার করিতে দেখা যায় ; স্বয়ং ভারতচন্দ্র ও বঙ্গীয় ছন্দের মূলধন বেশী বাড়াইতে পারেন নাই ; নিম্নলিখিত পদের সুন্দর ছন্দটি দেখুন ;—"ধনি রঙ্গিণী রাই। বিলসহি হরি সঙ্গে রস অবগাহই। হরি সুন্দর মুখে। তাম্বুল দেই চুম্বই নিজ সুখে। ধনি রঙ্গিণী ভোর। ভুলল গৌরবে কানু করি কোড়। দুহুঁ দুহুঁ গুণ গায়। একই মুরলীরন্ধ্রে দুজনে বাজায়। কেহ কেহ কহে মৃদুভাব। নারী পরশে অবস পীতবাস। কেহ কাড়ি লয় বেণু। রাসে রসে আজ ভুলল কানু। (পঃ কঃ ১৩১১ পদ।) ত্রিপদী ছন্দের প্রথম দুচরণার্দ্ধে মিল রাখা সর্ব্বদা আবশ্যক ছিল না, যথা ;—'আমার অঙ্গের, বরণ লাগিয়া পীতবাস পরে শ্যাম। প্রাণের অধিক করের মুরলী, লইতে আমার নাম। আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ, যখন যেদিগে পায়। বাহু পসারিয়া, বাউল হইয়া, তখন সেদিগে যায়। (জ্ঞানদাস।) পদগুলি সর্ব্বদাই গীত হইত, সুতরাং কোন অক্ষর-নিয়মের বশীভূত ছিল না। কোন কোন স্থলে পদ অপরিমিতরূপ

লম্বা হইয়াছে, যথা ;—"জয় জয় দেব কবি-নৃপতি শিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম। জয় জয় চণ্ডীদাস রস শেখর অখিল ভুবনে অনুপাম॥" পঃ কঃ ১৫ পদ। ছন্দাদি সম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

বঙ্গভাষার ব্যাকরণ না থাকাতে বিভক্তি অনেকটা ইচ্ছাধীন ছিল; পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় হইতে এই অধ্যায়ে সে বিষয়ে কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হয় না। এই অধ্যায়েও "কাশীরে গমন" "বৈকুণ্ঠকে গমন" "মাতাতে পাঠান" (মাতাকে পাঠান) "মোহর" (আমার), "তাত"—(তাহাতে), "ইথি" (ইহাতে), প্রভৃতি নানাবিধ অনিয়মিত বিভক্তি দেখা যায়। "চণ্ডালাদিক" "পাককর্ত্তাদিক", প্রভৃতির বহুল ব্যবহার দৃষ্টে 'দিগ' ও "দিগের" প্রাগ্‌লক্ষণ বিশেষ রূপে পাওয়া যাইতেছে।

সামাজিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে এইযুগে এক বিরাট পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়; ব্রাহ্মণের পদরজসেবী, জাতিভেদের দৃঢ় দুর্গে আশ্রিত সমাজ অপরিবর্ত্তনীয় নিত্যকর্ম্মের নিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, নূতনভাবের তীব্র জ্বালাতে সেই শৃঙ্খল গলিয়া ব্রাহ্মণ ও শূদ্র একস্তূপে মিশিয়া গেল—নবসৃষ্টির কোলে ক্ষণকালের জন্য প্রাচীন সৃষ্টি মগ্ন হইল; প্রাচীন সমাজ স্বীয় দুর্দ্দান্ত শিশুটির ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া কিছুকাল স্তম্ভিত হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমে স্খলিত পদ পুনরপি স্থির করিয়া স্বীয় অদম্য বালকটিকে শাসন করিতে দাঁড়াইল। এইযুগে মৃদঙ্গের ধ্বনি ও হরিবোলের আনন্দ একদিগে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া উত্থিত হইতেছে, অপরদিগে এই আনন্দবিদ্বেষী দল বিদ্রূপ করিয়া বেড়াইতেছে;—

"শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস। কেহ বলে যত পেট ভরিবার আশ॥ কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার। পরম উদ্ধতপনা কোন ব্যবহার॥ কেহ বলে কতরূপ পড়িল ভাগবত। নাচিব, কাঁদিব হেন না দেখিল পথ॥ ধীরে ধীরে বলিলে কি পুণ্য নহে। নাচিলে গাহিলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে॥ চৈ, ভা, আদি।

এই দলের কোন কোন অগ্রসর ব্যক্তি কালী-মন্দিরে যাইয়া স্বীয় দুষ্ট অভিপ্রায়ের মঞ্জুরী চাহিতেছে;—"এতকহি হাসি হাসি পাষণ্ডীরগণ। চণ্ডীর মন্দিরে গিয়া করে আস্ফালন॥ প্রণমিয়ে চণ্ডীরে কহয়ে বারেবার। অদ্যরাত্রে এ গুলিরে করিবে সংহার॥" ভক্তিরত্নাকর। বৈষ্ণবগণ ও ইহাদিগের ঋণ সুদ সহিত পরিশোধ করিতে ত্রুটি করেন নাই,—"লোচন বলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে। অনল জ্বালিয়া দিব তার মাঝ মুখ পানে॥" অন্যত্র "এত পরিহারে যে পাপী নিন্দা করে।

তবে লাথি মারি তার মাথার উপরে।" চৈ, ভা। বৈষ্ণবদলের গোঁড়া দল দোওয়াতের কালীকে সেহাই, হাড়ীর কালীকে ভুষা, ও জবা ফুলকে ওড় ফুল বলিতেন। কালী পূজার মধ্যে কোনরূপে সংশ্লিষ্ট থাকা ইঁহারা নিতান্ত পাপকর কার্য্য মনে করিতেন; শ্রীবাসের বাড়ীতে বিদ্রূপহেতু গোপাল নামক এক ব্রাহ্মণ রাত্রে "কলারপাতে উপরে থুইল ওড় ফুল। হরিদ্রা সিন্দুর রক্ত-চন্দন তণ্ডুল।" চৈ, চ, ম। কালী পূজার এই আয়োজন দেখিয়া শ্রীবাস বড় বড় লোককে প্রাতে ডাকিয়া দেখাইলেন "সবারে কহে শ্রীনিবাস হাসিয়া হাসিয়া। নিতারাত্রে করি আমি ভবানী পূজন। আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন। তবে সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার। ঐছে কর্ম্ম হেথা কৈল কোন দুরাচার। চৈ, চ, ম। এই অপরাধে সেই রসিক ব্রাহ্মণটির কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল বলিয়া চৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত আছে।

এই কলহ ব্যাপার প্রশংসনীয় না হইলেও একটি সান্ত্বনার কথা এই যে ইহাতে দেখা যায়—জাতীয় জীবনের নিরুদ্ধ শক্তি জড়তার বাঁধ ভাঙ্গিয়া নূতনভাব গ্রহণে উন্মুখতা দেখাইতেছিল।

অবতারবাদ কেবল চৈতন্য সম্প্রদায়ে আবদ্ধ ছিল না; লৌকিক বিশ্বাসের সুবিধা পাইয়া চৈতন্যদেবের পশ্চাতে বঙ্গদেশে কয়েকটি নকল চৈতন্যদেব দাঁড়াইয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস ক্রোধের সহিত জানাইতেছেন পূর্ব্ববঙ্গে এক দুরাত্মা আপনাকে রামের অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছিল; ভক্তি-রত্নাকরে এই স্থলের ব্যাখ্যাস্থলে নরহরি চক্রবর্ত্তী বলেন, এই ব্যক্তির নাম কবীন্দ্র ছিল। কিন্তু বৃন্দাবন দাস রাঢ়দেশস্থ অপর একজন অবতারের প্রসঙ্গ বলিতেই ক্রোধে বিশেষ ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে প্রথম "ব্রহ্মদৈত্য" প্রভৃতি নানারূপ অশিষ্ট সংজ্ঞায় বাচ্য করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছিলেন,—"সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল। অতএব তারে সবে বলেন শিয়াল।" এই স্থলের ব্যাখ্যায় নরহরি চক্রবর্ত্তী উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে বিপ্রকুলজাত ও "মল্লিক" খ্যাতি বিশিষ্ট বলিয়া জানাইয়াছেন এবং বৃন্দাবনদাসের স্বর অনুকরণ করিয়া তাঁহার প্রতি "রাক্ষস", "পাপিষ্ঠ" প্রভৃতি অসংযতভাষা বর্ষণ করিতেও ত্রুটী করেন নাই।

চৈতন্যদেবের পরেও বৈষ্ণব সমাজে ভক্তিময় বৈরাগ্যের স্বাভাবিক খেলা কতক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্রমশঃ মহোৎসব ব্যাপারাদির আধিক্যে তাঁহাদের নানারূপ বিলাসবৃত্তির উদ্রেক হয়; এস্থলে অবশ্য

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে হইবে, মাংসের স্বাদ ত্যাগ করিয়া তৎস্থল পূরণ করিতে চেষ্টিত বৈষ্ণবগণ নানাবিধ মিষ্ঠ দ্রব্য ও উপাদেয় শাক্ শবজী দ্বারা বাঙ্গালীর আহারীয় সামগ্রীর তালিকা খুব প্রশংসনীয়ভাবে বাড়াইয়া ফেলেন। ইহাদিগের নাম সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ করা দুরূহ; পাঠক চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের ৩ ও ১৫ পরিচ্ছেদে, অন্তখণ্ডের ১০ পরিচ্ছেদে এবং পদকল্পতরুর ২৩২৮ সংখ্যক পদে প্রদত্ত খাদ্যতালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন। এই বিষয়ে আমাদের এই একটি আক্ষেপ যে একদিন রঘুনাথদাস ভূনিক্ষিপ্ত পচা প্রসাদান্ন কণার এক মুষ্ঠি খাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এবং চৈতন্যপ্রভু তাহা "খাসাবস্তু" বলিয়া গ্রহণ করিতেন, বৈষ্ণব সমাজের সেই এক নিবৃত্তির দিন ছিল—ক্রমে ক্রমে সেই গৌরবজনক ব্রাহ্মণস্থ সমাজ হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব সমাজ যতই বড় হইতে লাগিল, ততই সাধারণ মনুষ্যসুলভ দুর্ব্বলতা ও পাপ তাহাতে প্রবিষ্ট হইল; সামাজিক আয়তন বৃদ্ধির ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল বলিতে হইবে। কিন্তু চৈতন্যদেবের পরেও ইঁহাদের মধ্যে অনেক খাঁটি লোক জন্মিয়াছিলেন; নরোত্তমদাস দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় রাজবৈভব ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রভাবে হরিশ্চন্দ্র রায় ও চাঁদরায় প্রভৃতি দস্যুগণ পর্য্যন্ত সাধুবৈষ্ণব হইয়াছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রেম বিহ্বলতা, নৈসর্গিক শক্তি ও শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য তাঁহার জীবনের প্রথমভাগকে কেমন উজ্জ্বল শ্রী প্রদান করিয়াছে। একদিনের চিত্র ভুলিবার কথা নহে;—গোস্বামীগণ কৃত গ্রন্থগুলি হারাইয়া শ্রীনিবাস পাগলের ন্যায় বীরহাম্বিরের সভায় প্রবেশ করিয়াছেন, শোকে বিহ্বল শ্রীনিবাসের অন্য জ্ঞান নাই, বজ্রাহতের ন্যায় তিনি নিস্পন্দ; সভায় ব্যাসাচার্য্য ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন,—দেবরূপী দর্শকের অপূর্ব্ব অবয়ব দর্শনে, ভক্তিভরে বীরহাম্বির প্রণত হইলেন—সভাস্থলীতে তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় এক আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তারিত হইল; তাঁহার আগমনের কারণ কি প্রশ্ন হইল—কিন্তু অসহ্য দুঃখ-কাতর শ্রীনিবাস উত্তর করিলেন "ভাগবত পাঠ সাঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন বাঞ্ছনীয় নহে।" সেই দুঃখের সময় ও ভক্তি-পূরিত চিত্তে দাঁড়াইয়া তিনি ভাগবতপাঠ শুনিতে লাগিলেন। যেন পাহাড়ের বক্ষে অগ্নির স্রোত বহিতেছিল কিন্তু সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি ঋজু হিমাচ্ছন্নশৃঙ্গ অন্তর্দাহের কিছুমাত্র চিহ্ন প্রকাশ করিল না।

কি সুন্দর ভাগবতে ভক্তি! কি সুন্দর সভা সৌষ্ঠবকারী উজ্জ্বল বিনয়! শ্রীনিবাসআচার্য্য অনুরুদ্ধ হইয়া ভাগবত পড়িতে লাগিলেন, শোকাকুল স্বরে, ভক্তিমাখা কণ্ঠের আবেগে অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে শ্রীনিবাস যখন ভাগবত ব্যাখ্যা করিলেন, তখন বীর-হাম্বির, ব্যাসাচার্য্য প্রভৃতি তাবতে তাঁহার পদে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। অশ্রুজলে সভা মণ্ডব প্লাবিত হইল, বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির আশাতীত উচ্ছ্বাসে বনবিষ্ণুপুর স্বর্গপুর হইয়া উঠিল।

কিন্তু বৈষ্ণব সমাজের এই উচ্চভাব পরে রক্ষিত হয় নাই, ক্রমে ধীরে এই কীর্ত্তি স্বীয় উন্নত গৌরবচ্যুত হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইল; পরে স্বয়ং শ্রীনিবাসের দেবমূর্ত্তিতে বিলাসপঙ্ক লগ্ন হইল; তিনি বীর হাম্বিরের প্রদত্ত বহুসংখ্যক অর্থ রীতিমত গ্রহণ করিয়া ধনী হইলেন ও পরিণত বয়সে স্ত্রীবর্ত্তমানে শুধু অনুরোধ রক্ষার্থ দ্বিতীয়বার পরিণয় করিলেন। নরহরিচক্রবর্ত্তীর উৎসাহসূচক বর্ণনা সেইস্থলে আমাদের কর্ণে বাজিয়াছে, তিনি শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় পরিণয় উপলক্ষে লিখিয়াছেন "গোষ্ঠীসহ রাজার উল্লাস অতিশয়। আচার্য্য বিবাহে বহু অর্থ কৈল ব্যয়॥ সর্ব্বলোকে ধন্য ধন্য কহে বারেবার॥ ভঃ রঃ।

কিন্তু বৈষ্ণবসমাজে তখন ও ভক্ত ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার এইসব ব্যবহার অনুমোদন করেন নাই, যথা—প্রেমবিলাসে, গোপালভট্টের সঙ্গে মনোহর দাসের কথোপকথন,—

"বিষ্ণুপুর মোর ঘরে হয় বার ক্রোশ। রাজার রাজ্যে বাস করি হইয়া সন্তোষ। আচার্য্যের সেবক রাজা বীরহাম্বির। ব্যাসাচার্য্যাদি অমাত্য পরম সুধীর॥ সেই গ্রামে আচার্য্য প্রভু বাস করিয়াছে। গ্রাম ভূম বৃত্তি আদি রাজা যা দিয়াছে॥ এই ত ফাল্গুন মাসে বিবাহ করিলা। অত্যন্ত যোগ্যতা তার যতেক কহিলা॥ মৌন হয়ে ভট্ট কিছু না বলিলা আর। "স্খলৎপাদ স্খলৎপাদ" কহে বারেবার॥

ইহার কিছু পূর্ব্বে গোপাল ভট্ট, লোকনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ কৃষ্ণদাস-কবিরাজকে তাঁহাদের জীবনচরিত লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, ইঁহাদের সাংসারিকতা ও গৌরবস্পৃহা একবারেই ছিল না।

যাঁহারা ভক্তির রাজ্যে দেবতা ছিলেন, তাঁহাদিগের দেহে ও যেন মৃদু সাংসারিক সুখের বায়ু বহিতে লাগিল; নরোত্তমবিলাসে দেখা যায়, জাহ্নবীদেবী ভোজনান্তে "উষ্ণজলে" স্নান করিতেন, এক ব্রাহ্মণী পরিচারিকা "অতি সূক্ষ্মবস্ত্রে"। তাঁহার অঙ্গ সাবধানে মোছাইয়া দিত, অপর এক পরিচারিকা বস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। (সপ্তম বিলাস।) মূল কথা

বৈষ্ণব সমাজের সেই প্রেমের কঠোর দেবব্রত পরে আর রক্ষিত হয় নাই। শেষে বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গদিগকে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গিনীগণের নূতন অবতার কল্পনা করিয়া পুস্তক লিখিলেন, গদাধর রাধিকা, রূপ সনাতন—রূপমঞ্জুরী ও লবঙ্গমঞ্জুরী, কবিকর্ণপুর গুণচূড়া সখী হইলেন; এইরূপে অন্যান্য প্রত্যেক ভক্তগণকেই পূর্ব্বাবতারের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া পবিত্র করা হইল। মুরারি গুপ্ত হনুমান ও পুরন্দর অঙ্গদের অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং এক লেখক চাক্ষুষ ঘটনা বলিয়া এই অঙ্গীকার করিয়াছেন যে "পুরন্দর পণ্ডিত বন্দো অঙ্গদ বিক্রম। সপরিবারে লাঙ্গুল যার দেখিল ব্রাহ্মণ॥" বৈষ্ণব বন্দনা।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভক্তির প্রভাব ক্রমে ক্রমে হ্রাস হওয়াতে, জীবনের আদর্শ ক্রমে গুণ্ঠিত হওয়াতে ভক্তগণ এইরূপে ক্রমে পৌরাণিক ভূত হইয়া পড়িলেন ও ধর্ম্মটি শাস্ত্রের পত্রাবদ্ধ হইয়া পড়িল। চৈতন্যপ্রভুর এত নির্ম্মল ও উন্মাদকর প্রেমধর্ম্ম ধীরে ধীরে বিলাসপঙ্ক ও কুসংস্কারের কুক্ষীগত হইল।

সমাজের অপরদিকে নরহত্যা ইত্যাদি ব্যাভিচার চলিতেছিল, নরোত্তম-বিলাসের এই লোমহর্ষন অংশটি দেখুন—"করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে। ছাগ মেষ মহিষ-শোণিত ঘর দ্বারে॥ কেহ কেহ মানুষের কাটা মুণ্ড লৈয়া। খর্গ করে করয় নর্ত্তন মত্ত হৈয়া॥ সে সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়। হইলেও বিপ্র তার হাত না এড়ায়॥ সঙ্গে স্ত্রী লম্পট জাতি বিচার রহিত। মদ্য মাংস বিনে না ভুঞ্জয়ে কদাচিত॥" (সপ্তম বিলাস) পরন্তু জগাই মাধাই প্রভৃতির বৃত্তান্তে জানা যায়, তাহারা ব্রাহ্মণ হইয়া সর্ব্বদা মদ্য এবং গোমাংস ভক্ষণ করিত * কিন্তু এরূপ বোধ হয় না যে তাহারা জাতি-চ্যুত অবস্থায় ছিল।

এইকালে বাঙ্গালী খাইয়া পরিয়া বেশ সুখী ছিল; গৃহজাত দ্রব্যেই দৈনিক অভাবগুলি একরূপ সুন্দরভাবে পূর্ণ হইত, বাজারের ব্যয় কিছুই ছিল না বলিলেই চলে। মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে কালকেতুর বিবাহের ব্যয়ের যে একটা ফর্দ্দ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে নিম্নশ্রেণীর বিবাহে যে ব্যয় হইত, তাহার একটা মোটামুটি ওজন পাওয়া যায়। ধর্ম্মকেতু ১৩ গণ্ডা কড়া (আড়াই পয়সার কিছু বেশী) লইয়া বাজারে গেল, ব্যয় এইরূপ,—

* "ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ
ডাকা চুরি পরগৃহ দাহ সর্ব্বক্ষণ।" চৈ, ভা, মধ্য, ১৩ অঃ।

দুইখানা ধরা (বোধ হয় নেংটী, ধরা বা ধটা হইতে ধুতি শব্দ আসিয়াছে)— ৫

পান	... ...	২
খয়ের	... ...	২
চূন	... ...	॥ কড়া
মেটে সিন্দুর	... ...	২
খুঞা (একরূপ বস্ত্র)	...	৪॥
	মোট	১৭

ইহা কবির কল্পিত হিসাব বলিয়া বোধ না। ভদ্রলোকের বিবাহের ব্যয়েরও আর একখানা ফর্দ্দ দেখাইতেছি; চৈতন্যপ্রভুর প্রথম বিবাহ অতি সামান্যরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল,—তাহাতে শ্বশুরালয় হইতে তিনি পঞ্চহরিতকী মাত্র উপঢৌকন পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয়বারের বিবাহকে একটা প্রকাণ্ড উৎসব বলিয়া বৃন্দাবনদাস উল্লেখ করিয়াছেন; কথিত আছে এই এক বিবাহের ব্যয়ে পাঁচ বিবাহ সুনির্ব্বাহ হইতে পারিত, চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা এইরূপ,—"বুদ্ধিমন্ত খান বলে শুন সর্ব্বভাই। বামনিয়া মত কিছু এ বিবাহে নাই॥ এ বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন। রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন॥" বিবাহের আয়োজনের মধ্যে দেখা যায়, গৃহ "আলিপনা" দ্বারা রঞ্জিত হইল, ও আঙ্গিনার মধ্যস্থলে বড় বড় কতকটি কদলী বৃক্ষ রোপিত হইল; এই বিবাহ উপলক্ষে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ মণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আহার করার কথা ছিল না;—এ নিমন্ত্রন "গুয়াপান" গ্রহণের। গুয়াপান ও মাল্য চন্দন সমাগত ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হইল, কিন্তু "ইতি মধ্যে লোভিষ্ট অনেকজন আছে। একবার লৈয়া পুনঃ আর বেশ কাছে। আরবার আসি মহা লোকের গহলে। চন্দন গুবাক মালা নিয়া যায় ছলে॥ সবেই আনন্দে মত্ত কে কাহারে চিনে। প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা করিলা আপনে॥ সবারে তাম্বুল মালা দেহ তিনবার। চিন্তা নাহি ব্যয় কর যে ইচ্ছা যাহার॥" এই গুবাক মাল্যচন্দন বিতরণ উপলক্ষে বৃন্দাবনদাস আরও লিখিয়াছেন, যে সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ যাহা লইয়া গিয়াছিলেন তাহা দূরে থাকুক, ভূমিতলে যে পরিমাণে গুবাক ও মাল্য পড়িয়াছিল,—"সেই যদি প্রাকৃত লোকের ঘরে হয়। তাহাতেই ভাল পাঁচ বিবাহ নির্ব্বা হয়॥" উপসংহারে "সকল লোকের চিত্তে হইল উল্লাস। সবে বলে ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাস। লক্ষেশ্বর [illegible] এই নবদ্বীপে। হেন অধিবাস নাহি করে কার বাপে॥ এমত চন্দন মালা দিব্য গুয়াপান। অকাতরে কেহ কভু নাহি করে দান॥" চৈ, ভা, আদি)।

ভরসা করি এখনকার কৃপণ ধনীগণ এই প্রাচীন নজিরের বলে ব্যয় সংক্ষেপ করিতে সক্ষম হইবেন।

সেকালে মানুষের নামের সঙ্গে প্রায়ই একটা অসঙ্গত উপাধি লগ্ন থাকিত, এখনও মধ্যে মধ্যে গ্রামদেশে তাহা না থাকে এমত নহে, কিন্তু সেকালে লেখকগণ প্রকাশ্যভাবে তাহা পুস্তকে ব্যবহার করিতেন, "খোলাবেচা শ্রীধর", "কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ", প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা "খঞ্জভগবান", "কালা কৃষ্ণদাস", "ভূঁড়ে শ্যামদাস" "নির্লোম গঙ্গাদাস" প্রভৃতি সার্টিফিকেট যুক্ত নামের উল্লেখ পাইয়াছি। শিশু এখন প্রথম পুস্তকেই এই ধারা মুখস্থ করিয়া থাকে "কাণাকে কাণা বলিও না।"। তখনকার গ্রন্থকারগণ বোধ হয় এই তত্ত্ব কথাটি জানিতেন না।

শাসনাদি সম্বন্ধে দৃষ্ট হয় সাধারণ বিচারের ভার কাজির উপর ছিল—কাজির নীচে শিকদার ও শিকদারের অধীন দেওয়ান ছিল; কোটালের উপর দায়ীত্বই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল, পুলিস দারগার কার্য্য ভিন্ন রাজ্যের নূতন সমস্ত সংবাদের রিপোর্ট কোটালের দিতে হইত। হিন্দুরাজাগণের পুলিস দারগার কাজ "নিশাপতি" দিগের দ্বারা করাইতেন; এই "নিশাপতি" ও "কোটাল" একইরূপ কর্ম্মচারী বলিয়া বোধ হয়। যুদ্ধ বিগ্রহাদির সময় একরাজ্য হইতে অপর রাজ্যে লোক যাতায়াত করিতে পারিত না; নিষিদ্ধ পথে ত্রিশূল পুতিয়া পথিকদিগকে সতর্ক করা হইত। রাজাদিগের আদেশ সম্বলিত "ডুরি" লইয়া পথিকগণ যাতায়াত করিতে পারিতেন। এই "ডুরি" একরূপ পাসপোর্টের ন্যায় ছিল। রাজাগণ অনেক সময় দস্যুবৃত্তি করিতেন, বীরহাম্বির এইরূপ একজন দস্যু দলপতি ছিলেন; আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও বহু সংখ্যক দস্যুপতির নাম পাইয়াছি। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ; হরিচন্দ্ররায়, চাঁদরায়, নারোজী প্রভৃতি দস্যুগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রতিগ্রামে রাজা একজন "মণ্ডল" নিযুক্ত করিতেন, এই "মণ্ডল" গ্রামের একরূপ শাসনকর্তা ছিলেন।

আমরা মৈথিলবঙ্গ অধ্যায় শেষ করিবার পূর্ব্বে নিম্নে দুরূহ শব্দার্থবোধক একটি তালিকা দিতেছি;—

অতএ—অতএব, অথর—অস্থির, অবক—এইক্ষণ, অনুসয—ইঙ্গিত, অলখিতে—অলক্ষ্যভাবে, অরু—রক্তবর্ণ, আন—অন্ত, আঁতর—অন্তর, উগল—উদিত হইল, উখি—অগ্নি, উথার—বাক্ত, উপড়ি—উথলিয়া, ওখদ—ঔষধ, কতি—কোথা, কর্ষক শীলা—কষ্টিপাথর, কাদড়—একরূপ ফুল, কাঁধার—কূল, কোর—ক্রোড়, খিণ—ক্ষীণ, খেরি—খেলা, গাগরি—ক্ষুদ্র কলস, গারি—গালি,

গীম—গ্রীবা, গোয়ান—জ্ঞান, গোরী—গৌরী, সুন্দরী, গোঙার—লম্পট, চোর; ("হামি অবুধ নারী তুহুঁ ত গোঙার, বিদ্যাপতি)।"—"অমূল্য রতন সাথে, গোঙারের ভয় পথে, লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া" (প, ক,।) চকেবা—চক্রবাক, চড়ুরী—চটক, চোরাবলি—চুরি করিলে, ছটাছটি—প্রকাণ্ড, ছাতিয়া—বক্ষ জনু—যেন, জয়তুর—জয় ঢাক, জীউ—জীবন, জীক—যাহার, তোড়ল—ত্যাগ করিল, তোর—তোমাকে, দুগুলি—দুইযোড়া, দিঠি—দৃষ্টি, দুউ—দুই, দেহে—দেহ, দোতিক—দুতীর, ধম্মিল্ল—খোঁপা নিঙারিতে—ঝাড়িতে, নিয়ড়—নিকট, লুকি—লুকায়িত থাকা, পদুমিনী—পদ্মিনী, পাতিয়ার—প্রত্যয় করে, পুরুখ—পুরুষ, পসারল—বিস্তৃত করিল, ফুয়ল—উন্মুক্ত, ফুলায়ল—প্রস্ফুট করিল, বরিখন্তিয়া সার—বর্ষণ করে, বাউর—বাউল, বালি—বালিকা, বিছুরি—বিস্মৃত হওয়া, বিহি—বিধাতা, বেসালি—দুগ্ধ জ্বাল দেওয়ার পাত্র, ভাঙ—ভ্রূ, ভাব, ভাগি—ভাগ্য, ভাখী—ভাষা ভিয়াইল—হইল, ভোখিল—ক্ষুধার্ত্ত, মরু—আমার, শিঙ্গার—বেশ ভূষা, শুতিয়া—শুইয়া, শেজ—শয্যা, সামাইল—প্রবেশ করিল, সঞে—স্নেহ, সিহালা—শৈবাল, সিনান—স্নান।

এখন দেখা যাউক বাঙ্গলা ভাষার উপর হিন্দী কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে কি না; হিন্দী শব্দে মৃচ্ছকটিকাদি নাটকের প্রাকৃতের মত অনেকটা সংপ্রসারণ ক্রিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে; যথা,—হর্ষ—হরিষ, মগ্ন—মগন, নির্ম্মাণ—নিরমান, গর্জ্জন—গরজন, নির্ম্মল—নিরমল, জন্ম—জনম, নির্দ্দয়—নিরদয়, রত্ন—রতন, যত্ন—যতন, প্রকাশ—পরকাশ, দর্শন—দরশন, বর্ষা—বরিষা, ইত্যাদি। এই কোমল শব্দগুলি বাঙ্গলা কথায় ব্যবহৃত হয় না, কেবল পদ্য রচনায় দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব যুগের কবিতায় এইভাবের কোমল শব্দ বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় কিন্তু পরবর্ত্তী সাহিত্যে ক্রমশঃ তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিয়াছে; বাঙ্গলাভাষা যে ভাবে রূপান্তরিত হইতেছে, এই সম্প্রসারণ ক্রিয়া সেই পরিবর্ত্তনের অনুকূলে নহে, এজন্য এই প্রথা হিন্দীপ্রভাবের শেষ চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ হিন্দী ভাষার অনুনাসিক শব্দের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, যাঁহা, তাঁহা, কবহুঁ, যবহুঁ প্রভৃতি অসংখ্য শব্দের উপর চন্দ্রবিন্দু দিতে হয়, ঐসব শব্দ যেসব সংস্কৃত শব্দের রূপান্তর, তাহাতে এরূপ কিছুই নাই যদ্বারা এই চন্দ্রবিন্দু সমর্থিত হইতে পারে। চন্দ্রবিন্দু, 'ঞ' এবং 'ঙ' হিন্দীভাষা হইতে আসিয়া বৈষ্ণব যুগের রচনায় গাঢ় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। (২) এখন ও বঙ্গভাষায় আঁখি, কুঁড়ে,

* "The same was the case in the Bengali four hundred years ago and the Chaitanya Charitamrita affords inumerable instances of its use in words like খাইঞা, খাইঞা for the modern খাইয়া, খাইয়া &c."

IndoAryans Vol. II. P. 320.

কুঁজ, কাঁক, পুঁথি ইত্যাদি শব্দের অনুনাসিক উচ্চারণ রহিয়া গিয়াছে, অথচ অক্ষি কুটীর কুব্জ, কক্ষ, পুস্তক ইত্যাদি শব্দের রূপান্তরে চন্দ্রবিন্দু কিরূপে সমাগত হইবে, ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ইহাও হিন্দী-প্রভাবের শেষ চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়।

বৈষ্ণবগণ "শ্রী" শব্দের পক্ষপাতী ছিলেন, পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে (ভক্তি রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে) 'শ্রীকেশ', 'শ্রীদর্শন' 'শ্রীহস্ত', 'শ্রীলালট', 'শ্রীপ্রসাদ' প্রভৃতির অবধি নাই,—সেইসব পুস্তকে ক্ষুদ্র শ্রেণীবদ্ধ অক্ষর-গুলির মধ্যে মধ্যে প্রায়সই পতাকাধারী সেনাপতির ন্যায় "শ্রী" গুলি বড় সুন্দর দেখায়। বৈষ্ণবগণের দ্বারা "মহোৎসব", "দশা" "লুট" (হরির লুট) প্রভৃতি শব্দের অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে। "বাঁকা" শব্দ বঙ্কিম শব্দের অপভ্রংশ, ইহা এখন "উৎকৃষ্ট" অর্থে ব্যবহৃত হয়; শ্রীকৃষ্ণের বঙ্কিমত্ব হেতু এই শব্দ গৌরবাত্মক হইয়াছে।

এইস্থলে বৈরাগীগণের শিরোমুণ্ডন সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক। চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি পুস্তকে দেখা যায়, মহাপ্রভুর শির-মুণ্ডণের সময় শিষ্যগণ নানারূপ বিলাপ করিতেছে, সামান্য কেশচ্ছেদ উপলক্ষে এত বেশী আক্ষেপ কোন কোন পাঠকের নিকট বিরক্তিকর বোধ হইতে পারে। এবিষয়টি আমরা প্রাচীনকালের মানদণ্ড দ্বারাই মাত্র বিচার করিতে পারি, সে সময় বঙ্গের বহু সংখ্যক শিক্ষিত যুবক সংসার ত্যাগী হইতেন; এখনকার শিক্ষা আমাদিগকে সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করে, তখনকার শিক্ষা সংসার ত্যাগ করিতে শিখাইত; বহু সংখ্যক পিতা মাতার স্নেহের হৃদয় ছিন্ন করিয়া, গৃহস্থের প্রফুল্লতার বাতিটি চিরদিনের জন্য নিবাইয়া যুবকগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন, একবার শিরোমুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাস লইলে তিনি আর সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন না। যুবকগণ সে সময় দীর্ঘকেশ রাখিয়া আমলকী দ্বারা তাহা ধৌত করিয়া পুষ্পাভরনে সজ্জিত করিতেন। এহেন কেশচ্ছেদ অর্থে তখন চিরদিনের জন্য,—পিতা মাতা ও বন্ধু বান্ধবের আশা-চ্ছেদ বুঝাইত—এইজন্য চৈতন্যপ্রভুর শিরোমুণ্ডনের উপলক্ষ্যে এতদীর্ঘ আক্ষেপোক্তির কথা দৃষ্ট হয়। এই সন্ন্যাস গ্রহণ তখন গৃহস্থের একটি সাধারণ আতঙ্কের কারণ ছিল,—এখনও বালকগণ পিতা মাতা বর্ত্তমানে কুশাসনে বসিতে পায় না,—কিন্তু ইহা প্রাচীন ভয়ের শেষ চিহ্ন,—বস্তুতঃ

ভয়ের আর কোন কারণ নাই। রমণীগণ বিধবা হইলে তাঁহাদের কপালের সিন্দুর মোছা ও শাঁখা ভাঙ্গা যত কষ্টের কারণ হয়,—তখন যুবকগণের কেশচ্ছেদ ও সেইরূপ একটি শোকাবহ ব্যাপার ছিল।

বৌদ্ধযুগের কিছু কিছু চিহ্ন বৈষ্ণবযুগের ভাষায় পাওয়া যায়, হরিদাসকে প্রলুব্ধ করার বর্ণনোপলক্ষে "মায়া মোহিত" শব্দ পাওয়া গিয়াছে, উহা বুদ্ধদেবের প্রলোভনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; "গোফা" শব্দ বৌদ্ধদিগের, উহাও চৈতন্যভাগবত, গোবিন্দদাসের করচা প্রভৃতি পুস্তকে অনেক স্থলে পাওয়া যায়। আর একটী শব্দ "পাষণ্ডী" ইহা বৌদ্ধগণ অন্য ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের প্রতি ব্যবহার করিতেন,—হিন্দুর "ম্লেচ্ছ" মুসলমানের "কাফের" খ্রীষ্টানের "infidel" যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, বৌদ্ধগণ ও "পাষণ্ডী শব্দ সেই অর্থেই প্রয়োগ করিতেন, যথা—অশোকের আদেশ লিপিতে,—"দেবানম্ পিয়ো পিয়দশি রাজা সবত ইচ্ছতি, সবে পাষণ্ড বংসেয়ু সবে তে সয়মঞ্চ ভাব-শুদ্ধিন্ চ ইচ্ছতি।" দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী (অশোকের নামান্তর) রাজা এই ইচ্ছা করেন যে পাষণ্ড (বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থা শূন্য ব্যক্তি) গণও যেন সর্ব্বত্র নিরাপদে বাস করেন। বৈষ্ণবগণ এইশব্দ বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে ধার করিয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি প্রয়োগ করিতেন।

বৈষ্ণব অধ্যায়ে প্রসঙ্গত এখানে আমরা "সুবুদ্ধিরায়" সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। "সুবুদ্ধিরায়" "গৌড়ের অধিকারী" বলিয়া ছাপা চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের ২৫ অধ্যায়ে উল্লিখিত দেখা যায়, এইজন্য ঐতিহাসিক রাজ্যে এই অজ্ঞাত "গৌড়াধিপ" মহাশয়ের জন্য তদন্ত হয়, কিন্তু ঐতিহাসিকগণ ইহার কোনও খোঁজ পান নাই; আমার নিকট দুইশত বৎসরের অধিক যে হস্তলিখিত চৈতন্যচরিতামৃত আছে, তাহাতে "পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধিরায় গৌড়অধিকারী" স্থলে "পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধিরায় ছিল অধিকারী" এই পাঠ দৃষ্ট হয়; কিন্তু বীরহাম্বীরের সভাসদ ব্যাসাচার্য্যের হস্তলিখিত চৈতন্যচরিতামৃত এমন কি কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিজ হস্তলিখিত চৈতন্য-চরিতামৃত ও রক্ষিত আছে বলিয়া যখন জানা যায়, তখন এবিষয় সহজেই মীমাংসা হইতে পারে

আমরা এখন "সংস্কারযুগের" সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছি। কিন্তু এই যুগের অমৃতময় গীতি ত্যাগ করিয়া যাইতে কষ্ট বোধ হইতেছে; যে দেবরাণী

মানুষ একযুগের জন্য সুপ্ত মানবাত্মাকে জাগাইয়া অদৃষ্টভাগ্যনির্দ্দিষ্ট অধিকার গুলির ন্যায়ানুযায়ী ভাগ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, যিনি বর্ত্তমানকে অতীতের কঠোর শাসন হইতে নিষ্কৃতি দিয়া ইতিহাসে উজ্জ্বল করিয়াছেন, পশুমুণ্ড ও বনফুল ছাড়িয়া নয়নাশ্রু দ্বারা দেবার্চ্চনা শিখাইয়াছেন—যাঁহার নির্ম্মল অশ্রু বিন্দুতে একযুগের বঙ্গসাহিত্য মণির ন্যায় সুন্দর হইয়া রহিয়াছে, সেই চৈতন্যপ্রভুর পবিত্র নামাঙ্কিত যুগ আমরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে এই খানে সমাপন করিতেছি।

কিন্তু গীতি কবিতার যুগ গতে পরবর্ত্তী সময়ে বঙ্গসাহিত্যে দেশী পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণের কতকগুলি খাঁটি ছবি অঙ্কিত হইয়াছিল—সেগুলি তিনশত বৎসর পূর্ব্বের; তাহারা বড় উজ্জ্বল, বড় সুন্দর; তাহা দর্শন করিলে প্রাচীন পর্ণকুটীরকেও সুন্দর বলিতে হইবে ও কুটীরনিবাসিনীগণের চরিত্রের সৌন্দর্য্যে পাঠক মুগ্ধ হইয়া পড়িবেন। চলুন, আমরা কাব্যের পরিষ্কার আয়নায় বিম্বিত প্রাচীন সামাজিক জীবনের প্রকৃত রূপ দেখিতে যাই।

অষ্টম অধ্যায়।

সংস্কার-যুগ।

১। লৌকিক ধর্ম্ম-শাখা।

২। অনুবাদ-শাখা।

"সংস্কার-যুগ" কেন বলি? সমাজের ইতিহাসে সর্ব্বত্রই দুইরূপ শক্তির ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। যুগে যুগে প্রতিভান্বিত পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রাচীন ভাঙ্গিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, কিন্তু প্রাচীন ভগ্ন হওয়ার জিনিষ নহে; প্রতিভাবান্ ব্যক্তি অন্তর্হিত হইলে পুনশ্চ প্রাচীন আসিয়া স্বীয় আধিপত্য সুস্থির করে; নূতন ও পুরাতন কালের দ্বন্দ্বে ভাবীসমাজ গঠিত হয়। নূতন সম্প্রদায়ে অদম্য তেজ থাকে, তাহাতে প্রাচীনের আবর্জ্জনা ভাসাইয়া লইয়া যায়; সেই সঙ্গে প্রাচীনকালের মণিমুক্তা ভাসিয়া না যায়, এইজন্য রক্ষণ-শীল-সম্প্রদায় স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। স্বাধীনতার চিহ্ন

সর্ব্বত্রই বিস্ময় ও আনন্দোৎপাদক, স্বাধীনতার অগ্নিতে অতীতের মৃতদেহের সৎকার হয় ও বর্ত্তমানের চিত্র উজ্জ্বল হয়; কিন্তু তথাপি উহার একটা গৃহস্থালী-বিরোধী উশৃঙ্খলতা আছে, যাহার সতেজ আবর্ত্তে ভাল মন্দ একসঙ্গে মিশিয়া লুপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে।

বৈষ্ণব-যুগে বঙ্গের চরম প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল; আমরা দেখাইয়াছি বঙ্গসাহিত্যের নিরুদ্ধ-স্রোত চৈতন্যপ্রভুর চরণস্পর্শে নূতন হর্ষে সজীব হইয়া গমনশীলতা লাভ করে। বৈষ্ণবপদে ও চরিতাখ্যানে আমরা স্বাধীনতার নবখেলার প্রভাব দেখিয়াছি।

কিন্তু প্রাচীন পদ্মপুরাণ, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি শত শত পুস্তক বাঙ্গালাসাহিত্যে পড়িয়াছিল, তাহাদের কোন কোনটির উপর বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি লেখক রোষানল বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা দগ্ধ হয় নাই। ফুল্লরার চরিত্রে, খুল্লনার চরিত্রে যে স্থায়ী সৌন্দর্য্যের আভাস ছিল তাহা বাঙ্গালী পাঠক ভুলিতে পারে নাই। যে টুকু ভাল, জীবনে হউক, সমাজে হউক, ইতিহাসে হউক—তাহা দলিত হইয়াও লুপ্ত হয়না, তাহার পুনঃ পুনঃ অঙ্কুরোদ্গম হয়,—তাহার সুন্দর মনুষ্যত্ব বারংবার ইতিহাসে দেখা দেয়; যাঁহারা তাহা লুপ্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা তাহার সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়া ফেলেন ও তাহাকে নবশক্তি লাভ করিতে সুবিধা দেন। এই যুগে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু রক্ষণ-শীল-সম্প্রদায় ও প্রাচীনকে কতকটা নূতন ছাঁচে ঢালিয়া রক্ষা করেন; আধুনিক চিন্তার নারায়ণতৈল সংযোগে প্রাচীনকে সজীব রাখিতে হয়। রামায়ণ, মহাভারতাদির অনুবাদ, চণ্ডীকাব্য, পদ্মাপুরাণ, শিবসংকীর্ত্তন ইত্যাদি পুস্তক এই যুগে নবভাবে সংস্কৃত হইয়া পুনরায় লোকমনোরঞ্জনের উপযোগী হয়। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, মনসার ভাসান প্রভৃতি তাবৎ পুস্তকেরই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই নূতন সংস্করণময়-যুগকে আমরা "সংস্কার-যুগ" আখ্যাপ্রদান করিয়াছি।

আমরা দেখাইব কৃত্তিবাস, সঞ্জয়, কবীন্দ্রপরমেশ্বর, প্রভৃতি অনুবাদ লেখক ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন, কাশীদাস, রামমোহন, রঘুনন্দন প্রভৃতির হস্তে,—দ্বিজজনার্দ্দন, বলরামকবিকঙ্কণ প্রভৃতি লেখক মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম প্রভৃতির হস্তে,—ও কাণা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণদেব প্রভৃতি লেখক

কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ দাস প্রভৃতি একগোষ্ঠী নূতন মনসার ভাসান রচকের হস্তে এইযুগে নবজীবন লাভ করিলেন। কিন্তু প্রাচীন লেখকগণের কীর্ত্তি নবভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন কবিগণ তাঁহাদিগের যশের সমস্ত অংশ অধিকার করিয়া লইলেন,—প্রাচীন্ কীটভুক্তকাগজের নজিরে আদৃত মহাজন-গণের ঋণের কথা জানা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা কে খোঁজ করে!

এই ঋণের পরিমাণ ও গুরুত্ব কত, তাহা দেখা যাক্। মাধবাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীলেখকগণের নিকট মুকুন্দরাম নানা বিষয়ে ঋণী। মূল বিষয়ের ত কথাই নাই,—সমস্তই এককথা; তাহা ছাড়া পংক্তি গুলি পর্য্যন্ত অপহৃত দেখা যায়। ভারতচন্দ্র স্বীয় নায়ক সুন্দরের মত সিঁধকাটিয়া চুরি করিয়াছেন; তাঁহার গলে যে যশের মুক্তামালা, তাহা তিনি ইহলোকে নিজের বলিয়াই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন কিন্তু যেখানে ন্যায়ের উচিত তুলাদণ্ডে প্রকৃত অধিকারের ভাগ হয়, সেখানে সেই বড় মুক্তার ছড়ার একগোটা ও তাঁহার থাকে কিনা সন্দেহ। বঙ্গসাহিত্য হইতে দূরে গেলে দেখা যায় কালিদাস পদ্মপুরাণ হইতে, সেক্ষপীরের হলিন্‌সিয়াড হইতে, মিণ্টন ডাণ্টে হইতে চুরি করিয়াছেন। এই সব পরস্বাপহারক দস্যু কাব্য-জগতে লব্ধযশ ও শ্রেষ্ঠ কেন? ইহার এক উত্তর—ইহাঁরা প্রতিভার রাজদণ্ড লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যাহা স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাতেই ইহাঁদের অধিকার বর্ত্তিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজগণ সকলেই এক প্রকার দস্যু। কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি লেখক নানা স্থান হইতে আহৃত রত্নের উৎকৃষ্ট সমন্বয় করিয়াছেন; পৃথিবী ক্ষমতার পূজক,—এজন্য ইহাঁরা অপহরণ করিয়াও লোকপূজার পুষ্পচন্দন পাইতেছেন। কিন্তু যাহারা চুরি করিয়া ঢাকিতে পারেনা,—যাহাদের বিশ্রী সমন্বয়ে পল্লবের সঙ্গে শাখার, ত্বকের সঙ্গে হাড়ের মিল পড়েনা, সেই দুর্ভাগ্য-গণের জন্যই লোকনিগ্রহের লৌহদণ্ড উত্থিত হয়। শক্তিমান স্বেচ্ছাচারীর দ্বারা পাপ পুণ্যের কৃত্রিমগণ্ডী নির্দ্ধারিত হইতেছে,—কিন্তু এই সমস্ত সমাজিক উন্নতি ও অবনতির মূলে ভাগ্যদেবী দাঁড়াইয়া পাগলিনীর মত কাহারও মাথায় ছত্র ধরিতেছেন, কাহারও মাথার ছত্র কাড়িয়া লইতেছেন।

প্রতিভান্বিত কবি মন্ত্রবলে প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের সমস্ত সৌন্দর্য্য অপহরণ করিয়া স্বীয় কাব্যপটে সন্নিবিষ্ট করেন; ইহাকে অপহরণ না

বলিয়া আহরণ বলা উচিত, কারণ অঙ্কনপটু চিত্রকরের জন্য গত যুগের কাব্য-চিত্র ও নব-যুগের দৃশ্যাবলী তুল্যরূপই ব্যবহার্য্য ও তিনই এবিষয়ে একমাত্র সত্ত্ববান।

১। লৌকিক ধর্ম্মশাখা।

মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি ও ঘনরাম।

মাধবাচার্য্য।

চণ্ডীর উপাখ্যান দ্বিজজনার্দ্দন রচনা করিয়াছিলেন, উহা একটি ছোট খাট ব্রতকথা। চণ্ডীর ভক্তগণ এই ব্রতকথাটি ক্রমে বড় কাব্যে পরিণত করিলেন; কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরোহিত ঠাকুর যে ব্রতকথা সমাধা করিয়া যাইতেন, তাহা লইয়া যোল পালা গান রচিত হইল।

মুকুন্দরামের পূর্ব্বে কতজন কবি এই উপাখ্যান লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, ঠিক বলা যায় না। বলরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল,* মাধবাচার্য্যের চণ্ডী ১৫৭৯ খৃঃ অব্দে প্রণীত হয়।† এই চিত্রগুলি সংশোধন করিয়া মুকুন্দরাম নূতন কাব্য প্রণয়ন করেন।

সংশোধিত চিত্রের পর প্রথম উদ্যমের নমুনা দেখিয়া কাব্যামোদীগণ কতদুর পরিতৃপ্ত হইবেন বলা যায় না, তবে একরূপ ভাব-বিকাশের পর্য্যায় লক্ষ্য করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক, তাঁহারা পূর্ব্ব নমুনাগুলি পাইলে আদর করিবেন সন্দেহ নাই।

বলরাম-রচিত চণ্ডী আমরা দেখি নাই, কিন্তু মাধবাচার্য্যের চণ্ডী মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি। মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরামের ক্ষমতা এক দরের নহে—মুকুন্দরামের প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর কবির, মাধবাচার্য্য দ্বিতীয়

---

* মুকুন্দরাম তাঁহার হস্ত লিখিত পুঁথির দীর্ঘ বন্দনাপত্রে লিখিয়াছেন "গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কণ" ইহা দ্বারা অনুমান হয় বলরামকবিকঙ্কণের চণ্ডী অবলম্বন করিয়া তিনি স্বীয় কাব্য রচনা করেন। "মেদিনীপুরের লোকদিগের সংস্কার, এই বলরামকবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের শিক্ষা গুরু।" পরিষদের পত্রিকা, ১৩০২ শ্রাবণ, ১১০ পৃঃ।

† ইঁহার জীবন সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রেণীর কবিগণের সঙ্গে দাঁড়াইতে পারেন, কিন্তু উভয় কবির প্রতিভায় কতকটা এক পরিবারের লক্ষণ দৃষ্ট হয়; যেন প্রকৃতি সুন্দরী একই হস্তে দুইটি ফুল গড়িয়াছেন, দুইটীতেই স্বভাব-গত অনেক সাদৃশ্য, কিন্তু একটি অন্যটি হইতে বেশী উজ্জ্বল, সুগন্ধি ও সুন্দর, তাই পথিকের চক্ষু সেইটির প্রতি মুগ্ধ হইয়া অপরটিকে উপেক্ষা করে। কিন্তু যেখানে গোলাপ নাই, সেইখানেই পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে মালতী ফুলটির রূপ উপভোগ করা সম্ভবপর; কবিকঙ্কণের সান্নিধ্যের ছায়া হইতে মাধুকবিকে নিরাপদ স্থলে লইয়া গুণের বিচার করা উচিত হইবে; আমরা উভয় কবিকে দেখিয়া ফেলিয়াছি সুতরাং বোধ হয় প্রকৃত বিচারের অধিকারী নহি। মাধুকবির ফুল্লরা কবিকঙ্কণের ফুল্লরার ন্যায় লজ্জা-নতা সুন্দরী গৃহস্থবধূ হয় নাই। এই ফুল্লরার জিহ্বা অসংযত, তাহার চরিত্রে অপরটির ন্যায় সংযত শীলতা ও স্বাভাবিক সরমের বিকাশ পায় নাই। মাধুর লহনা ও খুল্লনা ততদূর পরিষ্কার ছবি নহে—উহারা মুকুন্দের লহনা ও খুল্লনার প্রসূনাবস্থা। গল্পাংশে উভয় কবিরই বেশ ঐক্য আছে— মধ্যে মধ্যে মুকুন্দ স্বীয় কল্পনার কোন রম্য দৃশ্য বা মানুষ-চরিত্র-জ্ঞানের কোন বিচিত্র আদর্শ দেখাইতে পূর্ব্বশ্রুত গল্পের সরলবর্ত্মের পার্শ্বে একটু তীর্য্যগলীলা করিয়া লইয়াছেন। উষার সিন্দূরবর্ণে প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশের পূর্ব্বে শেষতারার ক্ষীণালোকে আধমুদিত জগত-দৃশ্যের ন্যায়, মুকুন্দের চণ্ডীর পূর্ব্বে মাধুর চণ্ডী কাব্য-বিকাশের পূর্ব্বাভাস দেখাইতেছে। মাধুর তুলিতে চণ্ডীকাব্যের যে সব ছায়াপাত হইয়াছিল, মুকুন্দের বর্ণবিন্যাসক্রমে তাহারা সজীব সুন্দর পদার্থ হইয়াছে।

মুকুন্দ স্বভাবের নিজ ঘরের কবি, মাধু তদপেক্ষা ক্ষমতায় অল্প কিন্তু তাঁহারও স্বভাবের প্রতি স্থির-লক্ষ্য। ক্ষুদ্র ঘটনা, ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ বিষয় লইয়া অনেক সময় বড় কবির কবিত্ব বিকাশ পায়; কবি ব্যাধের ক্ষুদ্র কুটীর বর্ণনা করিবেন, এস্থলে লেখনীর ছেঁড়াকাঁথা, মাংসের পসারা ও ভেরাণ্ডার থামই বর্ণনীয় বিষয়। এখানে কবির 'নবনীত কোমল,' 'নখরুচি কিংশুক জাল' প্রভৃতি কেতাবতী উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করার একবারেই সুবিধা নাই। মাধু যে কার্য্য হাতে লইয়াছিলেন, তাহার যোগ্য ক্ষমতা তাঁহার বেশ ছিল,—"ফুলি গেলী, খেলী এয়ো আইল ব্যাধ ঘরে। মৃগ চর্ম্ম পরিধান,

দুর্গন্ধ শরীরে॥" প্রভৃতি বর্ণনায় দেখা যায়, মাধু ভেরাণ্ডার থাম ধরিয়া ব্যাধের ঘরে উঁকি দিয়া নিজে দেখিয়াছেন; সেখানে ব্যাধরূপসীগণের অর্দ্ধাবৃত অঙ্গের দুর্গন্ধ সহ্য করিয়াও ভদ্রকবি তাহাদের গ্রাম্যরূপের ফটো তুলিয়া লইয়াছেন,—তন্মধ্যে পিণ্টী করিতে যান নাই; বাঙ্গলা প্রাচীন কবিগণের মধ্যে খগরাজ ও তিলফুলের হাত হইতে যাঁহারা নায়ক নায়িকার নগ্ন নিরাভরণ রূপটি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের নৈসর্গীক শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিতে হইবে। কোন কোন সময় মাধুকবি বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিঃসহায় ভাবে প্রকৃতির হাতে যাইয়া পড়িয়াছেন, কাব্যের মর্য্যাদা ভুলিয়া বালকের ন্যায় একটি বিড়ালের গতি পর্য্যন্ত অনুসরণ করায় তৃপ্তি বোধ করিয়াছেন, তাঁহার এই অসংযত ক্রীড়ায় এমন একটু স্বাভাবিকত্ব আছে, যাহাতে শিশুর পোকা ধরার যত্ন মনে পড়ে,—নিম্নের অংশটি "আব পিজিয়ের" গল্পের মত,—

খুল্লনায় বলে দিদি মুড়া খাও তুমি। তবে এক লক্ষ টাকা পাইব যে আমি॥ ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি কেহ নাহি খায়। মাচার তলে থাকি বিড়াল আড় চোখে চায়॥ ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাতের কাছে। মুড়া লৈয়া বিড়াল গেল বাড়ীর পাছে॥ অনেক যতন করি পুষিনু বিড়াল। হেন বিড়াল মুড়া লৈয়া কার বাড়ী গেল॥ হাউ হাউ চিঁই চিঁই করিতে করিতে। এ বাড়ী হইতে বিড়াল ও বাড়ী যাইতে। মুড়া গেল পড়ি কোথাকার পথেতে।"

কবির রূপ বর্ণনায় ও সর্ব্বত্র সেই স্বভাবের খেলা—কালকেতু ব্যাধের শৈশবের মূর্ত্তিটি এইরূপ—"তবে বাড়ে বীরবর। জিনি মত্ত করিবর, গজশুণ্ড জিনি কর বাড়ে॥ যতেক আখেটি সুত, তারা সব পরাভূত খেলায় জিনিতে কেহ নারে॥ বাটুল বাঁশ লয়ে করে, পশু পক্ষী চাপি ধরে, কাহার ঘরেতে নাহি যায়। কুঞ্চিত করিয়া আঁখি, থাকিয়া মারয়ে পাখী, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ে যায়॥" মুকুন্দরাম এই আভাস দৃশ্যটিকে বড় করিয়া, উজ্জ্বল করিয়া পরিষ্কার বর্ণক্ষেপে আঁকিয়াছেন, যথা,—

"দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু। বলে মত্ত গজপতি, রূপে নব রতি পতি, সবার লোচন সুখ হেতু॥ নাক মুখ চক্ষুকাণ, কুন্দে যেন নিরমান, দুই বাহু লোহার সাবল। রূপগুণ শীল বাড়া, বাড়ে যেন হাতী কড়া, যেন শ্যাম চামর কুন্তল॥ বিচিত্র কপালতটী, গলায় জালের কাঁটি, করযোড়া লোহার শিকলি। বুক শোভে ব্যাঘ্রনখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে, কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলী। দুই চক্ষু জিনি নাট, খেলে দাণ্ডা গুলি ভাঁটা কাণে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল। পরিধান রাঙ্গা ধুতি, মস্তকে জালের দড়ী, শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল। লইয়া শতেক ঠেলা, যার সঙ্গে করে খেলা, তার হয় জীবন সংশয়। যে জন আঁকুড়ি

করে, আছাড়ে ধরণী ধরে, ডরে কেহ নিকটে না রয়॥ সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, শশারু তাড়িয়ে ধরে, দূরে গেলে ধরায় কুক্কুরে। বিহঙ্গম বাঁটুলে বিন্ধে, লতায় জড়িয়ে বান্ধে; স্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে।" ক, ক, চণ্ডী।

উভয় চণ্ডীতে অনেক ছত্র পাওয়া যায়, যাহা ঠিক একরূপ; এক হয় মুকুন্দরাম সেগুলি মাধবের চণ্ডী হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা উভয় কবিই কোন লুপ্তকবির ভূপ্রোথিত ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছেন।

মুকুন্দের কাব্যের প্রায় সমস্ত অংশই মাধুর চণ্ডী হইতে উৎকৃষ্ট; গঠন-প্রণালী, কাব্যাংশ, ঘটনা বৈচিত্র প্রভৃতি সকল গুণেই মুকুন্দরামের চণ্ডীতে বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয়। কিন্তু মাধুর কালকেতু, মুকুন্দের কালকেতু হইতে বিক্রমশালী, মাধুর ভাঁড়ুদত্ত, কবিকঙ্কণের ভাঁড়ুদত্ত হইতে শঠতায় প্রবীণ। এই দুই চরিত্র সমালোচনায় সময় আমরা মাধুর চণ্ডী হইতে সাহায্য গ্রহণ করিব। মাধু প্রকৃত বাঙ্গালী কবির ন্যায় কঠোর বিষয় হইতে কোমল বিষয় রচনায় পটু—তাঁহার রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক ধুয়া গুলি বন-ফুলের সৌরভময়—নিম্নে কতকটি উদ্ধৃত করিতেছি;—

(ক) "কানাই তুমি ভাল বিনোদিয়া। নবকোটি চাঁদ ফেলাই ও মুখ নিছিয়া॥ বনে থাক বন-ফুল দিয়া গাঁথ হার। গোপঘরে ননী খাও গরিমা তোমার॥ মাঠে থাক ধেনু রাখ, বাঁশীতে দেও শান। গোপালের ঘরের মণি, গোপালের পরাণ॥"

(খ) কাল ভ্রমরা, যথা মধু তথা চলি যাও। আমার সংবাদ প্রাণনাথেরে জানাও॥ যে কথা কহিবে প্রভুর যনাইয়া কাছে। সুস্থির সম্ভ্রমে কেও লোকে শুনে পাছে॥ চরণ কমলে শত জানাইও প্রণাম। অবশেষে শুনাইও রাধার নিজ নাম॥

(গ) আজু মোর মন্দিরে আওত কালা। কি করিবে চাঁদ পবন অলি কোকিলা।

(ঘ) শিশু পশু চলি যায় অনেক সন্ধানে। কানাই কালা, বলাই ধাবা চাঁদের সমানে॥

কবি মাধু যুদ্ধ বর্ণনায় যে ছন্দ প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তাঁহার ১৭৩ বৎসর পরে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে সেই ছন্দ অনুসরণ করিয়া যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন; কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গাধিপের যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে "ধূমে প্রচণ্ড ভাইয়া, কোপে প্রজ্বলিত হৈয়া, মার কাট সঘনে ফুকারে। জনার্দ্দনের যত সেনা, পদেতে কম্পমানা, নানা অস্ত্র বরিষণ করে। পদাতি পদাতি রণে, অশ্বারে অশ্ব সনে, কুঞ্জরে কুঞ্জরে, চাপাচাপি। অস্ত্র ঝাড়নি করি, তুরগ উপরে চড়ি, রাহুতে রাহুতে কোপাকুপি॥ কোপে বলে কালদণ্ড, শুনরে ভাই প্রচণ্ড, মিছা কেন কর হটাহটি। লুটিব আর পুরিব, কালকেতুরে ধরিব, নগর করিব ধুল্যাপাট।" প্রভৃতির পরে "ধূমে প্রতাপ আদিত্য। ভাবিয়া অসার, ডাকে মার মার, সংসারে সব অনিত্য" ইত্যাদি একটি প্রতিধ্বনির মত শুনায়।

মাধবাচার্য্যের চণ্ডী চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যদুর্গ আশ্রয় করিয়া নিরাপদ ছিল, কিন্তু কবিকঙ্কণ এখন মুদ্রাযন্ত্র প্রভাবে নবশক্তি লাভ করিয়া তাঁহাকে সেই নিভৃত নিকেতন হইতে তাড়াইতেছেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

হুসেন সাহার রাজত্ব বঙ্গ-ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা ব্যাপক, কিন্তু সাধারণত মুসলমান অধিকারে হিন্দুর অন্ন সংস্থান ক্রমে নষ্ট হইতেছিল, ও উৎপীড়নে দেশ শুদ্ধ আতঙ্ক জন্মিয়াছিল; মুসলমান আইনের একটি ধারা এইরূপ ছিল, "যদি কোন মুসলমান দেওয়ান হিন্দুর নিকট কর আদায় করিতে উপস্থিত হন, তবে সেই হিন্দুর সম্পূর্ণ অবনতিসহকারে তাহা দিতে হইবে; অপিচ যদি মুসলমান দেওয়ান ইচ্ছা করেন যে কাফেরের মুখে থুথু প্রদান করিবেন, তবে তাহার তৎক্ষণাৎ মুখ ব্যাদন করিয়া তাহা লইতে হইবে,—ইহাতে তাহাদের ঘৃণার বিন্দুমাত্র ও কারণ নাই; এই থুথু প্রদানের কয়েকটি নিগূঢ় অর্থ স্বীকার করিতে হইবে, ইহা দ্বারা সরকারের আশ্রিত কাফেরের সম্পূর্ণ বশ্যতার পরীক্ষা হইবে, এবং একমাত্র সনাতন ইসলামধর্ম্মের গৌরব ও মিথ্যাধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শিত হইবে।* আইনের ধারা পর্য্যন্ত এইরূপ মার্জ্জিত ছিল। বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য খুঁজিলে মধ্যে মধ্যে মুসলমান অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গক্রমে পাওয়া যায়। যথা বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে—"যাহার মস্তকে দেখে তুলসীর পাত। হাতে গলায় বাঁধি লয় কাজির সাক্ষাৎ॥ কক্ষতলে মাথা থুইয়া বজ্র মারে কিল। পাথর প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল॥ পরেরে মারিতে পরের কিবা লাগে ব্যাথা। চড় চাপড় মারে আর ঘাড় গোতা॥ ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা বৈসে অতিশয়। ঘরেতে গোময় না দেয় দুর্জ্জনের ভয়॥ বাছিয়া ব্রাহ্মণ পায় পৈতা যার কাঁধে। পেয়াদাগণ নাগ পাইলে হাতে গলায় বাঁধে॥" মুকুন্দরামের অনেক স্থলের বর্ণনায় ও এইরূপ অত্যাচারের আভাস পাওয়া যায়। মুসলমান-প্রভাবের ক্রমোন্নতির পশ্চাতে দূর ভাগ্যাকাশের সীমান্তে হিন্দুর সুখ স্বচ্ছন্দের তারা ডুবিয়া যাইতেছিল; বঙ্গদেশে হিন্দুর দুর্ভাগ্য ও মুসলমানের

* When the Collector of the Dewan asks them (the Hindoos) to pay the tax, they should pay it with all humility and submission: and if the Collector wishes to spit into their mouths, they should open their mouths without the slightest fear of contamination so that the Collector may do so. The object of such humiliation and spitting into their mouths is to prove the obidence of the infidel subjects under protection and promote if possible the glory of the Islam the true religion and to show comtempt to false religions (Von Neor's Akbor) আকবর এই আইন রদ করেন।

সৌভাগ্যের ভাষাই প্রমাণ দিতেছে; হিন্দুর "কুঁড়ে" (কুটীর)—মুসলমানের "দালান", "এমারত"; হিন্দুর গাঁ (গ্রাম) মুসলমানের "সহর"; হিন্দুর "শস্য" কর্ত্তিত হইয়া যখন মুসলমানের সেবায় লাগে, তখন তাহা "ফসল" হিন্দুর "টাকা" (তঙ্কা) করগ্রাহী মুসলমানের হস্তে পৌছিলে "খাজানা" হয়; স্বভাবের সমস্ত সামিগ্রীতে পল্লীবাসী হিন্দুর অধিকার, "চন্দ্র" "সূর্য্যের" হিন্দুনাম ঘোচে নাই। কিন্তু ক্ষুদ্র মেটে তৈলের "প্রদীপটি" মাত্র তাঁহার, "ঝাড়", "ফানস" "দেওয়ালগিরি"—সমস্ত বিলাসের আলো মুসলমানের; হিন্দু অপরাধ করিলে "কাজি" "মেয়াদ" দেয়; ইহা ছাড়া "বাদসাহ", "ওমরাহ" হইতে "উজির", "নাজির", সামান্য "কোটাল" "পেয়াদা", "বরকন্দাজ" "নফর" পর্য্যন্ত সকলই মুসলমানীশব্দ; "জমি", "তালুক", "মুলুক" প্রভৃতি মুসলমানী শব্দ; "জমিন্দার", "তালুকদার" ও তাই; উপাধিগুলি ও তাবত মুসলমানী—"জুমলদার" "মজুমদার", "হাবিলদার" সম্মানসূচক "সাহেব", প্রভুত্বসূচক "হুজুর" এই সবভাষা বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া হিন্দুর ভাষাকে যবনাধিকারচিহ্নিত করিয়াছিল।

বঙ্গদেশের রাজনৈতিক বিপ্লব দূরপল্লীর কৃষককবিকে ও গৃহ সুখে বঞ্চিত করিল। মামুদ সরিফ্ নামক ডিহিদারকে কবি মুকুন্দরাম দুরপনেয় কালীর বর্ণে অঙ্কিত করিয়া তাঁহার অমর কাব্যের একপার্শ্বে রাখিয়া গিয়াছেন। এই ব্যক্তির অত্যাচারে প্রজাগণের দুঃখ অসহ্য হইয়া উঠিল, সরকারগণ খিল ভূমি আবাদী বলিয়া লিখিয়া লইল, তাহারা খাজানা শোধ করিতে না পারিয়া ধান, গরু বিক্রয় করিল, বাজারে জিনিষের মূল্য হ্রাস হওয়াতে টাকার দ্রব্য দশ আনায় বিক্রয় হইতে লাগিল। পোদ্দারগণ প্রত্যেক টাকায় আড়াই আনা কম দিতে আরম্ভ করিল ও আমলাগণ এক কুড়ার মাপ খর্ব্ব করিয়া ১৫ কাঠায় বিঘা ধরিতে লাগিল। এদিগে প্রজাগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পাছে প্রাণটি লইয়া পলাইয়া যায়, এইজন্য কোটাল ও জমাদারগণ পথ অবরোধ করিয়া পাহাড়া দিতে লাগিল।

দরিদ্র মুকুন্দ সাত পুরুষ যাবৎ চাষাবাদ করিয়া দামুন্যায় বাস করিতেছিলেন,—এই দামুন্যা পল্লীতে* তাঁহার কবিতায় প্রথম নমুনা "শিবকীর্ত্তন"

* বর্দ্ধমান সিলিমাবাদপরগণার অধীন। এই গ্রাম রত্নামুনদীর তীরবর্ত্তী।

প্রসূত হয়, কিন্তু এবার এই রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনি স্বীয় গ্রামে কোনরূপেই থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মুনিব গোপীনাথনন্দী ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু খাজনার দাবী পূর্ণ করিতে না পারিয়া বন্দী হইলেন, কবি গম্ভীর খাঁর সহিত যুক্তি করিয়া চণ্ডীগড়ের শ্রীমন্তখাঁর সাহায্যে, শিশু পুত্র, স্ত্রী ও ভ্রাতা রামানন্দের সহিত পলাইয়া দেশ ত্যাগী হইলেন। "তৈল বিনা কৈনু স্নান" এবং "শিশুকাঁদে ওদনের তরে" প্রভৃতি দুএকটি ইঙ্গিতবাক্যে সেই বিপদাপন্ন ক্ষুদ্র পরিবারটির শোচনীয় দুরবস্থা চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। গভীর দুঃখে কোনও সময় গভীর ব্যাকুলতা জন্মে, তখন নির্ভর ও ভক্তিপূর্ণ অশ্রু চক্ষে উচ্ছলিত হয়, সংসারের অন্য অবলম্বন-রহিত হইলে যিনি শেষের আশ্রয়, তাঁহারই পদে মানুষের মনের স্বভাবপ্রবৃত্তি ধাবিত হইয়া থাকে। মুকুন্দ এই সময় জলপথে যাইতেছিলেন, জলের সাপলা কুড়াইয়া নয়নজল মিশাইয়া চণ্ডীদেবীর পদে উপহার দিলেন, স্বপ্নে চণ্ডী তাঁহাকে কাব্য লিখিতে আদেশ করিলেন; কবি এই স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার চণ্ডীকাব্য তাই এত সুন্দর হইয়াছে; দৈবশক্তিলাভে বিশ্বাস জন্মিলে মানুষী শক্তি বাড়িয়া যায়, ইহা কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কবি তেলি গাঁ, গোড়াই নদী, তেউটা, দারুকেশ্বর, আমোদরনদ, গোথরা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া আরড়া ব্রাহ্মণভূমির রাজা রঘুনাথরায়ের শরণ লইলেন; রঘুনাথরায়ের পিতার নাম বাঁকুড়া রায়,—তাঁহার অনুগ্রহে কবি রাজপরিবারের শিশুগণের শিক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন, এই ব্রাহ্মণভূমিতে রঘুনাথ রায় তাঁহাকে দশআড়া ধান মাপিয়া প্রদান করেন, এই স্থানের অন্নজলে পুষ্ট হইয়া কবি চণ্ডীকাব্য রচনা করেন।

যখন কবি আরড়াতে* আসিয়া চণ্ডীকাব্য সমাধা করিয়াছিলেন, তখন মানসিংহ "গৌড়বঙ্গ উৎকলের" রাজা হইয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দামুন্যা হইতে পলাইয়া আসেন তখন "অধর্ম্মী রাজা"র (সম্ভবতঃ হুসেন কুলিখাঁ অথবা মজফরখাঁ) হস্তে বঙ্গের শাসনভার অর্পিত ছিল।

* এই আরড়া গ্রাম বর্ত্তমান ঘাটাল থানার অধীন ও জেলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতী। আরড়ার ব্রাহ্মণ রাজা রঘুনাথের বংশধরগণ এখনও ঐ স্থানের ২ ক্রোশ দূরে "সেনাপত" গ্রামে বাস করিতেছেন; তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি এখন বর্দ্ধমান রাজা দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। রঘুনাথ রায়ের বর্ত্তমান বংশধর রামচন্দ্র দেবের অতি যৎসামান্য সম্পত্তি আছে।

কবির স্বহস্ত-লিখিত চণ্ডীর পাঠ এইরূপ, "ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজে ভৃঙ্গ, গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ। অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে, খিলাৎ পায় মামুদ সরিফ।" কবির ধন্যবাদপাত্র, প্রবল বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ, রাজা মানসিংহ কখনই দ্বিতীয় ছত্রের "অধর্ম্মী রাজা" হইতে পারেন না। বিশেষ যদি মানসিংহের সময়ই কবি পলাইয়া আসিতেন, তখন তাঁহার প্রবল বিষ্ণুভক্তি সত্ত্বেও কবির তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া কখনই সম্ভবপর নহে; উক্ত ছত্র কয়েকটির অর্থ এইরূপ "এখনকার রাজা মানসিংহ ধন্য, তিনি গৌড়বঙ্গ উৎকলের অধিপ, (প্রজাদিগকে সুখে রাখিয়াছেন)। কিন্তু অধর্ম্মী (যবন) রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে মামুদ সরিফ খিলাৎ পাইয়া অনেক অত্যাচার করিয়াছিল", ইত্যাদি। "শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা। সেইকালে দিলা গীত হরের বনিতা" "অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে, দামুন্যা হইতে পলাইয়া আসিবার পথে চণ্ডীদেবী কবিকে পুস্তক রচনার আদেশ প্রদান করেন; এই আদেশের ১১।১২ বৎসর পরে পুস্তক সমাধা করিয়া যখন কবি গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ লিখেন, তখন বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা রাজা মানসিংহ ছিলেন। গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ সমস্ত প্রাচীন কবিই গ্রন্থ সমাধা করিয়া লিখিতেন; বটতলার ছাপা পুস্তকে ইহা পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া ইহা পূর্ব্বে রচিত হয় নাই, "এই গীতি হইল যেমনে" কথাটি দ্বারাও দৃষ্ট হয়, গীতি সমাপ্ত হওয়ার পরই মুখবন্ধটি রচিত হইয়াছিল। এখনও গ্রন্থ রচনা শেষ হইলে লেখকগণ ভূমিকা লিখিয়া থাকেন। ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে কবির দামুন্যা ত্যাগ স্বীকার করিয়া তখন তাঁহার বয়স ৩০ বৎসর ধরিয়া লইলে অনুমান ১৫৪৭ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর ঠিক মধ্যভাগে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। *

কবিকঙ্কণের পিতামহের নাম জগন্নাথমিশ্র, পিতার নাম হৃদয়মিশ্র। এই হৃদয়মিশ্রের উপাধি ছিল "গুণরাজ"। হৃদয়মিশ্রের পুত্রগণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মত ভেদ আছে; কবি নিজে জানাইয়াছেন, তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র ছিলেন, কনিষ্ঠ রামানন্দের কথাও আমরা তাঁহার নিকট হইতেই জানিতে পারিয়াছি। "কবিচন্দ্র" উপাধি কি আসল নাম ইহা

* চণ্ডীকাব্য সমাধার সময় কবির বয়স ৪০ বৎসরের নূন ছিল বলিয়া বোধ হয় না, এই কাব্যে কবির পুত্রবধূ, জামতার নাম ও পৌত্রের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

সম্পর্কে মতের বিভিন্নতা আছে। শিশুবোধকে যে "অযোধ্যারাম" কৃত "দাতাকর্ণ" পাওয়া যায়, সেই অযোধ্যারামই কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। আমার ধারণা এই, কবিচন্দ্রের নাম ছিল "নিধিরাম", চণ্ডীকাব্যের হস্তলিখিত একখানা প্রাচীন পুঁথি আমার নিকট আছে, তন্মধ্যে "বন্দ মাতা সুরধুনী" শীর্ষক গঙ্গাবন্দনাটি "দ্বিজ নিধিরামের" ভণিতাযুক্ত পাইয়াছি। মুকুন্দরামের রচিত পুস্তকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃত গঙ্গাবন্দনাটি যোজনা করিয়া দেওয়া স্বাভাবিক, যাহা হউক এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা সম্ভব নহে। নিধিরাম, মুকুন্দরাম ও রামানন্দ এই তিন নামে 'রামের' ঐক্য আছে। কবিচন্দ্র প্রণীত দাতাকর্ণ ও গোবিন্দ মঙ্গল আমরা পড়িয়াছি। চণ্ডীকাব্যে ও গোবিন্দমঙ্গলের উল্লেখ আছে। গোবিন্দ মঙ্গল হইতে পরে কিছু তুলিয়া দেখাইব; ইহাছাড়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে "অঙ্গদের রায়বার" টিতে "কবিচন্দ্রের" ভণিতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু খাঁটি প্রমাণের অভাবে "কবিচন্দ্র" পাইলেই মুকুন্দরামের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে জড়িত করা আমাদের সাহসে কুলায় না।

মুকুন্দরামের পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র "মীন মাংস" ত্যাগ করিয়া গোপাল আরাধনা করিয়াছিলেন,—কবির মাতার নাম, 'দৈবকী', পুত্রের নাম, 'শিবরাম', পুত্রবধূর নাম 'চিত্রলেখা' কন্যার নাম 'যশোদা' ও জামাতার নাম 'মহেশ' ছিল। এখন ও কবিকঙ্কণের বংশধরগণ বর্দ্ধমানে রায়না থানার অধীন ছোটবৈনান গ্রামে বাস করিতেছেন।*

---

* কবির হস্তলিখিত পুঁথি দামুন্যায় এখনও রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে এই কয়েকটি ছত্র দৃষ্ট হয়,—"কয়ড়িকুলের রাজা, সুকৃতি তপন ওঝা, তস্য সুত উমাপতি নাম। তনয় মাধব শর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা, তার নয় তনয় সোদর॥ উদ্ধরণ, পুরন্দর, নিত্যানন্দ হৃদয়েশ্বর, বাসুদেব, মহেশ সাগর। সর্ব্বেশ্বর অনুজাত, মহামিশ্র জগন্নাথ। একভাবে পূজিল শঙ্কর॥ বিশেষ পুণ্যের ধাম, হৃদয় মিশ্র নাম। কবিচন্দ্র তার বংশধর॥ অনুজ মুকুন্দ শর্ম্মা। সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা, নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় বিধান। শিবরাম বংশধর, কৃপা কর মহেশ্বর, রক্ষ পুত্র পৌত্রে ভগবান।"—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, কবিকঙ্কণের শিবরাম ভিন্ন অপর একপুত্র ছিল, তাঁহার নাম গঙ্গানন্দ এবং কবির বংশ এখন তিন স্থানে বাস করিতেছেন, ১ম দামুন্যায়, ২য় বীরসিংহে, ৩য় হুগলীর অন্তঃপাতী রাধাবল্লভপুরে। বিদ্যানিধি মহাশয় আরও বলেন "কবিকঙ্কণের অধস্তন ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম ও দশম পুরুষ অদ্যাবধি জীবিত।" পরিষদের পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩০২, ১১৯ পৃষ্ঠা। এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে—অনুসন্ধান, ১২৯৯ সাল মাঘ ৩১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার উপায় নাই। লহনা ও খুল্লনার বিবাদ উপলক্ষে একজন সহিলে কোন্দল হয় দূর। বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্ত্তি ঠাকুর।" কবি এইভাবের একটি স্পষ্ট ও দৃঢ় ইঙ্গিত দ্বারা যেন বুঝাইয়াছেন, তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। কবি তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়সহ মাণিকদত্ত নামক এক অধ্যাপকের নিকট সঙ্গীত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, একথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। "পাথরকুচা"—নিবাসী গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণভূমির রাজ সভায় "চণ্ডীকাব্য" প্রথম গান করিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে।

কবিকঙ্কণ প্রথম শ্রেণীর কবি, কিন্তু তিনি যে সমাজের ফটো তুলিয়াছিলেন তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর। ষোড়শ শতাব্দীর জীবন্ত ইংরেজসমাজ আর সেই যুগের স্তিমিত সুখ দুঃখের আলয় বঙ্গীয় কুটীর একরূপ দৃশ্য নহে। কিন্তু আল্পাইনশীর্ষে ত্রিযামার শশীরশ্মি ও পল্লীগ্রামের বর্ষা-প্রপাতসিক্ত তরুগুল্ম এই উভয় দৃশ্যে সৌন্দর্য্যের বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও উভয়কেই উৎকৃষ্টভাবে অঙ্কন করিতে প্রথম শ্রেণীর তুলির প্রয়োজন। সেক্ষপীয়রের হাতে যে তুলি ছিল, মুকুন্দরাম ও সেইরূপ এক তুলি লইয়া চিত্র করিয়াছিলেন, কিন্তু দৃশ্যগুলি একদরের নহে। এইদেশে ইতিহাসের মধ্যঅধ্যায়ে রাম, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, নল প্রভৃতি আদর্শ পুরুষগণের শ্রেণী একবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে কিন্তু সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি রমণীদলের শ্রেণী কতকাংশে অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। স্বামীর সঙ্গে বনগমন না করিলেও সেদিন পর্য্যন্ত বঙ্গীয় রমণীগণ হাস্য মুখে স্বামীর শ্মশানে পতঙ্গের ন্যায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিতা ফুল্লরা, খুল্লনা ও বেহুলাকে চিনিতে বিলম্ব হইলেও তাহারা সেই পৌরাণিক রমণীগণেরই ভগ্নী এবং এক বংশের লক্ষণাক্রান্ত। মুকুন্দরামের চণ্ডীতে পুরুষের পৌরুষ না থাকিলেও উৎকৃষ্ট রমণী চরিত্র বিরল নহে।

কাব্য লিখিতে লিখিতে যখন অন্তদৃষ্টি নির্ম্মল ও প্রতিভান্বিত হইয়াছে তখন মুকুন্দরাম নিজে লেখনী ছাড়িয়া দিয়াছেন, চরিত্রগুলি হাস্য পরিহাস ও কথা বার্ত্তা বলিয়াছে, তিনি ভণিতায় নিজের নাম সই করিয়া প্রস্তুসম স্থির রাখিয়াছেন। এইভাবে যবনিকার পশ্চাতে যাইয়া সক্ষেত্রে কার্য্য করা কৃতকর্টা প্রকৃতির নিজের কার্য্য করার ন্যায়। সাহিত্যে উৎকৃষ্ট নাটকলেখকগণ মাত্র এই গুণ দেখাইয়া থাকেন; মুরারি শীলের সঙ্গে কালকেতুর সাক্ষাতের অংশটি দেখুন;—

"বেনে বড় দুষ্টশীল, নামেতে মুরারি শীল, লেখা জোখা করে টাকা কড়ি। পাইয়া বীরের সাড়া, প্রবেশে ভিতর পাড়া, মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি॥—খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।—কোথা হে বণিকরাজ, বিশেষ আছয়ে কাজ, আমি আইলাম সেই হেতু॥ বীরের বচন শুনি, আসিয়া বলে বেণ্যাণী, আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার। প্রভাতে তোমার খুড়া, গিয়াছে খাতক পাড়া, কালি দিব মাংসের উধার॥ আজি কালকেতু যাহঘর।—কাষ্ঠ আন একভার, হাল বাকী দিব ধার, মিষ্ট কিছু আনিহ বদর। শুনগো শুনগো খুড়ী, কিছু কার্য্য আছে দেড়ী, ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী॥ আমার জোহার খুড়ী, কালি দিহ বাকী কড়ী, অন্য বণিকের যাই বাড়ী॥—বাপা এক দণ্ড কর বিলম্বন। সহাস্য বদনে বাণী, বলে বেণে-নিতম্বিনী, দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন॥ ধনের পাইয়া আশ, আসিতে বীরের পাশ, ধায় বেণে খিড়কীর পথে। মনে বড় কুতূহলী, কাঁধেতে কড়ীর থলী, হড়পী তড়াজু করি হাতে। করে বীর বেণেরে জোহার। বেণে বলে ভাই পো, এবে নাহি দেখি তো, এতোর কেমন ব্যবহার॥ খুড়া উঠিয়া প্রভাতকালে কাননে এড়িয়া জালে, হাতে শর চারি প্রহর ভ্রমি। ফুল্লরা পশার করে, সন্ধ্যাকালে যাই ঘরে, এই হেতু নাহি দেখ তুমি॥ খুড়া ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী।—হয়ে মোর অনুকূল, উচিত করিও মূল, তবে সে বিপদ আমি তরি॥ বীর দেয় অঙ্গুরী, বাণিয়া প্রণাম করি, জোঁখে রত্ন চড়ায়ে পড়ান। কুঁচ দিয়া করে মান, ষোল রতি দুই ধান, শ্রীকবি কঙ্কণ রস গান॥

সোণা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল, ঘষিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল॥ রতি প্রতি হইল বীর দশগণ্ডা দর। দুধানের কড়ি আর পাঁচ গণ্ডা ধর। অষ্টপণ পঞ্চগণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি। মাংসের পিছিলা বাকী ধরি দেড় বুড়ি॥ একুনে হইল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি। কিছু চালু চালু খুদ কিছু লহ কড়ি॥ কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি পাই। যেজন অঙ্গুরী দিল দিব তার ঠাঁই॥ বেনে বলে দরে বাড়াইলাম পঞ্চবট। আমা সঙ্গে সওদা করি না পাবে কপট॥ ধর্ম্মকেতু ভায়া সঙ্গে ছিল লেনা দেনা। তাহা হইতে দেখি বাপা বড়ই সেয়ানা॥ কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া। অঙ্গুরী লইয়া আমি যাই অন্য পাড়া॥ বেণে বলে দরে বাড়াইলাম আড়াই বুড়ি। চালু খুদ না লইও গণে লও কড়ি॥"

লহনার সঙ্গে খুল্লনা বিবাদ করিতেছে, কবির ইহা বর্ণনীয় বিষয়। কলহাকৃষ্টা প্রতিবাসিনীগণ,—"চুলাচুলি দুসতিনে অঙ্গনেতে ফিরে। চাহিয়া রহিল সবে নিবারিতে নারে॥ চাহিয়া রয়েছ কেন নাকে হাত দিয়া। উচিত কহনা কেন ভাতার পুত খেয়ে॥" শেষ দুটি উক্তি লহনার, কিন্তু কবির তাহা বলিবার অবকাশ নাই। মূল কথা কবি বর্ণনা আরম্ভ করিয়াই ঠিক বর্ণিত ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করেন ও সম্পূর্ণরূপে তদ্গত হইয়া পড়েন, তিনি তখন চক্ষে দেখিয়া লিখেন। ধনপতি চাঁদ বণিককে মাল্যচন্দন দেওয়াতে নিমন্ত্রিত বণিকগণ ক্রুদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের বাক্‌বিতণ্ডা ও কলহ কবি যেন দেখিতে দেখিতে নোট করিয়া গিয়াছেন,—

"এমন বিচার সাধু করি মনে মনে। আগে জল দিল চাঁদ বেণের চরণে॥ কপালে চন্দন দিয়া মালা দিল গলে। এমন সময়ে শঙ্খ দত্ত কিছু বলে॥ বণিক সভায় আমি আগে পাই মান। সম্পদে মাতিয়া নাহি কর অবধান॥ যেকালে বাপের কর্ম্ম কৈল ধুসদত্ত। তাহার সভায় বেণে হৈল ষোলশত। ষোলশতের আগে শঙ্খদত্ত পাইল মান। ধুসদত্ত জানে ইহা চন্দ্র মতিমান॥ ইহা শুনি ধনপতি করিল উত্তর। সেইকালে নাহি ছিল চাঁদ সদাগর॥ ধনে মানে কুলে শীলে চাঁদ নহে বাঁকা। বাহির মহলে যার সাত ঘড়াই টাকা॥ ইহা শুনি হাসি কহে নীলাম্বর দাস। ধন হেতু হয় কিবা কুলের প্রকাশ॥ ছয়বধূ যার ঘরে নিবসয়ে রাঁড়। ধনহেতু চাঁদবেণে সভা মধ্যে ষাঁড়। চাঁদ বলে তোরে জানি নীলাম্বর দাস। তোমার বাপের কিছু শুন ইতিহাস॥ হাটে হাটে তোর বাপ বেচিত আমলা। যতন করিয়া তাহা কিনিত অবলা॥ নিরন্তর হাতাহাতি বারবধূর সনে। নাহি স্নান করি বেটা বসিত ভোজনে॥ কড়ির পুটলী সে বাঁধিত তিন ঠাঁই। সভা মধ্যে কহ কথা কিছু মনে নাই। নীলাম্বর দাস কহে শুন রামরায়। পসরা করিলে তাহে জাতি নাহি যায়॥ কড়ির পুটলী বাঁধি জাতির ব্যাভার। আঁটো ছোপড়া খাইলে নহে কুলের খাথার॥ নীলাম্বর দাস রামরায়ের শ্বশুর। ধনপতি গঞ্জি কিছু বলিল প্রচুর। জাতিবাদ হয় যদি তবে হই বঙ্ক। বনে জায়া ছাগ রাখে এবড় কলঙ্ক॥"

আর একটি গুণ, মুকুন্দ কবি সংসারের খাঁটিরূপভিন্ন অন্য কিছু কল্পনা করেন না; তিনি মিথ্যা কল্পনার প্রতিশ্রুত অরি। যেখানে বাধ্য হইয়া কোন দীর্ঘ রূপকথার অবতারণা করিয়াছেন, সেখানে ও প্রকৃত রাজ্যের কথা দ্বারা তাহা যথাসাধ্য সংযত ও সত্যের আভাযুক্ত করিয়া তুলিয়াছেন,—স্বপ্নের মধ্যে জীবনের রেখা আঁকিয়াছেন। পশুর সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধের অংশটি পাঠ করুন। কবির স্পষ্ট অঙ্গুলী সঙ্কেতে এই যুদ্ধের বর্ণনাটি আমার নিকট একটি গূঢ় ও মহিমান্বিত রাজনৈতিক বিপ্লবের কথার ন্যায় বোধ হইয়াছে। পশুগণ যুদ্ধে হারিয়া ভগবতীর নিকট কাঁদিতেছে—তাঁহাদের সঙ্গে চণ্ডীর কথোপকথন এইরূপ—

চণ্ডী—সিংহ তুমি মহাতেজা, পশু মধ্যে তুমি রাজা, তোর নখে পাষাণ বিদরে। শুনিয়া তোমার রা, কম্প হয় সর্ব্ব গা, কি কারণে ভয় কর নরে॥

সিংহ—বীর ক্ষত্রি অদ্‌ভুত, দ্বিতীয় যমের দূত, সমরে হানয়ে বীর রথ। দেখিয়া বীরের ঠাম, ভয়ে তনু কম্পমান, পলাইতে নাহি পাই পথ॥

চণ্ডী—আদি ক্ষত্রি তুমি বাঘ, কে পায় তোমার লাগ, পবন জিনিতে পার জোরে। তব নখ হীরাধার, দশন বজ্রের সার, কি কারণে ভয় কর নরে॥

ব্যাঘ্র—যদি গো নিকটে পাই, ঘাড় ভাঙ্গি রক্ত খাই, কি করিতে পারি আমি দূরে। ব্যর্থ নহে তার বাণ, একে একে লয় প্রাণ, দেখি বীরে প্রাণ কাঁপে ডরে॥

চণ্ডী—পশু মধ্যে তুমি গণ্ডা, উত্তম তোমার খাণ্ডা, বিরোধ না কর কার সনে। তুমি যদি মনে কর, প্রলয় করিতে পার, মরে ভয় কর কি কারণে॥

গণ্ডা—কালকেতু মহাবীর, দূর হতে মারে তীর, খর্গে তার কি করিতে পারে। বীরের অস্ত্রের বেগে, বত্রিশ দশন ভাঙ্গে, পশুগণে মহামারি করে॥

চণ্ডী—তুমি হস্তী মহাশয়, তোমাব কিসের ভয়, বজ্রসম তোমার দশন। তব কোপে যেই পড়ে, যমপথে সেই নড়ে, কেবা ইচ্ছে তব দরশন॥

হস্তী—দুই চারি ক্রোশ যায়, তবে মোর লাগ পায়, উলটিয়া শুণ্ডে মোরে খেঁচে। মোর পিঠে মারে বাড়ি, লয়ে যায় তাড়াতাড়ি, ছাগলের মূল্যে লয়ে বেচে। ইত্যাদি।

মনে হয় যেন, পশুযুদ্ধ উপলক্ষ্য করিয়া কবি মানুষীদ্বন্দ্বের কথারই আভাস দিয়াছেন। উদ্ধৃত অংশ হইতে এবিষয়ে আরও স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে; ভালুক কাঁদিয়া বলিতেছে "বনে থাকি' বনে খাই জাতিতে ভালুক। নেউগী, চৌধুরী নহি, না রাখি তালুক॥" হস্তী বলিতেছে,—"বড় নাম, বড় গ্রাম বড় কলেবর। লুকাইতে স্থান নাই বীরের গোচর। পলাইয়া কোথা যাই, কোথা গেলে তরি। আপনার দন্ত দুটা আপনার অরি।" ইত্যাদি।

এই কবির লেখনীর বড় চমৎকার গুণ এই যে উঁহার মন্ত্রপূত স্পর্শে পশু জগতে মানুষী তত্ত্বের বিকাশ পায়; কবি প্রকৃতির ফুল পল্লব বর্ণনাগুলিও মানুষী উপমা দ্বারা সজীব ও উপভোগ যোগ্য করিয়া তুলেন, এই উপমাটি দেখুন, "এক ফুলে মকরন্দ, পান করি সদানন্দ, ধায় অলি অপর কুসুমে, এক ঘরে পেয়ে মান, গ্রাম যাজি দ্বিজ যান, অন্য ঘরে আপন সম্ভ্রমে॥" কবির চিত্তে মানুষসমাজ এত স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও গাঢ়বর্ণে মুদ্রিত ছিল যে,—জলে, স্থলে, গুল্ম লতায় ও ইতর জীবে সতত মানুষীভাবই প্রত্যক্ষ হইত।

কিন্তু কবিকঙ্কণ সুখের কথায় বড় নহেন, দুঃখের কথায় বড়। বড় বড় উজ্জ্বল ঘটনার মধ্যে অবিরত ফল্গুনদীর ন্যায় এক অন্তর্বাহী দুঃখ সংগীতের মর্ম্ম স্পর্শী আর্ত্তধ্বনি শুনা যায়। সুশীলার বারমাসী হইতে ফুল্লরার বারমাসী হৃদয়কে গভীরতর স্পর্শ করে; নিঃশব্দ করুণরস কাব্য-খানাকে বিয়োগান্ত নাটকের গূঢ়মহিমাপূর্ণ করিয়াছে, সুখবসন্তকাল বর্ণনায়ও কবির প্রেমগীতির মলয় বায়ু আবৃত করিয়া উদরচিন্তার আক্ষেপবাণী উঠিয়াছে। নানাবিধ দুঃখের কথা তাঁহার প্রতিভার চরণ নূপুর কাড়িয়া লইয়া যেন গতি মন্থর করিয়া দিয়াছে।

কবিকঙ্কণের পুরুষচরিত্রে দর্শন, কবিত্ব, কি কোন উচ্চদরের চিন্তার বিকাশ নাই। হ্যামলেট, ওথেলো, করিওলেনাস প্রভৃতি নাট্যবীরগণের উন্মত্ত আবেগের কথাগুলি অবস্থা বিশেষে পাঠকের যপমন্ত্র হইবার যোগ্য হয়, তাহা জীবনের এক এক পর্য্যায়ে পাঠক নিজ মনে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন। সেক্ষপীয়রের চরিত্রগুলির মধ্যে যে গুলি পাগল, তাহারাই কবির কণ্ঠে অমর যশোমাল্য অর্পণ করিয়াছে। কবিতায় হউক, সমাজে হউক, শাসনে হউক, ভাব যেখানে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তিতে মাতিয়া পাগলের ন্যায় দৌড়ায় ও মানুষীসংস্কারের সীমা লঙ্ঘন করে, সেইখানে স্থায়ী যশঃ ছায়ার ন্যায় তাহার অনুগমন করিয়া থাকে; সেক্ষপীয়রের নাটকে ভাবের সেইরূপ উচ্ছ্বাস আছে, বাঙ্গলী কবিগণের মধ্যে একমাত্র চণ্ডীদাসের গীতে তাহা দৃষ্ট হয়।

কবিকঙ্কণের বর্ণিত ঘটনার একটা মূলকেন্দ্র নাই; উৎকৃষ্ট নাটক বা কাব্যে ছোট বড় পুঞ্জ পুঞ্জ ঘটনার স্রোত দৌড়াইয়া একটি মূল কেন্দ্রে পড়িয়া মিশিয়া যায়,—সেই মূল দৃশ্যের চতুষ্পার্শ্বে নানা ঘটনা ও চরিত্রের বিকাশ পায়; বিশেষ একটি অঙ্ক নানাশৃঙ্গবেষ্টিত কাঞ্চন-জঙ্ঘার ন্যায় বহু অধ্যায়সমন্বিত হইয়া সকলের উপরে স্বীয় অত্যুচ্চ আবেগের শীর্ষ দেখাইয়া থাকে। কবিকঙ্কণের দুএকটি মূল ঘটনা ধরিতে পারা গেলেও তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য ঘটনার সেরূপ অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না। চণ্ডীকাব্য বিশৃঙ্খল একটি প্রাকৃতিক অরণ্যানীর ন্যায় তরু, গুল্ম, পুষ্প, গুহা সমস্ত একত্র এক দৃশ্যপটে দেখাইতেছে, এই সৌন্দর্য্যের সাধারণ তন্ত্রে প্রত্যেক শোভাই নিরীক্ষণযোগ্য, কিন্তু বিশেষ কোন একটি অপূর্ব্ব সুদৃশ্য হয় নাই।

কবিকঙ্কণের অন্য একবিধ গৌরব আছে। সরলা মিরেণ্ডা, স্নেহশীলা কর্ডেলিয়া, পতিপ্রাণা দেস্‌দেমনা ইঁহারা সহসা ঘটনা বিশেষের মধ্যে পড়িয়া চরিত্রের বিকাশ দেখাইয়াছেন—ইঁহাদের নাম ইতিহাসের পত্রে অঙ্কিত হইবার যোগ্য। কিন্তু বঙ্গীয় কবির ফুল্লরা ও খুল্লনার ন্যায় বিলাতি সুন্দরীগণ সুগৃহিণী নহেন; বঙ্গের কুঁড়ে ঘরে দৈনন্দিন যে সহিষ্ণুতার পরীক্ষা হয়, নিত্য প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিলেই আত্মোৎসর্গের যে মন্ত্র যপ করিয়া বঙ্গনারীগণের গৃহ কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে হয়, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হওয়া ও সেই মন্ত্র গূঢ়সহিষ্ণুতার সহিত অভ্যাস করা সকলস্থলে সম্ভবপর নহে,—এই স্থানে মুকুন্দ কবির নির্ব্বিরোধ রাজত্ব। আমরা এখানে চণ্ডীকাব্যের উপাখ্যানভাগ সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কালকেতুর গল্প।

লোমশ মুনি সমুদ্রের তীরে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন; ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর তাঁহার নিকটে যাইয়া কহিলেন "মুনি, আপনি শীতাতপ সহ্য করিয়া তপ করিতেছেন, একখানা কুটীর প্রস্তুত করিলে ভাল হয় না!" লোমশ উত্তরে বলিলেন "কি হেতু বাঁধিব ঘর জীবন নশ্বর।" (মা, চ)। নীলাম্বর প্রশ্ন করিলেন "মুনি আপনার আয়ু কত?" উত্তরে, "লোমশ বলিল শুন, ইন্দ্রের তনয়। পরিচ্ছন্ন লোম মোর দেখ সর্ব্বগায়॥ এক ইন্দ্রপাতে এক লোম হয় ক্ষয়। সর্ব্বলোম ক্ষয় হ'লে মরণ নিশ্চয়॥" (মা, চ)। এই মহাপুরুষ তথাপি ঘর বাঁধিতে বিরত ছিলেন। ইঁহার কঠোর দার্শনিক উপেক্ষার নিকট আধুনিক সভ্যতার প্রকাণ্ডকাণ্ড কি একটা ঘোর পণ্ডশ্রম বলিয়া বোধ হইবে!

নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন "অমর কে?" উত্তর—"একমাত্র শিব।" সুতরাং নীলাম্বর শিব সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। নীলাম্বরের আহৃত পূজার ফুলগুলির মধ্যে একটি কীট ছিল, তাহার দংশন জ্বালায় মহাদেব অস্থির হইয়া নীলাম্বরকে শাপ দিলেন—"পৃথিবীতে গিয়া জন্ম গ্রহণ কর।" তাঁহার স্ত্রী ছায়া ও তৎসহগমন করিল। মর্ত্ত্যলোকে এই দুই ব্যক্তিই কালকেতু ও ফুল্লরা। কিন্তু এই অলৌকিক অংশ মূল গল্পের কোন হানি করে নাই; পূর্ব্ব জন্মের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া বৌদ্ধদিগের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছিল; এখন আমরা মনুষ্যজীবনকে আদ্যন্তরহিত একটি বিচ্ছিন্ন প্রহেলিকার ন্যায় মনে করি, কিন্তু সেকালে কবিগণ জীবনের আদি অন্ত দেখাইয়া দিতেন।

কিন্তু সুখের বিষয়, নীলাম্বর কালকেতু অবতারে তাঁহার স্বর্গীয় বৈভবের কোন চিহ্ন লইয়া আসেন নাই; কালকেতুকে আমরা খাঁটি একটি ব্যাধ-রূপেই দেখিতেছি; শৈশবে তাহার শরীরে দুর্দ্দান্ত তেজ, সে শশারু তাড়িয়া ধরিত, শিকার দূরে গেলে কুকুর দিয়া ধরাইত, পক্ষীগুলিকে বাটুল ছুঁড়িয়া মারিত; কালকেতু পঞ্চবর্ষেই "শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল।" (ক, ক, চ,)। ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। সে কাব্যের প্রধান চরিত্র, কিন্তু মুকুন্দকবি

তাহাকে বর্ণনা করিতে গগন হইতে চন্দ্র ও জল এবং স্থল হইতে বাঁধুলি কি পদ্মফুল লইয়া নাড়াচাড়া করেন নাই। তাহার "দুইবাহু লোহার সাবল (ক,চ)। সে যখন ভোজন করিতে বসে, তখন কবির উৎপ্রেক্ষা এইরূপ, "শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিকার। গ্রাসগুলি তোলে যেন তেআঁটিয়া তাল।" নায়কের প্রতি এরূপ অবমাননাকর কথা বলিতে এখনকার কবিগণ কখনই স্বীকৃত হইবেন না। মুকুন্দ—ব্যাধের রূপ স্বকীয় একবিন্দু বর্ণক্ষেপেও গিল্টী করিতে চেষ্টা করেন নাই—কবির উপর স্বভাবের বিশেষ অনুকম্পা, তিনি সততই স্বভাবকে অবলম্বন করিতে পারিয়াছেন।

কালকেতু একাদশবর্ষ বয়সে বিবাহ করিলেন, সোমাই ওঝা ঘটকরূপে যখন সঞ্জয়ব্যাধের বাড়ীতে যাইয়া তাহার কন্যাটি দেখিতে চাহিলেন, তখন পিতা স্বীয় কন্যার মেঘবরণ চুল ও চাঁদবরণ মুখের প্রশংসা করেন নাই, তিনি বলিলেন "এই কন্যা রূপে গুণে নাম যে ফুল্লরা। কিনিতে বেচিতে ভার পারয়ে পসরা॥ রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে। বন্ধুজন মেলিয়া ইহার গুণ গানে।" (ক, চ)। এই স্থলে আমরা ফুল্লরাকে প্রথম দেখি। শিশু কালকেতুর বর্ণনাটি আমরা একবার উদ্ধৃত করিয়াছি (২৩৬ পৃষ্ঠা); যৌবনে কালকেতু নিত্য নিত্য বনে যাইয়া শিকার করিত; ব্যাঘ্রগুলিকে লেজ মোচড়াইয়া মারিত,—"দেবীর বাহন" বলিয়া সিংহকে বধ করিত না, কিন্তু ধনুকের বাড়ি দিয়া তাহাকে এরূপ শিক্ষা দিত যে,—"তৃষ্ণায় আকুল সিংহ পান করে নীর।"

সারাদিন শিকার করিয়া একভাঁড় মৃত পশুস্কন্ধে কালকেতু সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিয়া আসিত; তাহার ভোজনটি খুব বিরাট রকমের ছিল, সে হাঁড়িতে হাঁড়িতে ভাত, নেউলপোড়া, পুঁইশাক, কাকড়া প্রভৃতি খাইয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিত—"রন্ধন করেছ ভাল আর কিছু আছে?" ক, ক, চ। স্বীকার করিতে হইবে, তখন ক্ষুধা ও খাদ্য উভয়ই প্রচুর ছিল।

এদিগে পশুগণ বিষম বিপদে পড়িয়া চণ্ডীদেবীর শরণাপন্ন হইল; তিনি বর দিলেন "কালকেতু আর তোমাদিগকে কিছু করিতে পারিবে না।"

সেদিন কালকেতু রীতিমত ধনু হস্তে বনে যাত্রা করিল; তাহার নিশ্চিন্ত অন্তঃকরণে দেবীর কৃপার পূর্ব্বাভাস নিঃশব্দ প্রফুল্লতার উদ্রেক করিতেছিল,—

"প্রভাতে পরিয়া ধড়া, শরাসনে দিয়া চড়া, খর খুর কাছে তিনবাণ। শিরে [illegible]

অঙ্গ-বড়ি, কর্ণে ফটিকের কড়ি, মহাবীর করিল প্রয়াণ॥ দেখে কালকেতু সুমঙ্গল—দক্ষিণে গো, মৃগ, দ্বিজ, বিকশিত সরসিজ, বামে শিবা ঘট পূর্ণজল॥ চৌদিগে মঙ্গল ধ্বনি, কেহ জ্বালে হোম বহ্নি, দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী॥ দেখিল রুচির তনু, বৎসের সহিত ধেনু, পুরাঙ্গনা দেয় জয়-ধ্বনি॥ দূর্ব্বা, ধান্য, পুষ্পমালা, হীরা নীলা মতিপলা, বামভাগে বারনিতম্বিনী॥ মৃদঙ্গ মন্দিরা রায়, কেহ নাচে, কেহ গায়, শুনে বীর' হরি হরি ধ্বনি॥"

কিন্তু হঠাৎ পথে স্বর্ণবর্ণ গোসাপ দেখিতে পাইল। গোসাপ যাত্রার পক্ষে শুভ চিহ্ন নহে; কালকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে ধনুর্গুণে বাঁধিয়া লইল, "যদি অন্য শিকার জোটে, তবে ইহাকে ছাড়িয়া দিব, নতুবা ইহাকেই শিকপোড়া করিয়া খাইব।"

দেবীর চক্রে সেদিন ঘনঘোর কুজ্ঝটিকাতে বনপ্রদেশ আচ্ছন্ন হইল। কালকেতু সারাদিন ধনুঃশর হস্তে বনে বনে ঘুরিয়া কিছুই পাইল না—কংস-নদীর তীরে কতকটুকু জল খাইয়া অবসন্ন দেহে বিশ্রাম করিতে বসিল, কিন্তু "বিষম সম্বল চিন্তা মহাবীর লাগে, এক চক্ষে নিদ্রা যায় এক চক্ষে জাগে॥"

ফুল্লরা শিকারের আশায় অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু কালকেতুর শূন্য হস্ত দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল; কালকেতু আপাততঃ গোসাপটাকে "ছাল উতাড়িয়া শিকপোড়া" করিতে আদেশ করিল এবং সখীগৃহ হইতে ফুল্লরাকে কিছু ক্ষুদ ধার করিয়া আনিতে বলিল, তৎপর স্বয়ং ক্ষুন্নমনে বাসি মাংসের পসার লইয়া গোলাঘাট অভিমুখে ধাবিত হইল।

ফুল্লরা বিমলার মাতার নিকট দুই কাঠা ক্ষুদ ধার করিল, দুই সখী একখানে বসিয়া একদণ্ড গৃহের আলাপ করিল, শেষে ফুল্লরাসুন্দরী ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

এদিগে গোসাপরূপিণী চণ্ডী পরমা সুন্দরী যুবতী হইয়া কুটীরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন তাঁহার রূপের প্রভায় "ভাঙ্গা কুড়্যাঘরখানা করে ঝলমল। কোটীচন্দ্র প্রকাশিত গগন মণ্ডল॥" বিস্মিতা ফুল্লরা প্রণাম করিয়া আগমণের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। চণ্ডী বলিলেন, তিনি সতিনীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া আসিয়াছেন। সেই ব্যাধের কুটীরেই তিনি থাকা স্থির করিয়াছেন। ফুল্লরা সেই ভাঙ্গা কুটীরে স্বামীর প্রেমের বড়াই করিয়া সুখী ছিল; তাহার উপবাস, দারিদ্র্য সকলই সহ্য হইয়াছিল কিন্তু অদ্য চণ্ডীর রূপ দেখিয়া আশঙ্কায় মুখ শুকাইয়া গেল;—"পেটে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা। ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল রন্ধনের ত্বরা।"

যতবার জিজ্ঞাসা করিল, ততবারই এক উত্তর, চণ্ডী সেই স্থানেই থাকিবেন, তখন মনের আশঙ্কা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ফুল্লরা সুন্দরী,—সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি নানা পৌরাণিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতে লাগিল—"স্বামী ছাড়িয়া স্ত্রীলোকের একদণ্ড ও পরগৃহে থাকা উচিত নয়, আপনার এস্থান ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।" সে কত নৈতিক বক্তৃতা দ্বারা চণ্ডীদেবীকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিল—"সতিনী কোন্দল করে, দ্বিগুণ বলিবে তারে, অভিমানে ঘর ছাড়বে কেনি।" "এ বিরহজ্বরে যদি স্বামী মরে, কোন্ ঘাটে খাবে পানী॥"

কিন্তু দেবীর নিঃশব্দ রহস্য-প্রিয়তা একটি অটল অভিসন্ধির ভাণ ধরিয়া উপায়হীনা ফুল্লরার সমস্ত অনুনয় বিনয় বৃথা করিয়া দিল। ফুল্লরা নীতি-বাক্যে ফিরাইতে না পারিয়া দারিদ্র্যের ভয় দেখাইতে লাগিল,—"বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখবাণী। ভাঙ্গা কুড়ে ঘর তাল পাতের ছাউনি। ভেরাণ্ডার খাম তার আছে মধ্য ঘরে। প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥" প্রভৃতি বর্ণনা পড়িলে এই রহস্যের অভিনয়ের মধ্যে ও আমাদের কান্না পায়। জৈষ্ঠ্যে,—"বইচির ফল খেয়ে করি উপবাস।" "পসরা এড়িয়া জল খাইতে না পারি। দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধসারি।" শ্রাবণে,—"কত শত খায় জোক, নাহি খায় ফণী।" "দুঃখ কর অবধান। বৃষ্টি হৈলে কুড়ায় ভাসিয়া যায় বাণ॥" "মাংসের পসারা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে। আচ্ছাদন নাহি অঙ্গে স্নান বৃষ্টি নীরে॥" আশ্বিন মাসে,— "উত্তম বসনে বেশ করয়ে বণিতা। অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা। কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে। দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে।" কার্ত্তিক মাসে,—"নিযুক্ত করিলা বিধি সবার কাপড়। অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥" "ফুল্লরার আছে কত কর্ম্মের বিপাক। মাঘমাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক।" "মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ। মালতীএ মধুকর পিয়ে মকরন্দ। বনিতা পুরুষ দোঁহে পীড়িত মদনে। ফুল্লরার অঙ্গপোড়ে উদর দহনে॥" এই বর্ণনাগুলির মধ্যে স্থলে স্থলে চণ্ডীদেবীকে ভয় দেখাইবার প্রকাণ্ড চেষ্টা আছে,—"কোন্ সুখে ইচ্ছিলে হইতে ব্যাধের নারী।"

কাঙ্গালিনীর এই দৈনিক কষ্টসহ মূর্ত্তিখানা বঙ্গীয় কুটীরে কিরূপ সুন্দর দেখাইতেছে। ফুল্লরা নিজের এই ঘোর দারিদ্র্যদুঃখ লজ্জায় কাহাকেও বলিত না, কিন্তু এইরূপসী কামিনীকে উহা না জানাইলে সে ত গৃহ ছাড়ে না। ফুল্লরার নীরব পতিপ্রেমের এই সুন্দর বিকাশে আমরা প্রীত হই—কিন্তু তাহার অকারণ কাতরতায় ঈষদ্‌হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না।

তথাপি দেবী যাইবেন না, তাঁহার প্রচুর ধন আছে—তিনি ব্যাধ-

কুটীরের দারিদ্র্য ঘুচাইবেন। আর তিনিত নিজে ইচ্ছা করিয়া আসেন নাই "এনেছে তোমার স্বামী বাঁধি নিজ গুণে।" "হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ মহাবীরে।।"

স্বামী ইহাঁকে নিজে লইয়া আসিয়াছেন, শুনিয়া উপায়হীনা অভিমানিনী ফুল্লরা মনের ভাব গোপন করিতে পারিল না।

"বিষাদ ভাবিয়া কাঁদে ফুল্লরা রূপসী। নয়নের জলেতে মলিন মুখ শশী॥ কাঁদিতে কাঁদিতে রামা করিল গমন। শীঘ্রগতি গোলাঘাটে দিল দরশন॥ গদগদ বচনে চক্ষুতে বহে নীর। সবিস্ময় হইয়া জিজ্ঞাসে মহাবীর॥ শাশুরী ননদী নাহি, নাহি তোর সতা। কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রতা।"

ফুল্লরা—"সতা সতীন নাহি প্রভু তুমি মোর সতা। ফুল্লরার এবে হৈল বিমুখ বিধাতা॥ কি দোষ দেখিলা মোর জাগ্রত স্বপনে। দোষ না দেখিয়া কর অভিমান কেনে॥ কি লাগিয়া প্রভু তুমি পাপে দিলা মন। আজি হৈতে হৈলা তুমি লঙ্কার রাবণ॥ আজি হৈতে বিধাতা হইল মোরে বাম। তুমি হৈলা রাবণ, বিপক্ষ হৈল রাম॥ পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে। কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে॥ শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড় দুরাচার। তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার॥" কালকেতু—"সুব্যক্ত করিয়া রামা কহ সত্য ভাষা। মিথ্যা হৈলে চোয়াড়ে কাটিব তোর নাসা॥" ফুল্লরা—"সত্য মিথ্যা বচনে আপনি ধর্ম্ম সাক্ষী। তিন দিবসের চন্দ্র দ্বারে বসি দেখি॥"

একদিগে ফুল্লরার সরল প্রেমপূর্ণ ভয়, অপর দিগে কালকেতুর নির্ম্মল অমার্জ্জিত চরিত্রে বৃথাসন্দেহজনিত ক্রোধ,—দুইটী বিপরীত ভাবের উদ্দাম অভিনয় চিত্রকরযোগ্য নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।

কালকেতু গৃহে আসিয়া দেখিল "ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর খানা করে ঝলমল। কোটি চন্দ্র বিরাজিত বদন মণ্ডল।" বিস্মিত হইয়া কালকেতু বলিল এই শ্মশান সমান ব্যাধগৃহে তুমি কে? ব্যাধ হিংসুক, চতুর্দ্দিকে পশুর হাড় এই ঘরে "প্রবেশে উচিত হয় স্নান।" এখানে তুমি কেন? এখানে রাত্রি বাস করা উচিত নহে—লোকে মন্দ কথা বলিতে পারে। তুমি চল, আমি তোমাকে বাড়ী লইয়া যাইব। কিন্তু ব্যাধের স্বতঃপ্রবৃত্ত নৈতিক সাবধানতা ছিল, সে একাকী যাইবে না—"চল বন্ধু জনপথে, ফুল্লরা চলুক সাথে, পিছে লয়ে যাব ধনুঃশর।" দেবী উত্তর দিলেন না—চুপ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কালকেতুর রাগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—"বড়র বহরি তুমি বড় লোকের ঝি। বুঝিয়া ব্যাধের ভাব তোর লাভ কি॥" তথাপি চণ্ডী যান না, তখন ব্যাধ বলিল—"চরণে ধরিয়া মাগি ছাড়গো নিলয়" এবং অবশেষে—"এত বাক্যে চণ্ডী যদি না দিলা উত্তর। ভানু সাক্ষী করি

বীর যুড়িলেক শর।" কিন্তু সহসা অপূর্ব্ব পুলকে ব্যাধ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল, তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল,—শরীর ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল—যে শর ছাড়িতে চাহিয়াছিল, তাহা ছাড়িতে পারিল না; শর ধনু হস্তে আটকিয়া গেল। তখন স্বামীর বিপদে ফুল্লরাসুন্দরী আসিয়া সহায় হইল,—"নিতে চাহে ফুল্লরা হাতের ধনুঃশর। ছাড়াইতে নারে রামা হইল ফাফর।" এই সময় দেবী কৃপা করিয়া বলিলেন "আমি চণ্ডী তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি।" এই স্বভাব-নির্ভীক সত্যবাদী ব্যাধ যেন প্রকৃতির স্বীয় করের গঠিত অকৃত্রিম বস্তু, সে চণ্ডীকে বলিতেছে, "হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি। কি কারণে মোর গৃহে আসিবে পার্ব্বতী।" তখন দেবী স্বীয় দশভূজা মূর্ত্তি দেখাইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। সেই মূর্ত্তির বর্ণনাটি এস্থলে বড় সুন্দর হইয়াছে।

চণ্ডীর অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া ব্যাধ ও ফুল্লরা কাঁদিয়া পায় পড়িল; চণ্ডী কালকেতুকে একটি অঙ্গুরী উপহার দিলেন, কিন্তু—"লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী। এক অঙ্গুরীতে প্রভু হবে কোন্ কাম। সারিতে নারিবে প্রভু হইবে দুর্ণাম॥" সুতরাং চণ্ডীদেবীকে আরও সাত ঘড়া ধন দিতে হইল, এই সাত ঘড়া ধন ফুল্লরা ও কালকেতু সমস্ত বহিয়া লইতে পারিল না; তখন কালকেতু তাহার অভ্যস্থ সরলতাসহকারে একটি অনুরোধ করিল "এক ঘড়া ধন মা আপনি কাঁকে কর।" ক্ষীণাঙ্গী দেবী এক ঘড়া ধন নিজ কাঁখে তুলিয়া লইলেন; কিন্তু কালকেতু মূর্খ, দরিদ্র—তাহার মনে যে সমস্ত ভাব খেলা করিয়াছে, কবি তাহার কোনটিই গোপন করেন নাই—তাহার সরলতা, বর্ব্বরতা, মূর্খতা এবং চরিত্রবল এ সমস্ত ব্যাধ-নায়কেরই উপযোগী, অন্য কোন মানদণ্ডে তাহার তুলনা করিলে অন্যায় হইবে। যখন চণ্ডী ধন ঘড়া লইয়া ধীরে ধীরে চলিতেছেন তখন—"মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি। ধন ঘড়া লৈয়ে পাছে পলায় পার্ব্বতী।" এই সব বর্ণনায় এরূপ একটি সুন্দর অকৃত্রিমতার বিকাশ আছে, যাহা প্রথম শ্রেণীর কবি ভিন্ন অন্য কেহ দেখাইতে পারেন না। মুরারিশীলের নিকট অঙ্গুরী ভাঙ্গাইবার স্থলটি স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইয়াছে। একদিগে প্রবঞ্চক মুরারির কপট-ভদ্রতা সূচক প্রশ্ন, অপরদিগে কালকেতুর সরল বন্ধুভাবের উত্তর ও নির্ভীক সত্যপ্রিয়তা তাহার বর্ব্বরতাকে যেন প্রকৃত সুনীতির বর্ণে মার্জ্জিত করিয়াছে।

ইহার পর কালকেতু চণ্ডীর আদেশে গুজরাট বন কাটাইয়া রাজধানী স্থাপন করিল। কিন্তু পরে মুকুন্দকবি তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারেন নাই। মুকুন্দের কালকেতু ব্যাধ, তাহার কালকেতু রাজা হইতে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কালকেতু কলিঙ্গাধিপতির সহিত যুদ্ধে হারিয়া, স্ত্রীর অনুরোধে শয়নপ্রকোষ্ঠে লুকাইয়া ছিল—এ দৃশ্য দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি, কবি বাঙ্গালীবীরকে বোধ হয় যথা দৃষ্ট তথা অঙ্কণ করিয়াছেন, কিন্তু মাধবাচার্য্য কালকেতুর শেষ জীবন বেশ প্রশংসনীয় ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; ফুল্লরা যখন স্বামীকে যুদ্ধকরিতে নিষেধ করিতেছে, তখন কালকেতু বলিতেছে— "শুনিয়া বীরবর, কোপে কাঁপে থর থর, শুন রামা আমার উত্তর। করে লৈয়া শর গাণ্ডী, পুজিম মঙ্গল চণ্ডী, বলি দিব কলিঙ্গ ঈশ্বর॥ যতেক দেখহ অশ্ব, সকল করিব ভস্ম, কুঞ্জর করিব লণ্ড ভণ্ড। বলি দিব কলিঙ্গ রায়, তুষিব চণ্ডীকা মায়, আপনি ধরিব ছত্র দণ্ড॥" মা, আ, চ। এবং যেখানে কালকেতু বন্দী অবস্থায় রাজসভায় প্রবেশ করিল, তখন—"রাজসভা দেখি বীর প্রণাম না করে।" মা, আ, চ।

কলিঙ্গাধিপতিকে চণ্ডীদেবী স্বপ্নে আদেশ দিলেন—"আমার ভৃত্য কালকেতু, তাহাকে আমি রাজগি দিয়াছি, তুই তাহাকে ছাড়িয়া দে।" কলিঙ্গাধিপতি ও তাহাই করিলেন এবং স্বয়ং তাহাকে গুজরাটের সিংহাসনে দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত করিলেন।

ইহার পর সহসা এক দিন কালকেতু নীলাম্বর হইয়া ও ফুল্লরা ছায়া হইয়া স্বর্গে গমন করিল।

ভাড়ু দত্ত।

উপাখ্যান ভাগে একটি আবশ্যকীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়া গিয়াছি। আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যাই নাই, ভাড়ুদত্তকে স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করিব, এইজন্য পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে কিছু লিখি নাই। ভাড়ু শকুনি-শ্রেণীর ব্যক্তি, ধূর্ত্ততার জীবন্ত প্রতিকৃতি। এই চরিত্র বর্ণনায় কবিকঙ্কণ হইতে মাধবাচার্য্য বেশী ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, আমরা মাধবাচার্য্যের—কাব্যকে মূলতঃ অবলম্বন করিয়া ভাড়ু চরিত্র বর্ণনা করিব।

ভাড়ু দত্তের বাড়ী গুজরাটের নিকট, বাড়ীতে লক্ষ্মীর কৃপা আঁটে না পরিবারের তাবতেরই মধ্যে মধ্যে উপবাসী থাকিতে হয়। ভাড়ু দত্ত একদিন উপবাসে বঞ্চন করিয়া প্রাতে স্বীয় স্ত্রীর নিকট কিছু খাবার চাহিতেছে,—

"ভাড়ু দত্ত বলে শুন তপনদত্তের মা। ক্ষুধায় কামড়ে মোর পোড়ে সর্ব্ব গা॥" তপনদত্ত ভাড়ুর পুত্র। ভাড়ুর গুণবতী ভার্য্যা ক্ষুধার্ত্ত স্বামীর প্রতি হাসিয়া বলিল,—"যেন মতে কথা কহ লোকে বলে আউল। কালি গেল উপবাস আজি কোথা চাউল॥"

তখন ভাড়ু দুঃখিত চিত্তে "ভাঙ্গা কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বাঁধিয়া। হাওয়ালের মাঝে বোঝা নিলেক তুলিয়া॥" "ভাঙ্গা কড়ি" দিয়া কি হইবে, পাঠক সে প্রশ্ন এখন করিবেন না।

বাজারে উপনীত হইয়া ভাড়ু প্রথমে ধনাপশারীর নিকট গেল, কয়েক সের চাউল চাহিল এবং বলিল "তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া যাব তারে।" কিন্তু ধনা তাহাকে চিনিত, সে আগে কড়ি না পাইলে, চাউল দিবেনা। কিন্তু ভাড়ু দত্ত তাহাকে নানা রূপ উৎপীড়নের ভয় দেখাইল, রাজার পাইকগণ তাহাকে মান্য করে, সে তাহাদিগের সাহায্যে ধনাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবে। ধনা ভয় পাইয়া বলিল—"পরিহাস করিলাম করি বাড়াবাড়ি। চাউল নিয়া যাও তুমি নাহি দিও কড়ি॥" আনাজ বিক্রেতাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া এক বোঝা শাক শবজি লাভ করিল—"কালি দুই তিন ভুমি ইনাম দিব তোরে।" এইরূপ নানা ধূর্ত্ততা করিয়া সে লবণ ও তৈল আদায় করিয়া লইল; কিন্তু গুবাক-বিক্রেতার সম্মুখে প্রথমে একটু জব্দ হইল, তাহাকেও টাকা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দেওয়ার কথা বলাতে সে বলিল "তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া মজুত আন গিয়া কড়ি। মজুর পাঠাইয়া গুয়া নিও তবে বাড়ী॥" তখন ভাড়ু দত্ত রাজদরবারে তাহার প্রতিপত্তির কথা বলিতে লাগিল;—স্বীয় গৌরবের নানা খ্যাতি করিয়া বলিল—রাজা তাহাকে গাড়ু, কম্বল ও পাটের পাছড়া উপঢৌকন দিয়াছেন; বলা নিষ্প্রয়োজন এ সকলই মিথ্যা। গুবাক-বিক্রেতাকে ভয় দেখাইয়া বলিল,—"প্রাতঃকালে প্যাদা পাঠাইব ঘরে ঘরে। পতাকা তুলিয়া দিব গাছের উপরে॥" এইভাবে গুবাক, চিরা, মিঠা, সন্দেশ প্রভৃতি নানা দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইল। কিন্তু ঘোষের মা দধি বিক্রয় করিতেছিল, তাহার দধি ধরিয়া টানাটানি করাতে বৃদ্ধা তাহাকে কটুমুখে গালি দিতে লাগিল, ভাড়ু নানা উপায় জানে, সে তাহার কানে কানে বলিল,—"চোরা গরু লয়ে বুড়ি তোমার বসতি। বাদি হইয়াছে যত গ্রামের রায়তি॥" ভয়ে ঘোষের মার মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু মৎস্য-বিক্রেতার কঠিন হস্ত হইতে মৎস্য আদায় করিতে গিয়া ভাড়ু প্রকৃতই জব্দ হইল; সে

কোনরূপেই মৎস্য দিবে না। ভাড়ু যত বলিল, মৎস্য বিক্রেতা ভ্রুকুটি-কুটিল মুখে সব অগ্রাহ্য করিল, শেষে ভাড়ু টানাটানি আরম্ভ করাতে দুইজনে মল্লযুদ্ধ লাগিল, এই যুদ্ধে "কচ্ছ হতে ভাড়ুদত্তের পড়ে কাণা কড়ি॥" "কাণা কড়ি পড়ে ভাড়ু বহু লজ্জা পায়। মৎস্য ছাড়িয়া তবে উঠিয়া পলায়॥"

এই গেল বাজারের পালা; তারপর ভাড়ু কালকেতুরাজাকে প্রতারণা করিতে গিয়াছে,—

"ভেট লয়ে কাঁচ কলা, পশ্চাতে ভাড়ুর শালা, আগে ভাড়ুদত্তের প্রয়ান। ফোঁটা কাটা মহাদম্ভ, ছেঁড়া জোড় কোঁচা লম্ব, শ্রবণে কলম লম্বমান॥ প্রণাম করিয়া বীরে, ভাড়ু নিবেদন করে, সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়া খুড়া। ছেঁড়া কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি, ঘন ঘন দেয় বাহুনাড়া॥ আইনু বড় প্রীত আশে, বসিতে তোমার দেশে, আগেতে ডাকিবে ভাড়ুদত্তে॥ যতেক কায়স্থে দেখ, ভাড়ুর পশ্চাতে লেখ, কুলশীল বিচার মহত্ত্বে। কহি আপনার তত্ত্ব, আমলইঁড়ার দত্ত, তিনকুলে আমার মিলন। ঘোষ ও বসুর কন্যা, দুই নারী মোর ধন্যা, মিত্রে কৈল কন্যার গ্রহণ। গঙ্গার দুকূল পাশে, যতেক কায়স্থ বৈসে, মোর ঘরে করয়ে ভোজন। ঝারি বস্ত্র অলঙ্কার, দিয়ে করে ব্যবহার, কেহ নাহি করয়ে রন্ধন॥" ইত্যাদি ক, ক, চ। *

সে কালকেতুর পাত্রগিরিটা চায়। কালকেতু তাহাতে সম্মত হইল না; তখন ভাড়ু বকিতে আরম্ভ করিল,—কালকেতুর লোকজন যাইয়া ভাড়ুকে খুব প্রহার করিয়া দিল; তখন ভাড়ু—"পুনর্ব্বার হাটে মাংস বেচিবে ফুলরা।" প্রভৃতি গালি দিতে দিতে বাড়ী গেল,—

"পথে পড়া ফুল পাইয়া মাথে তুলি দিল। হাসিতে হাসিতে ভাড়ু বাড়ীতে চলিল। বাড়ীর নিকটে গিয়া ডাকয়ে রমণী। সত্বরে আনিয়া দেও এক ঘটি পাণি॥ প্রভুর বচন শুনি রমণী অস্থির। ভাঙ্গা ঘটিতে পুরি বাহির করে নীর॥ ভাড়ুরে দেখিয়া তার রমণী চিন্তর। দেওয়ানেরে গেলা প্রভু ধূলি কেন গায়॥ ভাড়ু এ বোলয় প্রিয়া শুনহ কর্কশা॥ মহাবীর সনে আজি খেলিয়াছি পাশা॥ ক্রমে ক্রমে মহাবীর ছয় পাটী হারি। রসে অবস হইয়া করে হুড়াহুড়ি॥ ধূলা ঝাড়ি বহুমতে পাইয়াছি রস। বীরের গায়েতে দিছি তার দুই দশ॥ কি বলিতে পারি প্রিয়া বীরের মাহাত্ম্য। যাহার পীরিতে বস হৈল ভাড়ুদত্ত।

কিন্তু রমণীকে এই সুখকর প্রবোধ দিলেও ধূর্ত্তের হৃদয় ক্রোধে জ্বলিতেছিল; ইহার পরে সে কলিঙ্গাধিপকে জানাইল যে তাঁহার রাজ্যের নিকট একজন নীচজাতি ব্যাধ রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছে এবং কৌশলে

* ভাড়ুদত্তের প্রসঙ্গে এই স্থলটি মাত্র কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে উদ্ধৃত হইল; অন্যান্য অংশ মাধবাচার্য্যের চণ্ডী হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

কলিঙ্গরাজকে উত্তেজিত করিয়া কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইল। এই যুদ্ধের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

যখন দুই রাজার পুনঃ সন্ধি হইল, তখন উভয়ের অনুমতি ক্রমে নাপিত ভাড়ুর মস্তক অশ্বমূত্রে ভিজাইয়া লইল ও মধ্যে মধ্যে ক্ষুর বাম পদের তলাতে ঘষিয়া মাথাটি বেশ মুণ্ডন করিয়া দিল। মস্তক মুণ্ডনের পর নাগরিকগণ প্রত্যেকে এক এক ঘড়া ঘোল তাহার মাথায় ঢালিয়া দিয়া গেল; ছেলেরা গীত বাঁধিয়া তাহার পাছে পাছে গান গাহিয়া চলিল; "কাল হাঁড়ি ফেল্যা মারে কুলের বহুড়ী"—এতদবস্থায় ভাড়ুকে গঙ্গা পার করিয়া দেওয়া হইল; কিন্তু শতবার ধৌত হইলে ও অঙ্গারের মলিনত্ব ঘোচে না; গঙ্গাপার হইয়া "লোকের সাক্ষাতে ভাড়ু কহে মিথ্যা কথা। গঙ্গা সাগরেতে গিয়া মুড়ায়েছি মাথা॥ এ বলিয়া মাগি খায় নগরে নগরে॥"

শ্রীমন্তের গল্প।

রত্নমালা অপ্সরী তালভঙ্গ দোষে লক্ষপতিবণিকের ঘরে খুল্লনা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

একদা উজানিনগরের যুবক ধনপতি সদাগর শ্যামল প্রান্তরে ক্রীড়াচ্ছলে পায়রা উড়াইতেছিলেন; এই পায়রা খুল্লনার বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইল; ধনপতি পায়রা চাহিতে গেলেন, খুল্লনা জানিতে পারিল ধনপতি তাহার খুড়তুত ভগ্নীর স্বামী, সুতরাং সম্বন্ধটিতে আমোদ করিবার সুযোগ ছিল; ঈষদুদ্ভিন্ন-যৌবনা খুল্লনা এক পসলা হাসি বৃষ্টি করিয়া কৌতুক করিতে করিতে চলিয়া গেলেন, ধনপতির মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি দাঁড়াইয়া খুল্লনাকে বিবাহ করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ধনপতি কুলে ও ধনে শ্রেষ্ঠ, কাব্য নাটক পড়িয়া পণ্ডিত; সুতরাং এ বিবাহে সম্মতি পাইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রথম স্ত্রী লহনাসুন্দরীকে প্রবোধ না দিলে হয় না—সে ত একথা শ্রবণমাত্র অভিমানে মাতিয়া বসিয়া আছে—কথা বলে না;—

"লহনা লহনা বলি ডাকে সদাগর। অভিমানযুক্ত রামা না দেয় উত্তর॥ ইঙ্গিতে বুঝিল লহনার অভিমান। কপট সম্ভাষে সাধু লহনা বুঝান॥ রূপনাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে। চিন্তামণি নাশ কৈলে কাঁচের বদলে॥ স্নান করি আসি শিরে না দাও চিরুণী। ভোজ না পায় কেশ শিরে বিন্দে পাণি॥ অবিরত ঐ চিন্তা অন্য নাহি গণি।

রন্ধনের শালে নাশ হইল পদ্মিনী॥ মাসী, পিসী, মাতুলানী, ভগিনী, সতিনী। কেহ নাহি থাকে ঘরে হইয়া রান্ধুনী॥ যুক্তি যদি দেহ মনে কহিবা প্রকাশি। রন্ধনের তরে তব করি দিব দাসী॥ বরিষা বাদলেতে উপনে পায় দুখ। কর্পূর তাম্বুল বিনে রসহীন মুখ॥"

এই কথা গুলির মোহিনীতে এবং একখানা পাটশাড়ী ও চুড়ি গড়িবার ৫ তোলা সোণা পাইয়া লহনা আর কোন আপত্তি করিল না।

লহনা মোটের উপর মন্দ মেয়ে নহে, তবে বুদ্ধিটি বড় স্থূল; তাহার প্রকৃতি সরল ও সুন্দর কিন্তু কোন দুষ্ট চালাক লোকের হাতে পড়িলে নির্ব্বোধ লহনা খেলার পুতুলের ন্যায় আয়ত্ত হইয়া যায়, প্ররোচনায় সে নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম ও করিতে পারে।

বিবাহের পর ধনপতিকে রাজাজ্ঞায় প্রবাসে (গৌড়ে) যাইতে হইল, তখন দ্বাদশবর্ষীয়া খুল্লনাকে সাধু লহনার হাতে হাতে সঁপিয়া গেল। লহনা স্বামীর কথা মাথায় লইয়া খুল্লনাকে ভালবাসিতে লাগিল; দুদিনের মধ্যে খুল্লনা সেই ভালবাসার আতিশয্যে অস্থির হইয়া উঠিল;—

"সাধু গেল গৌড় পথে, লহনার হাতে হাতে, খুল্লনা করিয়া সমর্পণ। পালয়ে স্বামীর সত্য, জননী সমান নিত্য খুল্লনারে করয়ে পালন॥ যবে ছয় দণ্ড বেলা, কুঙ্কুমে তুলিয়া মলা, নারায়ণ তৈল দিয়া গায়। যাহারা প্রাণের সখী, শিরে দেয় আমলকী, তোলা জলে স্নান করায়॥ আপনি লহনা নারী, শিরেতে ঢালয়ে বারি, পরিবার যোগায় বসন। করেতে চিরুণী ধরি, কুন্তল মার্জ্জন করি, অঙ্গে দেয় ভূষণ চন্দন॥ যবে বেলা দণ্ড দশ, হেম থালে ছয় রস, সহিত যোগায় অন্ন পান। ভুঞ্জয়ে খুল্লনা নারী, কাছে থোয় হেম ঝাড়ি, লহনার খুল্লনা পরাণ॥ ওদন পায়স পিঠা, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন মিঠা, অবশেষে ক্ষীর খণ্ড কলা। পরশে লহনা নারী, গায় দেখি ঘর্ম্ম বারি, পাখা ধরি ব্যজয়ে দুর্ব্বলা॥ অন্ন খায় লজ্জা করি, যদি বা খুল্লনা নারী, লহনা মাথার দেয় কিরা। দুসতীনে প্রেমবন্ধ, দেখিয়া লাগয়ে ধন্ধ, সুবর্ণে জড়িত যেন হীরা॥ লহনার মত সরল চরিত্রে গরল প্রবেশ করিতে বেশী সময় লাগে না। দুর্ব্বলা দাসী নির্জ্জনে বসিয়া খানিক এই চিন্তা করিল "যেই ঘরে দুসতীনে না হয় কোন্দল। সে ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল॥" একের করিয়া নিন্দা যাব অন্য স্থান। সে ধনী বাসিবে মোর প্রাণের সমান॥" এর পরে সে লহনাকে যাইয়া এই ভাবে উত্তেজিত করিল—"শুন শুন মোর বোল শুনগো লহনা। এবে সে করিলে নাশ আপনি আপনা॥ বসুমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ। দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কাল সাপ॥ সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে। অবশেষে এই তোমায় বধিবে পরাণে॥ কলাপী কলাপজিনি খুল্লনার কেশ। অর্দ্ধ পাকা

কেশে তুমি কি করিবে বেশ। খুল্লনার মুখশশী করে চল চল। মাহিতার মলিন তোমার গণ্ডস্থল ॥*** ক্ষীণমধ্যা খুল্লনা যেমন মধুকরী। যৌবন বিহীনা তুমি হৈলা ঘটোদরী ॥ আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কতদিন। খুল্লনার রূপ দেখি হবেন অধীন ॥ অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে। মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে ॥ নেউটিয়া আইসে ধন সুত বন্ধুজন। না নেউটে পুন দেখ জীবন যৌবন ॥"

এই উপদেশ লহনার উপর উদ্দিষ্ট কাজ করিল; সে ক্ষেপিয়া গেল;—খুল্লনাকে স্বামীর চক্ষের বিষ করিতে নানা তন্ত্র মন্ত্র ও ঔষধ খুঁজিতে লাগিল। অবশেষে এক জালপত্র লইয়া খুল্লনার নিকট উপস্থিত হইল, পত্রের মর্ম্ম এই—তুমি অদ্য হইতে ছাগল রাখিবে, ঢেঁকি শালে শুইয়া থাকিবে, একবেলা আধপেটা ভাত খাইবে ও খুঁয়া বস্ত্র পরিবে।

এই স্থল হইতে খুল্লনার চরিত্র পরিষ্কাররূপে বিকাশ পাইয়াছে। খুল্লনার যেরূপ পতিভক্তি, সেইরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি; তাহার ও একবারে রাগ না আছে এমন নহে, কিন্তু লহনা যেরূপ রাগে পাগল হইয়া যায়—নিতান্ত একটা দুষ্কর্ম্মও করিয়া ফেলিতে পারে,—খুল্লনার চরিত্রে সেরূপ নির্ব্বোধ রাগ দৃষ্ট হয় না। জালপত্র লইয়া লহনা উপস্থিত হইলে, সে তাহা একবারে অগ্রাহ্য করিল—ইহা তাহার স্বামীর লেখা নহে; আর সে এমন কি পাপ করিয়াছে, যাহাতে তাহার উপর এই কঠিন দণ্ডাজ্ঞা হইতে পারে। লহনা বলিল—তুমি এসেছ পরেই তাঁহাকে দেশ ছাড়িয়া গৌড়ে যাইতে হইয়াছে, বোধ হয় এইজন্য তিনি রাগিয়াছেন: আর তিনি নিজ হাতে চিঠি না লিখিয়া হয়ত মুহুরি দিয়া লিখাইয়াছেন। খুল্লনা বলিল—ও কথা কিছু নহে, এ পত্র জাল। তখন লহনা রাগিয়া তাহাকে মারিতে গেল, খুল্লনা রাগী ছিল না, তবে সে নিতান্ত আত্ম সমর্থন না জানিত, এমত নহে—"খুল্লনার অঙ্গুলী বিধির বিপাকে। দৈবাৎ লাগিল গিয়া লহনার বুকে। লহনা হইল তাহে যেন অগ্নি কণা। খুল্লনার দুই গালে মারে দুই ঠোনা ॥" এইত ঘটনা; তবে খুল্লনার "অঙ্গুলী" যে নিতান্তই "দৈবাৎ" লহনার বুকে লাগিয়াছিল, তাহা নাও হইতে পারে। শেষে শুদ্ধ শারিরীক বলের প্রভাবে লহনারই জয় হইল, খুল্লনা সুন্দরী ভূলুণ্ঠিত হইল—"কাতরে খুল্লনা দেয় রাজার দোহাই।"

এই অবস্থায় খুল্লনাকে বাধ্য হইয়া ছাগল চড়াইতে বনে বনে যাইতে হইল, ঢেঁকিশালে শুইতে হইল ও খুঁয়ার কাপড় পরিতে হইল। ছাগল রাখার সময় স্ফুরক্তযৌবনা খুল্লনাসুন্দরী গৃহের আড়াল হইতে বনের

শ্যামল প্রদেশে আসিলেন; যেখানে নানা বনফুল, সেখানে তাহাদেরই মত কামিনীর রূপ বিকাশ পাইল। তাহার ছেলি রক্ষনের কষ্ট পড়িতে আমাদের হতভাগিনী ফুল্লরার কথা মনে পড়িয়াছে; ইহার বারমাসীতে ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়। এই দুঃখের সময় পিতা মাতা খুল্লনার কোন বিশেষ খবর লয়েন নাই—"শুনিয়া খুল্লনা দুঃখে ছাড়য়ে নিশ্বাস। অবনী প্রবেশি যদি পাই অবকাশ॥" সুন্দরীর এই দুঃখের মূর্ত্তিখানা দেখুন—

"ধীরে ধীরে যায় রামা লইয়া ছাগল। ছাট হাতে পাত মাথে যেমন পাগল॥ নানা শস্য দেখিয়া চৌদিকে ধায় ছেলি। দেখিয়া কৃষান সব দেয় গালাগালি॥ শিরীষ কুসুম তনু অতি অনুপাম। বসন ভিজিয়া তার গায় পড়ে ঘাম॥"

কিন্তু খুল্লনা এখন বিদ্যাপতি-বর্ণিত বয়ঃসন্ধির মনোহর অবস্থায়; নব যৌবনাগমে খুল্লনা এই দুঃখ ভুলিয়া বসন্তকালে বিরহে মাতিয়া গেল; বহিঃ প্রকৃতির উন্মাদকর সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের আবেগ মিশিয়া গেল।

"মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণ পবন। অশোক কিংশুকে রামা করে আলিঙ্গন॥ কেতকী ধাতকী ফোটে চম্পক কাঞ্চন। কুসুম পরাগে শ্লথ হৈল অলিগণ॥ লতায় বেষ্টিত রামা দেখিয়া অশোক। খুল্লনা বলেন সই তুমি বড় লোক। আমা হৈতে তোমার জনম দেখি ভাল। তোমার সোহাগে সখি বন কৈলা আলো॥" খুল্লনা ভ্রমরের নিকট করযোড়ে বলিল 'চিত্ত চমকিত, যদি গাও গীত, খাও ভ্রমরীর মাথা।" কিন্তু ভ্রমরের গুণ গুণ গুঞ্জরণ থামিল না, তখন খুল্লনা রাগিয়া ভ্রমরকে গালি দিতেছে "তুই মাতোয়াল, মোরে হৈলি কাল, না শুন বিনয়বাণী। ধুতুরার ফুলে, কিবা মধু পীলে, তাহা মনে নাহি গণি।" কোকিলের কুহুস্বরে চমকিত হইয়া খুল্লনা কাঁদিয়া বেড়াইল; প্রকৃতির তরু পল্লব, পাখী, অদ্য নিরাশ্রয়া খুল্লনা সকলেরই অধীনা, কোকিলকে বলিতেছে "সদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাও তথা, এই বনে ডাক অকারণ।"

বঙ্গীয় গ্রাম্যসৌন্দর্য্য এইসব স্থলে উজ্জ্বল ও উপভোগ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পাঠক এইসব বর্ণনা পড়িতে বসন্ত ঋতুর নূতন হিল্লোল ও বন ফুল মত্ত হাওয়ার স্পর্শে সুখী হইবেন, খুল্লনাকে বড় ভাল ও সুন্দর বোধ হইবে।

পথশ্রান্ত খুল্লনা এইসব শোভা দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িল। চণ্ডীদেবী এইখানে খুল্লনার মাতৃরূপে দেখা দিয়া স্বপ্নে বলিলেন—

"কত দুঃখ আছে ঝি তোমার কপালে। সর্ব্বশী ছাগল তোর খাইল শৃগালে। তোর

দুঃখ দেখিয়া পাঁজরে বিঁধে ঘুন। আজিলো লহনা তোরে করিবেক খুন।" খুল্লনা জাগিয়া দেখিল সত্য সত্যই "সর্ব্বশী" ছাগলটি নাই,—তখন লহনার শাস্তির ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বন প্রদেশ ঘুরিয়া বেড়াইল। এই সময় পঞ্চ কন্যা তাহাকে চণ্ডী পূজা শিখাইয়া গেল, চণ্ডী খুল্লনাকে দেখা দিলেন; অশ্রুনেত্রে চিরদুঃখিনী খুল্লনা চণ্ডীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"জন্মে জন্মে ছেলি তুমি হও নিরঞ্জন। তোমা হতে দেখিলাম চণ্ডীর চরণ।" চণ্ডী তাহাকে স্বামী পুত্র লাভের বর দিয়া চলিয়া গেলেন।

এতদিনে দুঃখের রাত্রি প্রভাত হইল, সে রাত্র খুল্লনা বাড়ী যায় নাই; লহনার মনে অনুতাপ হইল, "স্বামী আমাকে হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন, খুল্লনাকে বনের কোন পশু খাইয়া ফেলিল নাকি?" প্রভাতে যখন খুল্লনা বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন লহনা তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় আদর ও যত্ন করিতে লাগিল।

ধনপতির চরিত্র বল বেশী কিছু ছিল না; সে গৌড়ে যাইয়া অসংযত সুখে মত্ত হইয়া বাড়ী ভুলিয়া ছিল; সেই রাত্রিতে খুল্লনাকে স্বপ্নে দেখিয়া বাড়ী যাওয়ার কথা মনে হইল। ধনপতি বাড়ী আসিলেন, তাঁহার আগমন সংবাদে লহনা স্বীয় শিথিল সৌন্দর্য্যকে যথা সাধ্য টানিয়া বুনিয়া নূতন বেশভূষায় সজ্জিত করিতে বসিল; "গুয়াটুটি" খোঁপা বড় সুন্দর করিয়া বাঁধিল কিন্তু "মাছিতা বদনে দেখি দর্পনে চাপড়।" দর্পন ভাঙ্গিলে সুন্দরীগণের মুখের মাছিতা ঘোচে কি? লহনা "মেঘ ডুম্বুর" কাপড় পরিয়া পরী সাজিয়া স্বামীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে গেল। এদিকে সে দিন অনেক লোক সাধুর ঘরে নিমন্ত্রিত; দুর্ব্বলা দাসী বিস্তর পয়সা চুরি করিয়াও বাজার হইতে অনেক আয়োজন পত্র সংগ্রহ করিয়াছে; সাধু খুল্লনাকে রাঁধিতে বলিলেন; লহনা তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল,—খুল্লনা কোন কাজের মেয়ে নহে, ওকে পাক করিতে দিলে সব নষ্ট করিয়া ফেলিবে, খুল্লনা কেবল পাশা খেলিতে জানে "নাহি রাঁধে, নাহি বাড়ে নাহি দেয় ভুক। পরের রাঁধন খেয়ে চাঁদপানা মুখ।" কিন্তু এই আপত্তিতে কোন ফল হইল না, খুল্লনাই রাঁধিতে গেল; দেবীর কৃপায় পাক বড় উত্তম হইল, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ধন্য ধন্য বলিল কিন্তু 'বাসি পান্ত ভাত ছিল সরা দুই তিন। তাহা খাইয়া লহনা কাটাইল দিন।" সকলটিকে খাওয়াইয়া দেবী-

রূপিনী লক্ষীবউ খুল্লনা লহনার নিকটে গেল,—"সম্ভ্রমে খুল্লনা আসি ধরিল চরণে। ঘুচিল কোন্দল দোহে বসিল ভোজনে।" খুল্লনা এইরূপ ক্ষমাশীলা ছিল।

তারপর খুল্লনা সাধুর শয্যা গৃহে যাইবে; লহনা তাহাকে নানা যুক্তি বলিয়া নিবারণ করিল; কিন্তু খুল্লনা সেইসব যুক্তিপ্রবর্ত্তক অভিসন্ধি বেশ বুঝিতে পারিল ও গল্পচ্ছলে যুক্তিগুলির অসারতা দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে পতিগৃহে গেল।

শয্যাগৃহে সুন্দর কৌতুকের অভিনয় হইয়াছিল, খুল্লনা শয্যার নীচে পলাইয়া ছিল তখন ধনপতির মুখে অনাহূত অনেক কবিত্বের কথা নিঃসৃত হইয়াছিল,—

'কহ খট্টা কোথা মোর খুল্লনা সুন্দরী। কহনা প্রদীপ কোথা মোর সহচরী॥ সত্য করি কহ কথা মধুকরবধূ। খুল্লনার কবরীতে পান কৈলা মধু॥ চিত্রের পুত্তলী যত আছে চারিভিতে। সবে জিজ্ঞাসয়ে সদাগর এক চিত্তে॥ এতদিন একলা আছিনু পরবাসে। স্বপ্নেতে খুল্লনা নারী বৈসে মোর পাশে॥ প্রবাস ছাড়িয়া আমি আসি নিজঘর। কি দিয়া সুন্দরী মোরে করিলা পাগল॥"

ক্রীড়াময়ী খুল্লনা ধরা দিল, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লহনা যত কষ্ট দিয়াছে, তাহা বলিতে লাগিল; শুনিয়া সাধু রাগে দুঃখে জর্জ্জরিত হইল, কিন্তু সে লহনার নিকট নিজে অপরাধী—খুল্লনাকে পাইয়া লহনার প্রতি তাহার ভালবাসার হ্রাস হইয়াছিল, আর এদিগে রাত্রি-শেষে যখন সাধু খুল্লনার ঘর হইতে বাহির হইতেছিল তখন ঈর্ষা ও ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি লহনা দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। "বা'র হতে লহনার চক্ষে চক্ষে ভেট। লজ্জায় লজ্জিত সাধু মাথা কৈল হেট॥" কি অপরাধহেতু রাগ করার পরিবর্ত্তে সাধু লজ্জিত হইল, পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন।

ইহার পরে পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ধনপতি নানা স্থান হইতে স্বজাতিবর্গ নিমন্ত্রন করিয়া আনিল। এই বণিক সমাজে মালা চন্দন দেওয়া লইয়া ঘোর কলহ বাঁধিয়া গেল, সে স্থলটি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি; এই কলহের পরিণাম এই দাঁড়াইল, সভায় প্রশ্ন হইল, "ধনপতি খুল্লনাকে কিরূপে গৃহে রাখিয়াছেন, সে বনে বনে ছাগল চড়াইত।" "শুকজলে মৎস আর নারীর যৌবন। বনান্তরে পায় যদি রজত কাঞ্চন॥ অযত্নে পাইলে তাহা ছাড়ে কোনজন॥ দেখিলে ভুলয়ে ইথে মুনি জনার মন॥" খুল্লনা যদি সতী হয়, তবে পরীক্ষা হউক, নতুবা আমরা আপনার বাড়ী খাইব না। ইহা শুনিয়া খুল্লনার পিতা

লক্ষপতি কাতর ভাবে রাজার দোহাই দিলেন।" তাহা শুনিয়া "বলে বেণে শঙ্খদত্ত, রাজবলে হয়ে মত্ত, জাতিরে দেখাও রাজবল। জাতি যদি অতিরোষে, গরুড়ের পাখা খসে, ইহার উচিত পাবে ফল॥" খুল্লনা যদি পরীক্ষা না দেয়, তবে ধনপতিকে এক লক্ষ টাকা দিতে হইবে, তবেই ভোজন হইতে পারে।

জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের যে অবস্থায় বুদ্ধি টলিয়াছিল, অদ্য উপায়হীন ধনপতির সেই অবস্থা; দুর্ব্বল বণিক গৃহে যাইয়া লহনাকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। "তুই কেন খুল্লনাকে ছেলি রাখিতে বনে পাঠাইলি।" এবং খুল্লনাকে যাইয়া বলিল—"আমি লক্ষ টাকা দিব, তোমার পরীক্ষা দেওয়ার কাজ নাই।" কিন্তু খুল্লনা সেরূপ মেয়ে নহে, সে বলিল এই লক্ষ টাকা তুমি অদ্য দিবে, এর পরে আর এক নিমন্ত্রণে আমাকে উপলক্ষ করিয়া দ্বিগুণ চাহিবে, তুমি কত দিতে পারিবে। আর এই কলঙ্ক আমি সহ্য করিতে পারিব না—"পরীক্ষা লইতে নাথ যদি কর আন। গরল ভখিয়া আমি ত্যজিব পরাণ।"

এইরূপে খুল্লনা সতী নিজ চরিত্রের দৃঢ়তা দেখাইয়া প্রফুল্ল মুখে সভায় পরীক্ষা দিতে দাঁড়াইলেন; তাঁহাকে জলে ডুবাইতে চেষ্টা হইল,—সর্প দ্বারা দংশন করা হইল,—প্রজ্জ্বলিত লৌহদণ্ডে তাঁহাকে দগ্ধ করিতে চেষ্টা করা হইল, অবশেষে যতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া খুল্লনাকে তন্মধ্যে রাখিয়া আগুন দেওয়া হইল; এইবার লক্ষপতি কাঁদিয়া উঠিল এবং ধনপতি শোকে বিহ্বল হইয়া আগুনে ঝাঁপ দিতে গেল।

কিন্তু শুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় এই যতুগৃহ হইতে খুল্লনাসতী আরও উজ্জ্বল হইয়া বাহির হইলেন; এইবার শত্রুগণ পরাভব মানিয়া খুল্লনাকে প্রণাম করিল।

এই ঘটনার কিছু পরে রাজভাণ্ডারে চন্দনাদি দ্রব্যের অভাব হওয়াতে রাজাজ্ঞায় ধনপতিকে সিংহল যাইতে হইল। ধনপতি "সাতডিঙ্গা" বোঝাই করিয়া দীর্ঘ প্রবাসের জন্য প্রস্তুত হইল। যাত্রার যে সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা লগ্নাচার্য্য অশুভ বলিয়া নিন্দা করাতে,—" এমন শুনিয়া সাধু মুখ করে বাঁকা। নফরে হুকুম দিয়া মারে তারে ধাকা॥" খুল্লনা পতির শুভ কামনা করিয়া চণ্ডীপূজা করিতে বসিয়াছিল, সদাগর "ডাকিনী দেবতা" বলিয়া চণ্ডীর ঘটে লাথি মারিল।

সদাগর ইন্দ্রাণী পরগণা, ললিতপুর, ভাওসিঙের ঘাট, মেটেরি, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া চলিল; সে সময় সপ্তগ্রাম খুব প্রসিদ্ধ ছিল, বোধ হয় হুগলীর ততদূর উন্নতি হয় নাই। কবি সমুদ্রের যে মানচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা কল্পনা ও কিম্বদন্তীর রেখায় অঙ্কিত,কিন্তু তন্মধ্যে দুএকটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব দুর্লভ নহে,—"ফিরিঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণধারে। রাত্রিদিন বহে যায় হার্ম্মাদের ডরে॥" এই বাক্য দ্বারা বোধ হয়, দক্ষিণ পূর্ব্ব উপকূলের পর্ত্তুগিজ দস্যুদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে।

চণ্ডীর ঘটে সাধু লাথি দিয়াছিল, অকূল সমুদ্রে পাইয়া চণ্ডী তাহার শোধ তুলিলেন; তুফানে ৭ ডিঙ্গার মধ্যে ৬ ডিঙ্গা মারা গেল; একমাত্র "মধুকর ডিঙ্গা" লইয়া সাধু সিংহলে পৌছিলেন। কিন্তু পথে কালিদহে দেবী এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাইয়া সাধুর চক্ষু প্রতারিত করিলেন। সমুদ্রে ঘন ঘন বড় ঢেউ উঠিতেছে, অনন্ত জলরাশির বহুদূর ব্যাপিয়া এক সুন্দর পদ্মবন; তন্মধ্যে এক প্রফুল্ল পদ্মারূঢ়া পরমসুন্দরী রমণী মূর্ত্তি; তিনি এক হস্তে হাতী ধরিয়া গিলিতেছেন। এই উজ্জ্বল, আশ্চর্য্য ও অপ্রাকৃত দৃশ্য দেখিয়া সাধু স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল; হাতীশুদ্ধ সুন্দরীর ভরে প্রফুল্ল পদ্মের ক্ষীণাঙ্গ কাঁপিতেছিল; সদাগর বিস্ময়ে বলিল—"হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর।" যাহা হউক সদাগর ভিন্ন এদৃশ্য অপর কেহ দেখে নাই। সাধু সিংহলে গেলে সিংহলরাজ তাহাকে যথেষ্ট আদর ও প্রীতি দেখাইলেন। কিন্তু সদাগরেরমুখে কমলবনে কমলিনীর হস্তী গিলিবার কথা শুনিয়া কাহারও প্রত্যয় হইল না। রাজা ও সাধুর মধ্যে সর্ত্ত হইল, এই কমলবনের দৃশ্য দেখাইতে পারিলে রাজা তাহাকে অর্দ্ধরাজ্য দিবেন, নতুবা সাধু যাবজ্জীবনের জন্য বন্দী হইবে। সাধু রাজাকে লইয়া কালিদহে সেই দৃশ্য আর দেখিল না—এই উপলক্ষে সাধুর নৈরাশ্য সূচক সংগীত "এযে ছিল, কোথায় গেল, কমলদলবাসিনী। লোকালয় ভয়ে বুঝি লুকাল গুভ বদনী॥" আমরা অশ্রুপূর্ণচক্ষে যাত্রায় শুনিয়াছি; সাধুর যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম হইল। কারাগারে চণ্ডী স্বপ্ন দেখাইয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন—আমার পূজা করিলে তোর এ দুর্গতি মোচন হইবে। কিন্তু সাধু উত্তরে বলিল—"যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী, মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি।"

এদিকে বাড়ীতে খুল্লনার এক পুত্র জন্মিল; প্রসব সময়ে লহনা নিজে বাজারে যাইয়া ধাত্রী ডাকিয়া আনিল ও খুল্লনার শুশ্রূষা করিতে কোন

রূপ ক্রটী করিল না। মালাধর নামক গন্ধর্ব্ব শিবের শাপে খুল্লনার গর্ভে শ্রীমন্ত হইয়া জন্ম লইলেন। শিশুটি বড় সুন্দর—"সাত আট মাস যায়, দুই দন্ত পরকাশ।" বালক সেই অর্দ্ধোদ্গত দন্ত দেখাইয়া নানা ভাবে হাসে ও ক্রীড়া করে; পঞ্চবর্ষ বয়সে শ্রীমন্ত ভাগবত শুনিয়া সহচরগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-অনুষ্ঠিত খেলা গুলি খেলিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীমন্ত বড় চঞ্চল; সহচর শিশু গুলি খুল্লনার নিকট নালিশ করিতেছে,—"করিয়া ক্রন্দন, বলে শিশুগণ, শুনগো শ্রীমন্তের মা। তোমার তনয়, মারয় সবায়, দেখ দেখ মারণের ঘা॥ সব শিশু মিলি, এক সঙ্গে খেলি, শ্রীমন্ত বড় দুরন্ত। দারুণ চাপড়ে, সব দন্ত নড়ে, লাঘবের নাহি অন্ত॥ ভুবন কিরণা, দুই ভাই কাণা, চক্ষে দিল বালি গুঁড়া। যাদব মাধব, দুভাই নীরব, দাম্বেগে হৈল খোঁড়া॥ খুল্লনা ঝাড়িয়া ধুলা, দিল হাতে লাড়ু কলা, তৈল দিল সর্ব্বগায়।" ইত্যাদি। কবি জানিতেন ক্রীড়াশীল অশান্ত ছেলেগুলি শেষে ভাল হয়; শ্রীকৃষ্ণজীবনের অশান্তপনার মাধুর্য্য হইতে বঙ্গের গৃহে গৃহে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। ইহার পর শ্রীমন্ত পড়িতে গেল; পিঙ্গল-কৃত ছন্দের ব্যাখা, মাঘ, ভারবী, জৈমিনিভারত, প্রসন্নরাঘব প্রভৃতি পুস্তকে অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার হইল। একদিন তিনি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—পূতনা অজামিল ইহারা গর্হিত আচরণ করিয়াও মুক্তি পাইল কিন্তু শূর্পনখার মুক্তি হইল না কেন, তাহার কেবল নাক কাণই কাটা গেল; "নবধা ভক্তির মধ্যে আত্মদান বড়।" সেত সেই আত্মদান করিতে চাহিয়াছিল। গুরু উত্তর দিলেন, সব শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা; কিন্তু শ্রীমন্ত এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া গুরুর প্রতি ঈষৎ পরিহাস-পূর্ব্বক বাক্য প্রয়োগ করিলেন।

গুরু রাগে ক্ষেপিয়া গেলেন ও শ্রীমন্তকে নিতান্ত অসঙ্গত বাক্যে গালি দিতে লাগিলেন; শ্রীমন্ত গুরুর কুব্যবহারে উচিত উত্তর দিতে বিরত হন নাই, কিন্তু তাঁহার মাতাকে লইয়া রহস্য করাতে শ্রীমন্ত ক্রোধে দুঃখে বাড়ীতে যাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন; সেই দিন তরুণ-বয়স্ক শ্রীমন্ত পিতার খোঁজে সিংহল যাওয়ার দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রাজার অনুরোধ, মাতার কাতরতা কিছুতেই তাঁহাকে বিরত করিতে পারিল না। পুনরায় ৭ ডিঙ্গা শ্রীমন্তকে লইয়া সিংহলাভিমুখে যাত্রা করিল।

আবার সেই নীল জলরাশির মধ্যে সেই সেই কথা, কালীদহে আশ্চর্য্য

কমলবন, সিংহলাধিপের নিকট যাইয়া সেই কথা বলাতে সভাসদগণ ও রাজার অপ্রত্যয়; এবার এই সর্ত্ত হইল—যদি শ্রীমন্ত কমলবন দেখাইতে পারেন, তবে রাজা তাঁহাকে অর্দ্ধরাজ্য ও নিজ কন্যা দিবেন, নতুবা দক্ষিণ মশানে তাঁহার শির কর্ত্তিত হইবে। শ্রীমন্ত রাজাকে লইয়া যাইয়া কমলবন দেখাইতে পারিলেন না, সুতরাং দক্ষিণ মশানে তাঁহার শির কর্ত্তিত হওয়ার উদ্যোগ হইল। স্নান করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীমন্ত জীবনের শেষ পিতা ও মাতা প্রভৃতির উদ্দেশে তর্পণ করিতে লাগিলেন; চক্ষের জলের সঙ্গে—তর্পণের জল মিশিয়া গেল——

"তর্পণের জল লহ পিতা ধনপতি। মশানে রহিল প্রাণ বিভুমে পার্ব্বতী। তর্পণের জল লহ খুল্লনা জননী। এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানী॥ তর্পণের জল লহ খেলাবার ভাই। উজানী নগরে আর দেখা হবে নাই॥ তর্পণের জল লহ দুর্ব্বলা পুষিনী। তব হস্তে সমর্পণ করিনু জননী॥ তর্পণের জল লহ জননীর মা। উজানি নগরে আমি আর যাব না॥ তর্পণের জল লহ লহনা বিমাতা। তব আশীর্ব্বাদে মোর কাটা যাবে মাথা॥ সবাকারে সমর্পণ আপন জননী। এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানী॥

ইহার পরে নিবিষ্টমনে শ্রীমন্ত ভগবতীর চৌত্রিশঅক্ষরা স্তব করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে শ্রীমন্তের নৌকার বাঙ্গাল মাঝিগণের দুর্দ্দশা বর্ণনায় কবি বেশ পরিহাস শক্তির পরিচয় দিয়াছেন—"বাঙ্গাল কাঁদেরে হড়ুর বাপই বাপই। কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥ * * * * আর বাঙ্গাল বলে বাই হইনু অনাথ। হর্ব্বধন গেল মোর হুকুতার পাত॥ আর বাঙ্গাল বলে বাই কইতে বড় লাজ। অলদি গুড়ি বাসা গেল জীবনে কি কাজ। যুবতী যৌবনবতী ত্যাজিলাম রোষে। আর বাঙ্গাল বলে দুঃখ পাই গৃহ দোষে। ইষ্ট মিত্র কুটুম্বের লাগে মায়া মো। আর বাঙ্গাল বলে না দেখিনু মাও গো।" *

বাঙ্গালগণ লইয়া ঠাট্টা এই প্রথম নহে; চৈতন্যপ্রভু এবিষয়ে ওস্তাদ ছিলেন।

ইহার পরে চণ্ডীদেবী আসিয়া শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া বসিলেন; রাজার সৈন্যগণ চণ্ডীর ভূত প্রেতের হাতে মার খাইয়া পলাইল; রাজা সসৈন্যে পরাস্ত হইলেন। চণ্ডীর কৃপায় তিনি আশ্চর্য্য কমলবন দেখিলেন; পিতা পুত্রে মিলন হইল; শ্রীমন্ত রাজকন্যা সুশীলার পাণিগ্রহণ

---

* তর্পণের অংশ ও এই অংশ হস্তলিখিত পুস্তকে ঠিক এই ভাবে নাই। বটতলার পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।

করিলেন। যখন পিতা পুত্র বাড়ীতে ফিরিতে ইচ্ছুক, তখন সুশীলা স্বামীকে সিংহলে আর একটি বৎসর থাকিতে প্রার্থনা করিল; এই উপলক্ষে সিংহলের বার মাসের সুখ বর্ণিত হইয়াছে, রাজকন্যা স্বামীকে সিংহলী সুখের চিত্র দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন,—বৈশাখে "চন্দনাদি তৈল দিব সুশীতল বারি। সাঙলি গামছা দিব চুয়া কস্তুরি॥" জ্যৈষ্ঠে—"পুষ্পশয্যা করি দিব চাঁদোয়া টানায়ে। হাস্য পরিহাসে যাবে রজনী বহিয়ে॥—"আষাঢ়ে দেখহ ঘন নাচয়ে ময়ূর। নবজলধর দৃষ্টে ডাকয়ে দাদুর॥ শুন প্রাণনাথ তুমি শুন প্রাণনাথ। নিদাঘে শীতল বড় তরুণীর হাত॥" শ্রাবণে,—"বিদেশ ত্যাজিয়া লোক আইসে নারী পাশে। কেমনে কামিনী ছাড়ি যাবে পরবাসে॥ ভাদ্রে—"মশা নিবারিতে দিব পাটের মসারি। চামর বাতাস দিব হয়ে সহচরী॥ মধুঘরে প্রাণনাথ করাইব বাস। আর না করিহ প্রভু উজানীর আশ॥ ফাল্গুনে—"ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে, তথি দোলমঞ্চ আমি করিব রচনে॥ সখী মিলি গাব সবে বসন্তের গীত। আনন্দিত হয়ে গাব কৃষ্ণের চরিত॥ চৈত্রমাসে—"মালতী মল্লিকা চাঁপা বিছাইব খাটে। মধুপানে গোঙাইব সদা গীত নাটে॥" কিন্তু এই সব সুখের চিত্র মাতৃদর্শন-ব্যাকুল পুত্রকে বিরত করিতে পারিল না। পিতা পুত্র বাড়ী গেলেন, পথে ধনপতি জলমগ্ন ডিঙ্গাগুলি চণ্ডীর কৃপায় ফিরিয়া পাইলেন; তিনি চণ্ডী পূজা করিতে সম্মত হইলেন।

বাড়ী আসিয়া কমলবনে আশ্চর্য্য রমণীমূর্ত্তি দেখাইয়া শ্রীমন্ত দেশী-রাজাকে ও মুগ্ধ করিলেন ও তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন।

যথাকালে শাপভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন। পৃথিবীতে চণ্ডীর পূজা প্রচারিত হইল।

চণ্ডীকাব্যের পূর্ব্বভাগে শিব-বিবাহাদি বর্ণিত হইয়াছে; এই অংশ নানা কবি নূতন করিয়া গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন—ভারতচন্দ্রের অনুকরণটি তন্মধ্যে বিশেষ প্রশংসা-যোগ্য হইয়াছে; কিন্তু এক শ্রেণীর কবির কথার লালিত্যে কর্ণ মুগ্ধ হইয়া যায়, অপর একশ্রেণীর ভাবের উচ্ছ্বাসে হৃদয় তৃপ্ত হয়; শব্দের মাধুর্য্যে যে পাঠকের সদসদ্‌জ্ঞান আবৃত হইবে না, তাঁহার নিকট মুকুন্দরামের "কামভস্ম," "শিব বিবাহ" প্রভৃতি অংশ শান্ত রসের আকর বলিয়া বোধ হইবে; তিনি ভারতচন্দ্রের "প্রতি লোকে বলি কালে, বিস্ময়িয়া নানা ছাঁদে ভালে চন্দ্র জলের তরঙ্গে॥" প্রভৃতি উচ্ছ্বসিত কাব কলার পদ বিন্যাস ফেলিয়া সেই প্রসঙ্গে মুকুন্দরামের রতির "মোর পরমায়ু লয়ে, চিরকাল থাক জীয়ে, আমি মরি তোমার বদলে" প্রভৃতির

মধ্যে প্রকৃত শোকের তীব্রত্ব বেশী অনুভব করিবেন। যাঁহারা শুধু ভাষার মিষ্টত্ব তালাস করেন, তাঁহারা জয়দেব ও ভারতচন্দ্র পাঠ করুন, চণ্ডীদাস ও কবিকঙ্কণের কবিতা স্বাদ করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

শিবের গীত বঙ্গসাহিত্যে অতি প্রাচীন বিষয়; আমরা রতিদেব ও রঘুরামরায়কৃত "মৃগলব্ধের" কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কালে শিববিবাহাদি ব্যাপার স্বতন্ত্র কাব্যের বিষয় না হইয়া প্রাচীন অনেকগুলি কাব্যের অংশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল; পদ্মপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যগুলিতে "শিবের বিবাহ," "হরগৌরী কোন্দল" প্রভৃতি গ্রন্থারম্ভে বর্ণিত হইতে দেখা যায়। এই শিব প্রসঙ্গও কবিগণের উপর্য্যুপরি চেষ্টায় সুন্দররূপে বিকাশ পাইয়াছে। বৃদ্ধও তরুণীকে এক গৃহস্থালীর হলে জুড়িয়া দিলে যে সব দুর্গতি ঘটে, তাহা একটি নির্ম্মল হাস্যের সহিত দর্শন করিয়া রামেশ্বর প্রভৃতি কবিগণ .শিবপ্রসঙ্গ উপলক্ষে কয়েকখানা কৌতুককর চিত্র আঁকিয়াছেন।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ভট্টনারায়ণ বংশোদ্ভূত। ইঁহার প্রপিতামহের নাম নারায়ণ, পিতামহের নাম গোবর্দ্ধন, পিতার নাম লক্ষ্মণ ও মাতার নাম রূপবতী। বরদা পরগণার অন্তর্গত যদুপুর গ্রামে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব নিবাস ছিল; তিনি এই যদুপুরে বাস করার সময় "সত্যপীরের কথা" রচনা করেন; "পরে সত্যপীর বন্দি কহে কবি রাম। সাকীন বরদাবাটী যদু পুর গ্রাম।" শেষে কবি মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা যশমন্ত সিংহের সভাসদ হইয়া উক্ত পরগণাস্থিত অযোধ্যাবাড় গ্রামে বাস স্থাপন করেন; যশমন্ত সিংহের উৎসাহে তিনি "শিব সংকীর্ত্তন" কাব্য রচনা করেন; গ্রন্থের অনেক স্থলেই যশমন্তসিংহের যশঃ প্রচারিত হইয়াছে; সেই সব পদে জানা যায়, যশমন্তসিংহের পিতামহের নাম রঘুবীর, পিতার নাম রামসিংহ ও পুত্রের নাম অজিতসিংহ; যশমন্ত সিংহ ১৮৩৪ খৃঃঅব্দে ঢাকার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন, ইঁহার ২২ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮১২ খৃঃ অব্দে "শিব সংকীর্ত্তন" শেষ হয়। কবির দুই স্ত্রী ছিল, এক জনের নাম সুমিত্রা, ও অপরের নাম পরমেশ্বরী; এতদ্ব্যতীত তাঁহার দুই ভ্রাতা শম্ভুরাম ও সনাতন,—পার্ব্বতী, গৌরী ও

সরস্বতী এই তিন ভগ্নী ও দুর্গাচরণাদি ছয় ভাগিনেয়ের কথাও তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

অন্যান্য পৌরাণিক কাব্যের ন্যায় শিবসংকীর্ত্তনেও দেব দেবীর বন্দনা, সৃষ্টিপ্রকরণ, দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন ইহাতে রুক্মিণীব্রত, বাণরাজার উপাখ্যান, প্রভৃতি বিষয়ের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা আছে; বাগ্দিনীরূপে গৌরীর শিবকে প্রতারণার স্থলটি রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় কবির স্বকপোলকল্পিত মনে করেন; কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে ভগবতীর ডোমিনীরূপে শিবকে প্রতারণা করার বিষয় পাঠ করিয়াছি। পূর্ব্বকালে পৌরাণিক বিষয়গুলি লইয়া অক্ষরজ্ঞ অনেক ব্যক্তিই কবিতা রচনা করিতেন, উপাখ্যানভাগের কোন্ অংশগুলি কোন্ কবির দ্বারা প্রথম কল্পিত হয়, তাহা খুঁজিতে যাওয়া ও আঁধারে ঢিল ফেলা একইরূপ কাজ।

রামেশ্বরের রচনা অনুপ্রাসদোষ দুষ্ট, কিন্তু অনেক স্থলে নিবিড় অনুপ্রাস ভেদ করিয়া বেশ একটু স্বাভাবিক হাস্যরসের খেলা দৃষ্ট হয়। রামেশ্বর কোন গভীর ভাব উদ্রেক করিতে চেষ্টা করেন নাই, এজন্য তিনি কখনই খুব বড় কবি বলিয়া পরিচিত হইবেন না। কিন্তু "শিব সংকীর্ত্তনের" আদ্যন্ত কবির মার্জ্জিত মৃদুহাস্যের রশ্মিতে সুন্দর। কার্ত্তিক গণেশ লইয়া শিব আহার করিতে বসিয়াছেন—এই উপলক্ষে কবি রহস্যের কুটিল আলোতে একটি অন্নপূর্ণা গৃহিণীর সুন্দর মূর্ত্তি দেখাইয়া লইয়াছেন—

"তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী। দুটি সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চমুখ পতি। তিন জনে একুনে বদন হ'ল বার। গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার। তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়। এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়। শুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া নাকে। অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে। গুহ গণপতি ডাকে অন্ন আন মা। হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হয়ে খা। মূষিকী মায়ের বাক্যে মৌনী হয়ে রয়। শঙ্কর শিখায়ে দেন শিখিধ্বজ কয়। রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে। যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে! হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে। ঈষদুষ্ণ সুপ দিল বেসারীর পরে। লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝী। সুপ হল সাঙ্গ আন আর আছে কি? দড়বড় দেবী এনে দিলা ভাজাদশ। খেতে খেতে গিরীশ গৌরীর গান যশ। সিদ্ধিফল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা। মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা। * * * * দিতে নিতে গতায়তে নাহি অবসর। শ্রমে হলো সজল কোমল কলেবর। ইন্দু মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মবিন্দু সাজে। মৌক্তিকের শ্রেণী যেন বিদ্যুতের মাঝে। অন্নদানে

গৃহিণীর এ আনন্দের ছবি এখন শেলাই ও উচ্চশিক্ষার হুজুগের সময় ভাল বোধ হইবে কিনা জানি না। বৃদ্ধ স্বামীর লাঞ্ছনা শাঁখা পরার প্রসঙ্গে বেশ বর্ণিত হইয়াছে; দেবী দুর্গাছি শাঁখা চাহিয়াছিলেন; শিব তাহা দিতে অপারগ, নিজের বাড়ীর অবস্থা সম্বন্ধে দেবীকে অনেক কথা বলিয়া শিব কিছু শ্লেষ সহকারে বলিলেন—"বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে। অল্লাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥" এই কথা দ্বারা শিব দেবীকে ভয় দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দেবী তাহার শোধ তুলিলেন—, "দণ্ডবৎ হইয়া দেবের ছুটি পায়॥ কান্তমনে ক্রোধ করি কাত্যায়নী যায়। কোলে করি কাত্তিকেয়ে, হস্তে গজানন। চঞ্চল চরণে হৈল চণ্ডীর চলন॥ গোড়াইল গিরীশ গৌরীর পিছু পিছু। শিব ডাকে শশিমুখী শুনে নাই কিছু॥ নিদান দারুণ দিব্য দিলা দেবরায়। আর গেলে অম্বিকা আমার মাথা খাও॥ করে কর্ণ চাপিয়া চলিল চণ্ডবতী। ভাবিল ভাইএর কিম্বা ভবানীর প্রতি॥ ধাইয়া ধূর্জ্জটি গিয়া ধরে দুটি হাতে। আড় হইয়া পশুপতি পড়িলেন পথে। যাও যাও যত ভাব জানা গেল বলি। ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেলা চলি। চমৎকার চন্দ্রচূড় চারিদিকে চায়। নিবারিতে নারিয়া নারদপাশে ধায়॥ 'রামেশ্বর ভাবে ঋষি দেখ বসে কি। পাথারে ফেলিয়া গেলা পর্ব্বতের ঝি॥"

বহুদিন একত্রবাস নিবন্ধন হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকটা উদারভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। সত্যপীর নামক মিশ্রদেবতার পূজা সেই উদারতার ফল। হরিঠাকুর এই উপলক্ষে ফকিরী আলখাল্লা গায় পরিয়াছেন ও উর্দ্দু জবানে বক্তৃতা দিতেছেন ;— "বিশ্বনাথ বিশ্বাস বুঝায়ে বলে বাছা। দুনিয়ামে এসাতি আদমি রহে সাঁচা॥ জালা যাতনা কাহে তেরা মৃত্যুকাল কাহে। রাত দিন বৈসা তৈসা সুখ দুঃখ হোয়ে॥ জানা পেও যাত যাতনা জানা পেও যাত। কাপরাত লেও আও মেরা সাথ॥ জওত সত্যপীর মেরা জওত সত্যপীর। তেরা দুঃখ দূর করতও হাম ফকীর॥"

কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি।

মনসার গল্পেরও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল; বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণ দেব প্রভৃতি আদিলেখকগণের দলে একদল নূতন কবি ভর্ত্তি হইলেন। এপর্য্যন্ত আমরা মনসার ভাসানরচক ৩১ জন কবির নাম জানিয়াছি ও সেই সব নাম ৫৯ পৃষ্ঠার ফুটনোটে দিয়াছি। এই পরবর্ত্তী মনসার ভাসান-রচক-কবিদিগের মধ্যে কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দদাসের ক্ষুদ্র পুস্তকখানা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইঁহারা বোমেণ্ট ও ফ্লেচারের ন্যায় দুইজন

একত্র হইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন; পুস্তকখানা ২৬০০ শ্লোকে পূর্ণ, ও ইহার পদ সংখ্যা ৬৬; তন্মধ্যে ২৬টি পদ কেতকাদাসের ভণিতাযুক্ত অবশিষ্ট ৪০টি ক্ষেমানন্দদাসের রচিত। যদিও পুস্তকের সর্ব্বত্রই ছুই কবির ভণিতাযুক্ত পদ পাওয়া যায়, তথাপি মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে পুস্তকের প্রথমার্দ্ধের অর্থাৎ লখিন্দরের বিবাহপালা পর্য্যন্ত অধিকাংশ স্থল কেতকাদাসের রচনা ও শেষার্দ্ধের অধিকাংশ স্থল ক্ষেমানন্দ-বিরচিত। ক্ষেমানন্দ করুণরসে ও কেতকাদাস হাস্যরসে পটু। এই দুই কবির রচনার কতকাংশ ১০১-১০২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিত্ব দেখাইয়া পাঠকবর্গকে খুসী করা যায়, এরূপ অংশ মনসার ভাসানে বড় বিরল; কিন্তু গল্পের আগা গোড়া পড়িলে পাঠকের চক্ষু মধ্যে মধ্যে অশ্রুপূর্ণ হইতে পারে, ও বেহুলা সতীর সুন্দর রূপে চিত্ত মুগ্ধ হইয়া যাইতে পারে। আমরা যখন এই পুথি প্রথম পড়িয়াছিলাম, তখন মানবী বেহুলাকে দেবী বলিয়া বোধ হইয়াছিল; বেহুলার পতিব্রতার কথা পড়িতে পড়িতে ভাবিয়াছিলাম—বাঁধুলী, তিল ফুল ও চতুর্দ্দশীর চাঁদ দিয়া কবিগণ সচরাচর যে সব সুন্দরী সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাদের অনেকে বেহুলার বাঁদী হইবার যোগ্য নহে। শ্রাবণ মাসে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সর্ব্বত্র ভাসান গান উপলক্ষে নৌকা লইয়া ক্রীড়া হইত; সেই সব গানের মূল লক্ষ্য ছিল বেহুলা; সেই গীত নানা রাগ রাগিনীতে উজ্জ্বল হইয়া পল্লী বধূগণের হৃদয়ে হৃদয়ে বেহুলা সতীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিত; আমরা এখন রেবেকা ও কসেটির মায়া ফাঁসে ঘরের খাঁটি সোনার মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি।

পূর্ব্ববর্ত্তী মনসার উপাখ্যানগুলির সঙ্গে তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে, কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দের পুঁথিতে চাঁদ সদাগরের উন্নত চরিত্র কতকটা খর্ব্ব হইয়াছে, কিন্তু বেহুলার চরিত্র আরও বিকাশ পাইয়াছে।

কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ সম্ভবতঃ কায়স্থছিলেন, একস্থলে কেতকাদাসের ভণিতায় "কেতকার বাণী, রক্ষ ঠাকুরাণী, কায়স্থ যতেক আছে।" পাওয়া গিয়াছে, অপর একস্থলে "ব্রাহ্মণ চরণে, ক্ষেমানন্দ ভণে, দেবী যারে কৃপা কৈল।"—দৃষ্ট হয়, ইহা দ্বারা তাঁহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া অনুমান করা যায়।

অন্য একটি পদ দৃষ্টে বোধ হয়, ক্ষেমানন্দ দাসের রাজীব নামক পুত্র ছিল—"ক্ষেমানন্দ কহে কবি। রাজীবে রাখিবে দেবী।" বেহুলার জলপথে ভ্রমণ উপলক্ষে বর্দ্ধমান অঞ্চলের স্থান নির্দ্দেশ ঠিক ঠিক হইয়াছে, অন্য দেশের তদ্রূপ হয় নাই, সুতরাং কবিদ্বয়কে বর্দ্ধমানবাসী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

অপরাপর মনসার ভাসান-রচকদিগের রচনা ও অনেকস্থলে বেশ সুন্দর হইয়াছে; আমাদের উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে স্থানাভাব। মনসা গোয়ালিনী বেশে ধন্বন্তরীর নিকট বিষাক্ত দধি বিক্রয় করিতে গিয়াছেন; তাঁহার শিষ্যগণের সঙ্গে গোয়ালিনী-রূপিনী দেবীর কৌতুককর কলহটি বর্দ্ধমানদাস কবির হস্তে বেশ সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম;—

"কেমনে তোমার স্বামী, পাঠায় তোমায় একাকিনী, গোয়ালা রহিল তোমার ঘরে। দরিদ্রের মত নয়, ধন আছে জ্ঞান হয়, নানাবিধ আছে অলঙ্কার॥ এতধন যার আছে, সে কেন বা দধি বেচে, হাটে ঘাটে মাথায় পসার। দুষ্ট জনে লাগ পায়, দধি ঘোল করে দেয়, কথা কহিতে মুখে মারে। তোমার নাহিক ভয়, দুষ্ট জন যদি হয়, কাড়ি লয় লণ্ড ভণ্ড করে॥ * * * বলিয়া এসব বোল, মুল্য করে দধি ঘোল, শিষ্য সব বড়ই চতুর। বর্দ্ধমান দাসে কয়, খেয়ে দেখ কেমন হয়, দধি মোর টক না মধুর॥ শিষ্যের বচন শুনি বলে গোয়ালিনী। এদেশে এমন বিচার আমি নাহি জানি॥ রাজা চন্দ্রধর হয় দেশে অধিকার। এই দেশে নাহি জানি এমন বিচার॥ ভিন্ন দেশী আসিয়াছি দধি বেচিবার। পথে একা পেয়ে কেন পরিহাস কর॥ আমার জাতির ধর্ম্ম মাথায় পসার। যাহার প্রসাদে মোর ভুঞ্জে পরিবার॥ বিনা দুঃখে কাহার কড়ি হয় উৎপত্তি। আমার সকল এই ঘরের সম্পত্তি॥ খাইয়া বেড়াও তুমি কহিতে না দেও ফুক। পরেরে বলিতে কি পরের লাগে দুঃখ॥ * * বর্দ্ধমানদাস কহে কীর্ত্তি মনসার। হাস্য করে শিষ্যগণ বলে আর বার॥ তোমার জাতির বুঝি পুরাতন কড়ি। দুনা কড়ি লাগে দিব বেচ দধি হাঁড়ি॥ যত হাঁড়ি আছে তোমার সকল কিনিব। আগে দধি খেয়ে দেখি পাছে কড়ি দিব॥ * * * পসার ভাঙ্গিয়া তোমার হাঁড়ি করি চুর। মোর ঠাঁই দেখাও তোমার হার কেউর॥ বর্দ্ধমান দাসে কয় কীর্ত্তি মনসার। ঘনাইয়া গোয়ালিনী বলে আরবার॥ * * যে জন আমার ধন দেখিতে না পারে। বিকাউক মোর ঠাঁই কিনিব তাহারে॥ শিষ্যগণ বলে মোরা যেই ধন চাই। সেই ধন পাই যদি তোমারে বিকাই॥ বর্দ্ধমান দাস কয় কীর্ত্তি মনসার। ঘনাইয়া গোয়ালিনী বলে আরবার॥"

গোপবধূর প্রসঙ্গে বৈষ্ণবকবিগণের দানলীলার পদ মনে হয়, বস্তুতঃ

কবিগণ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বত্রই স্থানে অস্থানে বৈষ্ণবপ্রসঙ্গের মাদকতা বৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। হস্তলিখিত পুঁথিগুলি ও রচনা দৃষ্টে বোধ হয় কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি পরবর্ত্তী মনসার ভাসান-রচকগণ ৩০০ হইতে ২০০ বৎসর পূর্ব্বে এই উপাখ্যান গুলি রচনা করিয়াছিলেন।

ঘনরাম।

হাকন্দপুরাণে শ্রীধর্ম্মমঙ্গলকাব্যের বিষয় প্রথম লিপিবদ্ধ হয়; কিন্তু হাকন্দ পুরাণ এখন লুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের আদিকবি ময়ূরভট্ট; তৎপর ১৫২৭ খৃঃ অব্দে খেলারাম এই বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করেন, আমরা ১২৬ পৃষ্ঠায় খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছি; ইহার পরে রূপরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রচারিত হয়—এই সব কাব্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ১৭১৩ খৃঃঅব্দে ঘনরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গলকাব্য সমাধা করেন। ঘনরাম ময়ূরভট্টের কথা স্বীয় কাব্যে শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন—"ময়ূর ভট্ট বন্দিব সংগীতের আদ্যকবি।" শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ১ম সর্গ। রূপরাম ঘনরামের সহপাঠী ছিলেন, তাঁহার কাব্য বড় বড় শব্দপূর্ণ ও রচনা জটিল, কথিত আছে ঘনরাম উহা পড়িয়া বলিয়াছিলেন—"শব্দ শুনে স্তব্ধ হবে গান শুনবে কি?"

ঘনরামের বাড়ী জেলা বর্দ্ধমানে স্থিত কইয়ড় পরগণান্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রাম; তাঁহার প্রপিতামহের নাম পরমানন্দ, পিতামহের নাম ধনঞ্জয়,—ধনঞ্জয়ের দুই পুত্র, শঙ্কর ও গৌরীকান্ত; গৌরীকান্ত ঘনরামের পিতা, কবির মাতার নাম সীতা দেবী; সীতাদেবীর পিতা গঙ্গাহরি কৌকুসাবীর রাজকুলোদ্ভূত ছিলেন। ঘনরাম ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন—বাল্যকাল হইতে কবি খুব শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন; তৎকৃত শ্রীধর্ম্মমঙ্গলকাব্যে মল্লদিগের লড়াই ও অশ্বাদির চালনার যেরূপ জীবন্ত বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে কবির ব্যায়ামক্রীড়ায় বিশেষ দখল ছিল বলিয়া বোধ হয়। ঘনরাম শৈশবে বড় কলহ-প্রিয় ছিলেন; তাঁহার পিতা গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে বর্দ্ধমানের তাৎকালিক প্রসিদ্ধ শাস্ত্র চর্চ্চার স্থান—রামপুরের টোলে পাঠাইয়া দেন; তথাকার হিতকর সংসর্গে

কবির কলহ-প্রিয়তার অনেকটা দমন হয় ও পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়া যায়। শৈশবেই কবিতাদেবীর কৃপা কটাক্ষ তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল; গুরু তাঁহার ভাবীযশঃ অঙ্গীকার করিয়া তরুণ বয়সেই তাঁহাকে "কবিরত্ন" উপাধি প্রদান করেন।

কৃষ্ণপুরাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের আদেশে ঘনরাম শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গলকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন—"অখিল বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,—কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান। চিন্তি তার রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি, দ্বিজঘনরাম রসগান।" শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ব্যতীত ঘনরাম-রচিত সত্যনারায়ণের একখানা পাঁচালী দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাঁহার ৪ পুত্র রামপ্রিয়, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণের নাম উল্লিখিত আছে; কয়েক বৎসর হয় কবির বৃদ্ধ প্রপৌত্র মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার একমাত্র পুত্র বর্ত্তমান আছেন।

ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ২৪ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত, মোট শ্লোক-সংখ্যা ৯১৪৭। ১ম সর্গ স্থাপনপালা, শ্লোক সংখ্যা ২৬৭; ২য় সর্গ ঢেকুরপালা, ২৩৮ শ্লোক; ৩য় সর্গ রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা, ২৫৬ শ্লোক; ৪র্থ সর্গ, হরিশ্চন্দ্র পালা, ২৬০ শ্লোক; ৫ম সর্গ শালেভরা পালা, ২৯৭ শ্লোক; ৬ষ্ঠ সর্গ, লাউসেনের জন্মপালা, ৩১৫ শ্লোক; ৭ম সর্গ আখড়া পালা, ৩৫৪ শ্লোক; ৮ম সর্গ ফলকনির্ম্মাণপালা, ৩১৭ শ্লোক; ৯ম সর্গ, গৌড় যাত্রার পালা, ৪০৭ শ্লোক; ১০ম কামদল বধ, ৩৫০ শ্লোক; ১১শ সর্গ, জামাতি পালা ৩২৭ শ্লোক; ১২শ সর্গ গোলাহাটপালা, ৫৯৪ শ্লোক; ১৩শ সর্গ হস্তিবধপালা, ৫১৮ শ্লোক; ১৪শ সর্গ, কাঙুরযাত্রা পালা, ৩৫৯ শ্লোক; ১৫শ সর্গ, কামরূপ যুদ্ধপালা ৪১৪ শ্লোক; ১৬শ সর্গ, কানড়ার স্বয়ম্বর, ৩০৭ শ্লোক; ১৭শ সর্গ, কানড়ার বিবাহ, ৪৮৫ শ্লোক; ১৮শ সর্গ, মায়ামুণ্ড পালা ৫৬৫ শ্লোক; ১৯শ সর্গ ইচ্ছাইবধ পালা ৪৩৫ শ্লোক ২০শ সর্গ, বাদল পালা, ২৮১ শ্লোক; ২১শ শ্লোক পশ্চিম উদয় আরম্ভ, ১৭৬ শ্লোক; ২২শ সর্গ জাগরণ পালা, ১০৭১ শ্লোক; ২৩শ সর্গ পশ্চিম উদয় ৩৩০ শ্লোক; ২৪শ সর্গ স্বর্গা-রোহণ পালা, ৩৬৪ শ্লোক।

সুতরাং এই কাব্য কবির অধ্যবসায়ের এক বিরাট দৃষ্টান্ত বলিতে হইবে। ধর্ম্মমঙ্গলে লাউসেনের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে; লাউসেন কুলটাগণের হস্তে পড়িয়া ইন্দ্রিয়জয়ী; ব্যাঘ্র, হস্তী ও কিম্ভ জন্তুর সম্মুখে যুদ্ধ করিয়া তিনি বুঝাইয়াছেন—তাঁহার বাহুবল অমিত; স্বীয় মাতুল মহামদের দুরভিসন্ধি নানাভাবে বিফল করিয়া বুঝাইয়াছেন, তিনি দেবানুগৃহীত; অজেয় ইছাই ঘোষকে জয় করিয়া বুঝাইয়াছেন, বিক্রমে তাঁহার সমকক্ষ নাই; স্বীয় অঙ্গগুলির এক একটি ছেদন করিয়া

দেবীর আরাধনা করিয়া বুঝাইয়াছেন—তিনি কঠোর তপস্বী; এতদ্ব্যতীত মৃত শিশুর মুখে কথা বলাইয়াছেন, স্বীয় বিনষ্ট সৈন্যদলের প্রাণদান করিয়াছেন, নানা অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া কলিঙ্গা ও কানড়াকে বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু এই রাশি রাশি ঘটনা বর্ণনা করিয়াও কবি তাঁহার নায়ককে বড় করিতে পারেন নাই; বিচ্ছিন্ন উপকরণ রাশি পড়িয়া আছে,—যে বিধি-দত্ত শক্তিগুণে সেগুলি একত্র করিয়া এক মহাবীরের চরিত্র গঠিত হইতে পারে, কবির সে শক্তি ও নৈপুণ্যের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়। লাউসেনের বিপদের সময় হনুমান আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া দিতেছেন; চণ্ডী আসিয়া তাহার শরীরের মশক খেদাইতেছেন, সুতরাং তাঁহার বিপদে পাঠকের শান্তিভঙ্গের কোন আশঙ্কা নাই এবং তাঁহার জয়লাভেও পাঠক তাঁহাকে কোনরূপ প্রশংসা করিতে ইচ্ছা বোধ করিবেন না। পাঠক এই কাব্যের আদ্যন্ত ঘুমের ঘোরে অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে পড়িয়া যাইবেন, কোন স্থলে তাঁহার চক্ষুকোণে অশ্রুবিন্দু নির্গত হওয়ার সম্ভব নাই। বর্ষাকালে জানেলা খুলিয়া অলস চক্ষে বৃষ্টিপাত দেখিতে একরূপ সুখ আছে, অবিরত জলের টুব টাব শব্দ, পত্রকম্পন ও বায়ু বেগে তরুরাজির মাথা নাড়া লক্ষ্য করিতে করিতে চক্ষুদ্বয় মুদিত হইয়া আসে এবং শূন্য নিষ্ক্রিয় মনে পুরাতন কথা ও পুরাতন ছবির স্মৃতি অনাহুত জাগিয়া উঠে; ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের একঘেঁয়ে বর্ণনা সেই বৃষ্টির টুব টাব শব্দের ন্যায়, তানপুরার মত তাহা হইতে অবিরত একরূপ ধ্বনি উঠিতেছে কিন্তু উহা পড়িতে একরূপ অলস সুখের উৎপত্তি হয়—স্থলে স্থলে কি কথা পড়িতে দূর দূরান্তরের কি কথা স্মৃতিপথে উদয় হয় ও ঘুমঘোরে চক্ষু মুদিত হইয়া আসে। মধ্যে মধ্যে যুদ্ধের দামামা বাদ্য এই নিদ্রাপ্রবণতা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তখন হাই তুলিয়া মন একটু বীররসে মাতিয়া যায়; নিম্নে একটু নমুনা দিতেছি—"মার মার বলি ডাক ছাড়েন ভবানী। সেনাগণ দানাগণ, সমরে নিদারুণ, দুদলে করে হানাহানি॥ রঙ্গিণী রণজয়ী, দুন্দুভি বাজাই, ঘনঘোর বাজাইয়া দামা। রায়পুত মজবুত, মৈছন যমদূত, সমমুখ জুড়ে থানাথানা॥ দাপাদাপি দলবল, মহীমাঝে মাতল, মানব মহিষে দানাদন্তে। ধর ধর বলি ঘন, ধাইল দানবগণ, ধমকে ধরাধর কম্পে॥ ঝাঁকে ঝাঁকে হরিষে, শরগুলি বরিষে, আকাশে একাকার ধুম। দিশাহারা দিবসে, হত কত হুতাশে, গোলা বাজে দুড়ুম দুড়ুম॥ কাকতা ঝাঁকে

ঝাঁকে, ঝিকিছে ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে বরিষে তীর। সামালিয়া হানিতে, গজবাজী সহিতে, সমরে শিকারের শির॥ করিয়া তর্জ্জন, ঘোরতর গর্জ্জন দুর্জ্জন দানাগণ দর্পে। সমরে সেনাগন, সংহারে বেষ্টন, ক্ষুধিত সর্পে। ১৭শ সর্গ। বীরের পর বীভৎস রস—"পাতিল প্রেতের হাট পিশাচ পসারী। নরমাংস রুধিরে পসরা সারি সারি। ফড়া ফড়া মড়া করে ডাকিনী যোগিনী। কেহ কাটে কেহ কুটে বাঁটে খানি খানি। কেহ কিনে, কেহ বেচে, কেহ ধরে তুল। কেহ চাকে, কেহ ভকে, কেহ করে মূল॥ রচিয়া নাড়ীর ফুল কেহ গাঁথে মালা। ধরে লয়ে কেহ কারে যোগাইছে ডালা॥ মনোরম মানুষের মাথার লয়ে ঘি। বাচিয়া যোগায় যত যোগিনীর ঝি॥ খর্পর পুরিয়া কেহ নিবারিছে ক্ষুধা। চুমুকে রুধির পিয়ে সম তার সুধা॥ কাঁচা মাস শায় কেহ ভাজা ঝোলে ঝালে। মানুষের গোটা মাথা কেহ ভরে গালে॥ কশমে চিবায় কেহ কুঞ্জরের শুঁড়। মুয়া বলে মুখে ভরে মানুষের মুড়॥ হাতী লয়ে হাতে কেহ উড়ায় আকাশে॥ লাফ দিয়ে লুফে কেহ অমনি গরাশে॥ পরিয়া নাড়ীর মালা কেহ করে নাট। মরা মাঝে মিছা শব্দ শুনি হান কাট॥ ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী চণ্ডদানা। হাটে করে কেবল মাংসের বেচা কেনা॥ হেন হাটে হাকিম হৈল হৈমবতী। করপুটে সম্মুখে ধূমশী করে স্তুতি॥" ১৭শ সর্গ। করুণরসের বড় অভাব, তবে মধ্যে মধ্যে পাঠকের অশ্রুপাত না হইলেও দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতে পারে—"শিঙ্গাদার ওরে ভাই এই ছিল আমার কপালে। নিশায় নিধন রণে, পিতা মাতা বন্ধুগণে, দেখিতে না পেনু শেষকালে॥ গলার কবচ মোর, শিঙ্গাদার ধর ধর, দিহ মোর যেখানে জননী। নিশান অঙ্গুরী লয়ে, ময়ূরার হাতে দিয়ে, ক'য়ো তুমি হ'লে অনাথিনী। তারে মোর মায়ের হাতে হাতে॥ সঁপে সমাচার বলো, অকালে অভাগা মলো, অভাগিনী রাখে সাথ সাথে॥ শুকায় সুবর্ণ ছড়া, বাপেরে ও ঢাল খাড়া, সমর্পিয়ে সমাচার বলো। রণে অকাতর হয়ে, শত্রু শির সংহারিয়ে, সম্মুখ সংগ্রামে শাকা মলো॥ কাণের কুণ্ডল ধর, শিঙ্গাদার তুমি পর। ছুরী তীরে তুষ বীরগণে॥ শুনি শোকে শিঙ্গাদার, চক্ষে বহে জলধার, বহে লোহ শাকার নয়নে॥ কেঁদে কহে পুনর্ব্বার, অপরাধ অভাগার, খণ্ডাইতে মা বাপের পায়। প্রণতি অসংখ্যবার, দেখা নাহি হলো আর, অল্পকালে অভাগা বিদায়। মরমে রহিল শেল, হেন জন্ম বৃথা গেল, মুখে না বলিনু রাম নাম। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সেবা, জননী জনক সেবা, না করিনু বিধি হৈল বাম।" ২২শ অধ্যায়।*

এই পুস্তকের সর্ব্বত্র কেবল শাস্ত্রের উদাহরণ, রামায়ণ ও মহাভারতাদির মুণ্ড চর্ব্বণ করিয়া কবি এই পুস্তক লিখিয়াছিলেন সন্দেহ নাই; শাস্ত্রজ্ঞানের পুঞ্জীকৃত ধূম্র পটল কবির নির্ম্মল আত্মাকে এরূপ ঘেরিয়া

* শিঙ্গাদার ও শাকা দুই ভাই, ময়ূরা শিঙ্গাদারের স্ত্রী।

ফেলিয়াছিল যে স্বানুভূত জ্ঞানের কথা তিনি একটি ও বলিতে পারেন নাই। একমাত্র কর্পূরের চরিত্র বাঙ্গালীর খাঁটি নকসা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কর্পূর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লাউসেনকে খুব ভালবাসে; ব্যাঘ্র, কুম্ভীর প্রভৃতির সঙ্গে লাউসেনের যুদ্ধের পূর্ব্বে এবং অপরাপর অনেক বিপদের পূর্ব্বে সে দাদাকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে অনেক নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু সে দাদাকে যত ভাল বাসে, নিজকে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভালবাসে; "আত্মার্থং পৃথিবীং ত্যজেৎ" চাণক্যের এই সুবর্ণ নীতি সে সর্ব্বত্র অনুষ্ঠান করিতে ক্রুটী করে নাই। বিপদের সময় সে দাদাকে ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে, ও যখন উঁকি দিয়া দেখিয়াছে আর ভয় নাই, তখন নিকটে আসিয়া অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছে, লাউসেন যখন জামতিনগরে বন্দী, তখন কর্পূর পলাতক, লাউসেন মুক্ত হইলে কর্পূর নির্ভয়ে আসিয়া দাদার গলা জড়াইয়া মিথ্যা কথা বলিতে লাগিল—"কাঁদিয়া কর্পূর সেনে করেন জিজ্ঞাসা। কালি কোথা ছিলে ভাই হায় কিবা দশা॥ কর্পূর বলেন যবে বন্দী হ'লে ভাই। রাতারাতি গৌড় ছিনু ধাওয়া ধাই॥ রাজার আন্দাশ করি জামতি লুঠীতে। লয়ে আসি লক্ষ সেনা পথে, আচম্বিতে। পথে শুনি বিজয়, বিদায় দিনু ভাই। লাউসেন বলে তোরে বলিহারি যাই॥"

উপসংহারে বক্তব্য ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল এত বিরাট ও এত এক-ঘেঁয়ে যে সমস্ত কাব্য যিনি পড়িয়া উঠিতে পারিবেন, তাঁহার ধৈর্য্যের শত মুখে প্রশংসা করা উচিত হইবে।

অনুবাদ শাখা।

ক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানাদি।

খ। রামায়ণ ও মহাভারতাদি।

ষোড়শ শতাব্দী অনুবাদের যুগ; এদেশে কবিতার প্রতিভা কবি-কঙ্কণের পর শতাব্দী কাল নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল; যে পাখীটি নিজের মুক্তকণ্ঠের সুধায় আকাশ প্লাবিত করিতেছিল, তাহাকে খাঁচায় পুরিয়া পরের বুলি শিখাইতে চেষ্টা আরম্ভ হইল। খণার বচনে ও গোপীচাঁদের

গানে আমরা সংস্কৃতের কোন চিহ্ন পাই নাই; বৈষ্ণবকবিগণের মধ্যে যিনি সকলের বড়, তিনি নিজের গান নিজের ভাষায় গাহিয়াছেন; চণ্ডীদাস পরকিয় ও স্ফুরিত কদম্বের বড় ধার ধারেন নাই। অপরাপর বৈষ্ণবকবিগণের পদে মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতের প্রভা পতিত হইয়াছে, দুএক স্থলে বঙ্গীয় কবিতার গলে সংস্কৃতের ঋণ সোণার হারের ন্যায় খাটীয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা উহার পদে শৃঙ্খল স্বরূপ হইয়াছে। কবিকঙ্কণ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দু এক স্থলে সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু কিছু রত্ন আনিয়া নিজের কবিতায় লাগাইয়াছেন, যথা—"অঙ্গে যদি লেপি চন্দন পঙ্ক। দহে দেহ যেন দংশে ভুজঙ্গ॥" ইহা জয়দেবের—"সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কং। পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং॥" পদের তর্জ্জমা; কিন্তু মুকুন্দরাম পথের বাহিরের দু একটি ফুলের লোভে হাত বাড়াইলেও প্রকৃতির পাছে পাছে অনুগত ভৃত্যের ন্যায়ই চলিয়াছেন।

কবিকঙ্কণের পর প্রকৃতি বাঙ্গালীর পর হইলেন—শাস্ত্র আপন হইল; ভাষা ভাবের অধিকার ছাড়িয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করিল এবং কবিগণ প্রকৃত মানুষ না দেখিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ছবিগুলি দেখিয়া পাগল হইলেন। সংস্কৃতের নানারূপ অদ্ভুত উপমা ও ভাব দ্বারা লেখনীগুলি ভূতাশ্রিত হইল, তাহারা সত্যযুগ হইতে আসিয়া কলিযুগের মানুষগুলির উপর জবরদস্তি আরম্ভ করিল; এখন এদেশে "আজানুলম্বিত বাহু" অদৃশ্য;—নগ্নতা আবরণের চেষ্টায় বস্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি পাওয়াতে এখন "লম্বোদর" ও "নাভী সুগভীর" আর লোক লোচনের আনন্দদায়ক হয় না; এই জনাকীর্ণ প্রদেশ এক সময় অরণ্যময় ছিল, তখন কুরঙ্গ মাতঙ্গের নৈসর্গীক ক্রীড়া সর্ব্বদা মানুষের প্রত্যক্ষ হইত,—তাহা ভাল বোধ হইত,—মানুষ নিজ গতিবিধি ও কটাক্ষের সঙ্গে তাহাদের হাবভাব মিলাইয়া মনে মনে খুসী হইত, এখন স্বভাবের বড় বনে আমরা কুরঙ্গীর বিলোল কটাক্ষ দেখি না; শীর্ণকায় হস্তীগুলি মাহুতের লাঠির ডরে তাহাদিগের স্বভাবগতি ভুলিয়া গিয়াছে;—ইহা ছাড়া রুচির ও অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছে, রামরম্ভার উপমায় মন তৃপ্ত হয় না,—সুতরাং সত্যযুগের উপমাগুলি এখন রহিত হইলে ভাল হয়। কিন্তু অতিরিক্ত বই পড়ার দোষে কবিগণ স্বভাবের অধিকারের বাহিরে যাইয়া পড়িলেন;

উপমাগুলি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম হইয়া মানুষীরূপকে ঘোর বিপদাপন্ন করিয়া ফেলিল; এই সময় কবিগণ যে সব সুন্দর ও সুন্দরীগণ আঁকিয়াছেন, তাঁহারা অতিরিক্ত মাত্রায় শাস্ত্রীয় উপমার চাতুরীর ফাঁদে পড়িয়া একরূপ জীয়ন্ত মারা গিয়াছেন; বিদ্যাঠাকুরাণীর রূপ পড়িয়া তাঁহাকে রূপসী জ্ঞান করা দূরে থাকুক, বীভৎস রসের উদয় না হইলেই যথেষ্ট। বঙ্গ সাহিত্যের এই রুচি নষ্ট করার পক্ষে পার্শীরও কতকটা হাত আছে, আমরা পরে তাহা সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

যাহাহউক ভাবের দুর্গতি হইলেও ভাষা ক্রমশঃ মার্জ্জিত হইতে চলিল; বঙ্গভাষা সংস্কৃতের অলঙ্কার ও ছন্দগুলি আয়ত্ত করিয়া লইল—কিন্তু প্রথমে এই বিষয়ে অনেক কবির চেষ্টা বড় হাস্যাস্পদ হইয়াছে,—আমরা সে সম্বন্ধে পরে লিখিব।

এই সংস্কৃতের আনুগত্য বঙ্গ সাহিত্যের বিরাট অনুবাদ চেষ্টায় বিশেষরূপে দৃষ্ট হইবে। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছিল—তাহারা একরূপ নগণ্য; আমরা বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছি, কিন্তু তাহাদের সবগুলি উল্লেখ করিতে পারিব না, সবগুলিই উল্লেখযোগ্য নহে—প্রথমতঃ আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকখানা উপাখ্যান ও পুরাণের অনুবাদের উল্লেখ করিয়া পরে রামায়ণ ও মহাভারত প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য এই অনুবাদগুলির অধিকাংশই খাঁটি অনুবাদ নহে, পুরাণ কি কাব্যাদি মূলতঃ অবলম্বন করিয়া মধ্যে মধ্যে কবিগণ নিজের কল্পনার ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতে ত্রুটী করেন নাই।

১। প্রহ্লাদ চরিত্র,—দ্বিজকংসারি প্রণীত; শ্লোক সংখ্যা ২২৪; হস্তলিপি (১৭০২ শক) ১৭৮০ খৃঃ অব্দ।

২। পরীক্ষিত সংবাদ—এই পুস্তকের অধিকাংশই রামায়ণের গল্পে পূর্ণ; শুকদেব পরীক্ষিতকে রামায়ণ শুনাইতেছেন ও প্রসঙ্গক্রমে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছেন। গ্রন্থকারের নাম পাওয়া গেল না। শ্লোক সংখ্যা ৮০০; শ্রীরামধন দেবশর্ম্মার হস্তাক্ষর, (১৭৩৮ শক) ১৮১৬ খৃঃ অব্দ।

৩। নৈষধ—লোকনাথদত্ত প্রণীত। ইহাতে নলোপাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণের বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে ও সর্ব্বশেষ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে

মোট শ্লোক সংখ্যা ২০৩৪; লেখক শ্রীরাম্বি কাইত, হস্তলিপি (১১৭৪ সন) ১৭৬৮ খৃঃ।

৪। ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যান—দ্বিজমুকুন্দপ্রণীত; শ্লোক সংখ্যা ৬৯০; হস্তলিপি (১১৮৪ সন) ১৭৭৮ খৃঃ অব্দ।

৫। দণ্ডীপর্ব্ব—রাজারামদত্ত প্রণীত; শ্লোক সংখ্যা ১৫০০; লেখক শ্রীরামপ্রসাদ দেঞ, হস্তলিপি (১৭০৭শক) ১৭৮৮ খৃঃ।

৬। নল দময়ন্তী—মধুসূদননাপিত-প্রণীত, শ্লোক সংখ্যা ২১২৪; লেখক শ্রীগৌর-কিশোর ধর, হস্তলিপি (১৭৩১ শক) ১৮০৯ খৃঃ।

৮। হরিবংশ—দ্বিজভবানন্দ কর্ত্তৃক অনুবাদিত শ্লোক সংখ্যা ৩১৬৮; লেখক শ্রীভাগ্যমন্ত ধুপী, হস্তলিপি (বাং ১১৯০ সন) ১৭৮৩ খৃঃ অব্দ।

৯। ক্রিয়াযোগসার—পদ্মপুরাণের একাংশের অনুবাদ। অনুবাদক শ্রীঅনন্তরাম শর্ম্মা, শ্লোক সংখ্যা ১০৫০। লেখক শ্রীরাঘবেন্দ্র রাজা; হস্তলিপি (১৬৫৩ শক) ১৭৩১ খৃঃঅব্দ।

এই পুস্তকগুলি আমার নিকট আছে; ইহা ছাড়া রঘুবংশের অনুবাদ, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বায়ুপুরাণ, গরুড়পুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি প্রায় সবগুলি পুরাণের অনুবাদ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি আমরা দেখিয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবু অক্রুরচন্দ্র সেন মহাশয় রামনারায়ণ ঘোষের অতি সুন্দর নৈষধ উপাখ্যান, সুধন্যা বধ, ধ্রুব-উপাখ্যান, প্রভৃতি কতকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন।

ইহাদের প্রায় তাবতের রচনাই একরূপ; রচনা সরল, মধ্যে মধ্যে কোমল কবিতাবণিতার লীলা খেলাও একটু একটু দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, এই সব পুস্তক বঙ্গভাষায় সংস্কৃত শব্দ ও উপমারাশি বহুল পরিমাণে আমদানী করিয়াছে। এই যুগের শ্রেষ্ঠ অনুবাদলেখক কাশী-দাসের রচনায় যে যে গুণ দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ পুস্তকগুলিতে ন্যূনাধিক পরিমাণে সেই সব গুণ লক্ষিত হইবে। এই নগণ্য পুস্তক-রাশির সুশৃঙ্খল খদ্যোত দীপ্তি নিবিড় সাহিত্য ইতিহাসে তাৎকালিক রুচি ও ভাবের পরিষ্কার পথ দেখাইতেছে, তাহা অনুসরণ করিতে করিতে আমরা কাশীদাসের প্রতিভার সন্নিহিত হইয়া পড়ি। পুঁথিগুলি হইতে কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করা উচিত, নিম্নে আমরা কিছু কিছু অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি;—

(১) প্রহ্লাদের স্তব—"ধ্যান করিয়া প্রহ্লাদ বলে উচ্চস্বরে। চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া যে শ্যামরূপ ধরে॥ কিরীটি কুণ্ডল হার বসন সুন্দর। বিজুলি মণ্ডিত যেন নব জলধর। পীতবাস পরিধান চরণে নূপুর। পদনখদীপ্তি কোটি চন্দ্র করে দূর॥ চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদাপদ্ম

করে। অঙ্গেত কৌস্তভমণি মহাদীপ্তি করে।" প্রহ্লাদ চরিত্র, বে, গ, পুথি ৯ পত্র।

(২) পরশুরামের বর্ণনা—"হেন কালে আসিলেন পরশুরাম বীর। দৈত্য দানব জিনি নির্ভয় শরীর। বাম হস্তে ধরে ধনু দক্ষিণ হস্তে তোমর। পৃষ্ঠেতে বিচিত্র টোণ অতি মনোহর। টোণের ভিতরে বাণ জলদগ্নি যেন। এক এক শর মুখে যেন কালযম। সুবর্ণ বর্ণ তনু লোচন লোহিত। অঙ্গ হৈতে অদ্ভুত তেজ স্ফরিত। লম্বিত পিঙ্গল জটা পরশিছে কটী। রঘুনাথে দেখি করে হাস্য খটখটি।" পরীক্ষিত সংবাদ, বে, গ, পুথি, ২৩ পত্র।

(৩) শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—"আমি ব্যাধি রূপ হৈয়া দেই দুঃখ ভোগ। আমি ঔষধ হৈয়া খণ্ডাই সেই রোগ। আমি গয়া আমি গঙ্গা আমি বারাণসী। কীট পতঙ্গ আমি, আমি দিবানিশি। আমি পণ্ডিতরূপ আমি মুর্খসম। আমি সে সকল করি উত্তম অধম। আমার নাশ নাই আমি করি নাশ। কাম ক্রোধ লোভ মোহ আমারই প্রকাশ।" পরীক্ষিত সংবাদ ১৪ পত্র। এইরূপ ভাব বাঙ্গলার পল্লীকবির রচনায় পাওয়া যায়—ইহা উচ্চ অদ্বৈত তত্ত্বের কথা; যে সু, কু, ব্যাখ্যা করিতে অন্যান্য ধর্ম্মে শয়তান কল্পিত, সেই সু, কু বোধ আমাদের ভ্রান্তির উৎপত্তি; সু, কু, আবর করিয়া অনন্ত পুরুষের ব্যাপক মহিমার প্রসার; মূর্খ ও পণ্ডিত, রোগ ও ঔষধ ইঙ্গিতে একে অন্যকে দেখাইতেছে, ইহারা একই সত্যের দুই ভিন্নদিক্ মাত্র, কিন্তু ইহাদের কোনটি তাঁহা ছাড়া নহে। হিন্দুস্থানের পল্লীর লোকগণ পুতুল পূজা করেন, আবার এইরূপ দু একটি কথা ও বলিতে জানেন।

কাশীদাসকে ছাড়িয়া স্থলে স্থলে ভারতচন্দ্রের উপমাগুলির পূর্ব্বখবর ও পাওয়া যায়; সাহিত্যেররুচি অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত উপমারপ্রতি প্রবর্ত্তিত হইতেছিল; লোকনাথ দত্তের নৈষধ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্য; কিন্তু মনোনিবেশ পূর্ব্বক লোকনাথ দত্তের রচনা পাঠ করিলে ইঁহাকে 'ক্ষুদ্র ভারতচন্দ্র' উপাধি দেওয়া যাইতে পারে; দময়ন্তীর রূপ বর্ণনা হইতে—

"দেখিয়া সুরঙ্গ তার ওষ্ঠাধর। অরুণ আকৃতি সূর্য্য হৈতে সমসর। দূরে থাকি কুসুম বাঁধুলি বিম্বফল। অপমানে বলে মোর সুরঙ্গ বিফল। দেখিয়া চিক্কিত তার দশনের কান্তি। সমুদ্রে প্রবেশ কৈল মুকুতার পাঁতি। তার শ্রুতি বিমল দেখিয়া মনোহর। আকাশে উড়িল লাজে গৃধিনী সকল। দেখিয়া সুচারু তান সিথা কেশ পাশ। চামরী বনেতে গেল হইয়া নৈরাশ। সীমন্ত বিচিত্র তার দেখি অদ্ভুত। ঘন ঘন গগনেতে লুকায় বিদ্যুত। দেখিয়া বিচিত্র গ্রীবা অতি শোভান্বিত। সমুদ্রেতে গেল শঙ্খ হইয়া লজ্জিত। তনু কঠিন তার পীন পয়োধর। দূরে থাকি হেরিলেক সুমেরুবর।"

নৈষধ, বে, গ, পুঁথি ৪০ পত্র। কিন্তু ইহাদের সকলের পূর্ব্বে বিদ্যাপতি কবি গাহিয়া রাখিয়াছিলেন—"কবরী ভয়ে চামরী গিরি কন্দরে, মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশ। হরিণ নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল, গতিভয়ে গজ বনবাস॥ ভুজ ভয়ে কমল মৃনাল পঙ্কে রহুঁ। কর ভয়ে কিশলয় কাঁপে॥"

কল্পনার এই বাড়াবাড়ি বঙ্গসাহিত্যে কাশীদাসের পরে ক্রমেই বেশী হইতে লাগিল, এই সময়ের অন্যান্য কবির লেখায় ইতস্ততঃ উক্তরূপ নানা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; নলদময়ন্তীলেখক মধুসূদন নাপিত দময়ন্তীর কপালে নিবিড় কেশ রেখায় ঈষদ্ আবৃত সিন্দুর বিন্দুর উপমা দিয়াছেন—"রাহু জিহ্বা নাড়ে যেন চন্দ্রে গিলিবারে॥"

মধুসূদন নাপিতরচিত 'নলদময়ন্তী' কাব্যের নাম উল্লেখ করিয়াছি; এই নরসুন্দর কবি স্বীয় পরিচয় স্থলে বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণের দাস নাপিত কুলেতে উদ্ভব। যাহার কবিত্ব কীর্ত্তি লোকেতে সম্ভব। তাহান তনয় বাণীনাথ মহাশয়। পৃথিবী ভরিয়া যার কীর্ত্তির বিজয়। তাহান তনয় শিষ্য শ্রীমধুসূদন। শুনিয়া প্রভুর কীর্ত্তি উল্লসিত মন॥" সুতরাং দেখা যাইতেছে কবির পিতামহ ও কাব্য লিখিয়া লব্ধযশঃ হইয়াছিলেন; মধুসূদনের রচনা সরল ও হৃদয়গ্রাহী; শীলকবি বড় একখানা কাব্য লিখিতে লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কৃতকার্য্যতায় কেহ বিদ্রুপ করিতে সুবিধা পাইবেন না; স্বভাব বর্ণনা এইরূপ—"কতদুর গিয়ে দেখে রম্য একস্থান। দিব্য সরোবর তথা পুষ্পের উদ্যান॥ তীরে, নীরে, নানা পুষ্প লতায় শোভিত। দক্ষিণা পবন তথা অতি সুললিত॥ কোকিলের ধ্বনি তথা ময়ূরের নৃত্য। ভ্রমরা নাচয়ে তথা ভ্রমরী গাহে গীত। পাইয়া শীতল বারি আনন্দ হৃদয়। স্নান তর্পণ কৈল সৈন্য সমুচয়॥ ছায়া, বারি, শীতল পবন মনোহর। নদী তীরে ভ্রমে রাজা সরস অন্তর॥ আনন্দে করয়ে কেলি যত জলচর। চক্রবাক কমলে শোভিত সরোবর॥ হংসে মৃনাল তুলি যাচে হংসিণীকে। উড়ে পড়ে চকোরী চকোর ডাকে।" এই কবির পুঁথিতে দু একটি স্থলে আমরা লোকনাথ দত্তের ভণিতা পাইয়াছি।

দণ্ডীকাব্যের বিষয় এই—দুর্ব্বাশার শাপে উর্ব্বশীঅপ্সরা পৃথিবীতে ঘোটকী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। একদা অবন্তীর রাজা দণ্ডী শিকার করিতে যাইয়া এই অপূর্ব্ব সুন্দরী ঘোটকীটি দেখিয়া সৈন্য সামন্ত ত্যাগ করিয়া তাহার পাছে পাছে ধাবিত হন; কতকদূরে গেলে নির্জ্জনে ঘোটকী অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি ধারণ করে, রাজা তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া

আসেন; ঘোটকী কামরূপিনী, লোকের সম্মুখে ঘোটকী হইয়া থাকিত, কিন্তু রাজার নিকট সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত। নারদ ঋষি শ্রীকৃষ্ণকে যাইয়া জানান, তাঁহার অধীনস্থ অবন্তীরাজ বড় সুন্দরী ঘোটকী পাইয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট ঘোটকী চাহিয়া বসেন, উত্তরে দণ্ডী বলিয়া পাঠান, তিনি সিংহাসন ও রাজ্য ছাড়িয়া দিতে পারেন, ঘোটকী ছাড়িতে পারিবেন না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দণ্ডীর যুদ্ধের উদ্যোগ হইল; দণ্ডী সহায় খুঁজিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভ্রমণ করিল। বিভীষণ, বাসুকী, ইন্দ্র, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন প্রভৃতি কেহই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষে যুদ্ধে সহায়তা দিতে স্বীকৃত হইল না। সুতরাং ক্ষুব্ধমনে ঘোটকীপৃষ্ঠে দণ্ডী গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতে গেলেন; এই গঙ্গারঘাটে সুভদ্রাদেবী স্নান করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি রাজার উদ্দেশ্য জানিয়া ভীমসেনের নিকট রাজার বিষয় সুপারিস করেন; ভীমসেন সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হন; তখন বড় একটা গোল বাঁধিয়া গেল; জনে জনে আসিয়া ভীমসেনকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল;—কিন্তু ভীম পাহাড়ের ন্যায় অটল; প্রদ্যুম্ন আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ভীমকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিল, দশ অবতারের এক এক অবতারের লীলা বর্ণন করিয়া প্রদ্যুম্ন বলিতে লাগিল "সেই প্রভু ঈশ্বর যে দেব ভগবান। হেন গোবিন্দেরে ভীম কর অল্প জ্ঞান।"—কিন্তু ভীম যে ভ্রুকুটী করিয়া ছিল, সে ভ্রুকুটিব্রত ভঙ্গ হইল না। বিষম যুদ্ধ বাঁধিল। ভীমসেনকে রক্ষা করিতে অগত্যা পাণ্ডব কৌরব একত্র হইল,—এই সুহৃদ-চমূপরিবৃত, অটল প্রতিজ্ঞাপরায়ণ, শরণাগত-আশ্রয়কারী ভীমসেনকে শ্রীকৃষ্ণ হইতেও পূজ্য দেবের ন্যায় বোধ হয়—কাব্যের সহজ সুন্দর বর্ণনা রাশি এই বৃহৎ চরিত্রের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ফুলপল্লব-যুক্ত লতার ন্যায় দেখাইতেছে। কতকদূর যুদ্ধ হইয়া আর যুদ্ধ হইল না; যুদ্ধের কারণ ফুরাইয়া গেল—ইতিমধ্যে বিবাদের জিনিষ ঘোটকী অপ্সরা হইয়া স্বর্গে নাচিতে গিয়াছে। 'আর কেন?' ভাবিয়া দণ্ডী শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

মুকুন্দরামের ভাই রামানন্দ প্রণীত-গোবিন্দমঙ্গলের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে;—ইঁহার রচনার বিশেষ কিছু প্রশংসনীয় নাই; এক আধটু সৌন্দর্য্যের কণা কুড়াইয়া পাওয়া যাইতে পারে, যথা—

"রাধিকার প্রেমনদী রসের পাথার। রসিক নাগর তাহে জেন যে সাতার॥ কাজলে মিশিল যেন নব গোরোচনা। নীলমণি মাঝে' যেন পশিল কাঁচসোণা॥ কুবলয় মাঝে যেন চম্পকের দাম। কালো মেঘ মাঝেতে বিজুলী অণুপাম॥ পালঙ্ক উপরে কৃষ্ণ রাধিকা কোলে। কালিন্দির জলে যেন শশধর হেলে॥"

আমরা পূর্ব্বোক্ত কবিগণের মধ্যে কাহারও বিশেষ পরিচয় পাই নাই। সম্ভবতঃ ইঁহারা সকলেই পূর্ব্ববঙ্গের লেখক। উঁহাদের মধ্যে এক মাত্র অনন্ত রামশর্ম্মা (ক্রিয়াযোগসার প্রণেতা) নিজের এক দীর্ঘ পারিবারিক ইতিহাস দিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত অংশ উঠাইতে স্থান দেখিতেছি না, উহাতে জানা যায় কবির নিবাস ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্ত্তী মেঘনা নদের পশ্চিম পারস্থিত সাহাপুর গ্রাম, কবির পিতামহের নাম কবিদুর্ল্লভ, কবিদুর্ল্লভের তিন পুত্র, রামচন্দ্র, রাঘবেন্দ্র ও রঘুনাথ। অনন্তরাম এই রঘুনাথের পুত্র, ইঁহার মাতামহের নাম রামদাস। কবি বিশারদ উপাধি বিশিষ্ট কোন লোকের শরণ লইয়া ক্রিয়াযোগ সার লিখিয়াছেন। এই আত্ম বিবরণের পর ক্রিয়াযোগসার পাঠ করিলে কি কি ফল হয়, তাহার এক লম্বা তালিকা আছে, তাহাতে বিশ্বাস করিলে ইন্দ্রের তক্ত হইতে কুবেরের ভাণ্ডার ও মৃত্যুর পরে অক্ষয় মুক্তির উপর পাঠকের দাখিলী সত্ব জন্মিবে।

এস্থলে আমরা প্রসিদ্ধ একজন অনুবাদ লেখকের বিষয় উল্লেখ করিব। অনুবাদকারক রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল; কাশীতে ইঁহার স্মৃতি-জ্ঞাপক জয়নারায়ণ কলেজ এখনও বিদ্যমান। ১০০ বৎসরের অধিক হইল ইনি কাশীবাস কালে কাশীখণ্ডের তর্জ্জমা করিয়াছিলেন, ইহা মূলের ঠিক অনুযায়ী ও নানাবিচিত্র ছন্দোবন্ধে সুপাঠ্য; পুস্তকের শেষে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই—"কাশীবাস করি পঞ্চ গঙ্গার উপর। কাশীগুণ গান হেতু ভাবিত অন্তর। মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি। ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি॥ সত্রশতচৌদ্দ শক পৌষ মাস যবে। আমার মানসমত যোগ হৈল তবে॥ হরমণি কুলে জন্ম পাটুলি নিবাসী। শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব রায়াগত কাশী॥ তার সঙ্গে জগন্নাথ মুখুয্যা আইলা। প্রথম ফাল্গুণে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা॥ শ্রীরামপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মণ। তাহিরা বলেন কাশীখণ্ড অনুক্ষণ॥ মুখুয্যা করেন সব কবিতা পাতড়া। তাহারে করেন রায় বর্জ্জিসা খসড়া॥ রায় পুনর্ব্বার সেই পাতড়া লইয়া। পুস্তকে লিখেন তাহা সমস্ত শুধিয়া॥ এইমতে চল্লিশ লাচাড়ি হৈল যবে। বিদ্যাবাগীশের কাশী প্রাপ্তি হৈল

তবে। ভাদ্রমাসে সুধুয্যা গেলেন নিজবাটী। বৎসর স্থগিত ছিল গ্রন্থ পরিপাটী। পরন্তু বাঙ্গালীটোলা গেলা যবে রায়। বলরাম বাচস্পতি' মিলিলা তথায়। পচন্দ্রী অধ্যায় পর্য্যন্ত তার সীমা। বক্রেশ্বর পঞ্চাননে সমাপ্ত সরিমা। কাশী পঞ্চক্রোশী আর নগর ভ্রমণ। এ দুই অধ্যায় পঞ্চাননে সমাপণ॥ পরে সম্বৎসরাবধি স্থগিত হইলা। শ্রীউমা-শঙ্কর তর্কালঙ্কার মিলিলা॥ যদ্যপি নয়ন দুটি দৈবযোগে অন্ধ। তথাপি তাঁহার গুণে লোকে লাগে ধন্দ॥ ইষ্ট নিষ্ঠ বাক্‌নিষ্ঠ কাশীপুরে জন্ম। পরানিষ্ট পরাঙ্মুখ বিজ্ঞমর্ম্মী মর্ম্ম॥ লোক উপকারে সদা ব্যাকুল অন্তর॥ গ্রন্থের সমাপ্তি হেতু হৈলেন তৎপর। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার আখ্যান। তর্কালঙ্কারের পিতা সুধীর বিদ্বান॥ নিজে তার সহিত করিয়া পর্য্যটন। ছয়মাসে বহুগ্রন্থ করি সঙ্কলন॥ ঋতু মাস তিথি বার বর্ষযাত্রা যত। পদ্যেতে আনিয়া সংস্কৃত অভিমত॥ তর্কালঙ্কারের বন্ধু বিষ্ণুরাম দাম। সিদ্ধান্ত আখ্যান অতি ধীর গুণবান। পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিস্কার। রায় করিলেন নর্ব্ব গ্রন্থের প্রচার।। ঘোষাল বংশের রাজা জয়নারায়ণ। এই খানে সমাপ্ত করিলা বিবরণ॥ তাঁহার আদেশক্রমে কিতাব করিয়া। রামতনু মুখোপাধ্যায় লইল লিখিয়া॥ সেই বহি দৃষ্টি করি নকলনবিসী। কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধায় চাতরা নিবাসী॥"

এই অনুবাদ সংকলন করিতে অনেকগুলি পণ্ডিত খাটিয়াছিলেন, ইহা এখনকার পণ্ডিত মণ্ডলীর উপেক্ষণীয় না হইতে পারে। কাশীখণ্ডের অনুবাদ ১১২০০ শ্লোকে পূর্ণ। ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ে কত শ্লোক আছে, তাহা অধ্যায় শেষে প্রাচীনরীতি অনুসারে একটি প্রহেলিকার সঙ্কেতে জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

কিন্তু পুস্তকের মূলভাগ হইতে পুস্তক শেষে যে কাশীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মূল্য বেশী। রাজা বাহাদুরের লিপিকৌশল—তাঁহার সত্য প্রিয়তা; তাৎকালিক কাশীর যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, তাহা একশত বৎসরে যবনিকা তুলিয়া অবিকল কাশীর মূর্ত্তিটি আমাদের চক্ষে অঙ্কিত করিয়া দিতেছে; কাল-গতে এই চিত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ক্রমে আরও বৃদ্ধি হইবে; তখন ম্যাণ্ডিভাইলের জেরুজিলাম, ব্যাসের ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডের প্রাচীন কাশী, হিউনসাঙের কুশীনগর ও নরহরি চক্রবর্ত্তীর বৃন্দাবন ও নবদ্বিপের চিত্রপটের সঙ্গে কাশীর এই মানচিত্র খানা এক স্থানে রক্ষা করার উপযুক্ত হইবে।

কবি গঙ্গার অর্দ্ধ গোলাকৃতি তীরের উপর বক্রভাবে স্থিত কাশীকে শিব ঠাকুরের কপালের অর্দ্ধচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথমে অসিঘাট, পরসনাথের ঘাট, সাজাদার ঘাট, বৈদ্যনাথের ঘাট,

ন্যারদপাড়ের ঘাট প্রভৃতি ৫৩টি ঘাটের এক ক্ষিপ্র বর্ণনা দিয়া লইয়াছেন, তন্মধ্যে তাহাদের আয়তন, গঠন প্রণালী ও তৎসম্বন্ধে চলিত জনশ্রুতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমোদপূর্ণ উল্লেখ আছে। তৎপর পোস্তাগুলি তাহাদের সংখ্যাও কম নহে; সূচীপত্রের সঙ্গে দুএকটি কৌতূহলোদ্দীপক কথা থাকিলে তাহাদের নীরসতা ঘোচে, রাজাবাহাদুরের রচনার ও ইহাই গুণ; পোস্তাগুলির মধ্যে—"মীরের পোস্তাকে সর্ব্ব প্রধান গণিব। উর্দ্ধে ষষ্টি হাত দীর্ঘে ত্রিশত প্রমাণ। যে মত পর্ব্বত মধ্যে সুমেরু প্রধান।" পোস্তাগুলির পরে "ঘাটিয়া" ব্রাহ্মণদিগের কথা; স্নানেন্তে লোক সমূহের কপালে তিলক কাটিয়া দেওয়া ইত্যাদি ইহাদের কাজ। কলিকাতা গঙ্গার ঘাটে উড়িয়া মহাশয়গণ এই কাজ করিয়া থাকেন, অর্দ্ধ পয়সার তৈল খরিদ করিয়াই স্নানকারী ইহাদের "যজমানঅ" হইয়া বসেন। তৎপর দালানগুলির বর্ণনা; দ্বিতল, ত্রিতল ও চৌতলের সংখ্যাই বেশী কিন্তু "কদাচিত ছয়তলা সাত তলা সাজে" শ্রীমাধব রায়ের ধারার কাশীর সর্ব্বোচ্চ মন্দির-চূড়, ইহা ১১০. হস্ত উচ্চ, ৯০ হস্তের পর বসিবার স্থান আছে,—"সুমেরুর দুই শৃঙ্গ যেমত প্রকাশ। মনে হয় তার চূড়া ভেদিল আকাশ। তাহার উপর যদি কোনজন যায়। সেই সে কাশীর শোভা দেখিবার পায়।" এই ধারারা দুঃখী ও নিরাশাগ্রস্থের শেষ উপায় ছিল, তাহারা ইহার উপর হইতে পড়িয়া মরিত। রাজা বাহাদুরের থাকা কালে যে হতভাগ্যগণ ইহার উপর হইতে প্রাণ দিয়াছে, তাহাদের উল্লেখ আছে; একব্যক্তি কোন সুন্দরীর প্রেমে মজিয়া তাহার সহিত সেই ধারারার উপর উঠে, তিন দিন প্রণয়ীযুগ্ম সেই স্থানে বঞ্চন করিয়া শেষে উভয়ে পড়িয়া মরে। কিন্তু মৃত্যু ইচ্ছা করিলেই সর্ব্বদা মরা যায় না, "অন্য একজন সেই ধারারাতে চড়ি। দৈবক্রমে তথা হৈতে তরুপরে পড়ি। তরুডাল সহ পূর্ণ হইয়া ভূমিষ্ট। অনায়াসে নিজ গৃহে হইল প্রবিষ্ট।" এখন মিউনিসিপালিটি যে কার্য্য করেন, পূর্ব্বে ধর্ম্মভীরু গৃহস্থগণ তাহা সম্পন্ন করিতেন—"মহাজনটোলী মধ্যে রাস্তাতে সর্ব্বথা। দিনকর হিমকর করহীন তথা। একারণ নিশাযোগে পথিকের প্রীতে। দীপ শিখা করে সবে নিজ খিড়কীতে।"

কবি অসংশ্লিষ্ট, অথচ সর্ব্বত্র উৎসুকনেত্র পথিকের ন্যায় সরলভাবে ভালমন্দের উল্লেখ করিয়া যাওয়াতে চিত্রের কোন কোন অংশ বেশ হাস্যরস মিষ্ট হইয়াছে—"নানা সন্ন্যাসীর কত শত মঠ। বাহে উদাসীন মাত্র গৃহী অন্তঃশঠ। নানাগন্নী মহাজনী ব্যবসা সবার। এক এক জনার বাড়ী পর্ব্বত আকার।"

ভগুপাঁগুাদের "কাহার ঠাকুর মঠে কার ঠাকুরাণী। বাটী পরিপাটী হেরি যেন রাজধানী॥" এবং উৎকৃষ্ট দধিদুগ্ধপুষ্ট "শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তী যেন রাজরাজেশ্বর॥" তৎপরে নানাজাতির বর্ণনা আছে; ব্রাহ্মণদের বেদাধ্যয়ন, সামবেদ পাঠ, লোকবৃন্দের গঙ্গাতীরে আমোদ প্রমোদ—এ সব তুলিতে আঁকার মত। এবং আখ্যায়িকার সর্ব্বত্র অতিশয় শ্রদ্ধা, বিনয় ও ধর্ম্মে প্রণতির উৎকৃষ্ট পরিচয় আছে। কাশীর কুচা-গলিতে সেই সময়ে সর্ব্বদা হত্যাকাণ্ড হইত—"এইমত প্রতি মাসে প্রায় হয় দ্বন্দ। ক্ষণমাত্রে গড়াগড়ি যায় কত স্কন্ধ।" শিল্পকারগণ কি কি বস্তু প্রস্তুত করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহার একটি পূর্ণ তালিকা আছে; জোলাগণ কিংথাপ, একপাট্টা, জামদানী, সাড়ী, শামলা, গুদড়, তাসের উপর ধনুকপাটা ও জরীমণ্ডিত বস্ত্র প্রস্তুত করিত ও "দ্বিশত পর্য্যন্ত থান মুল্যের নির্ণয়।" কিন্তু "সাদাতে রেশম পাড়ি কতরঙ্গ করে। শুদ্ধ সাদা অতুাত্তম করিতে না পারে।" নদীয়ার কারিকরগণ অতি সুন্দর শিবলিঙ্গ পাষাণ দ্বারা প্রস্তুত করিত। তৎপর দেবমন্দিরগুলির বর্ণনা,—এ বর্ণনা উজ্জ্বল, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নাট্যশালার ন্যায় বিচিত্র শোভা-উদ্ঘাটক; তখন অহল্যাবাইএর মন্দির নূতন প্রস্তুত হইয়াছে; পাষাণের খোদগারি ফুল ফলা লতা ও দক্ষিণ দেশস্থ মর্ম্মরের বিশাল বৃষের কথা উল্লেখ করিয়া উপসংহারে "কনক কলস শোভে মন্দির উপর। তিন লক্ষ ব্যয়ে যেই না হৈল কাতর।" ইহার পরে বিষ্ণুমহাদেব মহারাষ্ট্রার মন্দির ও অপরাপর মন্দিরের বিস্তৃত উল্লেখ—বর্ণনা এরূপ সরল, জীবন্ত ও সুন্দর—পাঠক যেন পথে দেখিতে দেখিতে যাইবেন। কাশীবাসিনী ধর্ম্মপ্রাণা রমণীগণের বর্ণনা আছে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মব্রতাদি, অনুষ্ঠান ও গঙ্গা স্নানাদির পরে রূপবর্ণনা—"গণ্ডারের চুড়ি কারু কনকে রচিত। ঘোর ঘন মাঝে যেন তড়িত জড়িত। কি উপমা দিব যেই পিটে দোলে বেণী। অখণ্ড কদলী দলে বিহরে নাগিনী॥" তাহাদের নোলকে—"বড় দুই মুক্তা মাঝে চুনি শোভা করে। যেমত দাড়িম্ব বীজ শুক চঞ্চু ধরে॥" কিন্তু এই বিষয় কবিকে হটাৎ প্রলুব্ধ করিতে পারে। কবির অলক্ষিতে উপমার উশৃঙ্খলতা আসিয়া পড়িয়াছিল—"কারু উরঃ দেশে মুক্তা মালার দোলানী। হিমাচলে আন্দোলিত যেন মন্দাকিনী॥" কিন্তু সতর্ক লেখক লেখনীকে সংযত করিতে জানিতেন—"এসব দর্শনে ভক্তি মনেতে হইবে। কদাচিত অন্যভাব মনেতে নহিবে।" ইহার পরে কাশীবাসী নানা জাতির অনুষ্ঠিত ধর্ম্মোৎসব, বার মাসের নানারূপ ব্যাপারাদি

বর্ণিত আছে। "তুলসী বিবাহ" সেই সময়ে কাশীর একটি বৃহৎ উৎসব ব্যাপার ছিল—রামলীলা, দুর্গালীলা প্রভৃতি যাত্রা সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইত।

কাশীখণ্ডের পুঁথি প্রেমানন্দ দাসের হস্তের লেখা। এই প্রেমানন্দ দাস "মনোশিক্ষা" নামক ক্ষুদ্র বৈষ্ণব পুস্তক রচনা করেন, তাহা বৈষ্ণবগণের আখড়ার একখানা নিত্য পাঠ্য পুঁথি। প্রেমানন্দ দাসের হাতের লেখা মুক্তার ন্যায় গোট গোট ও পুষ্পিত লতার ন্যায় নানা ভঙ্গীতে ক্রীড়াশালী; এই লেখার সর্ব্বত্রই 'ব' 'র' মত লিখিত হইয়াছে—ইহা মিথিলার ধরণে; প্রেমানন্দের হস্তের নকল আরও কতকগুলি পুঁথি আমার নিকট আছে—কাশীখণ্ডের হস্তলিপি ১৮০৮ খৃঃ অব্দের। সর্ব্বশেষ কবি প্রেমানন্দ নিজ রচিত দুইটী গান দিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবী মাধুর্য্য মাখা দুর্গা-বন্দনা।

(খ) রামায়ণ ও মহাভারতাদির অনুবাদ।

(রামায়ণ।)

আমরা কৃত্তিবাসকে বঙ্গের আদি রামায়ণ-রচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি; কবিকঙ্কণ ইঁহাকে বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন—"করজোড়ে বন্দিলাম ঠাকুর কৃত্তিবাস। যাঁহা হৈতে রামায়ণ হইল প্রকাশ॥" (অণুসন্ধান, ১৩০২। ২৯৫ পৃঃ) এবং পরবর্ত্তী বহুবিধ মহাজন ইঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া অনুবাদ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা কৃত্তিবাস সম্বন্ধে লিখিয়াছি, তাঁহার রামায়ণ সম্ভবতঃ অনেকটা মূলের অনুরূপ ছিল; আমরা হস্ত-লিখিত পুঁথিগুলিতে তরণীসেন বধ, বীরবাহুবধ, শ্রীরামের দুর্গাপূজা প্রভৃতি মূল বিষয় বহির্ভূত বিষয় পাই নাই। রামগতি ন্যায়-রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"শ্রীরামের ভগবতী পূজা ও রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন প্রভৃতি প্রস্তাব শ্রীরামপুর মুদ্রিত পুস্তকে কিছুমাত্র নাই॥" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ৮৪ পৃঃ।) সুতরাং আমাদের বিশ্বাস ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে,—কৃত্তিবাস-রচিত সংক্ষিপ্ত মূলানুযায়ী রামায়ণের খাঁতার সঙ্গে পরবর্ত্তী কবিগণ নানা পুরাণসঙ্কলিত প্রস্তাবাংশ ক্রমশঃ একত্র গাঁথিয়া দিয়াছেন;—সর্ব্বশেষ যিনি এই সংশোধন ও যোজনাদি কার্য্য করিয়াছেন, তাহাকে নিকটে পাইয়া আমরা ধরিতে পারিয়াছি—তিনি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী জয়গোপালগণকে ইতিহাস প্রত্নতত্ত্বের ক্ষিপ্রপক্ষ আশ্রয়ে ধরিতে পারিবে কিনা সন্দেহ; সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসের রাক্ষসগণ শ্রীরামের বন্দনাগীত গান নাই। কিছু

পরে ভক্তির বন্যায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল; সেই ভক্তির কয়েকটি লহরী কৃত্তিবাসী রামায়ণের অসুরগুলির 'প্রস্তরকঠিনহৃদয় বিধৌত করিয়া তাহাদিগের রূপ সাত্বিকভাবের স্নিগ্ধমহিমা-সংশ্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং জাতীয় প্রতিভার হস্তে কৃত্তিবাসের প্রতিভা নূতনরূপ গঠিত হইয়াছিল। কোন্ কোন্ কবি কৃত্তিবাসের ছদ্মবেশে আদিকবির অক্ষরের সঙ্গে স্বীয় অক্ষর মিলাইয়া ছিলেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন; আমরা কাহাঁর প্রাপ্য যশোমাল্য কাহাঁর কণ্ঠে দোলাইতেছি কে বলিবে? যখন শিশু ছিলাম,তখন বীরবাহুর স্তুতির এই অংশ সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি; —

"গজ স্কন্ধ হৈতে বীর নেহালে শ্রীরাম। কপটে মনুষ্য দেহ দূর্ব্বাদল শ্যাম॥ চাচর চিকুর শোভে চৌরশ কপাল। প্রসন্ন শরীর রাম পরম দয়াল॥ ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন অতি মনোহর। ভুবন মোহন রূপ শ্যামল সুন্দর॥ রামের হাতের বিচিত্র ধনু বিচিত্র গঠন। সকল শরীরে দেখে বিষ্ণুর লক্ষণ॥ নারায়ণ রূপ দেখি রাবণ কুমার। নিশ্চয় জানিল রাম বিষ্ণু অবতার॥ হাতের ধনুকবাণ ভূতলে ফেলায়ে। গজ হৈতে নামি কহে বিনয় করিয়া॥ ধরণী লোটায়ে রহে জুড়ি দুই কর। অকিঞ্চনে কর দয়া রাম রঘুবর॥ প্রণমহ রামচন্দ্র সংসারের সার। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণুর অবতার॥" ইত্যাদি।

কিন্তু এই বিষ্ণুভক্তির গন্ধ চন্দনমাখা কবিতা-সেফালিকা কাহাঁর? ইহার লেখক খুব সম্ভব কৃত্তিবাস নহেন। অঙ্গদের রায়বায়ের উৎকৃষ্ট বিদ্রূপাত্মক পংক্তিগুলি খুব সম্ভব কৃত্তিবাসের নহে,—উহা কবিচন্দ্র নামধেয় কোন অজ্ঞাত মহাজনের ভণিতাযুক্ত; বটতলা হইতে রামচন্দ্র সীতার জন্য চন্দ্র সূর্য্যকে ডাকিয়া ডাকিয়া যে সুললিত পদ্যে বিলাপ করিয়াছেন, তাহা খুব সম্ভব কৃত্তিবাস সে ভাবে লিখিয়া যান নাই। ইহা শুনিয়া কোন কোন কৃত্তিবাস-ভক্ত পাঠকের দুঃখ হইতে পারে—কিন্তু কঠিন সত্যের আঘাতে জীবনের কত প্রাণ-প্রিয় ধারনা বিসর্জ্জন দিতে হয়,— এই জীবন স্বপ্ন ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে স্বপ্ন রাজ্যের অন্তর্গত কত ছোট ছোট স্বপ্ন নিত্য নিত্য ভাঙ্গিয়া যায়;—দুরন্ত নেংটা শিশুটির ন্যায় সত্য ক্রীড়াচ্ছলে আমাদের সুকুমার বৃত্তির ফুল গুলি লইয়া টানাহেঁচড়া করিতে ভালবাসে।

এখন দেখা যাইতেছে বহুসংখ্যক পরবর্ত্তী কবি যুগে যুগে যুগোচিত নবরত্ন পরাইয়া কৃত্তিবাসকে বঙ্গদেশে প্রচলিত রাখিয়াছেন, তবে কৃত্তিবাসকে তাঁহারা একবারে ঢাকিয়া ফেলিতে পারেন নাই। আদিকবির

সারল্য ও কবিতার অনারম্বড় মাধুর্য্য বর্ত্তমানাকারগ্রস্ত রামায়ণের ও সর্ব্বত্র লীলা করিতেছে, যাঁহারা তাঁহার পুস্তকে যোজনা করিয়াছেন, তাঁহারাও নিজ লেখা কৃত্তিবাসী সারল্যের ছাঁচে গড়িয়া তবে জোড়া দিতে পারিয়াছেন।

কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কৃত্তিবাসের পর অনেক কবি রামায়ণ রচনা করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই সমকক্ষতা-ইচ্ছু কবিগণের কেহই আদি কবির যশঃ হরণ করিতে পারেন নাই। কেবল যাঁহারা তাঁহার কাব্যে বিন্দু বিন্দু অনুরূপ রচনা মিশাইয়া নিজেরা গা ঢাকা দিয়াছেন, তাঁহারা নাম গোত্র শূন্য হইয়া আদি কবির বিরাট কাব্যে আশ্রয় পাইয়াছেন।

আমরা এস্থলে সংক্ষেপে অপরাপর রামায়ণ রচকদিগের উল্লেখ করিয়া যাইতেছি;—

১ এবং ২। ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন—ইঁহারা পিতা পুত্র। ইঁহাদের বাসস্থান "দীনার দ্বীপ" বলিয়া পুঁথিতে পাওয়া যায়; শ্রীযুক্ত অক্রুরচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন, এই দীনার দ্বীপ ও মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত সোণার গাঁর নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান 'ঝিনার দি' একই স্থান। ষষ্ঠীবর ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ২০০ বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিখিতপুঁথি গুলিতেও ইঁহাদের উভয়ের রচনা পাওয়া যাইতেছে। ইঁহারা উভয়েই সাহিত্যব্রতে আজীবন বিবৃত ছিলেন; পদ্মপুরাণ রামায়ণ, মহাভারত এসমস্ত প্রসঙ্গেই ইঁহাদের প্রতিভা খেলিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিগুলির অধিকাংশই এই উদ্যোগী কবিদ্বয়ের লেখার নমুনা আছে। এক খানা প্রাচীন পদ্মপুরাণে দেখা গেল—ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল 'গুণরাজ'। মালাধর বসু, হৃদয়-মিশ্র ও ষষ্ঠীবর—বঙ্গসাহিত্যে এই তিন ব্যক্তির উপাধি "গুণরাজ" পাওয়া যাইতেছে। ষষ্ঠীবর জগদানন্দ নামক কোন ব্যক্তির আশ্রয়ে কাব্য লিখিয়াছিলেন, সেই পরিচয়ের অংশ ৬৬ পৃষ্ঠার নোটে উদ্ধৃত হইয়াছে। রামায়ণের অনেক উপাখ্যান ষষ্ঠীবরের রচিত পাইয়াছি। ষষ্ঠীবরের রচনা সংক্ষিপ্ত, সরল ও পরিপক্ক, কিন্তু তৎপুত্র গঙ্গাদাসের রচিত পদ্য চঞ্চল ও সুন্দর, তাহা বেশ চিত্তাকর্ষক; তত সংক্ষিপ্ত নহে কিন্তু বিস্তার হইয়াও মনোরম্য—কোন অংশই বিরক্তিকর হয় নাই। গঙ্গাদাসের রচিত উত্তরাকাণ্ড রামায়ণ হইতে নমুনা দেখাইতেছি;—সীতার অযোধ্যায় প্রবেশের পর শ্রীরাম বলিলেন "অগ্নি শুদ্ধা হইয়া সীতা পুরীমধ্যে যাউক। পাপিষ্ঠ অযোধ্যার লোক চক্ষু ভরি চাউক।" কিন্তু সীতার "মুক্তা জিনি বিন্দু বিন্দু চক্ষে পড়ে পাণি। রাম সম্বোধিয়া বোলে গদগদ বাণী॥ সংসারের সার তুমি অগতির গতি। আপনি জানহে আমি সতী কি অসতী॥ পৃথিবী নন্দিনী আমি তোমার ঘরণী। বিধাতা সৃজিল মোরে করি অনাথিনী॥ বারংবার

আনি আমা দোষ পুনি পুনি। নগরে চত্বরে যেন কুলটা রমণী॥ অপমান মহাদুঃখ না সএ পরাণে। মেলানি মাগিল সীতা তোমার চরণে॥ তবে তুমি পরে আর নাহি মোর গতি। জন্মে জন্মে স্বামি হউ তুমি রঘুপতি॥ এই বলিয়া সীতা দেবী অতি মনোদুখে। মা মা বলিয়া সীতা ঘন ঘন ডাকে॥ সাগর জঙ্গম ভার সহিবার পার। আমার ভার মা কেন সহিতে না পার॥" কবি গঙ্গাদাস সেন প্রায় প্রত্যেক পত্রেই পিতা ও পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন "পিতামহ কুলপতি, পিতা ষষ্ঠীবর। যার যশঃ ঘোষে লোক পৃথিবী ভিতর॥" ষষ্ঠীবর খুব বিখ্যাত ছিলেন এরূপ অনুমান করিবার আরও অনেক কারণ আছে। আমরা মহাভারত আলোচনা করার সময় এই দুই কবির প্রসঙ্গ পুনশ্চ উত্থাপন করিব।

৩। ভবানী-দাস বিরচিত লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়। ভবানীদাস জয়চন্দ্র নামক কোন রাজার আদেশে এই পুস্তক রচনা করেন। তিনি কে এবং কোন্ সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন অনুষ্ঠিত নানা দেশ-বিজয়ের বৃত্তান্ত এই কাব্যে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থকারকেও পূর্ব্ববঙ্গের লোক বলিয়া বোধ হয়। লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়ে প্রায় ৫০০০ শ্লোক আছে, সুতরাং ইহা আকারে বড়; কিন্তু গুণে বড় বলিয়া বোধ হয় না, রচনা শুষ্ক ও একঘেঁয়ে। এই কাব্যের কয়েকটি স্থলে রামচরণ নামক কবির ভণিতা আছে।

৪। দ্বিজ দুর্গারাম প্রণীত রামায়ণ—ইহা শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় পাইয়াছেন; ইহা কৃত্তিবাসের পরে লিখিত, কবি নিজে তাহা অনেক স্থলে স্বীকার করিয়াছেন। কবির কোনও আত্মবিবরণ পাওয়া যায় নাই; আমি এই পুস্তক পড়ি নাই; অক্রূর বাবু লিখিয়াছেন—ইহার রচনা বড় মধুর। আমরা দ্বিজ দুর্গারাম প্রণীত কালিকা-পুরাণের একখানা অনুবাদ পাইয়াছি।

৫। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ—পূর্ব্বে বিক্রমপুরাঞ্চলে এই পুস্তক অনেক স্থলে প্রচলিত ছিল,—ইহাতে সীতাকে কালীর অবতার কল্পনা করিয়া বাল্মীকীর সীতার উপরে এক নূতন সীতা খাড়া করা হইয়াছে।

৬। জগৎরাম রায়ের রামায়ণ—কিঞ্চিৎ অধিক ২৫০ বৎসর হইল, বাঁকুড়া জেলার ভুলুই গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জগৎরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম রাণীগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, ও বাঁকুড়ার ২০ মাইল উত্তরে। সাবেক ভুলুইগ্রাম নদীগর্ভে,—এখনকার ভুলুইগ্রামে জগৎরাম রায়ের বংশধরগণ বাস করিতেছেন; ভুলুই ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলির দৃশ্য বেশ রমণীয়, কবির উপভোগ্য ও বাসস্থানের উপযুক্ত—"ভুলুই স্থানটি এখনও অতি রমণীয়। দক্ষিণে অদূরে বিহারীনাথ শৈল, পশ্চিমে কিছু দূরে পঞ্চকোট শৈলশ্রেণী ও অরণ্য, উত্তরে অতি নিকটে শীর্ণ দামোদর দুই পার্শ্বে বিস্তীর্ণ বালুকাস্তূপের মধ্য দিয়া তরল রজত রেখার ন্যায় ধীরে বহিয়া যাইতেছে।" (পাক্ষিক-সমালোচক, ১২৯১ বাং ভাদ্র)। কবির পিতার নাম রঘুনাথ রায় ও মাতার

নাম শোভাবতী। পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথ সিংহ ভূপের আদেশে ইনি রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করেন, ১৭১২ সম্বতে (১৬৫৫ খৃঃ অব্দ) এই পুস্তক শেষ হয়। রামায়ণের পর এই কবি "দুর্গাপঞ্চরাত্রি" নামক একখানা কাব্য রচনা করেন, ইহাতে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক কিষ্কিন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসব বর্ণিত হইয়াছে। ১৬০২ শকে (১৬৮০ খৃঃ অব্দ) ইহা সম্পূর্ণ হয়। এই কাব্যের ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমীর পালা জগৎরাম রায়ের রচিত; অবশিষ্ট দুই পালা তৎপুত্র রামপ্রসাদ রচনা করেন। জগৎরাম রায়ের রামায়ণে মধ্যে মধ্যে বেশ সুন্দর বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহা ততদূর প্রাঞ্জল নহে। মিষ্ট শব্দ ব্যবহারে কবি সর্ব্বত্র পটু নহেন; "দুর্গাপঞ্চরাত্রির" কবির পরবর্ত্তী কাব্য, ইহার রচনা পরিপক্ক ও বেশ উপাদেয়। শিব ও গৌরীর কথা বার্ত্তা লইয়া মধুর ও তীব্র একটি দাম্পত্য-কোন্দল লিখিত হইয়াছে; গোপীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের 'রাখালী' 'পীতধটা' ও 'তিন ঠাঁই বাঁকার' খোঁটা ও শিবঠাকুরের সিদ্ধিধুতুরাপ্রিয়তা উপলক্ষে গৌরীর মিষ্ট ভর্ৎসন—সোহাগে ও গালিতে মিশ্রিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে রৌদ্রমিশ্র বৃষ্টির ন্যায় কৌতূহলকর হয়। জগৎরাম রায়ের কবিত্বের নমুনা;—"তুমিহে যেমন বলিলে তেমন, এমতি তোমার কাম। তব দোষ নয়, ধুতুরাতে কয়, তেঞিসে এমন সাজ। এই করিয়া সব খোয়াইয়া, হয়েছে দিগম্বর। তোমার গুণে, বিঁধিল ঘুণে আমার অন্তর॥ বিভূতি গায়, দেবের সভায়, যে যায় লেংটা বেশে। এমত কথা, বলিতে হেথা লাজ কি সুখে এসে॥ ভাঙ্গের ঘোরে, নয়ন ফিরে, চলিতে ঠাহর নাই। জটার ঘটা, বিভুতি কৌটা, দেখিলে ভয় পাই॥" রামপ্রসাদ ও পিতার অযোগ্য পুত্র নহেন,—দুর্গাপঞ্চরাত্রিতে তিনি এই ভাবে মুখবন্ধ করিয়াছেন,—"নবমী দশমী দুই দিবসের গান। বর্ণনা করিতে মোরে দিলা আজ্ঞা দান॥ আজ্ঞা পেয়ে হর্ষ হয়ে কৈনু অঙ্গীকার। যেমন মশকে লয় মাতঙ্গের ভার॥ বামন বাসনা যেন বিধু ধরিবারে। পঙ্গু লঙ্ঘিবারে চায় সুমেরু শিখরে॥ তেন অঙ্গীকার কৈনু পিতার বচনে। আগু পাছু কিছুমাত্র না ভাবিলাম মনে॥" রামপ্রসাদরচিত অপর একখানা বড় কাব্য আছে, তাহার নাম—"কৃষ্ণ লীলামৃত রস"।

৭। রামমোহনের রামায়ণ—এই অনুবাদ একরূপ আধুনিক, ১৮৩৮ খৃঃঅব্দে এই পুস্তক সমাপ্ত হয়। রামমোহনের পিতার নাম বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়; বাড়ী নদে জেলার গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ মেটেরী গ্রাম। গ্রন্থকার পিতার আদেশে নিজ বাড়ীতে সীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই বিগ্রহদ্বয়ের নিকট খুব ভক্তির উৎসব চলিত বলিয়া কবি বর্ণনা করিয়াছেন—"সে রামের দ্বারেতে সতত হুড়াহুড়ি। কেহ নাচে, কেহ গায়, দেয় গড়াগড়ি॥" পিতার আদেশে কবি সীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন ও "কৃপা করি আদেশ করিলা হনুমান। রামায়ণরচি কর জীবের কল্যাণ॥" তদনুসারে—"রচিলাম তাঁর আজ্ঞা ধরিয়া মস্তকে। সাঙ্গ হইল সপ্তদশ শতষষ্ঠী শকে॥" এই রামায়ণ সর্ব্বত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় প্রাঞ্জল না হইলেও মধ্যে মধ্যে এরূপ অংশ আছে, যাহা আদি কবির প্রতিভার কণিকাপাতে স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে মণ্ডিত হইয়াছে, যথা—"আসরে

নবীন মেঘ দিল দরশন। যেমত সুন্দর শ্যাম রামের বরণ॥ ঘন ঘন ঘন গর্জ্জে অতি অসম্ভব। যেমন রামের ধনু টঙ্কারের রব॥ রয়ে রয়ে সৌদামিনী চমকে গগনে। যেমন রামের রূপ সাধকের মনে॥ ময়ুর করয়ে নৃত্য নব মেঘ দেখি। রাম দেখি সজ্জন যেমত হয় সুখি॥ সদা জলধারা পড়ে ধরণী উপরে। সীতা লাগি যেমত রামের চক্ষু ঝোরে॥ সরসিজ শোভাকর হৈল সরোবরে। যেমত শোভিত রাম সেবক অন্তরে॥ মধু আসে পদ্মে অলি বাস করে মোদে। যেমত মুনির মন রাঘবের পদে। জলপানে চাতকের তৃষ্ণা দূরে যায়। রাম পেলে যেমত বাসনা ক্ষয় পায়॥ পুলকিত হয়ে মেঘ ডাকে ঘনে ঘন। যেমত রামেরে ডাকে নামপরায়ণ॥ নদ নদী অতি বেগে সমুদ্রে মিশায়। যেমত রামের অঙ্গে জীব লয় পায়॥ অবিরত বৃষ্টিতে পৃথ্বীর তাপ যায়। যেমত তাপিত রাম নামেতে জুড়ায়॥" (কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড) কবির বিদ্রূপ শক্তি বেশ ছিল। ভরত ও শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় ফিরিলে পরে কুব্জা সকলের নিকট বড়াই করিয়া বলিয়াছিল, সে রাজপুত্রদের নিকট অনেক ভূষণ উপঢৌকন পাইবে। তৎপরিবর্ত্তে শত্রুঘ্নের প্রহারে কুব্জ দেহ সুজু হইয়া পড়িল ও লজ্জায় কুব্জা পালাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল তখন— "নারীগণ কহে ভূষা দেখাইয়া যা। কুব্জা কহে ভাতার পুতের মাথা খা।" হনুমান লঙ্কাদহের পর বন্দী অবস্থায় ঢাক ঢোল বাদ্য সমন্বিত হইয়া লঙ্কার পথে পথে নীত হইতেছেন—"হনুমান কন মোর বিবাহ না হয়। কন্যাদান করিবে রাবণ মহাশয়॥ রাবণের কন্যা মোর গলে দিবে মালা। রাবণ শ্বশুর মোর ইন্দ্রজিত শালা॥ চারিদিগে হাসয়ে যতেক নিশাচর। কেহ বা ইষ্টক মারে কেহ বা পাথর॥ হনুমান কন বিবাহের কাজ নাই। এমন মারণ খায় কাহার জামাই॥" সুন্দরাকাণ্ড। ইহা আধুনিক সংযত রহস্যের ওষ্ঠচাপা হাস্য নহে—ইহা ধূলি ও কাদা হস্তে উচ্চ হো হো শব্দকর সেকেলে হাস্যরস; রামমোহন কবির ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট এই পুস্তকের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে।

৮। রঘুনন্দন গোস্বামী-রচিত রামরসায়ণ। রঘুনন্দন ও বেশী প্রাচীন লেখক নহেন; ১০০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল গত হইল তিনি বৰ্দ্ধমান জেলান্বিত মাড়ু গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনন্দন নিত্যানন্দবংশ-সম্ভূত বংশতালিকা এইরূপ—১। নিত্যানন্দ, ২। বীরভদ্র, ৩। বল্লভ, ৪। রামগোবিন্দ, ৫। বিশ্বম্ভর, ৬। বলদেব, ৭। কিশোরীমোহন, ৮। রঘুনন্দন; কিশোরীমোহনের আর তিনপুত্র ছিল, বিশ্বরূপ, সর্ব্বর্ষণ ও মধুসূদন; রঘুনন্দন তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। কিশোরীমোহন স্বয়ং একজন প্রসিদ্ধ ভাগবত ছিলেন ও তিনি নিজে বহুবিধ বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রঘুনন্দনের গুরুর নাম পাণ্ডব বিদ্যালঙ্কার। 'সেকাল আর একাল' পুস্তকে লিখিত আছে, রঘুনন্দন প্রায়শঃ প্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতা আসিতেন; রামকমল সেন মহাশয় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

রঘুনন্দনের মাতার নাম উষা ও বিমাতার নাম মধুমতী ছিল; রামরসায়ণ ব্যতীত রঘুনন্দনের শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার লীলা বিষয়ক একখানা বড়গ্রন্থ আছে। রঘুনন্দনের অপর নাম ভাগবত।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পর, অপরাপর যে সব রামায়ণের অনুবাদ আমরা পাইয়াছি, তন্মধ্যে রামরসায়ণ খানাই ভাল বলিয়া বোধ হয়। কবি অনেকাংশে বাল্মীকিকে অনুসরণ করিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তুলসীদাসের হিন্দীরামায়ণ হইতেও কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে। রামরসায়ণের অধ্যায় বিভাগ ঠিক বাল্মীকির পথে করা হয় নাই, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী রামায়ণগুলি হইতে এখানা বেশী সুশৃঙ্খল, সন্দেহ নাই। অধ্যায়গুলি এই ভাবে বিভক্ত হইয়াছে;—আদ্যকাণ্ড ১১, অযোধ্যা অরণ্য ৮, কিষ্কিন্ধ্যা ১০, সুন্দরা ১২, লঙ্কা ৩৬ ও উত্তরাকাণ্ড ১৮ অধ্যায়। কবির রচনায় সংস্কৃত শব্দ অতিরিক্তমাত্রায় পড়িয়াছে, মধ্যে মধ্যে তাহা শ্রুতিকটু হইয়াছে কিন্তু এরূপ রচনা ও বিরল নহে— "এথা রঘুবর, করিতে সমর, সুখেতে মগন হইয়া। অতি সুকোমল, তরুণ বাকল, পরিলা কটিতে আঁটিয়া॥ শিরে অবিকল, জটার পটল, বাঁধিলা বেড়িয়া বেড়িয়া। পরিলা বিকচ, কঠিন কবচ, শরীরে সুদৃঢ় করিয়া॥" রঘুনন্দনের পয়ারে ১৪ অক্ষরের নিয়ম কচিৎ লঙ্ঘিত হইয়াছে, এই কাব্যে নানা ছন্দের লীলা খেলা দৃষ্ট হয়, তাহা পরে আলোচনা করিব। কিন্তু কবির সংস্কৃতপরায়ণতা সত্ত্বেও হিন্দীভাষার ছিটা ফোটা তাঁহার কাব্যের প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। কঁহিতু কৈঁলু, তিঁহ, তবহু প্রভৃতি ক্ষুদ্র শব্দগুলি সংস্কৃতের সুশৃংখল ও পরিশুদ্ধ প্রণালীর মধ্যে হিন্দী প্রভাবের পতনোন্মুখ ধ্বজা উড়াইতেছে।

কবি রামরসায়ণের উত্তরাকাণ্ডে করুণরসের অংশগুলি ছাড়িয়া দিয়াছেন। সীতাবর্জ্জন লক্ষ্মণ বর্জ্জন, সীতার পাতাল প্রবেশ রামরসায়ণে স্থান পায় নাই। যে ঘটনা মনকে দুঃখের তরঙ্গে ফেলিয়া যায়, যাহাতে প্রাকৃতিক বিধানের উৎকর্ষের উপর সন্দেহ জন্মে, যেখানে সত্য ও শুভের অসমর্থতা প্রমাণিত হয়—তাহাদের শ্মশানের উত্তাপে করুণার অশ্রুবিন্দু শুকাইয়া যায়, বৈষ্ণবগণ সেরূপ ঘটনা বর্ণনা করিতে ভালবাসিতেন না। চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতে গৌরাঙ্গ প্রভুর তিরোধান বর্ণিত হয় নাই।

বিয়োগান্ত দৃশ্য অঙ্কন করিতে হিন্দুকবিগণ সততই অনিচ্ছুক, এইজন্য নায়ক নায়িকার দুঃখময় জীবন সমাপ্ত হইলে তাঁহারা শ্মশানের উপরে পটক্ষেপ করিয়া পাঠকের মনে ব্যথা দেন না, কল্পনার স্বর্গরাজ্য গড়িয়া নায়ক নায়িকাকে তথায় পৌঁছাইয়া ক্ষান্ত হন; বিয়োগান্ত দৃশ্য কবির লিপি কৌশলে সুখান্ত দৃশ্যের আভা ধারণ করিয়া পাঠকের দুঃখ ভুলাইয়া ফেলে।

রঘুনন্দন তাঁহার রামরসায়ণ গৃহ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধামাধব বিগ্রহের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন—"করিলাম যেই রাম বিলাস বর্ণন। শ্রীরাধামাধবে ইহা করিনু অর্পণ॥"

মহাভারত।

রামায়ণকাব্যে আদত উপাখ্যান ভিন্ন বাজে প্রসঙ্গ বেশী নাই; কিন্তু মহাভারতের মূলগল্পের সহিত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগল্প জড়িত হইয়া রহিয়াছে। ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, ও দুর্য্যোধনাদির সঙ্গে যযাতি, নল ও দুষ্মন্ত দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে উপমন্যু আরুণি ও উতঙ্ক প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তিগুলি দাঁড়াইয়াছেন; মূল ঘটনা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সঙ্গে ইঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই—ইঁহারা বড় বড় ছবির ফ্রেমের উর্দ্ধে ও অধে ছোট ছোট অবান্তর চিত্রের ন্যায় মহাভারতের মলাট শোভিত করিতেছেন মাত্র। মহাভারতের উপগল্পের অবধি নাই, পাঠক পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন—দ্রৌপদীর বস্ত্রের ন্যায় তাহারা একরূপ অফুরন্ত। জন্মেজয়ের ন্যায় অনুসন্ধিৎসু শ্রোতা ও বৈশম্পায়ণের ন্যায় ধৈর্য্যশীল বক্তা পরস্পরের গুণের পরিচয় দিতে ইচ্ছুক হইয়াই যেন পুঁথি এত লম্বা করিয়া তুলিয়াছেন; রুরুর গল্পের অর্দ্ধভাগ শেষ না হইতেই সর্পযজ্ঞের গল্প, এই গল্পের আধখানা শেষ না হইতেই আবার সমুদ্রমন্থনের প্রসঙ্গ আরম্ভ, সমুদ্রমন্থনের কথা শেষ না হইতেই ইন্দ্রের লক্ষ্মীভ্রষ্ট হওয়ার বিবরণ,—এই গল্পের অকুল সমুদ্রে পড়িয়া পাঠকের দিশাহারা হইয়া যাওয়ার কথা।

এরূপ কাব্যে গল্পজোড়া দেওয়ার বড় সুবিধা। জন্মেজয়কে দিয়া একটা প্রশ্ন করিলেই লেখক স্বীয় কল্পিত গল্পটি জুড়িয়া দিতে পারেন। বাঙ্গলা মহাভারতগুলি এই ভাবে ক্রমে ক্রমে বড় হইয়াছে;—মূল-বহির্ভূত শ্রীবৎস ও চিন্তার উপাখ্যানের ন্যায় অনেক বাজে গল্প মহা-ভারতরূপ মহাবৃক্ষের তলে আশ্রয় পাইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

আমরা কাশীদাসের পূর্ব্বে সঞ্জয় মহাভারত, ও কবিন্দ্র রচিত (পরাগলী) মহাভারত সমগ্র পাইয়াছি, এবং নসরত সাহার আদেশে রচিত মহা-ভারতের খবর পাইয়াছি, এই মহাভারত পরাগলী মহাভারতের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ষষ্ঠীবরসেনরচিত স্বর্গারোহণ পর্ব্বের শেষপত্রে জানিতে পাই, তিনিও সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। কাশীদাসের পূর্ব্বে এইগুলি ও সম্ভবতঃ আরও অনেকগুলি সমগ্র মহাভারত

বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল; কিন্তু ইহা ছাড়াও উক্ত খ্যাতনামা কবি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারতোক্ত উপাখ্যান ও পর্ব্ববিশেষের অনুবাদ হাতে পাইয়াছিলেন, ছুটিখাঁর আদেশে শ্রীকরনন্দী অশ্বমেধপর্ব্বের অনুবাদ করেন, রাজেন্দ্রদাস প্রণীত আদিপর্ব্ব, গোপীনাথদত্তপ্রণীত দ্রোণপর্ব্ব, গঙ্গাদাসসেনপ্রণীত আদিও অশ্বমেধ পর্ব্ব এতদ্ব্যতীত নানা কবির রচিত নলোপাখ্যান, প্রহ্লাদ চরিত্র ও ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যান প্রভৃতি মহাভারতের অংশগুলিও কাশীদাসের পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। কবিকঙ্কণ যেরূপ বলরাম ও মাধবাচার্য্যের চণ্ডীর উপর তুলি ধরিয়া তাহা সুন্দর করিয়াছেন, কাশীদাস তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের রচনার উপর ঠিক সেই ভাবে তুলিক্ষেপ করিতে পারেন নাই। কবিকঙ্কণ পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীগুলির ভাষামার্জ্জিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু কাব্যোক্ত চরিত্র গুলি জীবন্ত করিয়াছেন, তিনি মনুষ্য-প্রকৃতি গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত পাঠ করিয়া প্রাপ্ত উপকরণ রাশিতে হস্ত দিয়াছেন; যাঁহারা উপকরণ-রাশি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা মুকুন্দরামের মুজুরি করিয়াছেন মাত্র; কবি মহাপুরোহিতের ন্যায় স্বীয় প্রতিভার শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া সেই উপকরণ রাশিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু কাশীদাসের সেরূপ গৌরব কিছুই নাই; তিনি অনেক স্থলেই পূর্ব্ববর্ত্তী রচনাগুলির ভাষা একটু মার্জ্জিত করিয়া পত্রশেষে "কৃষ্ণদাসানুজ" কি "গদাধরাগ্রজ" ভণিতা দ্বারা সত্য সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছেন। কাশীদাসের মহাভারত যে অবস্থায় আমরা পাইতেছি, সে অবস্থায় অংশবিশেষের তুলনা না করিয়া ধারাবাহিকরূপে ইহাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু রাজেন্দ্রদাসের শকুন্তলোপাখ্যানের সঙ্গে তুলনা করিলে কাশীদাস-রচিত সেই উপাখ্যান অতি হীন বলিয়া বোধ হইবে; গঙ্গাদাসের অশ্বমেধপর্ব্ব কাশীরাম দাসের অশ্বমেধপর্ব্বের সঙ্গে তুলিত হইলে যশঃসম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা নাই। পরাগলী মহাভারতে ও সঞ্জয় মহাভারতে এরূপ অনেক অংশ আছে যাহা কাশীদাসী মহাভারতের সেই সব অংশ হইতে সুন্দর;—তথাপি ধারাবাহিকভাবে কাশীদাসের পুস্তকখানাই বোধ হয় উৎকৃষ্ট,—কিন্তু বটতলার কৃপায় কাশীদাসের রচনা পরিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত না হইলে তাহার স্থান কিরূপ হইত বলা যায় না।

সঞ্জয় ও কবীন্দ্র-রচিত ভারত ও ছুটিখাঁর আদেশে-রচিত অশ্বমেধপর্ব্ব সম্বন্ধে আমরা ইতি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অপরাপর যে সব মহাভারতের উপাখ্যান আমরা কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করি, তৎসম্বন্ধে এস্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

রাজেন্দ্রদাস, গোপীনাথ দত্ত, ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস-বিরচিত মহাভারতের কতকগুলি অংশের অনুবাদ আমরা পাইয়াছি, সে গুলির হস্তলিপি কিঞ্চিন্ন্যূন দুইশত বৎসর পূর্ব্বের; রচনা দেখিয়া বোধ হয় এই সব কবি অন্যূন ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে পুস্তক লিখিয়াছিলেন; ইঁহাদের মধ্যে রাজেন্দ্রদাসকে আমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করি; ইঁহার রচিত আদিপর্ব্বের প্রায় সমস্ত অংশ পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে শকুন্তলা উপাখ্যানটি বড় সুন্দর হইয়াছে—ইহা কালিদাসের শকুন্তলার প্রতিচ্ছায়া ও মধ্যে মধ্যে মাঘ প্রভৃতি কবির উৎপ্রেক্ষা-মণ্ডিত। ভাষাটি পূর্ব্ববঙ্গের, অতি জটিল তাহাতে আবার এত প্রাচীন; কিন্তু কবির তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য্যবোধ এই জটিল অপ্রচলিতশব্দবহুল রচনার মধ্যে মধ্যেও দৃষ্টিগোচর হয়,—পুরাতন বন্ধুরগাত্র বনদ্রুমের নিবিড় পত্র ভেদ করিয়া যেরূপ মধ্যে মধ্যে সুগন্ধি সুন্দর ফুল দেখিতে পাওয়া যায়, এই দ্বিশত বৎসর জীর্ণ পুঁথির অদ্ভুত ভাষার মধ্যে মধ্যেও সেইরূপ প্রকৃতকবির উপযুক্ত সুন্দর ভাবের কথা সন্নিবিষ্ট আছে।

এইকাব্যে অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা, বিদূষক প্রভৃতি কালিদাসের তাবত চরিত্রই গৃহীত হইয়াছে। দুষ্মন্ত মৃগয়ায় চলিতেছেন, তাঁহার অনুচর গোষ্ঠী সঙ্গে সঙ্গে; রাজধানীর সুন্দরীগণ গবাক্ষ হইতে,—"যার যার প্রিয়জন এই বাস্ত বলি। প্রিয়জন সম্বোধিয়া দেখায় অঙ্গুলী॥" দুষ্মন্ত মুনির তপোবনে পৌঁছিলেন, শকুন্তলা তখন ও আসেন নাই, কিন্তু আসিবেন, বহিঃপ্রকৃতি যেন আগুন্তক ভালবাসার সাহায্যার্থ দাঁড়াইল, প্রকৃতির বর্ণনাটি বেশ সুন্দর—

"শীতল পবন বহে, সুগন্ধি বহে বাস। ফল ফুলে বৃক্ষ সব নাহি অবকাশ॥ মন্দ মন্দ বায়ুএ বৃক্ষসব নড়ে। ভ্রমরের পদ-ভরে পুষ্প সব পড়ে॥ নব নব শাখা গাছি অতি মনোহর। থোপা থোপা পুষ্প নড়ে গুঞ্জরে ভ্রমর॥ নির্ম্মল বৃক্ষের তলে পুষ্প পড়ি আছে। লক্ষে লক্ষে বানর বেড়ায় গাছে গাছে॥ হেনজল না দেখিলুম নাহিক কমল। হেনপদ্ম না দেখিলুম নাহিক ভ্রমর॥ হেন ভৃঙ্গ নাহি যে না ডাকে মত্ত হৈয়া। কেবা জোহ না বান্ধে সে বন দেখিয়া॥" শেষের চারি পংক্তির কবিত্ব প্রশংসনীয়, কিন্তু

উহা ভট্টিকাব্যের একস্থলের পুনরাবৃত্তি মাত্র। বর্ণিত সুন্দর প্রকৃতিটি ছবির পশ্চাৎক্ষেত্রের ন্যায়, শকুন্তলা এই প্রকৃতির উপযোগী ছবি; তিনি যখন অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার সঙ্গে আসিলেন, তখন কবি "চিত্রের পুত্তলী যেন পটেতে লিখিল" বলিয়া পটপূর্ণ করিলেন। রাজা শকুন্তলাকে বনদেবী ভাবিয়া ফার্ডিনেণ্ডের ন্যায় কথা বলিতে লাগিলেন; শকুন্তলা ব্রীড়াবনতা, আবেশ-ময়ী, সে সব শুনিয়া—"হইলা লজ্জিত। বসনে ঢাকিয়া মুখ হাসিলা কিঞ্চিৎ॥" বসনত ছাই বাকল! তৎপর গন্ধর্ব্ব বিবাহ শেষ। বিবাহের বার্ত্তা মুনি কন্যাগণ জানেন না, বিবাহের পর শকুন্তলাকে তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য ঈষৎ পরিক্লিষ্ট কিন্তু বড় মধুর হইয়াছে, তাঁহাদের সরল বাক্চাতুরী পড়িতে পড়িতে বাল্মীকির "প্রভাত কালেষু ইব কামিনীনাং" শ্লোকটি মনে হইয়াছে। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাশার শাপ, কন্বমুনির স্নেহ, পরে কাঁদিতে কাঁদিতে শকুন্তলা এক দিন তাঁহার আজন্মসঙ্গিনী সখিগণ, উদ্যানের তরুলতা ও কুরঙ্গ শাবকের গলা জড়াইয়া শেষ বিদায় লইলেন। রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের পর অপমানিতা সুন্দরীর অভিমান-পূর্ণ তীব্র বাক্যগুলি,—রাজসভা হইতে তাড়িতা শকুন্তলা একাকিনী "কুহরি কুহরি কাঁদে তাপিত হইয়া।"—এই সব বেশ সৌন্দর্য্য-জ্ঞান-বিশিষ্ট তুলিকরের হস্তের কর্ম্মের ন্যায় সুন্দর হইয়াছে। শকুন্তলা অপমানিতা হইয়াও পতিতে অনুরক্তা, যিনি নিষ্ঠুর হইতেও নিষ্ঠুরের ন্যায় তাঁহার প্রতি ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাকে কাঁহারও সতীর নিকট নিষ্ঠুর বলিবার যো নাই, শকুন্তলা দুষ্মন্ত দেবের পূজক; দুষ্মন্তের মুখে অনুশোচনা শুনিলে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়—"শকুন্তলা বোলে শুন, নিঠুর না বোল পুনঃ প্রাণ হৈতে পতি ভিন্ন নহে। যাইব তোমারি সনে, কোন দুঃখ নাহি মনে, তুমি বিনে কেবা মোর হয়ে॥ ভাবি চাহ মনে মনে, চন্দ্ররশ্মিপান বিনে, বৃষ্টিজলে না জীয়ে চকোর। মীন যেন জল বিনে, পঙ্কজ মধু বিহনে, পতি বিনে নারীর কঠোর॥"

এই উপাখ্যান লইয়া পাপ পুণ্য সম্বন্ধে দীর্ঘ গবেষনা ও অন্য নানারূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে; কাশীদাসের শকুন্তলার শ্লোক সংখ্যা ১৭৮, রাজেন্দ্রদাসের শকুন্তলায় ১৫০০ শ্লোক। ইহা প্যারাডাইস লষ্টের দুইটি বড় অধ্যায়ের তুল্য। আমরা এরূপ বলিনা যে, রাজেন্দ্রদাসের কবিতা সর্ব্বত্রই সরল ও সুন্দর, ইহা যে সময়ের রচনা তখনকার ভাষা আধুনিক ভাষা-

হইতে যত তফাৎ, সেই সময়ের কথা বার্ত্তা, হাস্য পরিহাস এবং রুচি ও এখন হইতে সেইরূপ স্বতন্ত্র ছিল, স্থলে স্থলে পাঠকের বিরক্তি জন্মিতে পারে।

রামায়ণের অনুবাদ প্রসঙ্গে আমরা ষষ্ঠীবর ও তৎপুত্র গঙ্গাদাসের বিষয় জানাইয়াছি; ষষ্ঠীবরের রচিত স্বর্গারোহণ পর্ব্ব আমার নিকট আছে। এবং উহার শেষ পত্রে এই কবির রচিত সমগ্র মহাভারতের বিষয় উল্লেখ দেখিয়াছি। ষষ্ঠীবরের রচনা অনাড়ম্বর, বক্তব্য বিষয় বেশ সুন্দর ভাবে বলা হইয়াছে, তাহাতে কল্পনার জাকজমক নাই, মধ্যে মধ্যে দুএকটি মিষ্ট শব্দ ও সুন্দর উপমা বেশ ফুটিয়াছে, যথা—"স্বর্গ হৈতে নামিয়াছে দেবী মন্দাকিনী। পাতালে বহন্তি গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥ উত্তরে দক্ষিণে বহে সুরেশ্বরী-ধার। পৃথিবী পড়েছে যেন মালতীর হার॥" এই লেখা পড়িয়া আমাদের কালিদাসের। "মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে। মুক্তামালা কণ্ঠগতৈব ভূমেঃ॥" মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু কবি বোধ হয় তাহা মনে করিয়া লিখেন নাই।

আমরা গঙ্গাদাস সেনের আদিপর্ব্ব ও অশ্বমেধপর্ব্ব পাইয়াছি; আদিপর্ব্বে তাঁহার রচিত দেবযানী-উপখ্যান বেশ সুন্দর; ইনি পিতা হইতে অধিক ক্ষমতাশালী; কাশীদাসের রচনায় বটতলার পালিশ না পড়িলে গঙ্গাদাস সেন প্রায় তাঁহার সমকক্ষ হইতেন,—অনেক স্থলে বেশ আড়াআড়ি চলিতে পারিত; গঙ্গাদাস সেনের অশ্বমেধপর্ব্ব কাশীদাসের অশ্বমেধপর্ব্ব হইতে আকারে বড়। রচনার কিছু নমুনা দেওয়া যাইতেছে:—

"যৌবনাশ্ব পুরী ভীম দেখিলেক দূরে। সুবর্ণপূর্ণিতঘট প্রতি ঘরে ঘরে॥ বিচিত্র পতাকা উড়ে দেখিতে সুন্দর। দীপ্তমান শোভে যেন চন্দ্র দিবাকর॥ অতি বিলক্ষণ পুরী দেখিতে শোভিত। সহস্র কিরণ বেড়ি থাকে চারিভিত॥ যূপ আরোপিত পথে আছে সারি সারি। যজ্ঞ ধূমে অন্ধকার গগন আবরি॥ নানা বাদ্য নৃত্য গীত জয় জয় ধ্বনি। বেদধ্বনি নূপুরধ্বনি এই মাত্র শুনি॥ মণ্ডপ প্রাসাদ মঠ বিচিত্র নগর। পুরী দেখি হরিষ হইল বৃকোদর॥ ফলিত কদলীবন দেখিতে শোভিত। ডাল সনে পুষ্পভরে হয়েছে নমিত॥ গন্ধে আমোদিত সব সুললিত ঘ্রাণ। নানা বৃক্ষ লতাতে বিচিত্র নির্ম্মাণ॥ খর্জ্জুর পাক্রেলা যত ফলিত সঘন। দেখিতে জুড়ায় আঁখি দুঃখ বিমোচন॥ বিদারিত দাড়িম্বে বেষ্টিত পুরীখান। পূগাবস্ত দেখি যেন দেবতার স্থান॥ লেবু জাম্বীর আর নারাঙ্গার ফুল। অশোক চম্পক নাগ কেশর বকুল॥ সুবর্ণ কেতকী আদি জাতি ক্রম লতা। মালতি চম্পক কুন্দ লতিকা পুষ্পিতা॥ পশুপক্ষী বেড়ি ক্রীড়া করয়ে সকলে। কোকিলের ধ্বনি আর ভ্রমরের বোলে॥"

উদ্ধৃতাংশ ও এইরূপ নানা অংশের সঙ্গে কাশীদাসকবির সেই সেই স্থলের বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখিলে গঙ্গাদাস তাঁহার নিকট খর্ব্ব হইয়া পড়িবেন বলিয়া বোধ হয় না।

গোপীনাথদত্তের দ্রোণপর্ব্ব আমরা পাইয়াছি। ইহাতে উক্ত পর্ব্বের অন্যান্য বিষয়ের সহিত বহুপত্র জুড়িয়া দ্রৌপদী-যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে; অভিমন্যু বধে ক্রুদ্ধা রমণীদল কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন—দ্রৌপদী, সেনাপতি। ঘনরামের কাব্যে আমরা কানেড়ার যুদ্ধ বিবরণ পড়িয়াছি; ইতিহাসে দুর্গাবাইও লক্ষ্মীবাইএর নাম পাঠক মণ্ডলীর নিকট অবিদিত নহে, আমরা কালীদেবীর যুদ্ধ মূর্ত্তি গড়িয়া আজও পূজা করিয়া থাকি সুতরাং মহাভারতে দ্রৌপদী-যুদ্ধে অসম্ভব কল্পনা কিছুই নাই; কিন্তু যে দেশের পুরুষই ললনা. সে দেশের ললনা আঙ্গিনার রৌদ্রে ও বাতাসে উনাইয়া পড়িবার কথা,—যুদ্ধক্ষেত্রেরত কথাই নাই। বোধ হয় কাশী-দাস বাঙ্গালীর নাড়ী টের পাইয়াই দ্রৌপদী যুদ্ধের পালা জানিয়া থাকিলেও ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। গোপীনাথ দত্তের দ্রোপদীযুদ্ধে আশ্চর্য্য কবিত্বের চিহ্ন নাই, তবে তাঁহার বর্ণিত পত্রগুলির শেষে কাশীদাসের ভণিতা দিয়া তাহা কাশীদাসী মহাভারতের যুদ্ধ বর্ণনাগুলির সঙ্গে আঁটিয়া দিলে কোন সমালোচক তাহা অন্য কবির লেখা বলিয়া ধরিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ, মধ্যে মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের দু একটি শব্দ পরিবর্ত্তন করিলেই গোপীনাথ কাশীদাসে মিশিয়া যাইতে পারেন।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, কাশীদাসই ধারাবাহিকভাবে মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক; এই কবির জীবন সম্বন্ধে আমরা অতি যৎসামান্য বিবরণ জানিতে পারিয়াছি। কাশীরাম বর্দ্ধমান জেলার উত্তরে ইন্দ্রানী পরগণাস্থিত সিঙ্গি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, এইগ্রাম ব্রাহ্মণী নদীর তীরস্থ; কাশীরামকবির প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামহের নাম সুধাকর ও পিতার নাম কমলাকান্ত দেব; কমলাকান্তের ৩ পুত্র ছিল, কৃষ্ণদাস, কাশীদাস ও গদাধর। এই গদাধরের হস্তলিখিত সমগ্র মহাভারত রাইপুর রাজবাড়ীতে এখনও আছে, তাহা ১০৩৯ সালের লেখা, সে আজ ২৬৩ বৎসরের কথা। গদাধর কাশীদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; সুতরাং কাশীদাস ন্যূনাধিক ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন; এবং সম্ভবতঃ ২৭০ বৎসর পূর্ব্বে

মহাভারতের অনুবাদ সাঙ্গ করেন। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, কাশীরাম দাসের পুত্র আপন পুরোহিতদিগকে যে বাস্তুভিটা দান করেন, সেই দান পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১০৮৫ সালের লিখিত; বলা বাহুল্য এই দান পত্রোক্ত সন আমাদের মতের অনুকূল। সিঙ্গিগ্রামে "কেশে পুকুর" নামক একটি পুকুর আছে ও তথাকার লোকগণ "কাশীর ভিটা" বলিয়া একটি স্থান এখনও দেখাইয়া থাকেন।

কথিত আছে, কাশীরামদাস মেদিনীপুর আভাসগড়ের রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া পাঠশালা করিতেন; রাজবাড়ীতে যে সমস্ত কথক ও পুরাণ পাঠকারী পণ্ডিত আসিতেন, তাঁহাদের মুখে তিনি মহাভারত-প্রসঙ্গ শুনিয়া ইহাতে অনুরক্ত হন, এই অনুরাগের ফল—মহাভারতের অনুবাদ। সে সময়ের অনুবাদ মূল কাব্যের ছায়া লইয়া লিখিত হইত, কাশীদাসী মহাভারত ঠিক সংস্কৃতের অনুযায়ী নহে, এই জন্য কবি সংস্কৃত জানিতেন না, এরূপ মত প্রচার করা বোধ হয় উচিত নহে। নানা পুরাণ হইতে তিনি উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন, এইজন্য পুরাণ শুনার কথা লিখিয়া থাকিবেন। কৃত্তিবাসের ভণিতার সঙ্গে সঙ্গেও পুরাণ শুনিয়া গীতরচনার কথা লিখিত আছে, অথচ কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণে জানা যায়, তিনি সংস্কৃতে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। ভণিতার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে পুঁথি-লেখকগণ ও অনেক কথা যোজনা করিয়া থাকেন।

"আদি সভা বন বিরাটের কতদূর। ইহা লিখি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥"—
এই একটি চলিত বাক্য আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন স্বর্গপুর অর্থ কাশীধাম; কিন্তু যে ভাবে কবিতাটি লিখিত, তাহাতে উক্ত মুন্সীয়ানা অর্থ গ্রহণ করিলেও তিনি যে বাকী অংশ সমাধা করেন, এরূপ বোধ হয় না। এই প্রবাদ বাক্য সত্ত্বেও, কাশীরাম দাসই সমস্ত মহাভারত অনুবাদ করেন এইমত সমর্থন-অভিপ্রায়ে কেহ কেহ বলেন, মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী রচনায় কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু গঙ্গাদাস সেন, রাজেন্দ্রদাস, গোপীনাথ দত্ত প্রভৃতি কবির ভণিতা কাটিয়া যদি কাশীদাসী মহাভারতে আঁটিয়া দেওয়া হয়, তবেও বোধ হয় কোন পার্থক্য লক্ষিত হইবে না। বর্ণনাগুলি অনেক স্থলেই একরূপ; জয়-গোপালগণের প্রসাদে কাশীরাম দাসের কিছু কান্তি-বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ

নাই, এই নবযুগের পালিস চলিয়া গেলে কাশী, গঙ্গা, গোপী, রাজেন্দ্র প্রভৃতি অনেক স্থলে একদরে বিকাইবেন। কাশীদাসী মহাভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার ভণিতা দৃষ্ট হয়;—যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন প্রাচীন পুঁথি গুলিতে একাধিক ভণিতা থাকিলে পরবর্ত্তী পুঁথি-লেখকগণ সর্ব্বাপেক্ষা বড় কবির ভণিতা বজায় রাখিয়া অপরাপর কবির নাম ক্রমে বাদ দিয়া যান; এই ভাবে কৃত্তিবাসী রামায়ণে, নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে এবং অপরাপর গ্রন্থে বড় কবির নামের ছায়ায় ছোট ছোট অনেক কবি লীন হইয়া গিয়াছেন। ১৫৮৩ খৃঃ অব্দের লিখিত একখানা কাশীদাসী মহাভারতের শৈল ও নারীপর্ব্বে ভৃগুরাম দাসের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। গদাধর-লিখিত পুথি আমরা দেখি নাই—তাহাতে যদি সর্ব্বত্র কাশীরাম দাসের ভণিতা থাকে, তবে উহা প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তাহাহইলে "আদি সভা বনবিরাটের কতদূর" ইত্যাদি শ্লোকের মুন্সীয়ানা অর্থ গ্রহণ করিতে কিম্বা উহা অমূলক প্রবাদ-বাক্য বলিতে আমাদের কোন আপত্তি থাকিবে না।

কাশীরামদাসের মহাভারতের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারতগুলির রচনা তুলনা করিলে অনেকস্থলে বিশেষরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হইবে, আমরা না বাছিয়া যথেচ্ছা কয়েকটি স্থল তুলিয়া দেখাইতেছি।

যযাতির পতন।

"অষ্টক বোলেন্ত তুহ্মি কোন মহাজন।
পরিচয় দিয়া কহ আমাইয়া আপন॥
অগ্নি প্রায় তেজঃ পুঞ্জ দেখিতে সাক্ষাৎ।
কোন্ পাপে অধর্ম্মে হইল স্বর্গপাত॥
* * * *
যযাতি আমার নাম কহি শুনি তোক।
নহুষ নৃপতি সুত পুরুর জনক॥
করিলে সুকৃতি নর যেবা নরে কহে।
মরলোকে জান হয় পুণ্য ক্ষয় নহে॥
কহিলুম ইন্দ্রের ঠাঁই কথা সকল।
পুণ্য ক্ষয় হইয়া মুই পড়িল ভূমিতল॥"

সঞ্জয়কৃত ভারত, আদি।

"অষ্টক বলিল তুমি কোন মহাজন।
কোন নাম ধর তুমি কাহার নন্দন॥
সূর্য্য অগ্নি প্রায় তেজ দেখি যে তোমার।
স্বর্গ হৈতে পড় কেন না বুঝি বিচার॥
রাজা বলে নাম আমি ধরি যে যযাতি।
পুরুর জনক আমি নহুষে উৎপত্তি॥
পুণ্যবান জনের করিলাম অমান্য।
সেই হেতু আমার হইল ক্ষীণ পুণ্য॥"

কাশীদাস, আদিপর্ব্ব

কৃষ্ণের ক্রোধ।

ই বলিয়া সাতাকিরে করি সম্বোধন।
হস্তেত লইল চক্র দেব জনার্দ্দন॥
সূর্য্যের সমান জ্যোতি সহস্র বজ্রসম।
চারিপাশে ক্ষুর তেজ যেন কালযম॥
রথ হৈতে ফাল দিয়া চক্র লৈয়া হাতে।
ভীষ্মক মারিতে যায় দেব জগন্নাথে॥
পৃথিবী বিদার হএ চরণের ভারে।
ক্রোধ দৃষ্টিএ যেন জগত সংহারে॥
কুরুকুলে উঠিল তুমুল কোলাহল।
ভীষ্ম পড়িল হেন বলে কুরুবল॥
পদভরে কৃষ্ণের কম্পিত বসুমতী।
গজেন্দ্র ধরিতে যেন ধাএ মৃগপতি॥
সম্ভ্রম নাকুর ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয়ে বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর॥
আইস আইস কৃষ্ণ মোরে করহ সংহার।
তোহ্মার প্রসাদে মুক্তি তরিমু সংসার॥
তোহ্মার চক্রেতে মুক্তি যদি সংগ্রামেতে মরি।
ত্রিভুবনে রহিবে কীর্ত্তি পরলোকে তরি॥"

• কবীন্দ্র (পরাগলী)—ভারত। ভীষ্মপর্ব্ব।

"অস্থির হইলা হরি কমল লোচন।
লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন তখন॥
ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ।
ভীষ্মেরে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ।
গজেন্দ্র মারিতে যেন ধাএ মৃগপতি।
কৃষ্ণের চরণভরে কাঁপে বসুমতী॥
চমৎকৃত হয়ে চাহি দেখে সর্ব্বজন।
ভীষ্মেরে মারিতে যান দেব নারায়ণ॥
সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয়ে বসিয়া ভাবে রথের উপর॥
আসিছে ভুবনপতি মারিতে আমাকে।
মারুক আমারে যেন দেখে সর্ব্বলোকে॥
শীঘ্র এস কৃষ্ণ মোরে করহ সংহার।
তোমার প্রসাদে তরি এ ভব সংসার॥
তোমার বাণেতে যদি সমরে মরিব।
দিব্য বিমানেতে চড়ি বৈকুণ্ঠ যাইব॥"

কাশীদাস, ভীষ্মপর্ব্ব।

বৃষকেতুর পরিচয়।

"আকর্ণ পুরিয়া ধনু টঙ্কার করিল।
উচ্চস্বরে রাজা বৃষকেতুরে বলিল॥
অতি শিশু দেখি তুহ্মি বীর অবতার।
মোকে পরিচয় দেও শিশু আপনার॥
কাহার পুত্র তুহ্মি কিবা তোহ্মার নাম।
কোন্‌দেশে বসতি কিবা মনস্কাম॥
কি লাগিয়া নেও ঘোড়া কারন কিবা তার।
কি নিমিত্ত কর মোর সৈন্যের সংহার॥
* * * * * * *
রাজার বচন শুনি হাসে কুমার।
পরিচয় লও অহে নৃপতি আহ্মার॥
যাহার উদয়ে হএ তিমির নাশ।
যাহার উদয়ে হএ জগত প্রকাশ॥
মোর পিতামহ সেই জেন দিবাকর।
তার পুত্র উপজিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
ত্রিভুবনে বিখ্যাত বীর দাতার অগ্রণী।
যাঁরবলে দুর্য্যোধন ভুঞ্জিল মেদিনী॥
তার পুত্র বৃষকেতু হেন জান মোক।
কটাক্ষে নরপতি নাহি গণি তোক॥"

শ্রীকরনন্দীর (ছুটিখার আদেশে রচিত) ভারত। অশ্বমেধপর্ব্ব।

"বৃষকেতু দেখিয়া বলিছে নৃপবর।
কাহার তনয় তুমি মহা ধনুর্দ্ধর॥
কি নাম তোমার হে আসিলে কি কারণ।
পরিচয় দেও আগে তোমরা দুজন॥
যুবনাশ্ব বচনেতে বৃষকেতু বীর।
পরিচয় দিল নৃপে প্রফুল্ল শরীর॥
রবির তনয় কর্ণ জান এ জগতে।
জনম হইল যার কুন্তীর গর্ভেতে॥
কর্ণের তনয় আমি নাম বৃষকেতু।
তুরঙ্গ লইনু যুধিষ্ঠির-যজ্ঞহেতু॥"

কাশীদাসী মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব।

এইরূপ সাদৃশ্য সর্ব্বত্রই দেখাইতে পারা যায়, মোটের উপর কাশীদাসই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অংশবিশেষ তুলনা করিলে সর্ব্বত্র তাঁহার এই পদ রক্ষিত হয় না।

বাঙ্গলা ভাষা পূর্ব্বে শিক্ষিতগণের দৃষ্টির বাহিরে অঙ্কুরিত হইয়া বিকাশ পাইতেছিল, তখন শক্তিশালী কবিগণ নয়নজল ও প্রাণের উষ্ণত্ব দিয়া ইহাকে পুষ্ট করিতেছিলেন। কিন্তু শিক্ষিতগণের হাতে পড়িয়া মুন্সীয়ানার প্রতি রুচিপ্রবলতাহেতু বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রেমের নয়নজল শুকাইয়া গেল; সংস্কৃত পুঁথির অলঙ্কার ও উপমারাশি দ্বারা ভাষা সুন্দরী সজ্জিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের গুরুভারে ভাব চাপা পড়িয়া নির্জীব হইয়া হইয়া পড়িল। কাশীদাস এই দুই যুগের মধ্যে; তাঁহার কাব্যে পূর্ববর্ত্তী কবিগণের উদ্দীপনা আছে এবং নবযুগের লিপিপ্রণালী এবং মার্জ্জিত ভাষাও দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত দুই গুণে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ অপেক্ষা বিশেষ পটু ও ভাবী যুগের বেশী সন্নিহিত।—"চলৎ চপলা রূপে কিবা বরকায়।" "দ্বিকর কমল, কমলাংঘ্রিতল," 'নিষ্কলঙ্ক ইন্দুজ্যোতি পীন ঘনস্তনী,' প্রভৃতি সংস্কৃতের টুকরা তাঁহার কাব্যের মধ্যে মধ্যে মুক্তার ন্যায় পড়িয়া আছে, ও 'মুখরুচি, কত শুচি' 'সিংহগ্রীব,বন্ধুজীব,' 'অগ্নিআংশু,যেন পাংশু' প্রভৃতি পদে ভাবী অনুপ্রাস-প্রধান যুগের ছায়াপাত হইয়াছে। অনেক স্থলে সংস্কৃত উপমার অজস্র বর্ষণ হইয়াছে, কিন্তু উদ্দীপনার কোন হানি হয় নাই, যথা;—

"মুখ তুলি বৃকোদর যেই ভিতে যায়। পলায় সকল সৈন্য তুলা যেন বায়। সিন্ধুজল মধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দর। পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত করিবর। মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্র মণ্ডলে। দানবের মধ্যে যেন দেব আখণ্ডলে॥ দণ্ড হাতে যম যেন বজ্র হাতে ইন্দ্র। খেদাড়িয়া লৈয়া যায় সব নৃপবৃন্দ॥ যেই দিকে বৃকোদর সৈন্য যায় খেদি। দুই দিকে তট যেন মধ্যে বহে নদী" আদিপর্ব্ব।

লক্ষ্যভেদের উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণের চিত্র বঙ্গদেশীয় ভীরু অর্থলোভী ব্রাহ্মণগণ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে,—উহা বেশ খাঁটি অঙ্কন। কাশীরাম দাসের বর্ণনাগুলি সুন্দর ও স্বাভাবিক; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নপর সৈন্য বর্ণনা—বঙ্গীয় কবির লেখনীর উপযুক্ত বিষয়, সুতরাং কবি ইহাতে আশাতীতরূপে কৃতকার্য্য;—"যে দিকে পারিল যেতে সে গেলে সেদিগে। পলায় পশ্চিমবাসী রাজা পূর্ব্বদিকে॥ উত্তরের রাজাগণ দক্ষিণেতে গেল। পথাপথ নাহি জান

যে দিক পাইল॥ হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি না পাইয়া পন্থ। একে চাপি আর যায় যেই বলবন্ত। রথের উপর বেগবন্ত আসোয়ার। অবস্থা হইল যত কি কব তাহার। ঠেলাঠেলি চাপাচাপি অর্দ্ধ সৈন্য মৈল। স্থানে স্থানে পর্ব্বত আকার শব হৈল॥ এক পদ কাটা কারু, কাটা দুই ভুজ। বুকের প্রহারে কেহ হইয়াছে কুব্জ॥ সর্ব্বাঙ্গে বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার। মুক্ত কেশ নগ্ন দেহ কাণ কাটা কার॥ আড়ে ওড়ে ঝাড়ে ঝোড়ে অরণ্যে পশিয়া। জলেতে পড়িয়া কেহ যায় সাঁতারিয়া॥ ক্ষত্রি দেখি ব্রাহ্মণ পলায় উভরড়ে। দ্বিজে দেখি ক্ষত্রিয় লুকায় ঝাড়ে ঝোড়ে॥ দ্বিজের ক্ষত্রিয় ভয়, ক্ষত্র দ্বিজ ভয়। দ্বিজ ক্ষত্র বেশ ধরে ক্ষত্র দ্বিজ হয়॥ ধনুর্ব্বাণ ফেলিল হাতের গদা শূল। মাথার মুকুট ফেলি মুক্ত কৈল চুল॥ তুলিয়া লইল ছত্রদণ্ড কমণ্ডল। ধনুর্ব্বান তুলি নিল ব্রাহ্মণ সকল॥ প্রাণভয়ে কেহ গিয়া ডুবি রহে জলে। কেহ কাঁটাবনে পৈশে কেহ বৃক্ষ ডালে॥ মরার ভিতরে কেহ মরা হৈয়া রহে। দূর দূরান্তরে কেহ ভয়ে স্থির নহে॥" কাশীদাস, আদিপর্ব্ব।

মহাভারতের আদ্যন্ত এইরূপ সুন্দর ও জীবন্ত। এক এক খানা পত্র এক একটি পরিষ্কার চিত্র পটের ন্যায়; পড়িতে পড়িতে বড় বড় যুদ্ধবীর, ধর্ম্মবীর ও প্রেমিকের মূর্ত্তি মনশ্চক্ষের নিকট উদ্ঘাটিত হয়; তাঁহাদের সরল বিবেক, দৃঢ় কামনা ও চরিত্রের সাহস, কবিগণের সতেজ লেখনীর গুণে, ক্ষণকালের জন্য আমাদের হইয়া পড়ে, ও এই নিস্বত্ব, অর্দ্ধভুক্ত, পররোষকটাক্ষেমাত্রপাণ্ডুরতাপন্ন বাঙ্গালী জাতি ও ক্ষণকালের জন্য পৃথিবীজয়ী, আকাঙ্খাশালী, অভিমানস্ফীত পূর্ব্ব পুরুষগণের কাহিনী পড়িয়া স্বীয় ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া উত্তেজিত হয়। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে এই মহাভারত প্রসঙ্গ শুনিয়া দাক্ষিণাত্যে এক দেশহিতৈষী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বীরচরিত্র গঠিত হইয়াছিল, তিনি অর্জ্জুন তুল্য কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, মহাভারতের সঙ্গে তাঁহার নাম এখন ইতিহাসে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। বঙ্গদেশে এই মহাভারত সমুদ্র হইতে এখনও শ্রীকৃষ্ণচরিত্র, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি বুদ্বুদ উত্থিত হইয়া প্রাচীনভাবের অফুরন্ত আবেগের কথা জ্ঞাপন করিতেছে। এই কাব্য লইয়া হিন্দুস্থানের ভাবী অধ্যায়ে আর ও কত কবি, বীর ও চিত্রকর যশস্বী হইবেন, কে বলিতে পারে?

কাশীদাস মহাভারত ছাড়া আরও তিন খানা ছোট কাব্য রচনা করেন। ১। স্বপ্নপর্ব্ব, ২। জলপর্ব্ব, ৩। নলোপাখ্যান। কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর ও একজন কবি ছিলেন, তাঁহার রচিত কাব্যের

নাম, 'সারন বিরাট', ইহাতে রাজা বিরাট ও তাঁহার বন্ধু উত্তর গো-গৃহের অধিপতি রাজা সুশর্ম্মা ও গোহরণাদির বৃত্তান্ত লেখা আছে।

রামেশ্বরনন্দী নামক কবি সম্ভবতঃ কাশীদাসের পরে মহাভারত অনুবাদ করেন; যে হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছি, তাহা ২০০ বৎসরের প্রাচীন; এই কবির রূপবর্ণনাতে ভারতচন্দ্রের মত আকাশ পাতাল লইয়া ক্রীড়া ও যথেষ্ট বাক্যপল্লব আছে, ভাষাটি অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ—এই জন্য রামেশ্বরকে কাশীদাসের পরবর্ত্তী কবি বলিয়া মনে হয়,—

শকুন্তলার রূপ বর্ণনা—"চামরে চিকুর কেশ হেন মনে লয়। চাঁচর তাহাতে নাই এইত বিস্ময়।। চাঁদ কুন্দ দিয়া মুখ করিল নির্ম্মিত। তাহাতে কলঙ্ক হেতু নহে পরতীত।। অরুণ তিলক ভালে হেন লএ চিত। সর্ব্বক্ষণ রক্তবর্ণ না থাকে তাহাতে॥ ভুরুযুগ নিরমিল কাম শরাসনে। কঠিন দেখিয়া তারে নাহি লয় মনে।। কুবলয় দলে কৈল আখি নিরমাণ। চঞ্চলতা নাহি তাহে কটাক্ষ সন্ধান।। বিম্বফল জিনিয়া অধর হেন দেখি। ঈষৎ মধুর হাস তাতে নাহি লক্ষি।।" একবার উপমা দিয়া আবার ফিরাইয়া লওয়া—অলঙ্কার শাস্ত্রের পাতা লইয়া এইভাবে উলট্ পালট করা,—কাশীদাসের পরবর্ত্তী যুগের বিশেষত্ব।

রামেশ্বর কবির স্বভাব-বর্ণনা প্রাচীন কবিগণের স্বভাব বর্ণনার পুনরাবৃত্তি, কিন্তু ভাষা অনেকটা বিশুদ্ধ। যথা,—

"সম্মুখে দেখিলা রাজা মুনির আশ্রম। নানা বৃক্ষলতা তথা অতি মনোরম।। স্থলপদ্ম মল্লিকা মালতী বিরাজিত। লবঙ্গ কাঞ্চন নাগকেশর শোভিত। নানাজাতি বৃক্ষলতা সব পুলকিত।। রক্তবর্ণে শ্বেতবর্ণে হৈছে বিকশিত।। পুষ্পমধু পানে মত্ত মধুকরগণ। নানাস্থানে উড়ে পড়ে অস্থির সঘন॥ অস্তে অস্তে বাদ করি সতত ঝঙ্কারে। যাহারে শুনিলে কামে মুনি মন হরে॥ নানা জাতি পক্ষী নাদ করে সুললিত। বৃক্ষমূলে থাকিয়া খঞ্জন করে নৃত্য। কোকিল মধুরধ্বনি সঘনে কুহরে। তৃষ্ণায় চাতক পক্ষী পিউ পিউ বোলে॥ ময়ুর পেখম ধরি নৃত্য করে তথি। আশ্রম দেখিয়া তুষ্ট হইল নৃপতি॥"

রামেশ্বর নন্দীর ভারত, বে, প, পুথি ৮৫। ৮৬ পত্র।

ইহা শকুন্তলা উপখ্যানের পূর্ব্বভাগ। রাজেন্দ্রদাসের ন্যায় রামেশ্বরও কালিদাস হইতে শকুন্তলা উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন; "কণ্টক লাগয়ে পথে আপনা আচলে। খসাইতে রাজারে ফিরিয়া চাহে ছলে॥" প্রভৃতি শকুন্তলার চেষ্টা কালিদাসের জগদ্বিখ্যাত চিত্রের স্পষ্ট অনুকরণে চিত্রিত হইয়াছে।

ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী নামক অপর এক কবি মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন, ১৩০৩ সালের বৈশাখ মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত বাবু

রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় ইঁহার বিষয় জানাইয়াছেন, উক্ত প্রবন্ধলেখকের মতে ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী ২০০ বৎসর পূর্ব্বের কবি। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সনাতন চক্রবর্ত্তী ভাগবতের অনুবাদ করেন, লেখক আরঙ্গজীবের সঙ্গে সুজার যুদ্ধের সময় উল্লেখ করিয়া পুস্তকরচনার সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শিশুরামদাস নামক এক লেখক এই সময় প্রভাসখণ্ডের অনুবাদ করেন, তাহার পরে ঈশ্বরচন্দ্র সরকার প্রভাসখণ্ডের আর একখানা অনুবাদ সঙ্কলণ করিয়া ছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত কাব্যগুলিতে বাঙ্গলা দেশের আচার ব্যবহার সুচিত্রিত আছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডী সেই সমাজের এক খানা সুনির্ম্মল দর্পণের ন্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বঙ্গীয় গার্হস্থ্য-জীবন প্রতিফলিত করিতেছে। সে সময়ে যুদ্ধবিগ্রহাদি সর্ব্বদাই সংঘটিত হইত; এখন কবিগণ বীররসে মাতিয়া তোপের শব্দে আম্রবন কম্পিত ও মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর শান্তিভঙ্গ করেন, ইহা সর্ব্বৈব কাল্পনিক, বস্তুতঃ যুদ্ধের কথা ইতিহাসও কাব্য পড়িয়া আমরা জানিতে পাই, কোন বাঙ্গলা লেখকের সেইরূপ দৃশ্য দেখার কোন আশঙ্কা নাই; কিন্তু ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যুদ্ধাদি সর্ব্বদাই ঘটিত ও এই কৃষাঙ্গ ভীরু বঙ্গবাসীগণের মধ্যেও সৈনিক পুরুষের অভাব ছিল না; মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে আমরা ব্রাহ্মণ পাইক, কর্ম্মকার পাইক, চামার পাইক, নট পাইক, বিশ্বাস পাইক ও বাঙ্গাল-পাইকগণের বিবরণ দেখিতে পাই; ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্রপ্রয়োগ-নিপুণ ও বলিষ্ঠ ছিলেন, কালকেতুর বল ও সাহস একজন উচ্চদরের সৈনিকের উপযুক্ত; কিন্তু বঙ্গীয় কাব্য সমূহে অতি মাত্রায় যুদ্ধাদির বর্ণনা পাঠ করিয়াও আমরা প্রকৃত বীররস দেখিতে পাইনা; কৃত্তিবাসী রামায়ণে দৃষ্ট হয়, শ্রীরামচন্দ্র চাঁপা নাগেশ্বর জটায় বাঁধিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে আছে, চণ্ডীদেবী ভয়ানক যুদ্ধে মঙ্গলদৈত্যকে বধ করিয়া সহচরীগণের নিকট বিশ্রামের জন্য একটি পান ও পাখা চাহিতেছেন ও কলিঙ্গরাজ স্বপ্ন দেখিয়া আকুল হইয়া পড়াতে—

"রাজার প্রকৃতি দেখি রাণী সব কাঁদে। কর্ণে জপ করে কেহ শিরে শিক্ষা বাঁধে।"

কবিকঙ্কণের কালকেতু এত বড় বীর হইয়াও যুদ্ধে পরাস্ত হইবে পর

স্ত্রীর প্রবর্ত্তনায় ধ্যানাগারে লুক্কায়িত হইয়া রহিল, কলিঙ্গাধিপের কোটাল এই বলিষ্ঠ কাপুরুষটিকে তথা হইতে টানিয়া বাহির করিলে ফুল্লরা কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "না মার না মার বীরে শুনহে কোটাল। গলার ছিঁড়িয়া দিব শতেশ্বরী হার॥" (ক, ক, চ)। পরন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনায় এরূপ বর্ণনা বিরল নহে, "ব্রাহ্মণে না মার, ব্রাহ্মণে না মার, পৈতা দেখাইয়া কাঁদে।" (ক, ক, চ)। "যতেক ব্রাহ্মণ পাইক পৈতা ধরি করে। দন্তে তৃণ করি তারা সন্ধ্যামন্ত্র পড়ে॥" (মা, চ)।"

এই বঙ্গদেশে তখন সীতারামের ন্যায় দুএকজন প্রকৃত বীর ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সাধারণ নিয়মের বাদ। লাউসেনের ভ্রাতা কর্পূরের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, লাউসেনের যুদ্ধাদি বর্ণনা হইতে কর্পূরের প্রাণরক্ষার চেষ্টায় বাঙ্গালী-চরিত্র বেশী সুন্দর ভাবে দর্শিত হইয়াছে। প্রকৃত বীরত্বের অভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের বীরগণের শরের শণ্ শণ্ ও বাঁশের লাঠির ঠন্ ঠন্ একরূপ ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় বোধ হয়।

হিন্দুরাজাগণ সকালে বৈকালে পুরাণ-পাঠ শুনিতেন, ভাগবতই তখন শ্রেষ্ঠ পুরাণ বলিয়া আদৃত হইত। বড় বড় রাজাগণের অধীনস্থ রাজাগণ "ভূঞা রাজা" নামে আখ্যাত হইতেন; কোন বড় রাজার অভিষেকের সময় "ভুঞা রাজাগণ" তাঁহার মাথায় ছত্র ধরিতেন, রাজাগণ অনেক সময় গ্রামনগরাদি সংস্থাপনের সময় বহুসংখ্যক দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিতেন ও অনেক সময় কৃষকদিগকে লাঙ্গল ও চাষের বলদ প্রভৃতি দান করিয়া বাড়ী বানাইয়া দিতেন। রাজাদিগের দৌরাত্ম্যও প্রসাদের তুল্য ছিল; বাজারে পণ্যজীবিগণ রাজকর্ম্মচারীদিগের ভয়ে অস্থির থাকিত, আমরা ভাড়ুদত্তের প্রসঙ্গে তাহা দেখাইয়াছি। অনেক রাজার ধর্ম্মবিশ্বাস ও বিনয় ইতিহাসে দৃষ্টান্ত স্থলীয়, সচরাচর ব্রহ্মোত্তর দানপত্রে এইরূপ বিনীত প্রার্থনা পাওয়া যায়,—"যদি আমার বংশের অধিকার লুপ্ত করিয়া অন্য কেহ এই রাজ্য লাভ করেন, তবে তাঁহার নিকট আমার এই প্রার্থনা আমি তাঁহার দাসানুদাস হইয়া থাকিব, তিনি যেন ব্রহ্মবৃত্তি হরণ না করেন।" সাধারণ তন্ত্র রাজশাসনে মোটের উপর অপেক্ষাকৃত ন্যায়-বিচার অধিক লাভ করা যায়, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী রাজা উৎকৃষ্ট হইলে তাঁহার শাসনে পৃথিবী স্বর্গের ন্যায় হয়। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে দুর্ব্বলার বাজার করার যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে সে সময়ে জিনিষ পত্র সমস্তই অতি সুলভ মূল্য ছিল; মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে প্রদত্ত ফর্দ্দে

তদপেক্ষাও সুলভ মূল্য দৃষ্ট হয়, পূর্ব্ববঙ্গের বাজারে জিনিষের মূল্য আরও সস্তা ছিল বলিয়া বোধ হয়। ভদ্রলোকগণ তখন সাধারণতঃ পাদুকা ব্যবহার করিতেন না, ভদ্রলোক গৃহস্তের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে প্রথমেই তাঁহাকে পা ধোয়ার জল দিয়া সম্ভাষা করিতে হইত; বহুকষ্টে এক পূর্ণ গাড়ুর সাহায্যে কাঁদা ধুইয়া ফেলিয়া ভদ্রলোকগণ "গাম্ভীরার পীড়া" চাপিয়া বসিতেন, এবং কখনও আহারান্তে একটি অখণ্ড গুবাক চর্ব্বণ করিয়া মুখ শুচি করিতেন। খুবভাল অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ রাত্রিতে শয়ণ প্রকোষ্ঠে যাইবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া পা ধুইয়া পাদুকা পরিয়া শয্যায় যাইতেন; ধনপতি লক্ষেশ্বর ব্যক্তি. তিনি শুইবার পূর্ব্বে "চরণে পাদুকা দিয়া করিল গমন। পদ্মনাভ স্মরি সাধু করিল শয়ন॥" স্ত্রীলোকগণ অঙ্গদ কঙ্কণ, কর্ণপূর প্রভৃতি নানারূপ সোণার অলঙ্কার পরিতেন, নানা ছন্দে খোপা বাঁধিতেন, ও "মেঘ ডুম্বুর" কাপড় এবং কাঁচুলি পরিতেন; নিকৃষ্ট শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ "ক্ষুঞা" বা ক্ষৌমবাস পরিত, ইহা একরূপ অল্পমূল্য পট্টবস্ত্র; মাণিকচাঁদের গানে দেখিয়াছি গোপীচাঁদের রাজত্ব কালে বাঁদিগণ ও "পাটের পাছড়া" পরিত না; এই "পাটের পাছড়া" ও "ক্ষুঞাবাস" একই কাপড় বলিয়া বোধ হয়, ভারতচন্দ্র "খুয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত" কথায় এই "খুঞা" বস্ত্রের প্রতি নিগ্রহ দেখাইয়াছেন। স্ত্রীলোকগণের অঙ্গ মার্জ্জনার জন্য আমলকীই ছোপের কার্য্য করিত; স্বর্ণাদির সঙ্গে ফুলও অঙ্গরাগের একটি বিশেষ উপকরণ ছিল, বাজারে নানারূপ ফুল বিক্রয় হইত, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে গোপিনীগণের বেশ করার প্রসঙ্গে "কিনিয়া চাঁপার ফুল কেহ দেহি কাণে" পাইয়াছি। কিন্তু একজন বড় ইংরেজ লেখক "Rude nations delight in flowers." এই উক্তি করিয়া উৎকৃষ্ট নাগকেশর, কুরুবক, চম্পক, পুন্নাগ ও মালতীর জাতি মারিয়াছেন; সুন্দরীগণ এখন এইসব দেশীয় ফুল ছুঁইতে ভীত হইতে পারেন। পুরুষগণ বালা পরিতে লজ্জা বোধ করিতেন না, ও গরীব লোকও কর্ণে একটু সোণা পরিয়া কৃতার্থ হইত, গুজরাটপুরীর সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া কোটাল বলিতেছে—"নগরে নাগরজনা, কাণে লম্বমান সোণা, বদনে গুবাক হাতে পান। চন্দনে চর্চ্চিত তনু, হেন দেখি যেন ভানু, তসররঙ্গন পরিধান॥" (ক,ক,চ,)। নিম্নশ্রেণীর লোকগণ "খোসালা" নামক একরূপ শীতবস্ত্র গায় দিত। বাজারে জিনিষ খরিদ করিতে গেলে প্রথমেই কড়ী প্রত্যাসী দুই ব্যক্তির

সাক্ষাৎকার হইত; একজন লগ্নাচার্য্য ইনি পঞ্জিকা শুনাইয়া কিছু যাচ্ঞা করিতেন, অপর কুশারী উপাধি বিশিষ্ট ওঝা, ইহার কাঁধে একটা বড় কুশের বোঝা থাকিত ও ইনি বেদ পাঠ করিয়া অভ্যাগতকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কিছু যাচ্ঞা করিতেন।

তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে শিক্ষার চর্চ্চা খুব বেশী ছিল, শ্যামানন্দ সদ্গোপ হইয়াও অতি অল্প বয়সে ব্যাকরণ শাস্ত্রে কৃতি হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে; চণ্ডীকাব্যে শ্রীপতি বণিকের শাস্ত্রে অধিকারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার পিতা ধনপতি বণিকও "নাটক নাটিকা কাব্যে যাঁহার উল্লাস" বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। সংস্কৃত টোলে বাঙ্গালা অক্ষরের সঙ্গে দেবনাগর অক্ষরেও পুস্তক লিখিত হইত, ধনপতি বণিক সিংহলে "নাগরী বাঙ্গলা রায় পড়িবার জানি।" বলিয়া স্বীয় বিদ্যার পরিচয় দিতেছেন, টোলে সুরু হইতে কি ভাবে অধ্যাপনা চলিত মাধবাচার্য্য তাহার বিবরণ দিয়াছেন—"চ বর্গাদি বর্গ যত, পড়িলেক শ্রীমন্ত, কাগলায়ে প্রবেশিল মন। কেয় কর কম আদি, কল কোব অবধি, রেফ যুক্ত পড়ে যত ফলা। কিরি কিলি আর্ক আঙ্ক, এঙ্কাবধি যত অঙ্ক, কাগলায়ে পারগ হ'ল বালা॥ পূজা করি সরস্বতী, আরম্ভিলা পাঠ্য পুঁথি, জানিবার সন্ধির প্রকার। স্বরসন্ধি পড়িয়া, সুসম পল্লেতে গিয়া, শব্দ সন্ধি জানিলা অপার॥ চণ্ডীকার বর হেতু, পড়িলা সকল ধাতু, ত্রিবিকায় জানিতে কারণ। ষত্বণত্ব জ্ঞান হয়, সংস্কৃতে কথা কয়, পারগ হইলা ব্যাকরণ॥" কিন্তু ভক্তি রত্নাকরে দেখা যায় টোলের ঊর্দ্ধতন ছাত্রগণ ব্যাকরণকে 'শিশু শাস্ত্র' বলিয়া উপেক্ষা করিতেন। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অনেক সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হইতেন, কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গলার অনুশীলন বেশী করিতেন। ২০০—১০০ বৎসর পূর্ব্বের যতগুলি বাঙ্গলা পুঁথি পাইয়াছি, তাহাদের অনেকগুলি ইতর জাতির হাতের লেখা; কয়েকটির কথা উল্লেখ করিতেছি;—হরিবংশ (১১৯০ সন) লেখক শ্রীভাগ্যমন্ত ধুপি, নৈষধ (১১৭৪ সন) লেখক, শ্রীমাঝি কাইত, গঙ্গাদাস সেনের দেবযানী উপাখ্যান (১১৮৪ সন) লেখক শ্রীরামনারায়ণ গোপ, ক্রিয়াযোগসার (সনের নির্দ্দেশ নাই, ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিপি বলিয়া বোধ হয়) লেখক শ্রীকালীচরণ গোপ, রাজা রামদত্তের দণ্ডীপর্ব্ব (১৭০৭শক) লেখক শ্রীরামপ্রসাদ দেএ। এইরূপ আরও অনেক পুঁথি আমাদের নিকট আছে, ত্রিপুরা জেলায় রাজপাড়া গ্রামে ১০০ বৎসরের প্রাচীন এক খানা নলদময়ন্তী এক ধোপা বাড়ীতে আছে, উহা সেই ধোপার

পিতামহের লেখা, লেখাটি মুক্তার ন্যায় গোট গোট, বড় সুন্দর। আমরা মধুসূদন নাপিত রচিত নলদময়ন্তীর কথা উল্লেখ করিয়াছি এবং এই নাপিত কবি যে তাঁহার পিতামহের কবিত্ব-যশের বড়াই করিয়াছেন সে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি; গোবিন্দকর্ম্মকার রচিত করচা অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। আমি জেলায় জেলায় প্রাচীন পুঁথি খুঁজিয়া দেখিয়াছি, ভদ্রলোক-গণের ঘরে বাঙ্গলা পুঁথি বড় বেশী নাই কিন্তু ইতর লোকের ঘরে উহা রাশি রাশি পাওয়া যায়; ইহাদের দ্বারা প্রাচীন পুঁথি গুলি যেরূপ যত্ন সহকারে রক্ষিত, তাহাতে বঙ্গীয়সাহিত্যসেবকগণ তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

এখন লেখা পড়া শিখিলেই পৈত্রিক ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবার প্রবৃত্তি জন্মে; মধুসূদন নাপিত সংস্কৃত জানিতেন ও সে আমলের একজন কবি এবং কবির পৌত্র ছিলেন, কিন্তু তিনি বোধ হয় স্বীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া দেন নাই। সে সময় ধর্ম্ম, আমোদ ও আত্মার উন্নতি কামনায় জ্ঞানের চর্চ্চা হইত; জ্ঞানানুশীলন যে জাতি নির্ব্বিশেষে অর্থকরী, একথা তখন তাঁহারা জানিতেন না।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চ্চা ছিল, পর-অধ্যায়ে আমরা একজন শ্রেষ্ঠ স্ত্রীলোক কবির বিষয় আলোচনা করিব। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে দৃষ্ট হয়, খুল্লনা স্বামীর অক্ষর চিনিতেন ও তাহা লইয়া সতিনীর সঙ্গে বাক্ বিতণ্ডা করিতেছেন,—খুল্লনা বণিকরমণী; বৈষ্ণব-সাহিত্যে জানা যায়, মহাপ্রভু যে ৩½ জন শ্রেষ্ঠ কৃপাপাত্রের কথা উল্লেখ করিতেন, তন্মধ্যে শিখিমাহিতীর ভগ্নী মাধবী ½; এই মাধবী অতি শুদ্ধাচারিণী বৈষ্ণবী ছিলেন, পদকল্পতরুতে ইহার রচিত অনেকগুলি সুন্দর পদ আছে (৭৮৮, ১৮০৪, ২১৯২ এবং ২১৯৩ পদ দেখুন)। স্ত্রীলোক-গণের মধ্যে ঔষধ করিবার প্রথা বড় বেশী ছিল, আমাদের খোট্টা—ভ্রাতাদের গালি নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না, জগন্নাথতীর্থে এখন ও পাণ্ডারা গাহিয়া থাকে,—"জাল বিরাজহঁ, উড়িয়া জগন্নাথ। উড়িয়া মাগে ক্ষীর খিচুরী, বাঙ্গালী মাগে ডাল ভাত, সাধু মাগে দর্শন পর্শন মহা পরসাদ॥ বাঙ্গালিনী রমণী, পরমাসুন্দরী, দেখ্ নয়নকতারা, ভজন সাধন নাহি জানেত, জানে

বাঙ্গালিনী টোনা।" এই "টোনা" অর্থাৎ ঔষধ করার বৃত্তান্ত মুকুন্দকবি বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি উপসংহারে নিজকে বৃদ্ধ বলিয়া বাঁচাইয়াছেন, "ঔষধ প্রবন্ধে কহে মুকুন্দ বিশারদ। বুড়াকে না করে বশ দারুণ ঔষধ।" এই ঔষধ দ্বারা বশীকরণ প্রথা বিলাতেও চলিত ছিল, সেক্সপীয়র ম্যাকবেথ নাটকে যাদুর উপকরণের এক লম্বা লিষ্ট দিয়াছেন, মুকুন্দের তালিকা তাহার অনুরূপ; adders fork, eye of newt, scale of dragon, maw of shark, wool of bat, gall of goat, lizard's leg, wings of owlet প্রভৃতি বিলাতী যাদুর পার্শ্বে, "কচ্ছপের নখ, কাকের রক্ত, ভুজঙ্গের ছাল, কুম্ভীরের দাঁত, বাদুরের পাখা, কাল কুকুরের পিত্ত, গোধিকার আঁত, কোটরের পেঁচা,"—ইত্যাদি কবিকঙ্কণোক্ত উপকরণ গুলি স্থান পাইতে পারে, এই ছাই ভস্মের উল্লেখ দ্বারা প্রতীয়মান হইবে, মনুষ্যকল্পনা বীভৎস হইলেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই ভাবে কার্য্য করে, একই দ্রব্য খুঁজিয়া বেড়ায় ও নরপ্রকৃতি সর্ব্বত্র যে এক সাধারণ নিয়মাধীন তাহা প্রমাণ করে।

বঙ্গীয় সমাজ এই সময় বৈষ্ণবভাব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়া ছিল, চণ্ডীকাব্যে শ্রীমন্তের সহচরগণ ও বিবাহোপলক্ষে আগত এয়োগণের নাম পড়িয়া দেখুন; তাঁহাদের অধিকাংশ নাম আমাদের চির-পরিচিত গোপবালক ও গোপিনীগণের; শ্রীমন্ত বাল্যকালে শকট ভঞ্জন, পুতনা-তৃণাবর্ত্তবধ প্রভৃতি খেলার অভিনয় করিতেছেন, নিরক্ষর কালকেতু ব্যাধ পর্য্যন্ত কংস নদীর তীরে "হেথাই নরক স্বর্গ শুনি ভাগবতে" (ক, চ), বলিয়া ভাগবতের দোহাই দিতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গের রাজেন্দ্রদাস কবি শকুন্তলোপাখ্যান প্রসঙ্গে সমাজে পাপ পুণ্যের যে আদর্শ আঁকিয়াছেন, বঙ্গের দূরপল্লী গুলিতে বোধ হয় এখন ও ধর্ম্মাধর্ম্মের সেই শাসন কতক পরিমাণে বিদ্যমান আছে, "ভক্তি করি ব্রাহ্মণ সেবা করে যেই জন। তার পুণ্য ব্রহ্মা কৈতে না পারে আপন। গোধন জলেতে যদি জল পান করে। তার ফলে সেই জন যায় স্বর্গ পুরে।" কিন্তু পুষ্করিণী রিজার্ভ করার এই ধুমের সময় গোধনের জলপান করায় কোন পুষ্করিণীর মালিক পুণ্য সঞ্চয় ভাবিয়া সুখী হবেন কিনা সন্দেহ। মহাপাপগুলির ভয়ও ইদানীং অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত কাব্যে এই সব ব্যক্তি মহাপাপী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন,—

"নিষেধ দিবসে যে মৎস মাংস খায়। মাঘে মুলা খায় যে নির্ম্মাল্য পুছে পায়। কুলাচার ছাড়ি যেবা অনাচার করে। কুলবিদ্যা ছাড়ি যেবা অন্য বিদ্যা ধরে। ভোজনান্তে ক্ষৌর করে না করে বিচার। উত্তম অধমে অন্ন একত্র আহার।" এই শতাব্দীতে ইহার অনেকগুলি প্রথা রদ হইয়া গিয়াছে।

আমরা পূর্ব্ববৎ শব্দার্থের তালিকা দিয়া যাইতেছি, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেঃ— জাঙ্গাল—সেতু, নায়ক—গ্রন্থ লেখক, নৃপ—ব্রাহ্মণ, উতাড়িয়া—উত্তোলন করিয়া, উত্তরিল—পৌছিল, উধার—ধার, পিছিলা—পূর্ব্ববর্ত্তী ("মাংসের পিছিলা বাকী ধারি দেড় বুড়ি)"। জটে—চুল, ("জটে ধরি মাগ মোরে করিলা নিস্তার", "জটে ধরি বাঁধে মহাবীরে।" এখন জট অর্থ "জটা" হইয়াছে), পিছে—প্রতি, ("হাল পিছে এক তঙ্কা") নাবড়ো—ঠক, ক্রন্দন—কান্না, নাটুয়া—রঙ্গভূমির অভিনেতা ('স্নানকরি নীলাম্বর, ধরে পূর্ব্ব কলেবর, নাটুয়া ফিরায় যেন বেশ।") উভরায়—উচ্চরবে, জেঠি (জ্যেঠা)—টিকটিকী, চিয়াইয়া—চেতন হইয়া, ভাজি—ভাজন, বাঁঝি—বাঁদি, আহড়ে—আড়ে (লুকায় গগনবাসী মেঘের আহড়ে")। বালা—বালক ("চারি বছরের হল কানিয়ার বালা" চণ্ডীকাব্য ব্যতীত অপরাপর অনেক পুঁথিতেই বালা শব্দ বালক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।) ব্যাজে—ছলে (যৌবন করিয়া ডালি পো চাহিয়া ব্যাজে। কুলবতী জলাঞ্জলী দিল কুললাজে।", এই ব্যাজ শব্দের অর্থ অনেক স্থলে গৌণ। দানা—দানব, জরাধি—জরাগ্রস্ত, পুরোধা—পুরবাসী, মো—মমতা, লো—অশ্রু, কাতি—কাইস্তে, রোঢ়া—দন্তহীন, খণ্ড—গুড়, টাবা—নেবু, রায়বার—দৌত্য, কচ়া—কাঁচা ("বাড়ে যেন হাতী কচা")। দিয়ড়ি (দেউটী)—দীপ, তোক—অপত্য, শশা (শশারু)—খরগোস, বরিয়াতি—বরযাত্রী)। বেসাতি—বাজারের সদায়, শাড়া (বা শাটা)—"শটক, ঘৃত, জল ও পিঠালী মিশ্রিত ছানা।" (অক্ষয় বাবুর চণ্ডী, ২৫৫ পৃঃ।) অপরাপর পুঁথিতে—দড়বড়—তাড়াতাড়ি, অনুবন্ধ—অবতারণা, গোড়াইল—সাথে সাথে চলিল, কানি—ছেঁড়াবস্ত্র, হটে ছলনায় ("মনসার হটে সাধু ভিক্ষা মাগি খায়।" মনসার ভাসান)। ইটাল—ইট, নেউটিয়া—ফিরিয়া, গড়—প্রণাম, টোণ—তূণ, সমাধান—শেষ ("নিমিষেকে জীবন যৌবন সমাধান," (মা, চ) সমসর—তুল্য, বুঝাইল—বুঝাইল, পাড়ে—ফেলে, ("অর্জ্জুন কাটিয়া প'ড়ে, মুকুট ভূমিতে পড়ে।" কাশী), বাট—পথ, আগুয়ারি—অগ্রসর হইয়া, সাবহিত—সাবধান, সহজে—স্বভাবতঃ (এই শব্দ পূর্ব্বে মূল অর্থেই ব্যবহৃত হইত, এখন অর্থচ্যুতি হইয়াছে।) আচরণ—ভ্রমণ, বিচরণ ("প্রেত কাক কুকুরাদি করে আচরণ।" (রাম রসায়ণ), চৌরস—প্রসারিত (চাঁচর চিকুর রামের চৌরস কপাল," রামায়ণ), গদা—ঠাট্টা ("হেন বুঝি গদা মোরে করিল যুবতী" মা, চ)। পাথর—পাপড়ি, নাট—নৃত্য, উলি-অবতরণ করা, উড়ণ—পরিধান করা, খণ্ড—এই শব্দ পূর্ব্বে নানারূপ শব্দের সহিতই যুক্ত হইত, যথা চিরাখণ্ড, ছুরীখণ্ড, চোরখণ্ড, ইত্যাদি, খণ্ড কোন কোন সময় 'তস্ক' অর্থে প্রযুক্ত হইত যথা,

"গঙ্গ কপালিনী"; উঝা—সোজা, মেছু—প্রতিমা পঞ্জর, আগ্রাস—আশকা ("উপায় করিয়া গেল আমায় ভুচিয়ে" জগৎরামরায়ের রামায়ণ।), শারি—নিষাবাদ।

বিভক্তিগুলি পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন রূপ; সে সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা এ অধ্যায়েও অনেকাংশে খাটিবে, পূর্ব্ববঙ্গের পুঁথিতে "সংক্ষেপে কহিল"—(অর্থ "সংক্ষেপে কহিলাম") "একই দেখিল আমি তোমা দোয়া বর।" ইত্যাদি ভাবের প্রয়োগ অনেক দৃষ্ট হয়; জগৎ-রামের রামায়ণে—"সীতা ভেট দিয়া শিব মাগিব রাবণে।" ভাবের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; এইরূপ ব্যবহার পশ্চিম বঙ্গ হইতে এখন উঠিয়া গেলেও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে; কর্ত্তৃকারকের পর ক্রিয়ার নানা অদ্ভুত আকার উভয় স্থলের প্রাচীন পুঁথিতেই বিস্তর পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে প্রাচীন পুঁথি হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারে।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের কয়েকটি বাঁধা বিষয় ছিল, এ সম্বন্ধে ৬১-৬২ পৃষ্ঠায় একবার উল্লেখ করা হইয়াছে; সেই বাঁধা বিষয়গুলি সংক্ষেপে এই ভাবে বিভাগ করা যাইতে পারে:—১। বারমাসী,—বাঙ্গালা মুলুক ষড়-ঋতুর প্রিয়লীলাক্ষেত্র; বারমাসের বারটি রূপ প্রকৃতির পটে পরিস্কার রেখায় অঙ্কিত হয়, কবিগণ বৎসরের বারখানি সুখ দুঃখের চিত্র সুন্দর রূপে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। ২। অবরোধক্লিষ্টা বঙ্গীয় সীমন্তিনীগণ যখন একটু মুক্তি পান, তখন তাঁহাদের কতকটা অসতর্ক ও চঞ্চল হইয়া পড়া স্বাভাবিক, কবিগণ শ্যামের বাঁশীর তান কি বিবাহ বাসর উপলক্ষ করিয়া ঘরের বউগুলির অনভ্যস্ত স্বাধীনতার মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন, কাহারও কবরী অর্দ্ধমুক্ত, কাহারও সমস্ত অলঙ্কার পরা হয় নাই, অর্দ্ধ অঙ্গে অলঙ্কার পরা, অপরার্দ্ধ এলোথেলো, যেন কোন চিত্রকরের তুলির অসম্পূর্ণ সৃষ্টি; ইহাঁদের উঁকি ঝুঁকি কতকটা অস্বাভাবিক ও "হাবাবতী এক ভাবে কেন্দে আনে পাক্কা" (ক,ক,চ,) প্রভৃতি অসংযত স্ফূর্ত্তির অভিনয় বর্ণনায় কবিগণ সুন্দরীদিগের মোহিনীশক্তি দেখিতে সুবিধা দেন নাই; ভাগবতের একাংশে এই চিত্রের প্রথম ছায়া পাত হইয়াছিল। ৩। পুকুর ঘাটে রমণী। বঙ্গের রমণীগণ পল্লি-গ্রামে বাহিরের লোককে স্বীয়রূপ দেখিবার একবার সুবিধা দেন, পুকুরের জলে যখন পঙ্কজ ভাসিয়া উঠেও লিগ্ধকান্তি ফুটিয়া উঠে, তখন সেইরূপ কবির লেখনীর বিষয় হইতে পারে। বিদ্যাপতি হইতে আলোয়াল পর্য্যন্ত বহু কবি,

আর্দ্রবস্ত্রে কুম্ভকক্ষে রমণীগণের গৃহপ্রত্যাগমনের মুগ্ধকর আলোক চিত্র উঠাইয়াছেন। ৪। দাম্পত্য কলহ—বিদেশ-বিদ্বেষী বাঙ্গালীগণের ঘরে বসিয়া স্ত্রীর গালি খাওয়া নিত্যকর্ম্ম, এই গালির স্বাদ সর্ব্বদা তিক্ত নহে, একটু মধুরত্ব আছে; তারপর বৃদ্ধ স্বামীর ঘাড়ে যুবতীভার্য্যার ক্রোধ বৃষ্টি,কুলীন দিগের কৃপায় কুলললনার বিড়ম্বনা—দাম্পত্য প্রেমে অম্লরোগ,—কবিগণ শিবপার্ব্বতী প্রসঙ্গ উপলক্ষ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। ৫। পতি-নিন্দা, ইহা লইয়া অনেক অশ্লীলকথা বঙ্গসাহিত্য কলুষিত করিয়াছে, অশ্লীল বিষয়ের সঙ্গে আমাদের কোন সহানুভূতি নাই, কিন্তু এই পতি-নিন্দা এতগুলি কবি বর্ণনা করিয়াছেন, যে সমাজ ব্যাপিয়া ইহার কারণ ছিল বলিয়া বোধ হয়, ইহা নেহাৎ কল্পনা নহে; "কঠিন ব্যঞ্জন আমি যেই দিন রাঁধি, মারয়ে পিড়ার বাড়ি কোনে বসি কাঁদি।"(ক, চ) প্রভৃতি উক্তি মর্ম্মের; পিতা মাতা অর্থাদির লোভে প্রাণ প্রিয় কন্যাগুলিকে জলে ভাসাইতেন, তাহারা সেই জলে পড়িয়া আজীবন ভাসিতে থাকিত, কিছু বলিতে পারিত না—তাহাদের অবস্থা চণ্ডীদাসের কথায় বলা যাইতে পারে—"বদন থাকিতে, না পারি বলিতে, তেঞি সে অবলা নাম।" ৬। হনুমান—এই সমুদ্র লঙ্ঘন-সেতুবন্ধন-পটু বীরচূড়ামণি বঙ্গসাহিত্যের দেবদেবীগণের দক্ষিণহস্ত; সমুদ্রে ঝড় উঠাইতে হইবে,বড় প্রাচীর উঠাইতে হইবে, এ সমস্ত ব্যাপারেই দেব দেবীগণ হনুমানের শরণাপন্ন কিন্তু বাল্মিকীর এই মহাচরিত্র বঙ্গীয় সাহিত্যে শুধু একটি বানরে পরিণত হইয়াছে। ৭। শিশু-কন্যাকে স্বামীর ঘরে প্রেরণ সময় পিতৃগৃহ যে করুণার তরঙ্গে প্লাবিত হইত, তাহা লইয়া কবিগণ উমাও মেনকা সংবাদ বর্ণন করিয়াছেন।

এই নির্দ্ধারিত বিষয়গুলি লইয়া বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা খেলিয়াছে, এই বিষয়গুলি প্রাচীন কবিগণের লেখনীর সাধারণ সম্পত্তি; দেবদেবীর ভাণ করিয়া কাব্যপটে বঙ্গীয় গৃহস্থালীর দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাচীন পুঁথির অনেকগুলি যখন মুদ্রিত হইবে, তখন পাঠক এই বাঁধা বিষয় গুলি কোন্ কবির হস্তে কিরূপ ফলিয়াছে, তাহা নিরূপণ করার সুবিধা পাইবেন।

আমরা যে অধ্যায়ের সন্নিহিত হইতেছি, তাহার আভাস এই অধ্যায়-বর্ণিত নানা পুস্তকেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে; চণ্ডীর চৌত্রিশ অক্ষরা স্তুতি (চৌতিশা) অনেকগুলি প্রাচীন পুঁথিতে দেখা যায়;

এই "চৌতিশা" শুধু শব্দ লইয়া খেলা,—উহা অনেক স্থলে শ্রুতিকটু হইয়াছে, যথা—"টিটকারী টকারে হইনু পরাজয়ী। টঙ্কারিয়া রক্ষা কর মোরে কৃপাময়ী॥" এই কোমল গীতি-কবিতার দেশে শ্রুতি কটুতার অপরাধে কবির ফাঁসি হইতে পারে,—জয়দেব এই আজ্ঞা দিতেন। যাহাহউক শ্রুতিকটুতা সত্ত্বেও এইরূপ শব্দলইয়া খেলা হইতে ভাষা সাজাইবার চেষ্টা আরব্ধ হয়,মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে "ঘুচাও মনের রোষ, করপতি পরিতোষ, দিয়াত বিরাটহস্ত দান।" পাওয়া যায়, এই মুন্সীগিরি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই চেষ্টার বিকাশ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। ভালবাসার অভাবে হীরামালিনীগিরি আরম্ভ হয়, কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতেই লিপিচাতুর্য্যের হস্তে ভালবাসার দুষ্টামীর পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়, নিম্নলিখিত অংশটি দেখুন—"অশোক কিংশুক ফুল, হইল যেন চক্ষু শূল, কেতকী কুসুম কামকুন্ত। বৈরি কুসুমবাণ, অস্থির করয় প্রাণ, ঝাট নাশ যাওরে বসন্ত॥ শুইলে নলিনীদলে, কলেবর মোর জ্বলে, জল দিলে নহে প্রতিকার। মলয়ের সমীরণ, অগ্নি কণা বরিষন, পতি বিনে জীবন অসার॥" কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেই আমরা ভারতচন্দ্রী উপমার প্রথমোদ্যম দেখিতে পাই—"গৌরীবদন শোভা, লিখিতে না পারি কিবা, দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা। ম্লানচন্দ্র এই শোকে, না ফিরারি সর্ব্বলোকে, মিছে বলে কংকণের রেখা॥ গৌরীর দশন রুচি, দেখি দাড়িম্ব বিচি, মলিন হইল লজ্জাভরে, হেন বুঝি অনুমানে এই শোক করিমনে, পক্ককালে দাড়িম্ব বিদরে॥" পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই বাক্য-কলা ও লিপিচাতুরীর জাঁকালো বিকাশ দেখিতে পাইব।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

বঙ্গভাষার উৎপত্তি।

বঙ্গভাষা* কোন্ সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যেমন কোন ধর্ম্মবীর কি কর্ম্মবীরের আবির্ভাবসময় সম্বন্ধে অঙ্কপাত দৃষ্ট হয়, পাঠকগণের মধ্যে হয়তঃ কেহ কেহ এই অধ্যায়-ভাগে সেইরূপ একটা খৃষ্টাব্দ কি শকাব্দের প্রত্যাশা করিতেছেন, কিন্তু ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় প্রশ্নের তদ্রূপ সহজ উত্তর দেওয়া যায় না। কোন কোন লেখক, এইরূপ পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াসী হইয়া বলিয়াছেন, ১০০০ বৎসর হইল বঙ্গ-ভাষা ও বঙ্গাক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে। ললিতবিস্তরে দেখা যায়, বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্র নামক অধ্যাপকের নিকট অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, ব্রাহ্মী, সৌরাষ্ট্রী ও মাগধলিপি শিখিতেছেন; ইহা ৫৫০ খৃঃ পূর্ব্বের কথা। গৌড়ের সেনরাজাগণের তাম্রশাসন, এবং ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম তাম্রশাসন সমূহের অক্ষর বাঙ্গালা; সেই সকল তাম্রশাসন ন্যূনাধিক ৮ শত বৎসরের প্রাচীন। গোপীচাঁদের গান সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে, পাঠক দেখিবেন উহা বহু প্রাচীন রচনা; প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজা লক্ষ্মণসেন বঙ্গদেশে রাজত্ব

* উত্তরে রাজমহল দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পশ্চিমে উড়িষ্যা এবং পূর্ব্বে আসাম হইতে আরকান পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার উপত্যকাবাসী প্রায় ৫০ লক্ষলোক বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলিয়া থাকে। এই বৃহৎ ভূভাগের প্রচলিত ভাষায় নানারূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তথাপি ভাষা তত্ত্বালোচনাকালে ইহাকে এক ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।" হান্টরের ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার, ৩৪৭ পৃঃ।

করিতেছিলেন, কথিত আছে লক্ষ্মণ সেনের কল্পনাপ্রসূত কয়েকটি বাঙ্গলা-পদ পদ-সমুদ্র গ্রন্থে সংগৃহীত আছে; এইরূপ নানা কারণে বঙ্গভাষা ও বঙ্গাক্ষরের সহস্রবৎসরপূর্ব্ব উৎপত্তির সূত্র কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না।

আর্য্যগণ যখন ব্রহ্মাবর্ত্ত ত্যাগ করিয়া ভারতের নানাপ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, তখন তাঁহাদের ভাষা ও অক্ষর ক্রমশঃ স্বতন্ত্র হইতে লাগিল। দেশের অবস্থা ও অন্যান্য কারণে, এই স্বাতন্ত্র্য ঘটিয়াছিল। বিম্‌স্ সাহেব বলেন উড়িষ্যার অক্ষর গঠনে উক্তদেশসুলভ তালপত্র সমূহ বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে, তিনি একটি সপত্র তালতরুর ছবি স্বীয় পুস্তকে* মুদ্রিত করিয়া এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, উড়িয়াগণ সর্ব্বদা সেইরূপ গোলাকৃতি কুঞ্চিতাগ্র তালপত্র দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ তালপত্রে লৌহসূচির অগ্রভাগে পুস্তকাদি লিখিতেন, সুতরাং তালপত্রের ভাব তাঁহাদের মনে এরূপ ভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহাদের অক্ষরগুলি ও তালপত্রের ন্যায় কুঞ্চিতাগ্র গোলাকৃতি ছন্দ ধারণ করিয়াছে। হিন্দুস্থানের নানা দেশ-প্রচলিত অক্ষরগুলি এইভাবে পরস্পরের সহিত স্বতন্ত্র হইয়াছে। বিম্‌স্ সাহেবের মত যে সম্পূর্ণ গ্রহণীয়, আমরা তাহা বলিতেছি না। হয়ত উহাতে ইতিহাস-বিরোধী একটু কল্পনা, একটু কবিত্ব খেলিয়াছে; কিন্তু দেশভেদে ও অবস্থাভেদে যে অক্ষর ও ভাষার বৈষম্য দাঁড়াইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে আর্য্যগণ আসিলে পর, তাঁহাদের ভাষার সঙ্গে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য প্রদেশের ভাষা মিশ্রিত হইল এবং দেশের স্বাভাবিক কতকগুলি কারণ বশতঃ ও বঙ্গদেশ-কথিত-ভাষা রূপান্তরিত হইয়া গৌড়ীয়† অন্যান্য ভাষা হইতে পৃথক হইল। কিন্তু বঙ্গভাষার কবে উৎপত্তি হইয়াছে, কে বলিবে? আদি দেখিবার ঔৎসুক্য আমাদের নাই, বিজ্ঞান ও সে প্রশ্ন করে না; যাহা হইতেছে, তাহা কি ভাবে হইতেছে, তাহাই দর্শনীয়।

* Compartive Grammar Vol I.

† হরন্‌লি সাহেব নিম্নলিখিত ভাষাগুলিকে গৌড়ীয় ভাষার অন্তর্গত স্থির করিয়াছেন,—উড়িয়া, বাঙ্গলা, হিন্দি, নেপালী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, সিন্ধিয়া, পাঞ্জাবী, এবং কাশ্মীরী। আমরা সেই শব্দ উক্ত অর্থেই ব্যবহার করিলাম।

আর্য্য-জাতির প্রথম ভাষা বেদে, তৎপরবর্ত্তী ভাষা রামায়ণাদির সংস্কৃতে, তৎপরবর্ত্তী ভাষা বৌদ্ধদিগের পালি ও গাথা প্রভৃতি প্রাকৃতে, চতুর্থ প্রকার, বাঙ্গলা হিন্দি প্রভৃতি গৌড়ীয় ভাষাগুলিতে দৃষ্ট হয়; ইহা শুধু লিখিত ভাষার কথাই বলিতেছি। আমরা বঙ্গভাষার সময় নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া, ইহার লিখিত ভাষায় পরিণতির কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। ভাষার আদি নির্ণয় করিবার ভার, কল্পনা-শীল কবি ও দার্শনিকদিগের হস্তে দিয়া, ঐতিহাসিকগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

বোধ হয়, যে ভাষায় আদিম হিন্দুগণ কথা কহিতেন, বেদে ঠিক সেইরূপ ভাষাই রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরে ভাষার শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টাও ব্যাকরণের সৃষ্টি হইতে কথিত ও লিখিত ভাষা স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই, রামায়ণের ভাষা, ঠিক কথিত ভাষা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যখন কালিদাস, বালেন্দুবক্র পলাশ-প্রসূনের বর্ণনা করিতেছিলেন, কি জয়দেব, মদন মহীপতির কনক-দণ্ড-রুচি কেশরকুসুমের কথা লিখিতেছিলেন, তখন তাঁহারা সে ভাষায় কথা বলিতেছিলেন না। এখন ও বঙ্গের কত কবি, মুখে বিদ্যুৎ কি মেঘের ডাক বলিয়া, লেখনী দ্বারা ইরম্মদ কি জীমূতমন্দ্রের সৃষ্টি করিতেছেন; তাই বলিতেছিলাম, লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে, একটা প্রভেদ আছে ও চিরদিনই থাকিবে।

লিখিত ভাষার সঙ্গে, কথিত ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও, সে ব্যবধানের একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে, লিখিত ভাষা মৃত হইয়া পড়ে ও তৎস্থলে কথিত ভাষা একটু বিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হয়। লিখিত ভাষার উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়া উহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ হয়। ক্রমশঃ বাক্য-পল্লব ও শব্দের শ্রীবৃদ্ধির প্রতি রুচি প্রবল হওয়াতে—ভাষা জনসাধারণের অনধিগম্য হইয়া পড়ে,—তখন ভাষা বিপ্লবের আবশ্যক হয়। যখন সংস্কৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার সেইরূপ প্রভেদ ঘটিল তখন কথিত পালি-ভাষা, কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ হইয়া, লিখিত ভাষা হইয়া দাঁড়াইল; যখন পুনশ্চ প্রাকৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভেদ বেশী হইল, তখন বর্ত্তমান গৌড়ীয় ভাষাগুলি কিঞ্চিৎ পরিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হইল। ব্যাকরণ, শিশু ও অকৃতির বাক্ চেষ্টা শাসন করে বলিয়া, উহা চির-প্রবাহ-শীল ভাষার

গতি স্থির রাখিতে পারে না। ব্যাকরণকে অগ্রাহ্য করিয়া ভাষা রূপান্তর গ্রহণ করে। ব্যাকরণ, যুগে যুগে ভাষার পদাঙ্কস্বরূপ পড়িয়া থাকে। ভাষা যে পথে বহিয়া যায়, ব্যাকরণ সেই পথের সাক্ষী মাত্র। বিলুপ্ত মাহেশ ব্যাকরণের পর পাণিনি, তৎপর বররুচি, পুরন্দর, শাকটায়ন, যাস্ক, ইঁহাদের পর রূপসিদ্ধি, লঙ্কেশ্বর, শাকল্য, ভরত, কোহল, ভামহ, বসন্তরাজ, মার্কণ্ডেয়, ক্রমদীশ্বর, দীপঙ্কর, মোগ্‌গল্যায়ন, শিলাবংশ—ব্যাকরণ রচনা করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যাহা ভাষার দোষ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, পরবর্ত্তী যুগের ব্যাকরণ তাহাই ভাষার নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। তাই পাণিনির নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াও মহাবংশ ও ললিতবিস্তর শুদ্ধ বলিয়া গণ্য, এবং বররুচির নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াও চাঁদ কবির গাথা কি চৈতন্যচরিতামৃত নিন্দনীয় হয় নাই। সময় সম্বন্ধে যেরূপ প্রাতঃ, সন্ধ্যা, রাত্রি,—ভাষা সম্বন্ধে ও সংস্কৃত, প্রাকৃত, বাঙ্গলা, কি হিন্দি তদ্রূপ—পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার রূপান্তর।

বঙ্গভাষা আমরা এখন যেরূপ বলি, তাহার মুখ্য চিহ্নগুলি কোন্ সময় গঠিত হইয়াছিল, নিরূপণ করা সহজ নহে। বঙ্গভাষা জননীর গর্ভ হইতে শিশুর ন্যায়, কোন শুভ লগ্নে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। বহুদিন হইতে ক্রমে ক্রমে ইহার বর্ত্তমান রূপ গঠিত হইতেছিল। কথিত ভাষা, ব্যাকরণানুযায়ী লিখিত প্রাকৃত হইতে বহুদূর হইয়া পড়িল—তাহা একদিনে নহে। হরন্‌লি সাহেবের মতে, ৮০০খৃঃ হইতে ১২০০খৃঃ অব্দের মধ্যে প্রাকৃতের যুগ লুপ্ত ও গৌড়ীয় ভাষাগুলির শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-শক্তির পরাভবে, হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানে, হিন্দু-জাতির নব চেষ্টার স্ফুরণে, ও সংস্কৃতের নববিকাশে, সেই পরিবর্ত্তন এত দ্রুত হইল, প্রাকৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভেদ এত বেশী হইল, যে উক্ত ভাষাকে বিদায় দিয়া, গৌড়ীয়ভাষা গুলিকে লিখিত ভাষার শ্রেণীভুক্ত করা আবশ্যক হইল। ইতিহাসে ও বৌদ্ধাধিকারের লোপকাল ও হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুত্থান কাল ৮০০খৃঃ হইতে ১২০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে বলিয়া বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সংস্কৃত প্রাকৃত ও বাঙ্গলা।

ধর্ম্মবিপ্লবে প্রাচীনভাব ও ভাষার সংস্কার এবং নবভাব ও ভাষার প্রতিষ্ঠা হয়। রোমান যাজকদিগের প্রভুত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে, ল্যাটিনের একাধিপত্য নষ্ট হয়। বুদ্ধদেব মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, স্বীয় শিষ্যগণকে তাঁহার বাক্য ও কার্য্যাবলি পালিভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে অনুজ্ঞা করেন।* ভারতের ভাষার ইতিহাসে সেইদিন এক নবযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। যদিচ বৌদ্ধগণ ও মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন, তথাপি সেই অনুজ্ঞা প্রচারের সময় হইতে সংস্কৃতের অখণ্ড প্রভাব তিরোহিত হয়। দেবভাষা, দেব ও ঋষিগণের জন্য সেইদিন স্বর্গারোহণ করেন।

বৌদ্ধাধিকারে প্রাচীন ভাষা ও ভাব দলিত হয়। ব্রাহ্মণগণ কৃষিকার্য্য আরম্ভ করেন, কভু বা বৌদ্ধদিগের জীবে দয়া স্মরণ করিয়া, হলকর্ষণ কার্য্যে নিবৃত্ত হইবার বিধি প্রণয়ন করেন যথা,—

"বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবংস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপি বা। হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥ কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা। ভূমিং ভূমিশয়াং চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখম্॥" মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায় ৮৪ শ্লোক।

হল-চালনায় পাছে কোন ক্ষুদ্র জীব নষ্ট হয়, সেই আশঙ্কায় এই নিষেধ। ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ মুঞ্জশ্রী শ্রমণদিগের সঙ্গে একত্র বাস করিয়া, হিন্দু-ধর্ম্মকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিবিম্ববৎ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আদি চতুর্ব্বর্ণ হইতে নানা প্রকার সঙ্কর জাতি উদ্ভূত হয়, ব্রাহ্মণ বেশ্যাকে বিবাহ করিয়া সমাজে গৃহীত হইতেন— চারুদত্ত মৃচ্ছকটিকের শেষাঙ্কে বসন্ত সেনাকে বিবাহ করিলেন, এরূপ দেখা যাইতেছে; যে ভাবে বৌদ্ধগণ রামায়ণ নষ্ট করেন, তাহাতেই দৃষ্ট হইবে, বৌদ্ধাধিকারে হিন্দুশাস্ত্রের দুর্গতির একশেষ হইয়াছিল। রাজা দশরথের দুই পুত্র

* "আমার বাক্য সকল সংস্কৃতে অনুবাদ করিও না, তাহা হইলে বিশেষ অপরাধী হইবে। আমি যেমত প্রাকৃত ভাষায় উপদেশ দিতেছি, ঠিক সেইরূপ ভাষা গ্রন্থাদিতে ব্যবহার করিবে।" বুদ্ধবাক্য। ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত হইয়াছিল, এবং ইহার টীকাকারও কহেন বুদ্ধবাক্য সকল মকধিরুত্তি অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় রচিত।"

এবং এক কন্যা—পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ এবং কন্যা সীতা। রামায়ণের শেষে রাম সহোদরা সীতাকে বিবাহ করেন*। ইহা শুধু রামায়ণের বিকৃতি নহে, ইহা দ্বারা সমাজে বিবাহ-পদ্ধতি যে যথেচ্ছাচারে পরিণত হইয়াছিল, তাহার ও আভাষ পাওয়া যায়।

শুধু সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়াছিল, এরূপ নহে,—ভাষা ও বিশৃঙ্খল এবং শ্লথ হইয়া পড়িয়াছিল। কথিত ভাষার উপর লিখিত ভাষার সর্ব্বদাই প্রভাব দৃষ্ট হয়। সংস্কৃতের আদর্শ, লোক-চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইল ও তৎস্থানে শিথিল প্রাকৃত রাজসভায় প্রচলিত হইল। কথিত ভাষা ও পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদুভাব অবলম্বন করিল যথা,—

১। "পণমহ জমস্স চলণে॥" মুদ্রারাক্ষস ১ম অঙ্ক।

২। শূলং বিকন্তে? পওবে খেদকেদু? পুত্তে লাধাএ? লাবণে? ইন্দ উত্তে? অহো কুন্তীএ তেণ লামেণ জাদে? অশ্বখামে? ধর্ম্মপুত্তে? জড়াউ?" মৃচ্ছকটীক ১ম অঙ্ক।

৩। "পলিত্তাঅদু দাশীএ পুত্তে দলিদ্দ চালুদত্তাকে তুমং॥ ঐ ৮ম অঙ্ক।

সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রেই এইরূপ লেখা বহুবার পড়িয়াছেন। চারুদত্ত, রাম, রাবণ, দরিদ্র, চরণ স্থলে, চালুদত্ত, লাম, লাবণ, দলিদ্দ ও চলণ হইয়াছে। এখন ভারতবর্ষের কোন স্থানেই নিরক্ষর কৃষক ও রামকে লাম বলিলে ক্ষমার্হ হইবে না। কথিত ভাষাও এখন অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ হইয়াছে। ইহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া। জৈমিনি ও ভট্টপাদ এই প্রতিক্রিয়ার কার্য্য আরম্ভ করেন। সাহসরামের প্রস্তরলিপিতে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অশোকের যে অত্যাচার বর্ণিত আছে, রাজা সুধন্বা সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। যথা শঙ্কর বিজয়ে,—

"দুষ্টমতাবলম্বিনঃ বৌদ্ধান্ জৈনান্ অসংখ্যাতান্ রাজমুখ্যাননেকবিদ্যাপ্রসঙ্গভেদৈর্নির্জিত্য তেষাং শীর্ষাণি পরশুভিশ্ছিত্বা বহুষু উলূখলেষু নিক্ষিপ্য কটভ্রমণৈশ্চূর্ণীকৃত্য চৈবং দুষ্ট-মত-ধ্বংসমাচরন্ নির্ভয়ো বর্ত্ততে॥"

হিন্দু-ধর্ম্মের এই উত্থান কেবল উৎপীড়ন মাত্রেই পর্য্যবসিত হইল না। চতুর্দ্দিকে প্রাচীন শাস্ত্রের চর্চ্চা প্রারব্ধ হইল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আজ-

* অথ বারাণস্যাম দশরথ মহারাজ নাম অগাতি গমনমপহায় ধর্ম্মেণ রাজ্যমকোরসি। তস্ত ষোলসন্ন মহিষি সহস্সনম জেঠ্‌ঠিকা অগমহেসি দ্ব পুত্ত একণ সধিরম বিজয়ি। জেঠ্‌ঠ পুত্তো রাম পণ্ডিতো অহোষি। দুতীয় লক্ষ্মণ কুমারোধিত্তা সীতাদেবী নাম॥" ইত্যাদি। বৌদ্ধ জাতকঃ।

মিরের রাজপুত্র সারঙ্গদেব বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা রাজা বিশালদেব, হিন্দু-শাস্ত্র শুনাইয়া তাঁহার মতি গতি স্থির করিলেন। চাঁদকবি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।*

সংস্কৃতের আদর্শ ভাষাক্ষেত্রে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলে, লিখিত ও কথিত ভাষা উভয়ই বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। লাম পুনঃ রাম হইলেন। রত্নাকর দস্যুর উচ্চারণ সংশোধন সম্বন্ধে লৌকিক বিশ্বাস, কৃত্তিবাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"পাপে জড় জিহ্বা রাম বলিতে না পারে। কহিল আমার মুখে ও কথা না স্ফুরে॥ শুনিয়া ব্রহ্মার তবে চিন্তা হইল মনে। উচ্চারিবে রাম নাম এমুখে কেমনে॥ মকার করিল অগ্রে রা করিল শেষে। তবে বা পাপীর মুখে রাম নাম আইসে॥ ব্রহ্মা বলিলেন তারে উপায় চিন্তিয়া। মানুষ মরিলে বাপু ডাক কি বলিয়া॥ শুনিয়া ব্রহ্মার কথা বলে রত্নাকর। মৃত মানুষেরে সবে মড়া বলে নর॥ মড়া নয় মরা বলি জপ অবিশ্রাম। তব মুখে তখনি স্ফুরিবে রাম নাম॥ শুষ্ক কাষ্ঠ দেখিলেন বৃক্ষের উপরে। অঙ্গুলি ঠারিয়া ব্রহ্মা দেখান তাঁহারে॥ বহুক্ষণে রত্নাকর করি অনুমান। বলিল অনেক কষ্টে মরা কাষ্ঠ খান॥ মরা মরা বলিতে আইল রাম নাম। পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ॥ তুলা রাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয়। একবার রাম নামে সর্ব্বপাপ ক্ষয়॥ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

যাহার জিহ্বা পাপে জড়, এবং যে পরস্বহারক দস্যু, তাহার মুখে রাম নাম বিকৃত হয়। ইহাতে বৌদ্ধদিগের প্রতি একটুকু কটাক্ষ আছে। ব্রহ্মার (না ব্রাহ্মণের?) এত দোহাই ও যত্নের সহিত এই নূতন স্পেলিং শিক্ষা দেওয়ার পরে, আর কোন্ চাষা রামকে লাম বলিতে সাহস করিবে? তাই লকারের প্রভাব লুপ্ত হইল ও চাঁলুদত্ত, লাম, লাবণ, দলিদ্দ স্থলে, চারুদত্ত, রাম, রাবণ, দরিদ্র পুনরায় কথিত ভাষায় ফিরিয়া আসিল। সংস্কৃতানুযায়ী স্পেলিং প্রচার কার্য্য অদ্যাবধি চলিতেছে। প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকগুলির ভাষা ক্রমশঃ পরিশুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। সেইসব পুঁথিতে অনেক শব্দ দৃষ্ট হয়, যাহা এখন লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। যথা,—

* অতি দুচিত্ত ভয়ৈ সারংগ দেব। নিত প্রতি করৈ অবিহিতং সেব॥ বুধ ধ্রাম লিয়ৈ বাঁধে ন তেগ। সুনি স্রবং রাজ মন ভৈ উদেগ॥ বুলাই কুবংর সণমাণ কীন। কিহি কাজ তুমং ইহ ধ্রম্ম লীন॥ তুমং ছংড়ি সরম ইম কহৈ বত। বানিক পুত্র হন তেং দুচিত॥ ইহ নষ্ট জ্ঞান সুনিয়েণ কাণ। পুরষাতন ভজৈ কিত্তী হান॥ তুম রাজবংশ রাজ নহ সংগ। মৃগয়া সর খেলো বন কুরংগ॥ পরমোধ ভজো বোধক পুরাণ। রামায়ণ সুনহ ভারত নিদান॥ ইত্যাদি।" চাঁদগাথা।

পখা—পক্ষ, কাতি—কার্ত্তিকমাস, নিমল—নির্ম্মল, নখ্তা—নক্ষত্র, মুরুক—মূর্খ, বিভা—বিবাহ, পুনি—পুনঃ, শুকুল—শুক্ল, বগা—বক, দে—দেহ, সভাই—সবাই, বিনি—বিনা।*

বস্তুতঃ বাঙ্গলার সঙ্গে কালে সংস্কৃতের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইল যে, বাঙ্গলা প্রাচীন কবিতা স্থলে স্থলে সংস্কৃত কবিতা বলিয়াও গণ্য হইতে পারে, ভারতচন্দ্রের এই কবিতাটি দেবনাগর অক্ষরে ছাপা হইলে কাশী কি পুণার পণ্ডিতগণ ঠিক বাঙ্গালীর মতই তাহার রসাস্বাদ করিতে পারিবেন,—

"জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃষ ধ্বজেশ্বর, মৃগাঙ্ক শেখর দিগম্বর। জয় শ্মশান নাটক, বিষাণ-বাদক, হুতাশভালক মহত্তর। জয় সুরারি নাশন। বৃশেষ বাহন, ভুজঙ্গ ভূষণ জটাধর। জয় ত্রিলোক কারক, ত্রিলোক পালক, ত্রিলোক নাশক মহেশ্বর।"

বিম্‌স্ সাহেব বঙ্গভাষাকে গৌড়ীয় অন্যান্য ভাষা হইতে সংস্কৃতের অতি সন্নিহিত মনে করেন। তিনি প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের মতানুসারে, হিন্দি, পাঞ্জাবী ইত্যাদি ভাষাকে 'তৎসম' ও বাঙ্গলাকে 'তদ্ভব' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন † এবং এই নির্দ্দেশ করেন, যে পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে মুসলমানগণের প্রভাব বশতঃ ভাষা শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু বঙ্গভাষা সুদূর সীমান্তে নিরুপদ্রবে সংস্কৃতের ভাবে গঠিত হইতে অবকাশ পাইয়াছিল।

বঙ্গদেশে সংস্কৃতের শক্তি কখনই লুপ্ত হয় নাই। যখন সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল, তখন ও হিউনসাঙ, সমতট এবং বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থলে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি এই দেশের লোকদিগকে পরিশ্রমী ও শিক্ষাভিমানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশ সংস্কৃতের গর্ব্ব চিরদিনই রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। গৌড়ীয় রীতি বৃথা শব্দাড়ম্বর-পূর্ণ বলিয়া অলঙ্কার শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ অনাদর করিয়াছেন। বৈদর্ভীরীতির প্রসাদ গুণ, মাধুর্য্য ও সুকুমারত্ব ও গৌড়ীয়রীতির সমাস বহুলত্ব, দণ্ডাচার্য্য উদাহরণ দ্বারা দেখাইয়াছেন। যথা বৈদর্ভীরীতি,—

"মালতীমালা লোলালিকলিলা যথা।

গৌড়ীয় রীতি,—

যথা নতার্দ্ধ নাজন্ম সদৃক্ষাক্ষো বলক্ষগুঃ॥"

কিন্তু এইসব শ্রুতিকটু সমাসাবদ্ধ পদদ্বারা, বোধ হয়, সংস্কৃত এদেশে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাই গৌড়ীয় ভাষা গুলির মধ্যে, বঙ্গভাষা সংস্কৃতের অতি-সন্নিহিত।

* ইহার প্রায় সবগুলিই ডাক ও খনার বচনে পাওয়া যাইবে।

† Beames Comparative Grammar VOL. I. P. 29.

কেহ কেহ বলেন, বঙ্গভাষা প্রাকৃত হইতে আসে নাই; কিন্তু একবারে এক সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে। আমরা বাঙ্গলাকে গৌড়ীয় ভাষাগুলির মধ্যে সংস্কৃতের অতি সন্নিহিত মনে করিলে ও উক্ত মত কখনই সমর্থন করিতে পারি না। দেখা যাইবে, ডাক ও খনার বচনের ভাষা ও পরাগলী মহাভারতের ভাষাই স্থলে স্থলে এত কঠোর যে, তাহার অর্থ পরিগ্রহ করা সহজ নহে। এই সকল রচনা হইতে ৫০০।৬০০ বৎসর পূর্ব্বের ভাষা অবশ্য সংস্কৃত ছিল না, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। তাহা বর্ত্তমান ভাষা হইতে এত দূরবর্ত্তী ছিল যে, তাহাকে বঙ্গভাষা আখ্যা প্রদাম করা ও সঙ্গত নহে; সুতরাং প্রাকৃত ছাড়া কি বলা যাইতে পারে? হয়ত যে সব প্রাকৃত রচনা আমরা পাইয়াছি, এইদেশ-প্রচলিত প্রাকৃত ঠিক সেরূপ ছিল না; কিন্তু উহা ও সাহিত্য-দর্পণনির্দ্দিষ্ট ১৮ প্রকার প্রাকৃতিক ভেদের অন্তর্গত ছিল, অনুমান করা বোধ হয় অন্যায় নহে। দণ্ড্যাচার্য্য-বিরচিত কাব্যাদর্শে গৌড়দেশীয় প্রাকৃতের উল্লেখ আছে;—

শৌর-সেনীচ গৌড়ীচ লাটীচান্যাচ তাদৃশী।
যাতি প্রাকৃতমিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিম্॥

বঙ্গভাষার ঠিক প্রাগবস্থা আমাদের পরিচিত প্রাকৃতগুলির কোনটিতেই পাই না, কিন্তু অনেকরূপ সাদৃশ্য পাই। নিম্নে শব্দগত সাদৃশ্য দেখাইতে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। যদিও এই সব শব্দ নানাপুস্তকেই দৃষ্ট হইবে, তথাপি আমি যে পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত তালিকায় উল্লেখ করিলাম।

প্রাকৃত (সংস্কৃত)——বাঙ্গালা——যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।
†পত্থর (প্রস্তরঃ) ... পাথর।
†লোণ* (লবণম্) ... লুন।
বিজ্জুলী (বিদ্যুৎ) ... বিজুলী ... মৃঃ কঃ।

† এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট শব্দগুলি বাঙ্গলা ও ইংরেজী পুস্তকাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহার অধিকাংশই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবে' বিম্‌স্ সাহেবের 'Comparative grammar' এ ও রামদাস সেন মহাশয়ের প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া যাইবে।

* 'লুন' শব্দ পূর্ব্বে 'লোন' রূপেই ব্যবহৃত হইত; যথা কবিকঙ্কন চণ্ডীতে,—
"বায়ান্ন পুরুষ যার লোনের ব্যাপার। সে বেটা আমার কাছে করে অহঙ্কার॥"

প্রাকৃত (সংস্কৃত)	বাঙ্গালা	যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।
বাড়ী (বাটী)	... বাড়ী ...	মৃঃ কঃ।
ঘর (গৃহম্)	... ঘর ...	ঐ
দুআর (দ্বারম্)	... দুয়ার ...	ঐ
ঠাণ (স্থানম্)	... ঠাঁই ...	ঐ
বহু* (বধূঃ)	... বউ ...	মৃঃ রাঃ।
বক্কল (বল্কলম্)	... বাকল ...	শকুঃ।
†ভত্ত (ভক্তম্)	... ভাত ...	
†লট্‌ঠী (যষ্টিঃ)	... লাঠী ...	
†খম্ভ (স্তম্ভঃ)	... খাম্বা ...	
†চক্ক (চক্রং)	... চাকা ...	
ঘিঅ (ঘৃতম্)	... ঘি ...	মৃঃ কঃ।
দহী (দধি)	... দই ...	ঐ
†দুধ্ব (দুগ্ধম্)	... দুধ ...	
অন্ধআর (অন্ধকারঃ)	...আঁধার ...	মৃঃ কঃ।
শিআল (শৃগালঃ)	... শিয়াল ...	ঐ
হথী (হস্তী)	... হাতি ...	ঐ
ঘোড়ও (ঘোটকঃ)	... ঘোড়া ...	গাথা।
চন্দ (চন্দ্রঃ)	... চাঁদ ...	মৃঃ কঃ।
সঞ্ঝা (সন্ধ্যা)	... সাঁঝ ...	ঐ
হত্থ (হস্তঃ)	... হাত ...	শকু।
মত্থঅ (মস্তকং)	... মাথা ...	মৃঃ কঃ।
উত্ত (পুত্রঃ)	... সুত ...	উঃ চঃ।
কন্ন (কর্ণঃ)	... কাণ ...	মৃঃ কঃ।
হিঅঅ (হৃদয়ং)	... হিয়া ...	ঐ
অত্তা॥ (মাতা)	... আই ...	ঐ

* প্রাকৃত 'বহু' প্রাচীন বঙ্গীয় অনেক পুস্তকে দৃষ্ট হয়। যথা,—

'যাহার বহু ঝি দূরে যান্তি। তাহার নিকট বসে অসতী।' ডাকের বচন, বেণীমাধব দের সংস্করণ।

॥ বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে 'আতার' ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যথা,—

'আছিল আমার আতা কিছুই না জানি। তুরুকের ভয়েতে সেই হিন্দুয়ানী মানি॥'

প্রাকৃত (সংস্কৃত)	বাঙ্গালা	যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।
রাও, রায় (রাজা) ...	রায় ...	চঃ কৌঃ ও পিঙ্গল।
†চ্ছুরা (ক্ষুরঃ) ...	ছুরি ...	
†মসাণ (শ্মশানম্) ...	মশান ...	
বম্ভণ (ব্রাহ্মণঃ) ...	বামুন ...	মৃঃ কঃ।
চেড়ী* (চেটী) ...	চেড়ী ...	ঐ
সহি (সখি) ...	সই ...	ঐ
†জেট্‌ঠা (জ্যেষ্ঠ) ...	জেঠা ...	
উবজ্‌ঝাঅ (উপাধ্যায়ঃ)	ওঝা ...	মুঃ রাঃ
†কজ্জ (কার্য্যম্) ...	কায ...	
†কম্ম (কর্ম্ম) ...	কাম ...	
বহিণী (ভগ্নী) ...	বোন ...	মৃঃ কঃ
রাই (রাধিকা) ...	রাই ...	অপভ্রংশ ভাষা ¶
কাণু (কৃষ্ণঃ) ...	কানু ...	ঐ
গোয়াল (গোপঃ) ...	গোয়াল ...	ঐ
†বত্তা (বার্ত্তা) ...	বাত ...	
অপ্পি (আত্মা) ...	আপন ...	মুঃ রাঃ
আম্হি‡ (অহং) ...	আমি ...	মৃঃ কঃ
তুম্হি (ত্বং) ...	তুমি ...	উঃ চঃ
শে (সঃ) ...	সে ...	মৃঃ কঃ
তুএ (ত্বয়া) ...	তুই ...	ঐ
তুহ (তব) ...	তাহার ...	শকুঃ
এহ (এষঃ) ...	এই ...	ঐ
ইমিণ (অনেন) ...	এমনে ...	মুঃ রাঃ

* এই শব্দ পূর্ব্বে খুব প্রচলিত ছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণ দেখ।

¶ অপভ্রংশভাষামাহ আভীরাদিগিরঃকাব্যেষ্বপভ্রংশগিরঃ স্মৃতাঃ।

‡ বাঙ্গলা ও প্রাকৃতের সান্নিধ্য দেখাইতে এই 'আম্হি' ও 'তুম্হি' বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত ১৫০ বৎসরের পূর্ব্বের সমস্ত হস্তলিখিত পুঁথিতেই আমি ও তুমি স্থলে সর্ব্বত্রই আম্হি ও তুম্হি দৃষ্ট হয়। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের পুস্তকাগারে পরাগলী মহাভারত, সঞ্জয়-রচিত মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকে এই কৌতূহল-জনক বিষয় দৃষ্ট হইবে।

প্রাকৃত	(সংস্কৃত)	বাঙ্গালা	যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।
অজ্জ	(অদ্য)	আজ্জ	উঃ চঃ
ণা	(ন)	না	গাথা
অ	(চ)	ও	ঐ
দঢ়	(দৃঢ়ঃ)	দড় *	শকুঃ
সচ্চ	(সত্যম্)	সাচা	মৃঃ কঃ
অদ্ধ	(অর্দ্ধম্)	আধ	ঐ
বুড্‌ঢা	(বৃদ্ধঃ)	বুড়া	ঐ
দুঅ	(দ্বয়ং)	দুই	পিঙ্গল
দুণা	(দ্বিগুণ)	দুনা	ঐ
তিন্নি	(ত্রি)	তিন	ঐ
চারি	(চতুর্)	চারি	ঐ
ছট্‌ঠ	(ষষ্ঠ)	ছয়	মৃঃ কঃ
সত্ত	(সপ্ত)	সাত্ত	পিঙ্গল
অট্ট	(অষ্ট)	আট	মৃঃ কঃ
বার	(দ্বাদশ)	বার	পিঙ্গল
চোদ্দ	(চতুর্দ্দশ)	চৌদ্দ	ঐ
সোলা	(ষোড়শ)	ষোল	ঐ
বাইসা	(দ্বাবিংশ)	বাইশ	ঐ
†কেত্তক	(কিয়ৎ)	কত্তক	
†এত্তক	(ইয়ৎ)	এত্তেক	
†জেত্তক	(যাবৎ)	যত্তেক	
জথ	(যত্র)	যথায়	উঃ চঃ
এথ	(অত্র)	এথায়	মৃঃ কঃ

বাঙ্গলা আর প্রাকৃতের ক্রিয়ার নৈকট্য, অতি স্পষ্টই দেখা যায়। যে কোন প্রাকৃত রচনা হইতে ঐ সব ক্রিয়া খুঁজিয়া বাঙ্গলার সঙ্গে তুলনা করিলেই পরস্পরের সম্বন্ধ অনুমিত হইবে। প্রাকৃতের বর্ত্তমান কালের, হোই, পড়ই, কিণই,

* এই 'দড়' শব্দ পূর্ব্বে দৃঢ় অর্থেই ব্যবহৃত হইত। যথা,—
"মন্ত্রে কাবে শ্রীকর উদ্ধত বিজবর। কোনদিন আমাকে কিলায় পাছে দড়।" চৈ,ভা।
এই "দড়" অর্থ এখন নিপুণ হইয়াছে।

করই, বোলই, গচ্চই ইত্যাদি স্থলে আমরা বাঙ্গলা হয়, পড়ে, করে, কেনে, বলে, নাচে, ইত্যাদি পাইতেছি। প্রাকৃত শুনিঅ, লভিঅ, লই, ভবিঅ, করিঅ ইত্যাদি বাঙ্গলায় শুনিয়া, লভিয়া, লইয়া, হইয়া, করিয়া ইত্যাদি রূপ হইয়াছে। প্রাকৃত 'অচ্ছি'র সঙ্গে ভূ ধাতুর অসমাপিকা 'হইয়া'র মিলনে 'হইয়াছে' গঠিত। দেখিতেছে, করিতেছে ইত্যাদি ও ঐরূপেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থলে দুইটি শব্দ পৃথক ভাবে উচ্চারিত হয়, যথা—'দেখিতে—আছে' 'করিতে—আছে'। অতীত কালের 'আসীৎ' এর অপভ্রংশ, 'আছিল' পূর্ব্বোক্তরূপে অন্যান্য ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়।*

শব্দের রূপান্তরাবলম্বনের ক্রিয়া অতি বিচিত্র। শুধু অনুকরণপ্রিয়তাহেতু সময়ে সময়ে কোন ব্যাপক পদ্ধতি প্রচলিত হয়। 'চল,' 'খেল' ইত্যাদি ধাতুর 'ল' অন্যান্য ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যেখানে 'র'কারের সংশ্রব আছে, সেখানে 'ল' তে পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে, 'ড়লয়োরভেদঃ' —কিন্তু তদ্ভিন্ন ও অনেক স্থলে 'ল' প্রচলিত আছে। চলিলাম (চলামঃ) খেলিলাম (খেলামঃ) এর সঙ্গে সঙ্গে হাসিলাম, দেখিলাম ইত্যাদিতে 'ল' প্রযুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত 'ভ্রমঃ' স্থলে প্রাকৃত 'বোল্লাম' দৃষ্ট হয়:— 'ণ ভণামি এস লুদ্ধো গেহস্স রসেণ বোল্লামো' মৃঃ কঃ ৬ অঙ্ক।

করসি, খায়সি, করেন্তি, জানেন্তি ইত্যাদি প্রাকৃতের অনুযায়ী শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় পূর্ব্বে বিস্তর পরিমাণে প্রচলিত ছিল। শুধু কয়েকটিমাত্র উদাহরণ দিয়া দেখাইব। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলির উদ্ধৃতাংশে সেইরূপ আরও অনেক শব্দ দৃষ্ট হইবে।

(১) "ভিক্ষুকের কন্যা তুমি কহসি আমারে।
দেবযানী পলাইল কূপের ভিতরে॥" সঞ্জয়, আদিপর্ব্ব।

(২) "সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভএ বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর॥" কবীন্দ্র, ভীষ্মপর্ব্ব।

(৩) "প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি॥" চৈ, চ,—অন্ত্য।

(৪) "চতুর্দ্দিগে নরসিংহ অদ্ভুত শরীর।
হিরণ্যকশিপু মারি পিবন্তি রুধির॥" শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।

'করোমি'র অপভ্রংশ করোম ললিতবিস্তরে অনেক স্থলে পাওয়া যায়, এবং সর্ব্বত্রই ঐ শব্দ করিয়াছির অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ববঙ্গের কোন

* রামগতি ন্যায়রত্নপ্রণীত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। ২২পৃঃ।

কোন স্থলে এখনও করম ক্রিয়া কথায় ব্যবহৃত হয়। 'মৃগলব্ধ' পুঁথির ভূমিকায় এইরূপ আছে,—

"পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা বসুমতী। জন্মস্থান সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি॥"

'করিমু' প্রাচীন বাঙ্গলা পুস্তকে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। 'কুর্ব্বঃ' হইতে 'করিব' ও ঐরূপেই হওয়া সম্ভব। 'করিমু' র স্থলে কচিৎ 'করিবু' শব্দ ও প্রাচীন রচনায় দৃষ্ট হয়, যথা,—

"নিতি নিতি অপরাধ করে। বলে ডাক কি করিবু তারে॥" ডাক।*

প্রাকৃত 'হউ' (সং, ভবতু) 'দেউ' (সং, দদাতু) স্থলে হউক দেউক বাঙ্গলাতে প্রচলিত। এই 'ক' কোথা হইতে আসিল? বাঙ্গলা অনেক ক্রিয়ার পরই ঐরূপ 'ক' এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যথা করিবেক, খাইবেক, দেখুক ইত্যাদি। এই সকল শব্দের প্রাকৃতের মত (অর্থাৎ 'ক' ছাড়া) ব্যবহার প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থে ও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়—

"জয় জয় জগন্নাথ পুত্র দ্বিজরাজ। জয় হউ তোর যত ভকত সমাজ॥" চৈ, ভা—আদি।

"সর্ব্বলোকে শুনিয়া হইল হরষিত। সবে বলে জীউ জীউ এ হেন পণ্ডিত॥" চৈ, ভা—আদি।

সংস্কৃতের 'হি' যথা 'জানিহি' বাঙ্গলায় শুধু 'হ'তে পরিণত। পূর্ব্বে 'করিহ' 'যাইওহ' রূপ বাঙ্গলায় প্রচলিত ছিল। প্রাকৃতে ও অনুজ্ঞা বুঝাইতে 'হ'র ব্যবহার দৃষ্ট হয়,—

"আঅচ্ছ পুণো জুদংরমহ।" মৃঃ কঃ ২অঙ্ক।

কোথাও 'হু' দৃষ্ট হয়, যথা পিঙ্গলে "মইন্দ করেহু।" এই হু (হুঁ) হিন্দি ভাষায় প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে বাঙ্গলায় প্রাকৃতের মতই 'য' স্থানে 'জ' 'য়' স্থানে 'অ' বা 'এ' লিখিত হইত। প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মুদ্রিত অনেক পুস্তকে ও ঐরূপ লেখার সংশোধন হয় নাই, যথা,—

"উচিত বলিতে পাড়ে গালি। পোয়ে ঝিয়ে হয় বেআলি॥" ডাক।

"পৌষে যার নাহিক ভাত। তার কভু নাহিক সেআথ॥" ডাক।

হস্তলিখিত পুস্তকে,—যথা,—

"ভীষ্মক মারিতে আএ দেব জগন্নাথে। নির্ভএ বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর॥"
কবীন্দ্র—'বেঃ গঃ পুঁথি, ১০২ পত্র।

* বেণীমাধব দের সংস্করণ।

পূর্ব্বে ভারতের কথিত ভাষামাত্রই বোধ হয় 'প্রাকৃত' সংজ্ঞায় অভি-হিত হইত। এই বঙ্গভাষাকেও একজন প্রাচীন লেখক 'প্রাকৃত' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। সঞ্জয়রচিত মহাভারতের ২০০ বৎসরের প্রাচীন হস্ত-লিখিত একখানি পুঁথি আমার নিকট আছে, তাহার আদি পর্ব্বে রাজেন্দ্র দাসের ভণিতাযুক্ত অনেকগুলি পদ আছে,—একটি এইরূপ,:—

"ভারতের পুণ্য কথা শ্রদ্ধা দূর নহে। পরাকৃত পদবন্ধে রাজেন্দ্র দাসে কহে॥"

অপ্রভ্রংশ ভাষার রচনা স্থানে স্থানে বাঙ্গলার সঙ্গে ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যায়,—

যথা,—"রাই দোহারি পঠণ শুণি হাসিঅ কাণু গোয়াল।"

(রাই এর দোহারি পাঠ শুনি হাসিয়া কাণু গোয়াল।)

ছন্দমঞ্জরী, ৭ম স্তবক।

এখন দেখা যাইবে, প্রাকৃত ও বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে তুলনায় সংস্কৃতের সম্বন্ধ অতি কৌতূহল-জনক। প্রাকৃত, বৌদ্ধজগতে আধিপত্য লাভ করিয়া-ছিল; বৌদ্ধধর্ম্ম, হিন্দু ধর্ম্মের অবাধ্য সন্তান, বৌদ্ধাধিকারে প্রচলিত প্রাকৃত ও সংস্কৃতের অবাধ্য সন্তান; সংস্কৃতের বিরাট শব্দের ঐশ্বর্য্য প্রাকৃত উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষাগুলি তাহা গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলে পর, গৌড়ীয় ভাষা-গুলি প্রাধান্য লাভ করে। সংস্কৃতের পুনরুদ্ধারহেতু তদীয় বৈভবে গৌড়ীয়ভাষাগুলি গৌরবান্বিত হইল; প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত হইয়া ও ঐ সব ভাষা প্রাকৃতের ঋণচিহ্ন স্খালন করিতে চেষ্টিত হইল। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। কেহ ভিন্নদেশীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিতে পারে, কিন্তু তাহার বর্ণ, কথা, ভাবভঙ্গি তাহাকে চিনাইয়া দেয়। পরিচ্ছদ দৃষ্টে ভ্রম অতি স্থূলচক্ষেরই হইয়া থাকে। সংস্কৃতের অধ্যাপকগণ গৌড়ীয় ভাষাগুলিকে অপর্য্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দে ধনী করিলেন। লাম, চন্দ, লাধা লেখা দূরে থাকুক, এখন আর কেহ মুখেও বলে না। তবে যে সকল শব্দ বৎসরে একবার মাত্র ব্যবহার করিলে চলে, সেখানে আচার্য্যের কথা মানিয়া লোকসাধারণের উচ্চারণ সংশোধন করা স্বাভাবিক, কিন্তু যাহা দিনে দণ্ডে শতবার ব্যবহার করিতে হইবে, সেখানে উপাচার্য্যের অনুরোধ ও প্রয়াস বৃথা। ক্রিয়াগুলি, বিভক্তি চিহ্নগুলি সংস্কৃত হইতে অনেক ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আর সংশোধন হইল না। প্রতি ছত্রের

গঠনে প্রাকৃতের ভাব মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা এখনও সেইরূপই রহিয়াছে। শুধু নামশব্দ পরিবর্ত্তনে, এ ঋণ হইতে অব্যাহতি অসম্ভব। গৌড়ীয় ভাষাগুলির কচিদ্ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে অনেক স্থলেই সংস্কৃতের সাদৃশ্য প্রাকৃত অপেক্ষা অধিক, কিন্তু প্রতি ছত্রের গঠনগত, ক্রিয়াগত, বিভক্তিচিহ্নগত এবং নিত্য ব্যবহৃত শব্দগত সাদৃশ্য প্রাকৃত হইতে অল্প। বলা বাহুল্য, বঙ্গভাষা যে প্রাকৃতের অধিকতর সন্নিহিত, ইহাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

সংস্কৃত শব্দগুলি যে ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া, প্রথম প্রাকৃত তৎপর গৌড়ীয়-ভাষাগুলিতে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি নিয়মের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়; আমরা কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

আদ্য বর্ণের পরে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে, সংযুক্ত বর্ণের আদ্যাক্ষর লুপ্ত হয়,—যথা,—

হস্তি—হাতি; হস্ত—হাত; সপ্ত—সাত; কক্ষ*—কাখ; মল্ল—মাল; লক্ষ—লাখ; অম্র—আম; বজ্র—বাজ; পক্ষ—পাখ; হট্ট—হাট; অষ্ট—আট; কর্ণ—কাণ; কজ্জল—কাজল; অক্ষি—আঁখি। কখনও কখনও শেষ বর্ণের পরে আকার যুক্ত হয়, যথা,—ছত্র—ছাতা; চক্র—চাকা; চন্দ্র—চান্দা†; পক্ক—পাকা; পত্র—পাতা। কখন ও বর্ণের শেষ আকার লুপ্ত হয়, যথা,—লজ্জা—লাজ; সজ্জন—সাজ; ঢক্কা—ঢাক। আদ্য বর্ণের পরস্থিত সংযুক্ত বর্ণের আদ্যে ং কি নকার থাকিলে তাহা চন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়, যথা,—বংশ—বাঁশ; ষণ্ড—ষাঁড়; হংস—হাঁস, দন্ত—দাঁত; চন্দ্র—চাঁদ;। 'অ' স্থানে আর উদাহরণ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে, অনেক স্থলে স্বরবর্ণ অন্যান্যরূপে ও পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। যথা,—

'অ' স্থানে 'এ';—বঙ্গন—বেগুন।

'আ' স্থানে 'ই';—পঞ্জর—পিঞ্জর; সজ্ঞান—সিয়ানা।

'অ' স্থানে উ;—ব্রাহ্মণ—বামুন।

* কক্ষ, পক্ষ, লক্ষ ইত্যাদির 'ক্ষ'র উচ্চারণ 'খ্খ' এইরূপ ধরা হইয়াছে।

† প্রাচীন বাঙ্গলা পুস্তকে 'চান্দার' প্রয়োগ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। যথাঃ—

(১) "দেখিয়া বরেররূপ লেগে গেল ধাঁধা। কি ভাগ্য সাপের মাঝে আলো করে চাঁদা॥" ক, ক, চ।

(২) "জিনিয়া প্রভাত রবি, সিন্দুর কৌটার ছবি, তার কোলে চন্দনের চান্দা॥" ক, ক, চ।

(৩) "তোমার বদন চান্দা, মোর মন মৃগ বাঁধা, তিল অর্দ্ধ না দেখিলে মরি॥" ক, ক, চ।

(৪) "কাঁদিয়া আঁধার, কলঙ্ক চাঁদার, মরণ লইল আসি॥" চণ্ডীদাস।

(৫) 'লগন চাঁদা' বনা।

দ্বিপ্রহর—দুপুর; ঔষধ—ওষুধ।

ইহা ব্যতীত অন্যান্য অনেক সূত্র সঙ্কলিত হইতে পারে।*

ট ও ড স্থানে স্থানে 'ড়'তে পরিণত হয়, যথা,—ঘোটক—ঘোড়া; ঘট—ঘড়া†; ষণ্ড—ষাঁড়; চণ্ডাল—চাঁড়াল; ভাণ্ড—ভাঁড়।

'ধ' অনেক স্থলে 'য' কি 'ঝ'তে পরিণত হইয়াছে যথা,—উপাধ্যায়—ওঝা; বন্দ্যোপাধ্যায়—বাড়ুয্যা।

স্থানে স্থানে বর্ণ পরিত্যক্ত হইতে দেখা যায়, যথা 'ক'—সুবর্ণকার—সোণারু; চর্ম্মকার—চামার; কুম্ভকার—কুমার; নৌকা—নাও।

'খ'—মুখ—মু‡

'গ'—দ্বিগুণ—দুণা; ভগ্নী—বোন।

'ত'—ভ্রাতা—ভাই; মাতা—মা; শত—শ।

'দ'—হৃদয়—হিয়া; কদলী—কলা।

'প'—কূপ—কুয়া।

'ভ'—নাভী—নাই; গাভী—গাই।

'ম'—গ্রাম—গাঁ।

কথিত ভাষা এইরূপে সর্ব্বদা সহজ হইতেছে। বিম্‌স্ সাহেবের অভিপ্রায়, এই ভাষা লিখিত রচনায় ও প্রবর্ত্তিত হউক। তিনি বঙ্গদেশের সাধু সুলেখক-গণের প্রতি একটুকু কোপান্বিত। যাঁহাদের সহজ ভাষা মুখে না বলিয়া উপায় নাই, তাঁহারা লিখিতে বসিলেই সংস্কৃতের কথা স্মরণ করেন কেন? তখন খাওয়ার স্থলে আহার করা, ভাত স্থলে অন্ন ও জল স্থানে নীর ব্যবহার না করিলে তাহাঁদের মনঃপূত হয় না। আমাদের মতে এই আড়ম্বরপ্রিয়তা সর্ব্বদাই নিন্দনীয় নহে। বাঙ্গলা ভাষার কল্যাণ সাধন হেতু সংস্কৃতের নিকট সততই ইহার শব্দ ভিক্ষা করিতে হইবে। যদি বিষয় গৌরবজনক হয়, তবে একটুকু আড়ম্বরে ভাষার সৌষ্ঠব-বৃদ্ধি ব্যতীত ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ ঠিক কথিত ভাষা কখনই লিখিত ভাষায় পরিণত হইতে পারে না। দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রচলিত ভাষার একীকরণ জন্য লিখিত ভাষা স্বতন্ত্র থাকা আবশ্যক।

* Beames' Comparative Grammar দেখ।

† মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি। ধন ঘড়া লয়ে পাছে পালায় পার্ব্বতী। ক, ক, চ।

‡ নাহি রাঁধে নাহি বাড়ে নাহি দেয় মু। পরের রাঁধন খেয়ে চাঁদপানা মু। ক, ক, চ।

কলিকাতার কথিত 'গেলুম' লিখিত রচনায় স্থান পাইলে শ্রীহট্টের 'গ্যাছলাম' কি 'যাইবাম' অপরাধী কিসে? স্বদেশবৎসলগণ তাহা ও চালাইতে কৃত-সংকল্প হইতে পারেন। বঙ্গভাষা তবে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পৃথক ভাব অবলম্বন করিয়া বহুরূপী হইয়া দাঁড়াইবে। লিখিত ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা সেই জন্য প্রয়োজন হইতেছে, কিন্তু লেখনী লইয়া বসিলেই যে স্বর্গারোহণপর্ব্ব স্মরণ করিতে হইবে, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। মাইকেল তাঁহার সুহৃদ মন্মোহন বাবুর মাতার নিকট পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"আপনি পরম জ্ঞানবতী, সুতরাং ইহা কখনই আপনার নিকট অবিদিত নহে যে, এরূপ তীক্ষ্ণ শর-স্বরূপ শোক এ সংসারে সর্ব্বদাই মানব কুলের হৃদয় বিদ্ধন করে। পিতৃ-চরণ-দর্শন-সুখ প্রিয়বর যে পৃথিবীতে লাভ করিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি নিতান্ত ক্ষুণ্ণমান।"

এই রচনাকে সহসা পাণ্ডিত্যাভিধান দিতে প্রবৃত্তি হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়।

পাশ্চাত্য মত,—বিভক্তি-চিহ্ন ও ছন্দ।

এই সকল গৌড়ীয় ভাষা সংস্কৃত কি প্রাকৃত হইতে আসে নাই, কিন্তু অপর কোন অনার্য্য ভাষা হইতে ইহারা উদ্ভূত হইয়াছে, অনেক পণ্ডিত, এইরূপ সূত্র প্রচার করিয়াছিলেন। ক্রফোর্ড, ল্যাথাম, এণ্ডারসন, কে এবং কল্ডওয়েল, এই মতাবলম্বী। ইহাঁরা বলেন, বঙ্গীয়, হিন্দী, কি অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার আদিকালে সংস্কৃতের সহিত কোন সংশ্রব ছিল না। বিভক্তি ও ছন্দগুলির বিন্যাসপ্রণালী দ্বারাই কোন ভাষার আদি স্থির করা সঙ্গত। কেবল শব্দগত সাদৃশ্য দ্বারাই সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া উচিত নহে। তাঁহারা বলেন, আর্য্যজাতি ক্রমে দক্ষিণপূর্ব্বে অবতরণ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, কিন্তু বিজিত অনার্য্যদিগের সঙ্গে থাকা হেতু, তাঁহাদের ভাষা পরিগ্রহ করিলেন। সংস্কৃতের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব ভাষায় বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করিল। কিন্তু বিভক্তি-চিহ্ন ও বিন্যাসপ্রণালীতে উহাদের আদিম অনার্য্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। এতদনুসারে ডাক্তার কে বিবেচনা করেন যে হিন্দীর "কো" (যথা 'হামকো') ও বাঙ্গলার "কে" (যথা 'রামকে') তাতার অন্ত্যবর্ণ "ক" হইতে আগত

হইয়াছে। ডাক্তার কল্ডওয়েল, দ্রাবিড়* ভাষার বিভক্তি-চিহ্ন "কু" হইতে হিন্দির "কো" আসিয়াছে, এরূপ অনুমান করেন ও হিন্দী ইত্যাদি ভাষা যে দ্রাবিড়-ভাষা-সম্ভূত তাহাই প্রচার করেন। ডাক্তার হরন্‌লি ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই সব মতের অযৌক্তিকতা দেখাইয়াছেন। ফুটনোটে কল্ডওয়েলের যুক্তি ও তদ্বিরুদ্ধে হরন্‌লির খণ্ডনকারী যুক্তি উদ্ধৃত হইল।† গৌড়ীয় ভাষাগুলির বিভক্তি যে সমস্তই সংস্কৃত কি প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে, তাহা মিত্র মহোদয়, হরন্‌লি, দিট্যাছি ও জার্ম্মান

* দ্রাবিড়ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হয় নাই, অনেক পণ্ডিতই এই মতাবলম্বী। See—Comparative Grammar of the Dravidian Languages by Bishop Caldwell. P. 46. Ed. 1875, also Hunter's British Empire P. 327.

† Dr. Caldwell—The change which took place when Sanskrit acquired predominance as the Aryans gradually extended their conquests and their colonies, was rather a change of vocubulary than of grammar.

Dr. Hœrnle—As up to this time, the Aryan population of North India, who had emigrated many centuries before, had used exclusively Sanskritic languages (Sanskrit, Prakrit and Pali) it would be a most remarkable phenomenon, if they had exchanged their native grammar for that of the uncultured and despised aboriginal population, supposing that the language of the latter was really a non-Aryan one and that it had really survived the long Non-Aryan occupation (both suppositions by no means established yet). It had happened more than once, that a conquering nation (especially of inferior culture) while retaining more or less its native vocubulary, adopted the grammar of the conquered people (as the Normans in England, the Arabs and the Turks in North India, the Franks in Gaul) under the condition that this progress commenced from the very begining of the conquest. But the conquerors after having resided for centuries in the country and retained their native language (both in grammar and vocubulary, trifling instances in the latter excepted) entirely unmixed with the aboriginal languages, should abandon their grammar in favour of the conquered, requires strong proofs to be credited, especially as it is by no means certain, whether the aboriginal at all survived at so late a date. For according to evidence afforded by the Prakrit of the plays, Prakrit was spoken by the low class population, which was composed no doubt principally of the subjugated aboriginal people, who spoke a Sanskritic language from the first or adopted the vulgar dailect of the conquerors. J. A. S. 1872. Part I. No. II. P. 123.

পণ্ডিতগণ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গভাষার বিভক্তিগুলি সম্বন্ধে এখন ও কেহ সম্পূর্ণরূপে স্থির সিদ্ধান্ত করেন নাই। আমরা এই অধ্যায়ে সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব।

ফরাসী ইত্যাদি ভাষার মিত্রাক্ষর যোজনা, বর্ব্বর ভাষার দৃষ্টান্তে উদ্ভূত, এগ্রেস এবং হুয়েট এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। এ মত অবশ্য এখন সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইয়াছে। গৌড়ীয় ভাষাগুলি ও অনার্য্য কোন ভাষা হইতে নিঃসৃত হইয়া সংস্কৃত অভিধানের সাহায্যে পুষ্ট হইয়াছে এই মতও এখন সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত। এই সব অদ্ভুত মতপ্রচারকদিগের যুক্তি—সেক্ষপীয়র ও বেকন এক ব্যক্তি, বুদ্ধ কোন লোকবিশেষের নাম নহে, কশ্মীরাধিপ মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস একই ব্যক্তি—এই মতবাদীদিগের যুক্তির সঙ্গে এক সেল্‌ফে বদ্ধ হইয়া থাকিবে। দু এক জন গ্রন্থ-কীট দৈবাৎ কোন প্রাচীন আলমারীস্থ পুঁথিতে তাঁহাদের বিচিত্র যুক্তি-কুহক ও তর্কশক্তির পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, কিন্তু শিক্ষিত-জগত সেই সব মত আর গ্রহণ করিবেন না। সেই সব প্রাচীন যুক্তির শব, চিরদিন তরে ভূপ্রোথিত হইয়াছে।

বাঙ্গলা প্রথমা বিভক্তি, সংস্কৃতের মত; অনুস্বার কি বিসর্গ বর্জ্জিত হয় এই প্রভেদ। কিন্তু তথাপি উহা যে প্রাকৃতের অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। প্রথমার এক বচনে প্রাকৃতে কোথাও 'এ' সংযুক্ত দেখা যায়, যথা, 'শু অণেহু ভিচ্চাণকম্পকে শামীএ ণিদ্ধণকেবি শোহেদি।' মৃঃ কঃ ৩অঙ্ক। কর্ত্তৃবাচক তৃতীয়াতেও প্রাকৃত ঐরূপ 'এ' অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। এই 'এ' বাঙ্গলা কর্ত্তৃকারকে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। যথা,—

(১) "শুনিয়া রাজাএ বোলে হইয়া কৌতুক।
সুগন্ধা অপ্‌ছরা কেন হৈল মৃগরূপ॥" সঞ্জয়, আদি।

(২) "কদাচিৎ না দেখেছি হেনরূপ ঠান।
কোনমত বিধাতাএ করিছে নির্ম্মাণ॥"
রামেশ্বরী মহাভারত, বেঃ গাঃ পুঁথি ৮৬ পত্র।

প্রথমার দ্বিবচন ও বহুবচনের প্রভেদ, প্রাকৃতে রক্ষিত হয় নাই। অনেক স্থলেই প্রাকৃতে, দ্বিবচন কি বহুবচনে কেবল আকারযুক্ত প্রয়োগ দেখা যায়।

যথা,—'ভবঅদি তমসে অঅং দাব পরিসো জাদো দেউণ ণ আণামি কুশলবা।'—উঃ চঃ ৩য় অঙ্ক। 'কহিংমে পুত্তআ,'—উঃ চঃ ৭ম অঙ্ক।

প্রাচীন বাঙ্গলায় বহুবচন-বোধক নামশব্দে অনেক স্থলে ঐরূপ আকার দেখা যায়। যথা,—

"নরা, গজা বিশেসয়, তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়। বাইশ, বলদা তের ছাগলা" খনা।

ট্রম্প অনুমান করেন, বাঙ্গলা কর্ম্ম ও সম্প্রাদান কারকের 'কে' সংস্কৃতের সপ্তমীতে প্রযুক্ত 'কৃতে' শব্দ হইতে আগত।* এই 'কৃতের' নিমিত্তার্থ উদাহরণ স্থলে স্থলে পাওয়া যায়। যথা,—

"বালিশোবত কামাত্মা রাজা দশরথো ভৃশং।
প্রস্থাপয়ামাস বনং স্ত্রীকৃতে যঃ প্রিয়ং সুতম্॥"

রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড।

ম্যাক্সমুলর বলেন সংস্কৃতের স্বার্থে 'কঁ' হইতে বাঙ্গলা 'কে' আসিয়াছে। শেষ সময়ের সংস্কৃতে স্বার্থে 'ক'এর বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আমাদের মতে ম্যাক্সমুলরের মতই সম্পূর্ণ গ্রহণীয়। বাঙ্গলা প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথি আলোচনা করিলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের উদয় হইতে পারে না। এই 'ক' (যথা বৃক্ষক, চারুদত্তক, পুত্রক,) প্রাকৃতে অনেক স্থলে ব্যবহৃত দেখা যায়।† গাথা ভাষায় এই 'ক'এর প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, যথা ললিতবিস্তর-একবিংশাধ্যায়ে,—

"সুবসন্তকে ঋতুবরে আগতকে।
রতিমো প্রিয়া ফুল্লিত পাদপকে॥
বশবর্ত্তি সুলক্ষণ বিচ্ছুরিতকো।
তবরূপ সুরূপ সুশোভনকো॥
বয়ংজাত সুজাত সুসংস্থিতিকাঃ।
সুখ কারণ দেব নারাণ বসন্ততিকাঃ॥

* এই 'কৃত' শব্দ প্রাকৃতে 'কিতো', 'কিও' এবং 'কো' এই তিন রূপেই ব্যবহৃত হইত। ট্রম্প অনুমান করেন, শেষোক্ত 'কো'র সঙ্গে হিন্দীর 'কো' ও বাঙ্গলা 'কে'র সাদৃশ্য।

† "তাম্র-শাসনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতে স্বার্থে 'ক'এর ব্যবহার কিছু বেশী। 'দূত' স্থানে 'দূতক' 'হট্ট' স্থানে 'হট্টিকা,' 'বাট' স্থানে 'বাটক', 'লিখিত' স্থানে 'লিখিতক' এইরূপ শব্দপ্রয়োগ কেবল উদ্ধৃত অংশ মধ্যেই দেখা যায়। সমুদয় শাসনে আরো অনেক দেখা যাইবে।" শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল কৃত,—"ধর্ম্মপালের তাম্র-শাসন" সাহিত্য, মাঘ ১৩০১,৬৫৩ পৃঃ।

উত্থি লঘু পরিভুঞ্জ সুযৌবনকং।
দুর্লভ বোধি নিবর্ত্তয় মানসকম্॥" ইত্যাদি।

বাঙ্গলায় পূর্ব্বে এই 'ক' সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মতই ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের ২০০ বৎসরের পূর্ব্বের পুঁথিগুলিতে এই 'ক'এর প্রয়োগ অসংখ্য। আমরা এই স্থলে কয়েকটিমাত্র ছত্র উঠাইয়া দেখাইব।

(১) "রথ হৈতে ফাল (লাফ) দিয়া চক্র লৈয়া হাতে।
ভীষ্মক মারিতে যায়, দেব জগন্নাথে॥" কবীন্দ্র বেঃ গঃ ১০৫ পত্রঃ।

(২) "ভীষ্মক ভয়ে যত সৈন্য যায় পলাইয়া।" ঐ

(৩) "সে সে ভার্য্যা অনুক্ষণ পতিক সেবয়।" সঞ্জয়।

(৪) "শিখণ্ডীক দেখিয়া পাইবা অনুতাপ।" কবীন্দ্র বেঃ গঃ ৭৫ পত্র।

(৫) "পঞ্চ ভাই দ্রৌপদীক কুশল জানাইব।" ঐ ৭৭ পত্র।

এই ভাবে কর্ত্তা এবং কর্ম্ম উভয় স্থলে 'ক' থাকিলে কোন্‌টি কর্ত্তা কোন্‌টি কর্ম্ম. পরিচয় পাওয়া কঠিন। 'সৌরন্ধ্রীক কীচক বোলএ ততক্ষণ।'* ছত্রে কে কাহাকে বলিল, নির্ণয় করা সহজ নহে। সেই জন্য কর্ম্ম এবং সম্প্রদানে বাঙ্গলায় 'কে'র ব্যবহার পরে প্রচলিত হইল। গাথা ভাষায় ও প্রাকৃতে মধ্যে মধ্যে 'কে'র প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা প্রাকৃতে,—

পালিও অত্তদাসী এ পুত্তে দলিদ্দ চালুদত্তাকে তুমং।" মৃঃ কঃ ৮ম।

কোন কোন স্থলে বাঙ্গলা কর্ম্মকারকে কোন বিভক্তি-চিহ্নই প্রযুক্ত হয় না। যথা,—রাম গাছ কাটিয়াছে। এইরূপ ব্যবহার ও পূর্ব্বোক্ত 'ক' যুক্ত ব্যবহারের সঙ্গে পূর্ব্বে কোন পার্থক্যই ছিল না। কারণ 'ক' পূর্ব্বে বিভক্তিবোধক চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত ছিল না, উহা শুধু শব্দের অন্ত্যবর্ণ ছিল। এই জন্য প্রাচীন কালে কর্ম্ম এবং সম্প্রদান ব্যতীত অন্যান্য বিভক্তিতে ও 'কে' ব্যবহার হইত, যথা,—

"মথুরাকে পাঠাইল রূপ সনাতন।" চৈ, চ আদি, ৮ম পঃ।

বহুবচন বুঝাইতে পূর্ব্বে শব্দের সঙ্গে শুধু 'সব', 'সকল' প্রভৃতি সংযুক্ত হইত। যথা,—

"তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার।
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফূরুক সবার।" চৈ, ভা, (আদি)।

* কবীন্দ্র বেঃ গঃ। ৬০ পত্র।

ক্রমে "আদি" সংযোগে বহুবচনের পদ সৃষ্টি হইতে লাগিল। যথা,— নরোত্তম বিলাসে,—

শ্রীচৈতন্যদাস আদি যথা উত্তরিলা।
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিলা ॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাদি বাসা ঘরে।
করিলেন নিযুক্ত শ্রীব্যাস আচার্য্যেরে ॥
আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়।
হইলা নিযুক্ত শ্রীবল্লভীকান্ত তায় ॥

এইরূপে "রামাদি" "জীবাদি" হইতে ষষ্ঠীর 'র' সংযোগে 'রামদের' 'জীবদের' হইয়াছে স্পষ্টই দেখা যায়।

আদি শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ক' যুক্ত হইয়া 'বৃক্ষাদিক' 'জীবাদিক' শব্দের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। ফলতঃ উদাহরণেও তাহাই পাওয়া যায়। যথা,— নরোত্তম বিলাসে,—

"রামচন্দ্রাদিক যৈছে গেলা বৃন্দাবনে।
কবিরাজ খ্যাতি তার হইল যেমনে।"

এই 'ক'এর 'গ'এ পরিণতি ও সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। সুতরাং 'বৃক্ষাদিগ' (বৃক্ষদিগ) 'জীবাদিগ' (জীবদিগ) শব্দ পাওয়া যাইতেছে। এখন ষষ্ঠীর 'র' সংযোগে 'দিগের' এবং কর্ম্মের ও সম্প্রদানের চিহ্নে পরিণত 'কে'র সংযোগে 'দিগকে' পদ উৎপন্ন হইয়াছে, নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।*

করণ কারকের পৃথক চিহ্ন বাঙ্গলায় নাই বলিলেও হয়। সংস্কৃত 'রামেন' স্থলে প্রাকৃতে 'রামএ' ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতে বাঙ্গলায় পূর্ব্বে "রামে ডাকিয়াছে," "রাজায়(এ) বলিয়াছে" ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ প্রচলিত ছিল। এখনও "কুড়ালে পা কাটিয়াছে", "নৌকায় বাড়ী গিয়াছে" দৃষ্টান্তে প্রাকৃতের সঙ্গে বাঙ্গলার নৈকট্য দৃষ্ট হয়। "দ্বারা" শব্দ সংস্কৃত 'দ্বার' শব্দ হইতে আগত, উহা কথিত ভাষায় 'দিয়া'তে পরিণত।

* এই বিভক্তি-চিহ্ন প্রাকৃত হইতে আগত হয় নাই। ইহা সংস্কৃতের অভ্যুদয়ের পরে গঠিত হইয়াছে, তাই সংস্কৃতের সঙ্গে বেশী সংশ্লিষ্ট। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুস্তক গুলিতে এইরূপ প্রয়োগ আদৌ নাই। 'দিগকে' 'দিগের' এখনও পূর্ব্ববঙ্গে কথায় প্রচলিত হয় নাই।

সম্প্রদান সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে; বাঙ্গলায় কর্ম্ম কারকের সঙ্গে সম্প্রদান কারকের কোন প্রভেদ নাই। প্রাকৃতে 'হিংতো' শব্দ* পঞ্চমীর বহুবচনে ব্যবহৃত হইত। এই 'হিংতো' হইতে বাঙ্গলা 'হইতে' আসিয়াছে। এই 'হিংতো' পূর্ব্বে বাঙ্গলায় 'হস্তে' রূপে প্রচলিত ছিল, যথা,—

"কা'কে ক'ল্ল নির্ব্বলী কাহাকে বলী আর।
হাড় হস্তে নির্ম্মিয়া করয় পুনি হাড়।"

আলোয়াল কৃত পদ্মাবতী, ২পৃষ্ঠা।

এই 'হিংতো'র অপর রূপ 'হনে' ও পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলিতে অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। যথা,—

"তাকে দেখি মোহ পাইলুঁ, না দেখিলুঁ পুনি।
সেই হনে প্রাণ মোর আছে বা না জানি॥" সঞ্জয়, আদি।

প্রাকৃত ষষ্ঠীর চিহ্ন 'ণ'† বাঙ্গলা 'র'কারে পরিণত হয়। প্রাকৃত 'অগ্নীণ' স্থলে আমরা বাঙ্গলায় 'অগ্নির' পাইতেছি। 'ণ' সচরাচরই 'র' বা 'ড়'তে পরিণত হয়, এই পরিণতি সম্বন্ধে যদি কেহ বিশেষ প্রবোধ চান, তবে উড়িষ্যা দেশ ঘুরিয়া আসিলেই তাঁহার প্রতীতি জন্মিবে। কিন্তু ষষ্ঠীর সম্বন্ধে মতান্তর আছে; বপ অনুমান করেন, হিন্দীর 'কা' এবং বাঙ্গলা ষষ্টির চিহ্ন সংস্কৃত ষষ্ঠীর বহুবচনের 'অস্মাকম্', 'যুস্মাকম্' ইত্যাদির 'ক' হইতে আসিয়াছে।‡ কিন্তু হরন্‌লি সাহেব বপের অনুমানের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রোয়জন¶। তাঁহার মতে সংস্কৃত 'কৃতে' প্রাকৃতের রূপান্তর হইতেই বাঙ্গলা এবং হিন্দীর ষষ্ঠীর চিহ্ন আসিয়াছে। 'কৃতে' হইতে প্রাকৃত 'কেরক' উৎপন্ন হইয়াছে। এই 'কেরকের' অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়, সেই সেই স্থলে 'কেরকের' কোন স্বকীয় অর্থ দৃষ্ট হয় না, উহা শুধু ষষ্ঠীর চিহ্ন স্বরূপই ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। যথা,—

* "ভ্যসো হিংতো স্থংতো।"—ইতি বররুচিঃ।

† টামোর্ণঃ। অতোহনন্তরং টামোস্তৃতীয়ৈক বচন ষষ্ঠী বহুবচনয়োর্ণকারো ভবতীতি।
বররুচিঃ।

‡ Bopp's comparative grammar. Para 340. Note.

¶ Journal Asiatic Society 1872. No. II. P. 125.

"তুমংপি অপ্পণো কেরিকং জাদিং সুমরেসি।" মৃঃ কঃ ৬ষ্ঠ অঙ্ক।
"কস্স কেরকং এদং পবণম্।" ঐ

এই 'কেরক' (বা 'কেরিক') হইতে হিন্দী 'কর', 'কেরে', 'কের', 'কেরি' আসিয়াছে। যথা,—

তুলসীদাসের রামায়ণে—'ক্ষত্রজাতিকের রোষ' লঙ্কাকাণ্ড। 'বন্দৌং পদসরোজ সবকেরে' বালকাণ্ড। এই 'কেরক' হইতে যেরূপ হিন্দীর 'কের' ইত্যাদি আসিয়াছে, সেইরূপ অন্যদিকে বাঙ্গলা ও উড়িয়া ষষ্ঠীর চিহ্ন 'এর' ও 'র' উদ্ভূত।* রাজা রাজেন্দ্রলাল অনুমান করেন, বাঙ্গলা ষষ্ঠীর 'র' সংস্কৃত 'স্য' হইতে আগত। এই মতের সাপেক্ষে বলা যাইতে পারে যে, 'স' এবং 'র' উভয়ই বিসর্গে পরিণত হয়। অনেক স্থলে (যথা, বহির্গত) স, রেফ অর্থাৎ রকারে পরিণত হয়। সপ্তমীর 'তে' সংস্কৃত 'স্মিন' হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃতের একার যথা গহনে, কাননে, প্রাকৃত ও বাঙ্গলায় ঠিক তদ্রূপই আছে। কিন্তু বাঙ্গলার সপ্তমী একবারে প্রাকৃত-চিহ্ন-বর্জ্জিত নহে। সংস্কৃত শালায়াং, বেলায়াং, ভূম্যাং এর স্থলে প্রাকৃত শালাএ, বেলাএ, ভূমিএ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন হস্ত-লিখিত বাঙ্গলা পুস্তকে ও ঐ সব শব্দ প্রাকৃতের মতই পাওয়া যায়। আধুনিক 'শালায়' 'বেলায়', 'এ', 'য়' হইয়াছে এই প্রভেদ।

বঙ্গভাষার ইতিহাসে বিভক্তির অধ্যায় অতি আবশ্যকীয়। আমরা তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় এ বিষয়ে একবারেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন "কিন্তু

* In using কের in composition with the word in the genitive case, the initial 'ক' of the former is elided regularly. Thus we arrive at এর, Take for instance the genitive of সন্তান a child. It would be সন্তানকেরকো this would change to সন্তানকের and this to সন্তান এর—সন্তানের which is the present genitive in Bengali. By analogy the other Bengali genitive post-position র which it shares with the Oriya, is probably a curtailment of the genitive case 'কর'—as ঘোড়াকর, ঘোড়াঅর,—ঘোড়ার। Journal Asiatic Society 1872 No. II. P. 132—133.

এই সব বিভক্তি-চিহ্ন যে কোথা হইতে আসিল, তাহা ঠিক বলা যায় না।'* আমরা ও হয়ত তাহা ঠিক বলিতে পারিলাম না। তবে চেষ্টা করিয়াছি, এই মাত্র।

বাঙ্গলার আদিম অসভ্যদিগের ভাষার সঙ্গে, আর্য্যদিগের কথিত ভাষা কতক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে। অনার্য্য শব্দ কোন্ গুলি, নির্ণয় করা সহজ নহে। এই বাঙ্গলাভাষার সঙ্গে অনেক শব্দ মিশ্রিত আছে, যাহা পার্শী, আরবী, কি উর্দ্দুতে নাই, সংস্কৃত কি প্রাকৃত হইতে তাহাদের উদ্ভবের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় উদাহরণ দিয়াছেন, যথা,—কুলা, ঢেঁকি, ধুচনি; এই 'ধুচনি' শব্দ সংস্কৃত 'ধৌত' শব্দ হইতে আগত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গীয় অভিধানে অনেক শব্দ 'দেশজ' সংজ্ঞায় আখ্যাত হইয়াছে। প্রকৃতিবাদ অভিধানের সমগ্র শব্দসংখ্যা প্রায় সপ্তবিংশ সহস্র হইবে, তন্মধ্যে অন্যূন অষ্টশত শব্দ 'দেশজ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।† এই 'দেশজ' সংজ্ঞা-বিশিষ্ট শব্দগুলি ভালরূপ পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাদের অধিকাংশেই সংস্কৃতের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—আজ, হুল, ওছা, পাণ্ডা, ফাঁপা, পৌণে ইত্যাদি শব্দ 'দেশজ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, ইহারা বোধ হয় অদ্য, শূল, উচ্ছিষ্ট, পণ্ডিত, স্ফীত, পাদোন ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে কোন না কোনরূপে সংশ্লিষ্ট। দেশজ আখ্যা-বিশিষ্ট শব্দগুলির কতকটি অনার্য্য ভাষা হইতে গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃত বা প্রাকৃতের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। কোন্ শব্দ বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া কি আকার ধারণ করে তাহা অনেক সময় বুঝিয়া উঠা দুষ্কর; ইংরেজীতে মারগ্রেট হইতে 'পেগ', এলিজাবেথ হইতে 'বেছ' যে দুর্ভেদ্য নিয়মে সম্ভূত, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। এই প্রাকৃত-সম্ভূত বঙ্গভাষায় পার্শী, ইংরেজী, আরবী, পর্ত্তুগিজ, মগী প্রভৃতি নানা ভাষার শব্দ আছে, তবে অনুকৃতি দ্বারা ও অনেক শব্দ আপনা আপনি গঠিত হয়, যথা,—ময়ূরের 'কেকা', বানরের 'কিচ্‌কিচ্।' কিঞ্চিৎ

* ৺রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—পৃঃ ২০।

† প্রকৃতিবাদ অভিধান, দ্বিতীয় সংস্করণ, সম্বৎ ১৯৩৩।

অনার্য্য শব্দের মিশ্রণ গ্রীকে আছে, ল্যাটিনে আছে, সংস্কৃতে আছে, বাঙ্গলায়ও আছে, তদ্ধেতু বাঙ্গলা ভাষার জাতি যায় নাই।

এখন বাঙ্গলাভাষার ছন্দ পর্য্যালোচনা করা যাউক। 'পয়ার' শব্দটি 'পাদ' (চরণ) হইতে আসিয়াছে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই মত গ্রহণীয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গলা পয়ার কোথা হইতে আসিল, এই প্রশ্ন লইয়া একটুকু গোলে পড়িয়াছেন, এবং "করিমা ব্যবকসাই বর্হেলেমা" ইত্যাদি পার্শীর বয়েৎ তুলিয়া গবেষণা করিয়াছেন।

অতি প্রথমে ভাটগণ বিবাহাদির উপলক্ষে পাত্র পাত্রীর গৃহে যশোগান করিত। পাল রাজগণের স্তুতি-ব্যঞ্জক কবিতা বাঙ্গলাভাষার অতি প্রাচীন গীতি। তাহা ভাটগণের দ্বারাই প্রথম প্রচারিত হয়। এইরূপ গীতির প্রথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন।* প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য খুঁজিলে ও অনেক স্থলেই এই ভাটগীতির উল্লেখ পাওয়া যায়।†

শুধু ভাট-সংগীত নহে, পূর্ব্বে বাঙ্গলা রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবদিগের গীতি সমস্তই গায়কেরা সুর সংযোগে গান করিত। চৈতন্যভাগবতের পূর্ব্বে চৈতন্যমঙ্গল নাম ছিল। রামমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, মনসামঙ্গল এ সমস্তই গানের পালা ছিল। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ত্রিপদী স্থলে 'লাচাড়ী' (সম্ভবতঃ লহরী শব্দের অপভ্রংশ) 'দীর্ঘছন্দ' কি কোন রাগ রাগিনীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। লেখকগণ ও স্বস্ব ভণিতায় "রামায়ণ গান দ্বিজ মন অভিলাষে" কি "পয়ার প্রবন্ধে গাহে কাশীরামদাস" ইত্যাদি ভাবে পাদ পূরণ করিয়াছেন। এই সব গান একজনে গাইয়া যাইত ও তাহার

---

* "The institution of Bhats, is as old as Indo-Aryan civilization." Indo-Aryans Vol. II. P. 293.

† "পহিলে শুনিনু অপরূপ ধ্বনি কদম্ব কানন হৈতে।
তার পর দিন ভাটের বর্ণনা শুনি চমকিত চিতে॥
আর একদিন মোর প্রাণসখি কহিলে যাহার নাম।
গুণিগণ গানে শুনিনু শ্রবণে তাঁহার নাম॥"　। প, ক, ত, ৬৩৯।
"যাঁহার মুরলী ধ্বনি শুনি
সেই বটে এই রসিক-মণি।
ভাটমুখে যাঁর গুণ গাঁথা।
দূতিমুখে শুনি যাঁর কথা।"　প, ক, ত, ৬৩৯।

সঙ্গীগণ গীতির একভাগ সমাপ্ত হইলে সমবেত কণ্ঠে ধুয়া গাইত, প্রাচীন বাঙ্গলা যে কোন গ্রন্থে ঐরূপ ধুয়া অনেক পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের ধুয়াগুলি ভাষার মিষ্টত্বে অতুলনীয়, কিন্তু অন্যান্য প্রাচীন পুস্তকেও ধুয়া গুলি বেশ মধুর, যথা,—

"দান দিয়া যাও মোরে বিনোদিনী রাই
বারে বারে ভাঁড়িয়াছ নাগর কানাই।"

নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ,—(হস্তলিখিত পুঁথি)।

রাম নামের মহিমা কে জানে,
নাম সুধাময় অতি, গঙ্গাভাগীরথী
উৎপত্তি ও রাঙ্গা চরণে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড (হস্তলিখিত পুঁথি)।

গানে অক্ষর লইয়া কোন বাঁধাবাঁধি থাকে না, মাত্রার দিকে বেশী দৃষ্টি থাকে। তাই পূর্ব্বকালের পয়ারে কোন শৃঙ্খলতা দৃষ্ট হয় না। আমরা বাঙ্গলা পদ্যের প্রাচীনতম যে নিদর্শন পাইয়াছি তাহাতে কোন ছন্দ বা প্রণালী দৃষ্ট হয় না। ডাক ও খনার বচন ছন্দোবদ্ধ কবিতা বলিয়া বোধ হয় না। উহাতে মিলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি নাই। মাণিকচাঁদের গানে* অক্ষর, যতি বা মিলের কিছুমাত্র নিয়ম দৃষ্ট হয় না। ভাব প্রকাশ করিতে প্রয়োজন হইলে, অক্ষর-সংখ্যা ২৪, ২৫ কি ২৬ ও অতিক্রম করিয়াছে, আবার স্থল বিশেষে তাহা সংক্ষিপ্ত হইয়া ১২ কি ১০ এ অবতরণ করিয়াছে, এরূপও দৃষ্ট হয়। মিলের প্রতি কথঞ্চিৎ দৃষ্টি আছে, কিন্তু অনেক স্থলেই নিয়ম লঙ্ঘিত, সুতরাং মিল ও নিয়মাধীন ছিল বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

(১) পরিধানের সাড়ী অর্দ্ধখান ময়নামতী দিল জলত বিছায়া।
যোগ আসন ধরিল ময়না ধরম সরন করিয়া॥

(২) সাত দিয়া সাত জনা গর্জ্জিয়া যোগাইল।
চামের দড়া দিয়া বাঁধিল॥

(৩) তোর মাইয়া পাইয়াছে গোরক্ষ নাথের বর।
নাগাইল পাইলে অমলা না করে কুশল॥

* Journal Asiatic Society, Bengal 1878.—Part I. No. 3. P. 149.

(৪) তোমার বুদ্ধি নয় বধু সকলের চক্র।
যত বুদ্ধি সিখিয়া দেয় নিরাসী সকল ॥

কিন্তু এই গীতি ও ডাকের বচন ছাড়িয়া দিলে, পরবর্ত্তী যে কবিতা দৃষ্ট হয়, তাহাতেও ত্রিপদী এবং পয়ারাখ্য কবিতার চরণ বর্ত্তমানরূপ সীমাবদ্ধ দৃষ্ট হয় না। চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি দুএক থানা পুস্তকে পয়ার অনেক পরিমাণে নিয়মিত দেখা যায়। অন্য সমস্ত পুস্তকেই ঐরূপ নিয়মের ব্যতিক্রমই অধিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হয়। হস্তলিখিত পুঁথি যত প্রাচীন, যতি ও অক্ষরের ব্যতিক্রম তত বেশী। ত্রিপদীর মত পয়ার ও ভিন্ন ভিন্ন রাগ রাগিনী সংজ্ঞায় বাচ্য দৃষ্ট হয়। নিম্ন-লিখিত পয়ার 'গান্ধার রাগ' অভিধান প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাগশ্রী গান্ধার।

"যুদ্ধেত মরা হৈলে হয় স্বর্গগতি।
পলাইলে অযশ হয় নরকে বসতি॥
এ বুলিয়া বৃহন্নলা ধরিবারে জাএ।
অন্তরে থাকিয়া সব কুরুবলে চাএ॥
নড়এ মাথার বেণী নপুংশক বেশে।
দশপদ অন্তরে ধরিল গিয়া কেশে॥
কাকুতি করএ তবে উত্তর কুমার।
না কর না কর মোর প্রাণের সংহার॥
শুণ বৃহন্নলা মুই করম নিবেদন।
রথ বাহুড়াই আমার রাখহ জীবন॥
একশত সুবর্ণ দিমু শুদ্ধ সুগঠিত।
অষ্টশত মণি দিমু কাঞ্চন ভূষিত॥
বৈদুর্য্য বিচিত্র দিমু মণি মনোহর।
দশ হস্তি দিমু তোক পরম সুন্দর॥" কবীন্দ্র—বেং,গঃ পুঁথি ৬৫ পত্র।*

---

* আমরা উদ্ধৃত অংশের অনেক স্থলেই বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিবি না। প্রথমতঃ প্রাকৃতের সঙ্গে বঙ্গভাষার নৈকট্য দেখাইতে মূল হাতের লেখা অবিকৃত রাখা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ উদ্ধৃতকারীর প্রাচীন রচনা সংস্কার করিবার অধিকার আছে কি না, তাহা সন্দেহস্থল। যাহা আমরা ভ্রম বিবেচনা করিয়া সংশোধন করিতে প্রয়াসী, তাহাই হয়ত ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিবার একমাত্র পন্থা, শুদ্ধ করিতে গেলে সেই পথ রুদ্ধ হয়।

এই পয়ার,—গান্ধার রাগে কেমন শুনায়, জানিতে জনৈক ভাল গায়ককে নিযুক্ত করা আবশ্যক।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে গানে চৌদ্দ অক্ষরের নিয়ম পালনের প্রয়োজন ছিল না, উপরি উদ্ধৃত অংশ আমরা অক্ষর-নিয়ম-ভঙ্গের উদাহরণ স্বরূপ বাছিয়া উঠাই নাই, তথাপি উদ্ধৃত ১৪ চরণের মধ্যে ৫ চরণে পয়ারের নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। প্রাচীন বাঙ্গলা যে কোন পুঁথি খুঁজিলেই ১১ হইতে ১৭ অক্ষরের পয়ার বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইবে। আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি; পাঠক সেগুলিতে অমিল পদ ও অক্ষরের ব্যতিক্রম উভয়ই দেখিবেন।

(১) সম্মুখে রাখিয়া করে বসনের বা। (১৩)
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা। (১৩) চণ্ডীদাস।

(২) ভৈরব সূর্ত্ত গজপতি বড় ঠাকুরাল। (১৪)
বারানসী-পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাহার। (১৫)
রামায়ণ ৪০০ বৎসরের হস্তলিখিত পুঁথি।

(৩) যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম। (১৫)
তাঁহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান। (১৪) চৈঃ চঃ ১৬ পঃ।

(৪) খই কদলক আর তৈল হরিদ্রা (১৩)
প্রত্যেকে সবারে দিল শচী সুচরিত্র (১৪) চৈ, ম, আদি।

(৫) ক্ষৌণি-কল্পতরু শ্রীমান দীন দুর্গতি বারণ (১৭)
পুণ্য-কীর্ত্তি গুণাস্বাদী পরাগল খান (১৪)
কবীন্দ্র বেঃ গঃ পুঁথি। ৪৫ পত্র।

(৬) নারায়ণ নাম ফল কহিব একে একে। (১৫)
অজামিল মুক্তিপদ পাইল যেমতে॥ (১৪) শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।

(৭) চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্য বচন চরিত্র। (১৪)
ভক্ত প্রসাদে স্ফুরে জানিহ নিশ্চিত॥ (১৩) চৈ, ভা।

(৮) আজ্ঞা নাহি দেয় রাজা করি মায়া মো। (১৩)
শ্রীমন্তের নাহি রহে লোচনের লো॥ (১৩) ক, ক, চ।

এইরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ত্রিপদীর (লাচাড়ীর) অবস্থা ইহা হইতেও শোচনীয় ছিল। কবীন্দ্র-রচিত ভারত হইতে নিম্নে

ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ইহা পদ্য কি গদ্য এবং কিরূপে সেকালের কাব্যাস্বাদীগণ ইহা পড়িয়া সুখী হইতেন, নিরূপণ করা সুকঠিন।

দীর্ঘছন্দ।

শিশু হোতে পুত্র, দেব গুরু পুজন্ত,
নাহিক যে পরস্পর ভেদ।
বিপ্রতর্পন্ত, সতত করেন্ত,
অভ্যাস করেন্ত ধনুর্ব্বেদ॥
সতত সত্য ছাড়ি, অসত্য না বোলেন্ত।
প্রতিবর্গের, প্রাণ সমসর,
বিচিত্র যোদ্ধা মহাবীর।
মাদ্রী গর্ভে হৈল, মোহর প্রিয় পুত্র,
নকুল কোমল শরীর॥
বহু শত্রু ক্ষয়, করিল পুত্র মোর,
পুনি কি দেখিমু নয়নে।*
কহত গোবিন্দ, হাহা শিশু পুত্র,
নকুল চলিয়া গেল বনে॥

কবীন্দ্র, বেঃ, গঃ, পুঁথি ৭৯ পত্র।

এইরূপ দৃষ্টান্ত অল্প নহে, অনেক পাওয়া যায়। যে অবধি গান আর কবিতার অধিকার পৃথক হইয়াছে, সেই অবধি কবিতায় যতি ও অক্ষরের নিয়ম এত বাঁধাবাঁধি হইয়াছে।

এই সমস্ত ছন্দই যে সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের অনুকরণে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যদি আদি হইতেই বাঙ্গলা পয়ারে চতুর্দ্দশ অক্ষর থাকিত, তবে ও কি ইহার আদি খুঁজিতে আমাদের পার্শীর বয়েৎ তালাস করিতে হইত! এক অক্ষর হইতে ২৭ অক্ষর পর্য্যন্ত পদ সংস্কৃতে বহুল পরিমাণে রহিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গলা ছন্দের কাঙ্গাল নহে। নিম্নোদ্ধৃত চতুর্দ্দশ-অক্ষর-যুক্ত সংস্কৃত কবিতার যতি ও প্রায় বাঙ্গলার মত।

"ফুল্লং বসন্ত তিলকং তিলকং বনাল্যা
লীলাপরং পিককুলং কলমত্র রৌতি।
বাত্যেষ পুষ্প সুরভির্মলয়াদ্রিবাতো
যাতো হরিঃ সমথুরাং বিধিনা হতাংস্ম।" ছন্দো মঞ্জরী, দ্বিতীয় স্তবক।

পদান্ত মিলাইতে বাঙ্গালী কোথায় শিখিল, এই প্রশ্নের উত্তর জন্ম বহুদূর খুঁজিতে হইবে না। বোধ হয় যমক অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যবশতঃ শেষ সময়ের সংস্কৃতে মিলের দিকে একটুকু বেশী দৃষ্টি পড়িয়াছিল। ল্যাটিন ও ঐরূপ কারণেই সমিল হইয়া দাঁড়ায়।* শঙ্করের 'অর্থমনর্থং' ও জয়দেবের,—

"বসতি বিপিন বিতানে, ত্যজতি ললিতধাম।
লুঠতি ধরণীতলে বহু বিলপতি তব নাম॥"

প্রভৃতি রাশি রাশি মিত্রাক্ষরযুক্ত কবিতা হইতে বঙ্গীয় মিত্রাক্ষর কবিতার প্রথা সূচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রাকৃত কবিতায় ও মিল দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত "চরণগণবিপ্প, পঢম লইথপ্প" বা "সহা দীহাজাণেহী, কণ্ণাতিণ্ণা মাণেহী"† ও জয়দেবের 'রতি সুখ সারে, গতমভিসারে' প্রভৃতি পদগুলির অনুকরণে বঙ্গীয় ত্রিপদী গঠিত হইয়া থাকিবে। লঘু ত্রিপদী, লঘু চৌপদী ইত্যাদি ছন্দে নূতন উদ্ভাবনের কৌশল কিছুই নাই। কেবল সংস্কৃতের অনুযায়ী পদ বিন্যাশের কৌশল দৃষ্ট হয়। সংস্কৃতের ছন্দ অনন্ত প্রকার ও সে ভাষার অসীম ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক, বাঙ্গালী ঝিণুকে সেঁচিয়া এক লহরী আনিয়াছে মাত্র।

* "But the Latin Language abounds so much in consonances that those who have been accustomed to write verses in it well know the difficulty of avoiding them as much as an ear formed on classical model demands; and as this jingle is certainly pleasing in itself, it is not wonderful that the less fastidious vulgar should adopt it in their rythmical songs." Hallam's History of the European Literature Vol. I. P. 32.

† পিঙ্গল

চতুর্থ অধ্যায়।

বৌদ্ধ-যুগ।

(১) মাণিকচাঁদের গান (২) ডাক ও খনার বচন।

৮০০ খৃঃ হইতে ১২০০ খৃঃ।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ভারতবর্ষের ত্রিসীমা হইতে তাড়িত হইয়াছে। যে অধ্যায়ে আমরা অশোক, শীলভদ্র ও দীপঙ্করকে পাইয়াছিলাম, সেই অধ্যায় ভারত ইতিহাসে স্বতন্ত্র ভাবে পড়িয়া আছে; জয়দেবের ললিত গীতগোবিন্দের ভাব প্রাচীন-বঙ্গ-সাহিত্যে অলঙ্ঘ্যভাবে জড়িত, কিন্তু তাঁহার উদার বুদ্ধ-দেব-স্তোত্র বঙ্গ-ভাষায় গৃহীত হয় নাই। বাঙ্গলায় হিন্দু-গ্রন্থগুলির মধ্যে সেই স্তোত্রাংশ বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়িয়া আছে। দুএকজন কবি ভগবানের দশ অবতার বর্ণনার সময়ে জয়দেবের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা অতি সংক্ষেপে—যেন অনিচ্ছাক্রমে। প্রাচীন সাহিত্যে গণেশ, রামচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া মনসা ও দক্ষিণারায়ের বন্দনা অনেক গ্রন্থেই পাওয়া যায়, কিন্তু যাঁহার লোকমধুর চরিত্র-কাহিনীতে পাষাণ গলে, যাঁহার অপূর্ব্ব বৈরাগ্য প্রকৃতই মহাকাব্যের বিষয়, সেই বুদ্ধ-দেবের একটি সামান্য বন্দনা ও প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে হিন্দু-ধর্ম্মের অভ্যুত্থানই বঙ্গভাষা ও গৌড়ীয় অন্যান্য ভাষার শ্রীবৃদ্ধির কারণ, এই জন্যই সেই সব ভাষার সাহিত্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতি এই অবজ্ঞা দৃষ্ট হয়। ভগবান বিষ্ণু বুদ্ধরূপ গ্রহণ করিয়া বেদ নিন্দা করিয়াছেন, সেই ক্রোধে এক লেখক বিষ্ণু-বিগ্রহ পূজা ও তুলসীপত্র স্পর্শ করাও নিষেধ করিয়াছেন।* শ্রীচৈতন্যদেব বৃদ্ধ কাশীতে বৌদ্ধদিগের শেষ শক্তি নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, চৈতন্য-চরিতামৃত এই জয়ের ভেরী-বাদন উপলক্ষে বৌদ্ধগণের উল্লেখ করিয়াছেন, এই মাত্র।

'বৌদ্ধ-যুগ' অধ্যায়ে বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ কিছু লিখিবার সামগ্রী নাই,

* "বেদ বিনিন্দিতা যস্মাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।
ন স্পৃশেৎ তুলসী-পত্রং শালগ্রামঞ্চ নার্চ্চয়েৎ॥" কুলার্ণব তন্ত্র

তথাপি কিছু নিদর্শন আছে, সেগুলি আমরা একবারে উপেক্ষা করিতে পারি না।

সম্ভবতঃ হিন্দু-ধর্ম্মের প্রভাববিস্তারের পূর্ব্বেই বঙ্গভাষায় কতকগুলি নীতি-সূত্র ও প্রশংসা-গীতি রচিত হইয়াছিল। চৈতন্যভাগবতে যোগীপাল, গোপীপাল ও মহীপালের গীতির কথা উল্লিখিত আছে। উহাঁরা বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ও সম্ভবতঃ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতে ছিলেন। তাঁহাদের স্তুতিব্যঞ্জক গীতি ও তাঁহাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রচিত হইবার কথা।

(১) মাণিকচাঁদের গান।

বিজ্ঞবর গ্রীয়ারসন সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটির জারন্যালে* মাণিক-চাঁদের-গীতি-শীর্ষক একটি কাব্যপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মাণিকচাঁদ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। আমরা বাঙ্গলা যে সকল রচনা পাইয়াছি, তাহা হইতে ভাব ও ভাষায় ঐ গীতি সম্পূর্ণরূপে পৃথক। সেই গীতির রচনাপ্রণালী নানাকারণে আমাদের নিকট হিন্দু-ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হইয়াছে। এই জন্য আমরা মাণিকচাঁদকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম। চতুর্দ্দশ শতাব্দী কৃত্তিবাসের কাল, ঐ গীতি ও কৃত্তিবাসের গীতি কতদূর স্বতন্ত্র, উহারা যেন দুই ভিন্ন জগতের বস্তু! সুখের বিষয় ইতিহাস আলোচনায় জানিতে পারিলাম মাণিকচাঁদ খুব সম্ভব, মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পূর্ব্বেই রাজত্ব করিতেছিলেন। এ সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ইতিহাস লেখক বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের মত ফুটনোটে উদ্ধৃত করিলাম।†

* Journal Asiatic Society of Bengal 1878. Part I. No 3. P. 149. গ্রীয়ারসন সাহেব এই গান রঙ্গপুর অঞ্চলে যুগীদের বাড়ীতে প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন; ইহা ৭৩৪ শ্লোকে সম্পূর্ণ।

† "বিজ্ঞবর গ্রীয়ারসন সাহেব মাণীকচন্দ্রের গীতের আরম্ভে যে উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি ধর্ম্মপাল হইতে সুলতান হুসেন সাহের সমসাময়িক রাজা নীলাম্বর পর্য্যন্ত একটি রাজ-তালিকা প্রদান করিয়াচেন; যে প্রবাদ হইতে ডাক্তার বক্‌নন্ এইরূপ একটি তালিকা সংগ্রহ করিয়া ছিলেন, গ্রীয়ারসন সাহেব ও সেই প্রবাদবাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ বৃদ্ধ পল্ল-নবীশগণ এরূপ প্রবাদ প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন। কোন ইতিহাস লেখক ইহা বিশ্বাস

গ্রীয়ারসন সাহেব ও প্রকারান্তরে ঐ গীতের প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, শৈব-ধর্ম্মের প্রাবল্য সময় ঐ গীতি রচিত হইয়াছিল। ইতিহাসের স্বাক্ষ্যে প্রমাণ হয়, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে শৈব-ধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রবল ছিল।

এই গীতে শিব, যম প্রভৃতি দেববৃন্দ হইতে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্ত-বৃন্দের পর্য্যন্ত নাম পাওয়া যাইতেছে। গ্রীয়ারসন সাহেব বলেন, ইহার মধ্যে অনেক নাম, ঘটনা, ও যাবনিক শব্দ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রক্ষিপ্ত অংশ গুলি অপেক্ষাকৃত পয়ারের নিয়মে নিয়মিত ও সহজ বাঙ্গলায় রচিত দেখা যায়, গীতির প্রারম্ভ বৈষ্ণব-প্রক্ষিপ্তকারীর হস্ত-গন্ধ-যুক্ত, তাহা গোপন করা যায় না;—

"ভাবিও রামের নাম চিন্তিও একমনে।
লইলে রামের নাম কি করিবে যমে॥
অধমে না নৈল নাম জিভের আলিসে।
অমৃতের ভাণ্ড তনু গরাসিল বিষে॥

হেঁটে যাইতে যে জন রামের নাম লয়।
ধনুক বাণ লৈয়ে রাম ভকত সঙ্গে যায়॥
রাম নামের নৌকা খান শ্রীগুরুকাণ্ডারী।
দুইবাহু পসারিয়া ডাকে আস পার করি॥

এই রচনার পরেই,—

থুইয়া রামের গুণ সিদ্ধার গুণ গাই।
যাকে বন্দিলেই সিদ্ধি পাই॥

করিতে পারেন না। আমাদের বিবেচনায় গৌড়েশ্বর মহারাজ ধর্ম্মপাল শকাব্দার অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। যে মাণিকচন্দ্র রাজার গীতি গ্রীয়ারসন সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মাণিকচন্দ্রের সঙ্গে গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের কোন সম্পর্ক ছিল, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। তবে ইহা আমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে মহম্মদ বখতিয়ার খিলিজির নবদ্বীপ বিজয়ের পূর্ব্বে রাজা মাণিকচন্দ্র জীবিত ছিলেন। কিন্তু মাণিকচন্দ্রের গীতগুলি তাঁহার সমসাময়িক কিম্বা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে মাণিকচন্দ্রের গীতি অতি প্রাচীন বাঙ্গলার আদর্শ স্বরূপ। মাণিকচন্দ্র রাজার গীতে কড়ি দ্বারা রাজ-কর আদায়ের কথা লিখিত আছে, এইরূপ কড়ি দ্বারা রাজ-কর আদায়ের প্রথা হিন্দু শাসনকালে প্রচলিত ছিল। কিন্তু গ্রীয়ারসন যে গীত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে পরবর্ত্তী যোজনা (interpolation) দৃষ্ট হইয়া থাকে।" শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

মাণিকচাদ রাজা বঙ্গে বড় সত্তি।
হাল খানায় মাসড়া সাথে দেড় বুড়ি কড়ি॥
দেড় বুড়ি কড়ি লোকে খাজনা যোগায়।
তার বদলী ছয়মাস পাল খায়॥
এত মাণিকচন্দ্র রাজা সন্নায়া নলের বেড়া।
একতন যেকতন করি যে খাইছে তার দুয়ারত ঘোড়া।
থিনে বান্দি নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া।"*

সুতরাং প্রক্ষিপ্ত অংশ গুলি প্রাচীন জটিল রচনার কাণ্ড কি শাখায় বট-বৃক্ষ-সংলগ্ন ভিন্ন উদ্ভিদের ন্যায় জড়িত হইয়া আছে। তাহারা যে স্বতন্ত্র বস্তু, সে বিষয়ে দৃষ্টি মাত্রই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এই গীতির ভাব বৌদ্ধ জগতের। আধুনিক হিন্দুগণের পূর্ব্বপুরুষগণই অনেকে বৌদ্ধ-মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস ও ধর্ম্মভেদ হেতু তাঁহারা আমাদিগের সহানুভূতি ও বদ্ধমূল-সংস্কার হইতে, চীন ও জাপানবাসীদিগের ন্যায় সম্পূর্ণ দূরবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছেন। তাই মাণিকচাঁদের গান সলিলে সলিল-বিন্দুর ন্যায় এখনকার দেশীয় ভাবের সঙ্গে মিশ্রিত হয় নাই, সলিলে তৈল বিন্দুর ন্যায় স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়া আছে। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য খুঁজিলেই পক্ক-বিম্ব, দাড়িম্ব, কদম্ব, পদ্ম-পলাশ, খগরাজ, তিলফুল প্রভৃতি উপমার বস্তু দেখিতে পাই। গ্রাম্যগীত গুলিও এই উপমা হইতে মুক্ত নহে; মুসলমান রচিত বাঙ্গলা গ্রন্থে ও এই সব উপমার ছড়াছড়ি। রূপ বর্ণনার সহিত ইহারা প্রাচীন সাহিত্যে অলঙ্ঘ্য ভাবে জড়িত, এস্থলে সত্যের অনুরোধে বলা উচিত, সর্ব্বত্রই এই যোগ মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায় উৎকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু মাণিকচাঁদের গীতের রূপ বর্ণনায় বৃদ্ধ ব্যাস বাল্মীকি কি কবি কালিদাসের কোন হাত নাই। সেগুলি সংস্কৃত-প্রভাব শূন্য; সুতরাং সংস্কৃতের প্রভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীর দশন পংক্তি অতিশুভ্র, গোপীচাঁদ সোনার সঙ্গে তাহার উপমা দিতেছেন, সংস্কৃতের অজ্ঞতা হেতু দাড়িম্ববীজ কি মুক্তাপংক্তির কথা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। স্থলে স্থলে দুকথায় ছবিটি সুন্দর আঁকা হইয়াছে, রূপের

* উদ্ধৃত অংশ গুলিতে যে সব কঠিন ও অপ্রচলিত শব্দ পাওয়া যাইবে, তাহার অর্থ শেষে দেওয়া গেল। পাঠক তাহার সাহায্যে উহা বুঝিতে পারিবেন।

প্রতিবিম্ব ভাসিয়া উঠিয়াছে, অথচ দাড়িম্ব কদম্বাত্মক রূপ বর্ণনা হইতে তাহা পৃথক; হীরার দাসী রাজপুত্রকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া হীরাকে জানাইল ;—

"যেমন রূপ আছে রাজার চরণর উপর
তেমন রূপ নাই তোমার মুখের উপর।"

স্ত্রীর বাক্যে পুত্র স্নেহময়ী মাতাকে ৬০ মণ লৌহকটাহে ৮০ মণ তৈল পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছেন এবং নয় দিন অগ্নিকুণ্ডের উপর উক্ত কটাহ উত্তপ্ত রাখিতেছেন। যে হিন্দুর গৃহে গৃহে রামায়ণী ও মহাভারতীয় নীতি, সেই হিন্দুর চক্ষে এই ঘটনা বিজাতীয়, ইহা হিন্দু-জগতের বলিয়া বোধ হয় না।

রাণী ময়নামতীর ভয়ে কৈলাসে শিবকম্পিত, যমপুরে যম লুক্কায়িত। ময়নামতী দেব-বৃন্দকে দারুণ লাঞ্ছনা করিতেছেন, গোদা যম ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতেছে, এসব কথায় কেমন একটা বিজাতীয় ঘ্রাণ আছে, উহা হিন্দুর ঘরের কথার মত বোধ হয় না। ইতিহাসে পাওয়া যায় প্রসিদ্ধ অতীশ* (দীপঙ্কর) একাদশ শতাব্দীতে তন্ত্র মন্ত্রাদির চর্চ্চায় নিযুক্ত ছিলেন,—বৌদ্ধগণ শেষ সময়ে তান্ত্রিক অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই তন্ত্র মন্ত্রের প্রভাব মাণিকচাঁদের গানে বিশেষ দৃষ্ট হইবে। হাড়িসিদ্ধা ইন্দ্রকে ডাকিয়া পথ প্রস্তুত করিতেছেন, অপ্সরাদিগকে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে আদেশ দিতেছেন, অথচ তিনি জাতিতে চণ্ডাল। বস্তুতঃ এই গীতে নানারূপ ভীষণ, অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ঘটনার বর্ণনা আছে। তাহা আমরা আরব্যোপন্যাসের গল্পের ন্যায় পাঠ করিরাছি। অনুবাদ গ্রন্থ গুলি ছাড়িয়া দিলে ও কবিকঙ্কণ-চণ্ডী হইতে ভারতের অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা কোন্ গ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই? সেই সব ঘটনা হইতে মাণিকচাঁদের গীতে বর্ণিত ঘটনা স্বতন্ত্র। সে গুলির পশ্চাতে দেবশক্তি তাই সে গুলি হিন্দুর নিজস্ব বলিয়া পরিচিত, আর ইহার পশ্চাৎ শুধু মন্ত্রশক্তি। গ্রীয়ারসন সাহেবের মতে হাড়ি সিদ্ধার ইষ্টদেবতা

* "In 1042. The famous Atish, native of Bengal came to Tibbet. He wrote a great number of works which may be found in the Bstanhgyur and translated many others relating principally to Tantrik theories and practices."

Rockhill's Life of Budha. P. 227.

গোরক্ষনাথ ও অনেক নেপালী বৌদ্ধ-সাধু। বৌদ্ধ জগতের এই সংগীত বোধ হয় এতদিন লুপ্ত হইয়া যাইত, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত অংশ গুলিতে দেবদেবীর কথা সংযোজিত হওয়াতে ঐ গীতি ঈষৎ পরিমাণে হিন্দুত্বের আভা ধারণ করিয়াছে, এবং সেই হিন্দুত্বের আভাটুকুই বোধ হয় এই গানের পরমায়ু বৃদ্ধির কারণ।

এই গীতে বাঙ্গালী হৃদয়ের একটি কথা আছে, শুধু সেই স্থানে আমরা জাতীয় ভাবের তত্ত্ব খুঁজিয়া পাই। বাঙ্গালী কবি-কল্পনায় বড় নহেন, তিনি যুদ্ধের ভেরী বাজাইতে অসমর্থ। পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ, শরদাভ্রের ন্যায় স্বচ্ছ, বিদ্যুতের ন্যায় প্রখর প্রতিভাব্যঞ্জক কি আত্মনির্ভরে তেজস্বী কোন কাব্য এদেশে রচিত হয় নাই, কিন্তু প্রেমের কাটি হাতে লইলে বাঙ্গালী মন্ত্র-সিদ্ধ, গোপীচাঁদ সন্ন্যাসী হইতে উদ্যত, তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতেছেন, ভাষা জটিল ও গ্রাম্য হইলে ও সেই স্থলে একটুকু স্বাভাবিকত্ব আছে। গ্রীয়ারসন সাহেব সেই স্থলের কবিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন।

"না যাইও না যাইও রাজা দুর দেশান্তর।
কারে লাগিয়া বান্দিলাম সীতল মন্দীর ঘর॥
বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর নাই পাড় কালী।
এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরালী॥
নিন্দের স্বপনে রাজা হব দরিসন।
পালঙ্গে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন॥
দশ গিরির মাও বইন রবে স্বামি লইবে কোলে।
আমি নারী রোদন করিব খালী ঘর মন্দিরে॥
খালীঘর জোড়া টাটি মারে লাঠির ঘা।
বয়স কালে যুবতী রাড়ী নিতে কলঙ্ক রাও॥
আমাক সঙ্গে করি লইয়া যাও
জীবর জীবন ধন আমি কন্যা সঙ্গে গেলে।
রাঁধিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে
পিপাক্সার কালে দিমু পানী।
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী॥
আইল পাতার দখিলে কথা কহিয়া যামু॥
গিরি লোকের বাড়ী গেলে গুরু স্বাম বলিমু॥
সিতল পাটি বিছাইয়া দিমু বালীসে হেলান পাও।
হাউস মজে বাতিমু হস্ত পাও।

হাত খানি দুঃখ হইলে পাও খানি যাতিমু।
এরঙ্গর কৌতুকর খেলা হুতি ভুঞ্জিমু এহুতি ভুঞ্জাইমু॥
গ্রীসকালে বদনত দিমু দণ্ডপাখার বাও।
মাঘ মাসি সিতে ঘেসিয়া রমু গাও॥

গোপীচাঁদ বনের বাঘের ভয় দেখাইতেছেন, স্ত্রী উত্তরে বলিতেছে,—

কে কয় এগুলা কথা কে আর পইতায়।
পুরুসর সঙ্গে গেলে কি স্ত্রীক বাঘে ধরে খায়।
ওগুলা কথা ঝুটমুট পালাবার উপায়॥
খায় না কেনে বনের বাঘ তাক নাই ডর।
নিত কলঙ্কে মরণ হউক স্বামির পদতল॥
তুমি হবু বট বৃক্ষ আমি তোমার লতা।
রাঙ্গা চরণ বেড়িয়া লমু পালাইয়া যাবু কোথা॥
যখন আছিনু আমি মা বাপের ঘরে।
তখন কেন ধর্ম্মি রাজা না গেলেন সন্ন্যাসি হইয়ে॥
এখন হইনু রূপর নারী তোরে যোগ্যমান।
মোকে ছাড়িয়া হবু সন্ন্যাস মুই তেজিম পরান।"

মাণিকচাঁদের গীতি ভিন্ন আমরা আর ও কিছু রচনা এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করিব, তাহা,—

(২) ডাক ও খনার বচন।

এই সব বচন রচনার সময় বুদ্ধের প্রভাব বঙ্গদেশ হইতে উৎপাটিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে পুষ্করিণী খনন, বর্ত্ম নির্ম্মাণ বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি সাধারণের উপকার-জনক ধর্ম্ম যে অবশ্য পালনীয়, তাহা অনেকবার নির্দ্ধারিত আছে,* কিন্তু একটিবারও হরি কি অন্য দেবতার

* "ধর্ম্ম করিতে যবে জানি,।
পোখরি দিয়া রাখিব পানী॥
গাছ রুইলে বড় কর্ম্ম।
মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম্ম॥
যে দেয় ভাত শালা পানী শালী।
সে না যায় যমের বাড়ী॥
স্বর্ণ ভূমি কন্যা দান।
বলে ডাক স্বর্গে স্থান॥"

স্থানে স্থানে চার্ব্বাকের সূত্র ও প্রচারিত দেখা যায়, যথা,—

নাম লইবার সূত্র গৃহস্থকে পালন করিতে আহ্বান করা হয় নাই। ভাষার জটিলতায় এই সব বচন মাণিকচাঁদের গান হইতেও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। খনার বচনের প্রচলন অত্যন্ত অধিক, এই জন্য কালক্রমে তাহাদের ভাষা ক্রমশঃ সহজ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ডাকের বচন ততদূর প্রচারিত হয় নাই, এই জন্য সে গুলি ভাষার আদিমতা অনেকাংশে রক্ষা করিয়াছে। নিম্নলিখিত বচন গুলির* ভাষা খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

(১) বুন্দা বুঝিয়া এড়িব লুণ্ড।
আগল হৈলে নিবারিব তুণ্ড॥
(২) আদি অন্ত ভুজসি।
ইষ্ট দেবতা যেহ পূজসি॥
মরণের যদি ডর বাসসি।
অসম্ভব কভু না খায়সি॥
(৩) ডাঙ্গা লিড়ান বান্ধন আলি।
তাতে দিও নানা শালি॥
(৪) ভাষা বোল পাতে লেখি।
বাটাহুব বোল পড়ি সাথি॥
মধ্যাস্থে যবে সমাধে স্নায়।
বলে ডাক বড় সুখ পায়॥
মধ্যাস্থ যবে হেমাতি বুঝে।
বলে ডাক নরকে পচে॥

ডাক নামক জনৈক-গোপ 'ডাকের বচন' প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। যে বংশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার হইয়াছিল, সেই বংশে বঙ্গের সক্রেতিস ডাকের জন্ম কল্পনা করা কিছু অনুচিত হয় নাই, তবে মিহিরের পত্নী উজ্জয়িনীর ভাষা ছাড়িয়া বাঙ্গলায় নীতি ও জ্যোতিষতত্ত্ব সঙ্কলন করিতেছেন, একল্পনার দৌড় আর একটুকু বেশী। ডাক ও খনা দুর্ভেদ্য অন্ধকার-জাল হইতে জ্ঞান-রশ্মি বিকীরণ করিতেছেন। তাঁহাদের জীবনের উদয় অস্ত, পর্ব্বতের ন্যায় অলঙ্ঘ্য কুসংস্কারের দ্বারা

"ভাল দ্রব্য যখন পাব
কালিকারে তুলিয়া না থোব।
দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ
ঔষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ॥
বলে ডাক এই সংসার
আপনা মইলে কিসের আর।"

ঈশ্বর-প্রসঙ্গে যে "ঈশ্বরের স্ত্রী সনে করে পরিহাস" তাহার নিন্দা ডাক করিয়াছেন। ঈশ্বরের স্ত্রী কে? গুরু পত্নী নন্ত?

* বেণীমাধব দের সংস্করণ, ১২৯৫ সাল।

আবৃত। আমরা সে গুলির কিছুই প্রত্যয় করিতে পারিলাম না। কল্পনা-প্রিয় পাঠকগণ বটতলার সারসংগ্রহ হইতে তাঁহাদের সন্তোষার্থ বিবিধ সদনুষ্ঠানের আয়োজন খুঁজিয়া বাহির করিবেন।

বোধ হয় বঙ্গভাষা স্ফুরণের এই গুলি প্রাক্-চেষ্টা; ভাষা ও ভাব দৃষ্টে বোধ হয়, ৮০০–১২০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে এইসব বচন রচিত হইয়াছিল, যুগে যুগে ভাষার সংস্কার হওয়াতে সেগুলি বর্ত্তমান সহজাকারে পরিণত হইয়াছে। উহারা, একজাতির সম্পত্তি; হয়ত প্রাচীন কালে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই অজ্ঞাতসারে উহাদের রচনার সাহায্য করিয়াছে। কোন ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা এ সমস্ত বচন রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।* কালিদাস ও গোপালভাঁড় যেমন বঙ্গীয় রসিকতা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন, বঙ্গদেশের জ্ঞানে ও সেইরূপ সেকালে ডাক ও খনা নামধেয় প্রকৃত কিম্বা কল্পিত ব্যক্তিদ্বয় একাধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন।

এইসব বচনে কবিত্ব কিছুই নাই, উহারা কঙ্কাল-সার সত্য, ভাষা উহাদিগকে সাজাইয়া বাহির করে নাই, সুতরাং সাহিত্য-সেবীদিগের প্রীতিকর হইবে কি না জানি না। অনাড়ম্বরে অতি সংক্ষেপে কথাগুলি প্রচারিত হইয়াছে, বহু পুস্তক খুঁজিলে যে জ্ঞান লাভ হয়, ঐ সব বচনের দুছত্রে তাহা আছে,—উহারা এতদূর সত্য যে রেখা-গণিত কি অঙ্ক-গণিতের প্রশ্নের মত কষিয়া দেখ,—ফলে মিলিয়া যাইবে।

খনা ও ডাকের বচন দুইরূপ সামগ্রী। খনা কৃষক ও গ্রহাচার্য্যের নজির। ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্রতত্ত্বের কথা আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে মানব-চরিত্রের ব্যাখ্যা বেশী। আমরা নিম্নে কতকটি উদ্ধৃত করিতেছি; বাঙ্গালী পাঠক, আপনারা হামাগুড়ির সঙ্গে যে পাঠ অভ্যাস করিয়াছিলেন, এগুলি তাহার পুনরাবৃত্তিমাত্র, কিছুই নূতন নহে।

(১) খাটে খাটায় লাভের গাঁতি। | ঘরে ব'সে পুছে বাত।
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি ॥ | তার ভাগ্যে হাভাত ॥† খনা

* ডাক অর্থ প্রচলিত বাক্যও হইতে পারে। "এখনও ডাকের কথায় বলে" প্রভৃতি কথায় কোন কোন স্থানে ডাক অর্থ প্রচলিত বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

† "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী" তুলনা করুন।

(২) খনা ডেকে বোলে যান।
রোদে ধান ছায়ায় পান॥
(৩) দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ।
কমে না বাড়ে না বারমাস॥ খনা
(৪) দিনে রোদ, রাতে জল।
তাতে বাড়ে ধানের বল॥
কাতিকের উনজলে।
খনা বলে দুন ফলে॥
(৫) ঘরে আখা বাইরে রাঁধে।
অল্প কেশ ফুলাইয়া বাঁধে॥
ঘন ঘন চায় উলটি ঘার।
ডাক বলে এনারী ঘর উজার॥
(৬) নিয়র পোখরি দূরে যায়।
পথিক দেখিয়া আউড়ে চায়॥
পর সম্ভাষে বাটে থিকে।
ডাকে বলে এনারী ঘরে না টিকে॥
(৭) রাঁধে বাড়ে গায় না লাগে কাতি।
অতিথ দেখিয়া মরে লাজে।
তবু তার পূজার সাজে॥
সুশীলা শুদ্ধ বংশে উৎপত্তি।
মিঠা বোল স্বামীতে ভকতি॥
রৌদ্রে কাঁটা কুঁটায় রাঁধে।
খড়কাট বর্ষাকে বাঁধে॥
কাথে কলসী পানীকে যায়।
হেট মুণ্ডে কাকহো না চায়॥
যেন যায় তেন আইসে।
বলে ডাক গৃহিণী সেইসে॥

বঙ্গভাষার মুখবন্ধেই এইরূপ সারগর্ভ কথার সূচনা হইয়াছিল, ইহা আমাদের সৌভাগ্যের কথা। ঘরের বউ ও কৃষকগণ এই সব চরণ কণ্ঠস্থ করিয়াছে বলিয়া উহাদিগকে অবজ্ঞা করিও না। ফুল কি জঙ্গলে জঙ্গলে মিলে না? তারা কি মেঘে মেঘে ফোটে না? কিন্তু তাহাদের মত সুন্দর কে?

এইসব বচন পড়িতে পড়িতে আমাদের আর একটি কথা মনে হয়। এখন আমাদের ভিক্ষা করিতে হইলেও বিলাত হইতে ঝুলি কিনিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু যখন ঐসব বচন রচিত হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালী ভালরূপ গৃহস্থালী জানিত ও পরমুখাপেক্ষী ছিল না। কৃষক সারা জীবন পরিশ্রম করিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিয়া যে সত্যের আভাস পাইয়াছিল সেই জ্ঞান এসব বচনে প্রচুর আছে। কৃষক জানিত, জ্যৈষ্ঠে খরা ও আষাঢ়ে ধারা হইলে শস্য ধরায় আঁটে না। আষাঢ় মাস ভরিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিলে সে বৎসর বন্যা হয়। ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হইলে চিনা কাওন দ্বিগুণ হয়। "ধান্যের থোর জন্মিলে একমাস, ফুলিলে অর্থাৎ গর্ভে শীষ জন্মিলে ২০ দিন, ঘোড়ামুখো অর্থাৎ শীষভরে অবনত হইলে ১৩ দিন মাত্র পরেই কাটিবার উপযুক্ত হয়। অগ্রহায়ণে কাটিলে পূর্ণ ফসল হয়, পৌষে কাটিলে স্থানে স্থানে ফসল, মাঘে কাটিলে অল্পমাত্র ফসল এবং ফাল্গুনে কাটিলে কৃষকের কোনরূপ ফসল হয়

না।'১* এগুলি তাহাদের পুস্তক শিক্ষার ফল নহে, তাহারা হাল কাঁধে করিয়া প্রকৃতির নিকট এই শিক্ষা পাইয়াছিল। বড় বড় অধ্যাপকও ইহার অতিরিক্ত তাহাদিগকে কিছু শিখাইতে পারিতেন না। এখনও বঙ্গের কৃষক এই সব তত্ত্ব জানে, কিন্তু পূর্ব্বে ঘরে ঘরে সকলেই ইহা জানিত। আমরা শুধু জুলিয়েটের বিরহ ও ওথেলোর সন্দেহ বিষয়ে প্রাজ্ঞ হইতেছি ও পোপো-কেটিপেটল কোথায় তাহা মানচিত্রে দেখাইতে শিখিয়াছি, যাঁহাদের নিবাস বিচিত্র হর্ম্ম্যরাশিতে, যাঁহারা নিজদেশের প্রভু, পরের দেশের প্রভু,—তাঁহা-দের সঙ্গে ঘেঁষিয়া সমকক্ষ হইতে চাহিতেছি, কিন্তু গৃহস্থালী বুদ্ধিটুকু একবারে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এই দুর্দ্দিনে তাই এইসব বচন গুলি বড় প্রিয় বোধ হয়।

কিন্তু এই সব বচনের আঁধার দিক আছে। দৃষ্ট হইবে, বাঙ্গালী গৃহ স্থালী করিতেছিল সত্য, কিন্তু টিক্‌টিকির ভয়ে, হাঁচির ভয়ে, আকার ভয়ে, বাঁকার ভয়ে, কুঁজোর ভয়ে স্বীয় কুটীরে থাকিয়া জড়সর হইয়াছিল। পা বাড়াইতে হা করিতে বঙ্গীয় বীর পাঁজির দোহাই দিত; তাহারা কাকমুখে জ্যোতিষের বার্ত্তা শুনিয়া কার্য্যের ফলাফল নিরূপণ করিত। এই অপূর্ব্ব শব্দার্থের কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল।

শব্দ—ফল
ক ক—কল্যাণলাভ
কঃ কঃ—রাজোপদ্রব
কয়কং কয়কং—বহুজনের সহিত সাক্ষাৎ।
কেতংকেতং—রত্ন হানি।
কয়কো কয়কো—কলহ।
কৌলো কৌলো—নিষ্ফল বা ক্ষতি।
কোয়ং কোয়ং—রাজা বা প্রভু বিনাশ।
ক্রেং ক্রেং ক্রেং—দ্রব্য লাভ।
কঃকুকুং কঃকুকুং—শব দর্শন ইত্যাদি।
জ্যোতিষ রত্নাকর, ৪৪৫ পৃঃ।

জ্যোতিষ শাস্ত্র বিজ্ঞানরূপে অধীত হইতেছিল না,—সংসারক্লিষ্টের হস্তে পড়িয়া এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়াছিল। যে জাতি এরূপ ভীরু তাহাদের জীবনে স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্ত্তি কিরূপে থাকিবে? এইরূপ জ্যোতিষে ভক্তি জাতীয় প্রতিভা-বিকাশের প্রতিবন্ধক। তাই ঐ সব বচনে একদিকে বাঙ্গালীর অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া সুখী হই, অন্যদিকে তাহাদিগের জড়তা দেখিয়া দুঃখিত হই।

* খনার বচন, জ্যোতিষ রত্নাকর।

কিন্তু শঙ্কর-প্রণোদিত হিন্দু ধর্ম্মের ঢেউ বঙ্গে প্রবেশ করিল—অনড় টলিল; যাহা নড়ে না, তাহা নড়িতে শিখিলে দৌড়ায়। যে বঙ্গদেশের প্রতিভা কুসংস্কারেও জড়তায় মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, তাহা কয়েক শতাব্দীর মধ্যে খাঁড়া ধরিয়া বহুযুগ-সঞ্চিত কুসংস্কারের স্তুপ ছেদন করিতে দাঁড়াইল। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে সেই প্রতিভার ক্রমিক বিকাশ দেখাইব।

আমরা 'বৌদ্ধযুগের' রচনার যে সব অপ্রচলিত শব্দ পাইয়াছি, নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম।*

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম।
অক	...	উহাকে	...	মা, চ, গা।
অচুম্বিতের	...	আশ্চর্য্যের	...	ঐ
অফিন্না	...	যাহা উৎপাটিত হয় নাই	...	ঐ
অবুধ	...	বুদ্ধিশূন্য	...	ডাক।
আউচাউ	...	হাবুডুবু	...	মা, চ, গা।
আউ	...	জানু	...	ঐ
আউল	...	সিদ্ধ ব্যক্তি	...	ঐ
আউড়ে	...	বক্রভাবে	...	ঐ
আও	...	রব	...	ঐ

* এইসব শব্দের সকল অর্থই যে ঠিক হইল তাহা বলিতে পারি না। কোন কোন শব্দ কেবল স্থলবিশেষে একবার পাইয়াছি, সেই স্থলে যে অর্থে তাহা ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ধারণা হইয়াছে, তাহাই দিয়াছি। একই শব্দের ব্যবহার অনেক স্থলে না লক্ষ্য করিলে তাহার প্রকৃত অর্থ বোধ হয় না। ইহার কোন কোন শব্দ সম্পূর্ণ প্রাদেশিক, তাহা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের শব্দার্থ-বোধ-সৌকর্য্যার্থ কোন অভিধান এখনও রচিত হয় নাই, কিন্তু তাহার রচনা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমি এই পুস্তকে সেই বিষয়ের কথঞ্চিৎ অবতারণা মাত্র করিব, ধারাবাহিক কিছু এখানে আরম্ভ করা যায় না। এখানে বলা উচিত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'পঁহু' ও 'নিছনি' শব্দের অর্থ লইয়া "সাধনায়" ও শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় "সাহিত্য" পত্রিকায় এই বিষয়ের ইতিপূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ সূত্রপাত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় তাঁহার বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সংস্করণে কতকগুলি হিন্দী শব্দের অর্থের তালিকা দিয়াছিলেন।

আধার* ...	খাদ্য ...	ডাক
আপহর ...	পাহারা ...	ঐ
আপ্ত ...	আপন ...	মা, চ, গা
আছিল ...	উপস্থিত ...	ঐ
আইল পাতার ...	বৃহৎক্ষেত্র ...	ঐ
আরিব্বল ...	আয়ু ...	ঐ
আসা নড়ি ...	হাতের লাঠি ...	ঐ
একতন যেকতন...	যে কোন প্রকারে	ঐ
একলা ...	এক ...	ঐ
এলায় ...	এখন ...	ঐ
উকা ...	অগ্নি ...	ঐ
উলী ...	কুশল ...	ডাক
কা ...	কাক ...	খনা
কাউ ...	কাক ...	ঐ
কাউশিবার ...	তাগাদা করিতে...	মা, চ, গা ।
কাতি ...	কালী ; কার্ত্তিক মাস...	ঐ
কাঙ্গী ...	ছোট ...	ঐ
কোনটি ...	কোথায় ...	ঐ
কোটেকার ...	কোথাকার ...	ঐ
কুশলানী ...	মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ...	ডাক
কৈতর† ...	পায়রা ...	মা, চ, গা ।
খপরা ...	কুটীর ...	ঐ
খোচা ...	তৃণ পল্লব ...	ঐ
গাভুর‡ ...	যুবক, বলশালী ...	ডাক

* আধার শব্দ পূর্ব্বে মনুষ্যের খাদ্য ও বুঝাইত ; এখন ইহার অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়া শুধু পক্ষীর খাদ্য মাত্র বুঝায়।

† এখনও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত।

‡ বিক্রমপুর অঞ্চলে এখনও চলিত।

গাবুরাণী*	...	যৌবন	...	মা, চ, গা।
গিরি	...	গৃহ	...	ঐ
গোবিন	...	গভীর	...	ঐ
গোঁধলা	...	গোময়	...	ডাক
ঘরজুয়ান	...	চিরযৌবন	...	মা, চ, গা।
চতুরা	...	চতুর্দ্দার	...	ঐ
চাম্বর	...	চামর	...	ঐ
চরিচর	...	চরিত্র, উপায়	...	ঐ
ছামুর	...	সম্মুখের	...	ঐ
ছুছু	...	শূন্য	...	ডাক
জীউ	...	জীবন	...	মা, চ, গা।
জ্ঞান্তা	...	জ্ঞাতি	...	ঐ
ঝোলাঙ্গা	...	ঝুলি	...	ঐ
ডাঙ্গ	...	কাটি	...	ঐ
ডারিয়া	...	বাঁধিয়া	...	ঐ
ডাঙ্গাইবার	...	প্রহার করিতে	...	ঐ
ডাম্বাডোল	...	বহুজনতার শব্দ	...	ঐ
ঢেবা ডোরা	...	ঢোলের দ্বারা ঘোষণা		ঐ
ঢলমল	...	ঝলমল	...	ঐ
তেতকে	...	তত	...	ঐ
তৈল পাঠের থাড়া	...	পাঁঠা কাটার ছুরি	...	ঐ
দায়া†	...	ডাক	...	ঐ

* গ্রীয়ারসন গাবুরাণী অর্থ করিয়াছেন 'গর্ব্ব' (vanity). এসিয়াটিক সোসাইটির জ্যারন্তাল ১৮৭৮ প্রথম সংখ্যা ৩য় খণ্ড ২১৩ পৃঃ দেখ। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থলে গাভুর গাভুরাণী, উভয়বিধ রূপই প্রচলিত আছে ও যৌবন বুঝায়। পাঠক এই পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত স্থলে গাবুরাণী শব্দ দেখিবেন, তাহাতে যৌবন অর্থই সঙ্গত দৃষ্ট হইবে।

† এই দায় শব্দ পূর্ব্বে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইত। মাণিকচাঁদের গানে আছে,—

"যেন মতে কলাই বেচি রাজাকে দেখিল,
ঘরর স্বামক আইল বাপ দায় দিয়া"।

রাজার রূপে মুগ্ধ হইয়া ঘরের স্বামীকে বাপ বলিয়া আসিল। অনেক পরে চৈতন্যভাগবতে পাইতেছি, "অন্তের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন" অর্থাৎ অন্তের কথা দূরে থাকুক ইত্যাদি।

দোয়াদস	...	করঙ্গ	...	মা, চ, গা ।
দামরা	...	ঢোল	...	ঐ
দোন	...	দুই	...	ঐ
থবীরা	...	স্থবির	...	ডাক
ধরেক	...	ধরিও	...	ঐ
ধওল	...	ধবল	...	মা, চ, গা।
নঠ	...	নষ্ট	...	ডাক
নিন্দ	...	নিদ্রা	...	মা, চ, গা ।
নিতে	...	বিনা	...	ঐ
নেওয়া	...	প্রলেপ	...	ঐ
নেয়াই	...	ন্যায়	...	ঐ
পইতায়	...	প্রত্যয় করে	...	ঐ
পোথরি	...	পুষ্করিণী	...	খনা ।
পাহাড়	...	পার	...	ডাক ।
পাকেয়া	...	ঘুরাইয়া	...	মা, চ, গা, !
বাবন	...	ব্রাহ্মণ	...	ঐ
বারুণ	...	ঝাঁটা	...	ঐ
বাদে	...	জন্য	...	ঐ
বেন্নামুখ	...	মুখ ফিরাইয়া	...	ঐ
বুন্দা	...	বৃষ্টি-বিন্দু	...	ঐ
ভুসঙ্গ	...	ভস্ম	...	ঐ
বেআলি	...	অনৈক্য	...	ডাক ।
মাও	...	মাতা	...	মা, চ, গা ।
মধুকর*	...	নৌকা বিশেষ	...	ঐ

* 'মধুকর' নৌকা বিশেষের নাম। পদ্মপুরাণে নৌকার অনেকগুলি নাম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে 'মধুকর' নৌকাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়; স্বয়ং সদাগর 'মধুকরে' যাইতেন। বিক্রমপুরবাসীদের মুখে শুনিয়াছি, এখনও মধুকর অর্থে একরূপ নৌকাকে বুঝায়। মাণিক চাঁদের গানে "চৌদ্দখান মধুকর ভাসিয়া উঠিল" পদে স্পষ্টই মধুকর অর্থ নৌকা দেখা যায়, কিন্তু গ্রীয়ারসন সাহেব এই পদের অর্থ করিয়াছেন, "A swarm of bees flew up" J. A. S. Part I. No. 3, 1878. P. 235.

মাল্লি ...	পথ্য ...	ঐ
মাড়াল ...	পথ ...	ঐ
মিঠ ...	মিষ্ট ...	ডাক।
মুর্চ্ছল ...	বাদ্য-যন্ত্র বিশেষ...	মা, চ, গা।
যেটে ...	যে স্থানে ...	ঐ
যেত্কে ...	যত ...	ঐ
যোগ্যবান...	যোগ্য ...	ঐ
যেনমত ...	যখন মাত্র ...	ঐ
লহড়(লড়)...	দৌড় ...	ঐ
সমাধে ...	বোঝে ...	ডাক
সাধে ...	সংগ্রহ করে লয় ...	মা, চ, গা।
সানে ...	ইঙ্গিত	ঐ
সরুয়া ...	সরু ...	ঐ
সাঁও ...	সাপ ...	ঐ
সেঁওয়ালী...	সন্ধ্যাকালীয় ...	ঐ
হীন ...	শূন্য, বিয়োগ ...	খনা।

এই সময়ের ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব একবারেই দৃষ্ট হয় না, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। মাণিকচাঁদের গানে রাজা ভাল হইলে তাঁহাকে 'সতী' এবং দুষ্ট হইলে তাঁহাকে 'অসতী' বলা হইয়াছে। খনা শনিকে 'ভানুতনুজা' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বহু-পূর্ব্ব-রচিত মেয়েলী ছড়ার 'গুণবতী ভাই' শুনিয়াছিলাম, সেও বুঝি এই যুগের রচনা হইবে। মাণিকচাঁদের গানে ক্রিয়ার গুরু লঘু ভাব এখনকার প্রচলিত ভাব হইতে স্বতন্ত্ররূপ ছিল। 'যাইস্ না ধর্ম্মি রাজা পরদেশক লাগিয়া।' (মা, চ, গা ২৯২ শ্লোক) প্রভৃতি পদে সম্মানীয় পাত্রে লঘু ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে; অথচ ভৃত্য নেঙ্গাকে রাণী বলিতেছেন,— 'কেন কেন নেঙ্গা আইলেন কি কারণ' (৪৯ শ্লোক) মাণিকচাঁদরাজা তাঁহার প্রহারক যমদূতের প্রতি জিজ্ঞাসু হইয়াছেন, 'কে মারেন আমারে বিস্তর করিয়া' (৭২ শ্লোক) কোন কোন স্থানে আধুনিকমতে নিতান্ত বিরুদ্ধভাবাপন্ন 'তুমি চাইলেন দুখ' (৩০০ শ্লোক) প্রভৃতি রচনা দৃষ্ট হয়।

এই সময়ে রাজারা সোণার খাটে বসিয়া রূপার খাটে পদ স্থাপন

(৩০৭ শ্লোক) ও স্বর্ণ থালে ৫০ ব্যঞ্জনসহ অন্ন আহার (৪৬৭ শ্লোক) করিলেও নিত্য জীবন-যাত্রা-ঘটিত দ্রব্যে খুব উচ্চ অঙ্গের বিলাসের ভাব প্রদর্শন করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। 'ইন্দ্রকম্বল' (৫৫৫ শ্লোক) 'দণ্ডপাখা' (২৫৪ শ্লোক) ও 'পাটের সাড়ী' (৫৮০ শ্লোক) বিলাসের দ্রব্য মধ্যে গণ্য ছিল। পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে দেখিব কৃত্তিবাস পণ্ডিত গৌড়েশ্বরের নিকট একখানা 'পাটের পাছড়া' পাইয়াই ধন্য হইতেছেন। কিন্তু কবিকঙ্কণ 'মেঘডম্বুর কাপড়' ও 'জগন্নাথী থান' নামক একরূপ বস্ত্রের কথা গর্ব্বের সহিত উল্লেখ করিতেছেন* ও চৈতন্য প্রভুর সময় তিন টাকা মূল্যের ভোট কম্বলই মহার্ঘ বলিয়া গণ্য হইতেছে (চৈ, চ মধ্যমখণ্ড, ২০ প)। সে সব এসময়েরও অনেক পরে। খাদ্যের মধ্যে "ইন্দ্রমিঠা" (২৫৫ শ্লোক মা, চ, গা) নামক একরূপ মিষ্ট দ্রব্য উপাদেয় ছিল ও 'বংশহরির গুয়া' (২৫৭ শ্লোক) খাইয়া মুখ শুদ্ধি করা হইত। 'বংশ-হরির গুয়া খাইয়া' দন্ত শুভ্র হইয়াছে বলিয়া গোপীচাঁদ স্ত্রীর মুখের প্রশংসা করিতেছেন।

মাণিকচাঁদের গানে এবং ডাক ও খনার বচনে দৃষ্ট হয় ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকগণও কৃষি-ব্যবসা করিতেন ও স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত অক্ষক্রিয়াসক্ত ছিলেন। স্ত্রীলোক-গণের অক্ষক্রিয়াসক্তি কবিকঙ্কণের সময়ে ও বিদ্যমান ছিল।

সন্তান জন্মিলে সাতদিন পরে 'সাদিনা' দশদিন পরে 'দশা', এবং ত্রিশদিন পরে 'ত্রিশা' নামক উৎসব করা হইত (মা, চ, গা ২১০—২১১ শ্লোক)।

পঞ্চম অধ্যায়।

১। ধর্ম্মকলহে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি।

২। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ।

বঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের উত্থানে নানা মতাবলম্বী অধ্যাপক স্বীয় স্বীয় মত প্রচারে নিয়োজিত হইলেন। ইঁহাদের তর্ক-যুদ্ধ অতীব কৌতূহল-উদ্দীপক। গৌড়-বাসী প্রাচীন পণ্ডিত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য এই কলহ ব্যাপারের একখানা

* রাজার জন্য সাধু "নিল জগন্নাথী থান দশ জোড়া।" ক, ক, চ।
  সাধুর স্ত্রী "বাছিয়া পরিল মেঘডম্বুর কাপড়।" ঐ

চিত্রপট রাখিয়া গিয়াছেন; সে চিত্রখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে—তাহার নাম "বিদ্যোন্মাদ তরঙ্গিণী"।*

হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থানকালে বোধ হয় শৈবধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথম শির উত্তোলন করে। শৈব-ধর্ম্ম কীর্ত্তনোপলক্ষে ভাষায় কোন বৃহৎ কাব্য রচিত হয় নাই। "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" প্রভৃতি প্রবাদ বাক্য দ্বারা অনুমান হয়, শৈবমতের অধ্যাপকগণ সে বিষয়ে একবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। চট্টগ্রামের প্রাচীন 'মৃগলব্ধ' পুঁথিতে† শিবমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে; এইরূপ দুএকখানা প্রাচীন পুঁথিই শৈবধর্ম্মের ভগ্নকীর্ত্তি স্বরূপ বর্ত্তমান আছে। উহারা ক্ষুদ্র-কলেবর হইলেও জঙ্গলে কুড়াইয়া পাইয়া আমরা আদরে রক্ষা করিয়াছি। রামেশ্বরের শিব সংকীর্ত্তন আধুনিক সামগ্রী। উহাতে শিব অপেক্ষা দেবীর শক্তি সামর্থ্যের বর্ণনাই অধিক।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি সাধনে পদ্মাবতী ও চণ্ডীই বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছেন। সংস্কৃতের বচন স্পর্শ-মণি-তুল্য, তাহার প্রভাবে লোষ্ট্র ও দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে; এইজন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে মনসামাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তিত হইয়া এবং বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে‡ কালকেতু ও শালবাহন প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা বঙ্গীয় পদ্মপুরাণ ও চণ্ডী কাব্যের কেল্লা দৃঢ় করা হইয়াছিল।

---

* প্রায় ৬০ বৎসর অতীত হইল শোভাবাজারের স্বর্গীয়রাজা কালীকৃষ্ণবাহাদুর নিজকৃত একটি ইংরাজী অনুবাদসহ এইগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

† ১৫০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে গ্রন্থকার রতিদেব সম্বন্ধে এই বিবরণ পাওয়া যায়।

"পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা বসুমতী।
জন্মস্থান সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি॥
জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা বন্দম রাম নারায়ণ।
ধরণী লোটায়ে বন্দম যত গুরুজন॥
অন্নপূর্ণা শাশুড়ী যে শ্বশুর শঙ্কর।
মন্ত্রদাতা দয়াশীল মোক্ষদা ঠাকুর॥
গোপীনাথ দেব সুত রতিদেব গায়।
মৃগলব্ধ পুঁথি এহি হর গৌরীর পায়॥"

এই পুস্তকে শিবচতুর্দ্দশী ব্রতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন উপলক্ষে এক ব্যাধের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

‡ "ত্বং কালকেতুবরদা ছলগোধিকাসি।
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডীকাখ্যা॥" ইত্যাদি

শৈবধর্ম্মের উপর এইসব পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্ম্মতরঙ্গ উপর্য্যুপরি আঘাত করিয়াছে। শিবোপাসক ধনপতি সদাগর 'ডাকিনী দেবতা' চণ্ডীর ঘট্ পদ-প্রহারে ভগ্ন করিয়া 'মেয়ে দেব'-সেবিকা খুল্লনাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন,* বিষহরিকে শিবোপাসক চাঁদ সদাগর শুধু রক্ত চক্ষু দেখাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, হেঁতালের বাড়ি দিয়া কক্ষদেশ ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন।† কিন্তু বঙ্গীয় কাব্যগুলিতে চণ্ডী ও মনসাকে স্বীয় স্বীয় উপাসকভক্তগণের জন্য যেরূপ কার্য্য-তৎপর দর্শন করি, সে তুলনায় শিবঠাকুরকে নিতান্তই নিশ্চেষ্ট বলিয়া মনে হয়। খুল্লনার বিপদে, শ্রীমন্তের ক্ষেদে, লাউসেনের দুঃখে চণ্ডীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। স্বীয় পূজা প্রচারের জন্য চণ্ডী ও বিষহরির দিনে শান্তি ও রাত্রে নিদ্রা ঘটে নাই। সুন্দর দেবীর প্রসাদে কাব্য অপেক্ষা চৌর্য্যে ও কম কৃতিত্ব লাভ করেন্ নাই। বিষহরিকে পূজা করিয়া বিপুলা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন কে না জানে? ভক্তের স্মরণমাত্র ইঁহারা কখনও সাশ্রুনেত্র কখন ও খড়্গহস্ত। কিন্তু প্রায়শঃ ইঁহারা সামান্য মানবীর ন্যায় রাগ, হিংসা ও দুঃখের পরিচয় দিয়াছেন। দুএক স্থলে শুধু বর্ণনাগুণে চণ্ডী দেবী মহত্তর প্রভাব দেখাইয়াছেন। মুকুন্দরাম ক্রুদ্ধ চণ্ডীর যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা গম্ভীর রসে মিল্টনের লেখনী-যোগ্য। দেবীর ক্রোধ দেখিয়া বরুণ পাশ, যম কালদণ্ড, ইন্দ্র বজ্র, শিব শূল, ব্রহ্মা কমণ্ডলু, বিষ্ণু চক্র, সূর্য্য রশ্মি লোকপালগণ তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় প্রহরণ দিয়া প্রণত হইতেছেন। ত্রিলোকের এই ভীতিকর শক্তি-পুঞ্জ একত্র সংগ্রহ করিয়া সংহার-রূপিণী সিংহের উপর দাঁড়াইলেন। ইজিপ্টের পিড়ামিড কি ব্যাবিলনের প্রস্তর-গৃহ যাঁহারা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভিন্ন এবিগ্রহ গঠন করিবে কে?

কিন্তু চণ্ডী ও পদ্মাবতীর উদ্যমশীলতা মহাদেবে দৃষ্ট হয় না। চাঁদসদাগরের সাতখানা 'মধুকর ডিঙ্গা' খান খান হইয়া সমুদ্রে পড়িল। চাঁদবেনে 'শিব শিব' বলিয়া সপ্তবার ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।‡ কিন্তু শিবঠাকুর

* ধনপতির সিংহল যাত্রা, ক, ক, চ।

† "হেঁতালের বাড়ি দিলগো আগো তাতে ব্যাথা পাইলাম বড়।
জালুয়া মণ্ডপে গিয়া কাঁকালী কৈলাম দড়। বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ।

‡ "ভেলায় চাপিয়া সাধু পাইল গিয়া তট।
শিব শিব বলি সাতবার করে গড়।" কেতকাদাস।

নিশ্চেষ্ট, নির্ম্মম। ধনপতির অশ্রু মোচন করিতেও তিনি হস্ত উত্তোলন করেন নাই। সুতরাং বিষহরি ও চণ্ডীর প্রতিপত্তি যে বঙ্গদেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? চৈতন্যভাগবতে দেখা যায়, উক্ত দেবতাদ্বয়ের পূজা বিশেষ অর্থকরী ও সম্মানিত ব্যবসা ছিল।*

এস্থলে বলা উচিত, ভারতচন্দ্র শৈব ও শাক্তের যে কলহ বর্ণনা করিয়াছেন ও দাশরথী যাহার আভাস দিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের সময়ের সামগ্রী নহে; তাঁহারা অতীত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা অঙ্কন করিয়াছেন মাত্র। ভারতচন্দ্র উক্ত কলহ বর্ণনা করিতে যাইয়া নানা মতের সামঞ্জস্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; তদ্দ্বারাই দৃষ্ট হয়, শৈব শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় সে সময় পরস্পরের বিরোধ ভুলিয়া সকলেই যে এক পথের পথী, এই সত্য ধারণা করিতে সক্ষম হইয়াছিল; সুতরাং তাহারা ধর্ম্ম-বিদ্বেষের সীমা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল।

শৈব শাক্তের কলহ ভিন্ন এক সম্প্রদায়ে ও নানারূপ মতভেদ ও তজ্জনিত বিদ্বেষ বর্ত্তমান ছিল। এখনও এক এক সম্প্রদায় হইতে কতরূপ বিরুদ্ধ মতের প্রভা বিকীর্ণ হইয়া জগতকে সংশয়ান্বিত করিতেছে। বিদ্যোন্মাদ তরঙ্গিণীতে রামোপাসক ও শ্যামোপাসকের দ্বন্দ্ব বর্ণিত আছে, বটতলার কৃত্তিবাসী রামায়ণে সেইরূপ একটি কলহের অল্প মাত্রায় আভাস আছে,—

"এতেক মন্ত্রণা করি বিনতা নন্দন।
পাখাতে করিল ঘর অদ্ভুত রচন॥
ভকত বৎসল রাম তাহার ভিতরে।
দাণ্ডাইলা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ ধরে॥
ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে।
হনুমান দেখে তবে ভাবিছে অন্তরে॥
হনু বলে প্রাণপণে করি প্রভু হিত।
পক্ষীর সঙ্গেতে এত কিসের পীরিত॥
দেখিলেন হনুমান মহাযোগে বসি;
ধনু খসাইয়া পক্ষী করে দিল বাঁশী॥
হনুমান বলে পক্ষী এত অহঙ্কার।
ধনু খসাইয়া বাঁশী দিল আরবার॥
যদি ভৃত্য হই মন থাকে শ্রীচরণে।
লইব ইহার শোধ তোর বিদ্যমানে॥
বাঁশী খসাইয়া দিব ধনুঃশর করে।
লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ অবতারে॥

কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড।

পুনশ্চ,—"যা করেন শিব শূল, এবার পাইলে কূল,
মনসায় বধিব পরাণে।" কেতকাদাস।

* "দেখ এই চণ্ডী বিষহরিরে পূজিয়া।
কেনা ঘরে খায় পরে বসন পরিয়া॥ চৈ, ভা, আদি।

শ্রীচৈতন্যদেব এক রামোপাসককে শ্যামোপাসনায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

"ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন কৈল।
কহ বিপ্র এই তোমার কোন্ দশা হৈল।।
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর লৈতে রাম নাম।
এবে কেন নিরন্তর লও কৃষ্ণ নাম।।
বিপ্র বলে এই তোমার দর্শন প্রভাবে।
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাবে।।
বাল্যাবধি রাম নাম গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণ নাম আইল একবার।।
সেই হতে কৃষ্ণ নাম জিহ্বাগ্রে বসিল।
কৃষ্ণ নাম স্ফুরে রাম নাম দূরে গেল।।
চৈ, চ, মধ্যমখণ্ড ৯ ম পঃ।

এইরূপ বিভিন্ন উপাসকগণ তাঁহাদের মতানুযায়ী শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ও অনুরূপ গ্রন্থ ভাষায় বিরচিত করিয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে ধর্ম্মতত্ত্ব পৌছাইতে যত্নপর হইয়াছিলেন। আমরা অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ কালিকাপুরাণ গারুড়পুরাণ এইরূপ প্রায় তাবত পুরাণেরই অতি প্রাচীন বঙ্গানুবাদ দেখিয়াছি। ধর্ম্মভিন্ন কোন জাতি বড় হয় নাই, ধর্ম্মভিন্ন কোন সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই।

প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম লইয়া দেশময় ভাবের বন্যা ছুটিল। বৌদ্ধধর্ম্মকে উন্মুলিত করিতে যাইয়া বোধ হয় হিন্দুর বিপুলশক্তি ব্যয়িত হইয়া গিয়াছিল, তাই মুসলমানগণ এত সহজে হিন্দুর শিথিলমুষ্টি হইতে স্বাধীনতারত্ন কাড়িয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম* ও ভারতের স্বাধীনতা লুপ্ত

* বৌদ্ধধর্ম্ম শেষসময়ে নাস্তিকতাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যোন্মাদতরঙ্গিণীতে তাহাদের যুক্তি এই প্রকার বর্ণিত আছে।

(১) ন স্বর্গো নৈব জন্মান্তরপি ন নরকো নাপ্যধর্ম্মো নধর্ম্মঃ, কর্ত্তা নৈবাস্ত কশ্চিৎ প্রভবতি জগতো নৈব ভর্ত্তা ন হর্ত্তা। প্রত্যক্ষান্যন্নমানং ন সকল ফলভুগ্দেহভিন্নোঽস্তি কশ্চিন্মিথ্যাভূতে সমস্তেঽপ্যনুভবতি জনঃ সর্ব্বমেতদ্বিমোহাৎ।

অর্থ,—স্বর্গ নাই জন্মান্তর নাই, নরক নাই, অধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম নাই, এই জগতের কোনও সৃষ্টি কর্ত্তা নাই, সংহার কর্ত্তা নাই প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই। দেহ ভিন্ন পাপ পুণ্যাদি সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগী কোনও আত্মাদি নাই। এই মিথ্যাভূত অখিল সংসারে জীবগণ মোহ বশতঃ এই সকল অনুভব করিয়া আসিতেছে।

(২) অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ পাপমাত্মপ্রপীড়নম্।
অপরাধীনতা মুক্তিঃ স্বর্গোঽভিলষিতাশনম্।।
স্বদারপরদারেষু যথেচ্ছং বিহরেৎ সদা।
গুরুশিষ্যপ্রণালীকং ত্যজেৎ স্বহিতমাচরন্।

হইয়াছে; কিন্তু গৃহে গৃহে, প্রতি গৃহীর হৃদয়ে হৃদয়ে শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও সাবিত্রী মূর্ত্তি অঙ্কিত হইল—আমাদের এই লাভ। কৃষ্ণ ভক্তিতে দেশ ডুবিয়া গেল। বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানে নরহৃদয়ে নবভাব অঙ্কুরিত হইল, তাই আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে পাইয়াছি। আমরা ধর্ম্মজগতে ক্ষতিগ্রস্থ নহি। ভারতবর্ষ অন্যদিগে লাভালাভের গণনা করে না। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে শাস্ত্রের দোহাই ভিন্ন অন্য কথা নাই। পুরুষদিগের ত কথাই নাই, স্ত্রীলোকগণ ও প্রতি কথায় শাস্ত্রের নজির দেখাইতেন। ফুল্লরা ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে গৃহে-প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন (ক, ক, চ), লহনা দ্বেষপরবশ হইয়া খুল্লনাকে স্বামীর গৃহে যাইতে নিষেধ করিলে খুল্লনা কতকগুলি শাস্ত্রের নজির দেখাইয়া সপত্নীর তর্ক-কুহক দূর করিতেছে (ক, ক, চ), বিপুলাকে যখন তাঁহার ভ্রাতা স্বামীর শবত্যাগ করিতে বলিতেছে তখন বিপুলা তৎবিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় নজিরসহ অকাট্য প্রমাণ দেখাইতেছে (হস্তলিখিত পদ্মপুরাণ) কর্ণসেন যখন রঞ্জাদেবীকে সন্তান না হওয়ার কষ্ট বিস্মৃত হইতে অনুনয় করিতেছেন, তখন স্ত্রী শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধারণে পরাঙ্মুখ হয় নাই (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ৪র্থ সর্গ)

এইরূপ অসংখ্য স্থলে দেখা যাইবে শাস্ত্র চর্চ্চা সমাজের নিম্নতম স্তর ও স্ত্রীজাতি পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল, নিরক্ষর কালকেতু ব্যাধ কংস নদীর জল পান করিয়া দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাগবতের কথা উল্লেখ করিতেছে, উহা কবির অস্বাভাবিক বর্ণনা হয় নাই। প্রাচীন সামাজিক জীবনের ভিত্তিভূমি শাস্ত্র এবং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যর ভিত্তিভূমি সংস্কৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণকে শীর্ষস্থানে স্থাপন করিয়া উত্থিত হয় নাই। যদিও ভাষাগ্রন্থগুলিতে অজস্র ব্রাহ্মণের

অর্থ,—অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, আত্ম পীড়নই পাপ, পরাধীন না হওয়াই মুক্তি, অভিলষিত দ্রব্য ভোজনই স্বর্গ। নিজ পত্নীতে ও পরদারে সততই যথেচ্ছা বিহার করিবে; আপনার হিতজনক আচরণ করিয়া গুরু শিষ্য প্রণালী ত্যাগ করিবে।

(৩) কা সৃষ্টৌ পরিদেবনা যদি পুনঃ পিত্রোরপত্যোদ্ভবঃ।
কুম্ভাদ্যাঃ প্রভবন্তি সন্ততময়ী তত্তৎকুলালাদিতঃ ॥

অর্থ,—যখন মাতা, পিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হইতেছে, আর সেই কুম্ভকারাদি কর্ত্তৃক যখন নিরন্তর ঘটাদি উৎপাদিত হইতেছে, তখন সৃষ্টির জন্য ভাবনা কি আছে?

স্তব দৃষ্ট হয়।* যাঁহারা নব-হিন্দুধর্ম্মের নেতা হইলেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন না। কবীর জোলা তাঁতি, রাইদাস চর্ম্মকার, দাদুপন্থী-প্রবর্ত্তক প্রসিদ্ধ দাদু ধুনরী, পীপা রাজপূত, ধনা জাট এবং সেনপন্থী-প্রবর্ত্তক সেন † নাপিত ও তুকারাম শূদ্র ছিলেন। চৈতন্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ব্রাহ্মণেতর এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ নিকৃষ্ট জাতীয় ছিলেন।‡ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মনিষ্ঠা সমস্ত হিন্দুজাতি হরণ করিয়া লইয়াছিল তাই চর্ম্মকার ও ধর্ম্ম-নেতা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। মিস্ পারঙ্গিণ্টন যেরূপ স্বীয় কুটীরের দিগে আটলাণ্টিক মহাসাগরকে অগ্রসর দেখিয়া সম্মার্জ্জনী হস্তে তাহার গতি রোধ করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন সেইরূপ সমাজের গোঁড়াগণও এইধর্ম্ম-প্রবাহে সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান বিস্তারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রানুবাদকারীদিগকে গালি দিয়া বলিয়াছিলেন;—

---

* "যাঁর ক্রোধে যদুকুল হইল নির্ব্বংশ।
যাঁর ক্রোধে নষ্ট হয় সগরের বংশ॥
যাঁর ক্রোধে কলঙ্কী হইল কলানিধি।
যাঁর ক্রোধে লবণ হইল সলিলধি॥
যাঁর ক্রোধে অনল হইল সর্ব্বভক্ষ।
যাঁর ক্রোধে ভগাঙ্গ হইল সহস্রাক্ষ॥" কাশীদাস।

ব্রাহ্মণের ক্রোধ এইরূপ! পরীক্ষিৎ রাজা বলিতেছেন;—
"এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ।
দংশুক আমারে রহুক ব্রাহ্মণ বচন॥" ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি এতদূর।

† সেন পূর্ব্বে বন্ধগড়ের (গন্দোয়ানার অন্তঃপাতি) রাজাদিগের ক্ষুর নাপিত ছিলেন। শেষে ধর্ম্মজগতে তাঁহার প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, তিনিও তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি সন্তানেরা উক্ত রাজবংশের কুলগুরু হইয়া অতিশয় খ্যাতি ও প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, দ্বিতীয় ভাগ, ৬৫ সংখ্যা, ১৭৭০ শক, ১৭৯ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ প্রসিদ্ধ 'কড়চা' লেখক (পদকর্ত্তানহেন) গোবিন্দ দাস কামার ছিলেন;
"বর্দ্ধমান কাঞ্চন নগরে মোর ধাম।
শ্যামদাস পিতৃ নাম, গোবিন্দ মোর নাম॥
অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার।
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার॥" কড়চা।

"কৃত্তিবাসী, কাশিদাসী, আর বামুণ ঘেঁষী, এই তিন সর্ব্বনাশী" * কিন্তু তথাপি এই শাস্ত্রানুবাদও শিক্ষার স্রোত প্রতিরুদ্ধ হয় নাই।

পূর্ব্ব এক অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত প্রাচীন কাব্যের প্রায় তাবতই গানের পালা ছিল। বঙ্গের বৈভবশালী ব্যক্তিগণ এই সব গানের আদর করিতেন; প্রত্যেক রাজসভায়ই সভা-কবি নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি স্বীয় পৃষ্ঠপোষক উৎসাহ-দাতার ধর্ম্মবিশ্বাসানুকুল্যে কাব্য রচনা করিতেন। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখাইতে চেষ্টা করিব, গৌড়েশ্বরগণ বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ অনুবাদ গ্রন্থগুলি প্রণয়নে শাস্ত্রজ্ঞ কবিদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চণ্ডীকাব্য অন্নদামঙ্গল ও শিবসংকীর্ত্তন রচকগণও উৎসাহ লাভ করিয়াই কাব্য রচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু স্ববিক্রমে যাহা দাঁড়ায়, তাহার তুলনা নাই। বিষহরি ও চণ্ডীপূজার ন্যায় বৈষ্ণবগণের কীর্ত্তন ও ভজন অর্থকরী কি সম্মানাস্পদ ছিল না।† নিম্ন শ্রেণীর সমাজই নবভাবের প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র। যে ভট্টাচার্য্যের দল রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ চৈতন্যপ্রভুর প্রবর্ত্তিত নবধর্ম্মের প্রতিকূলে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। চণ্ডীদাস জীবনে সৌভাগ্যশালী ছিলেন না। ঢকানাদে তাঁহার কলঙ্ক প্রচারিত হইয়াছিল এবং তিনি সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন।‡ মহাপ্রভুর অনুচরগণও নানারূপ উৎপীড়ন ও নিন্দা সহ্য করিয়াছিলেন,$ তথাপি

* Baboo Hara Prasad Shastri's pamphlet on old Bengali Literature P.13.

† চৈতন্য প্রভু শ্রীধরকে বলিতেছেন,—"লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি। অন্ন বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি॥" এবং লাভজনক বিষহরি ও চণ্ডীপূজা অবলম্বনের উপদেশ দিতেছেন। চৈ, ভা, আদি।

‡ "দুঃখের কথা কৈতে গেলে প্রাণ কাঁদি উঠে।
মুখ ফুটে বলতে নারি মরি বুক ফেটে॥
ঢাক পিটিয়ে অপবাদ গ্রামে গ্রামে দেয় হে।
চক্ষে না দেখিয়ে মিছে কলঙ্ক রটায় হে॥"

বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, ৪০৬ গৌরাঙ্গাব্দ ১৬ই মাঘ।

$ "কেহ বলে এগুলার হইল কি বাই।
কেহ বলে রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই॥
কেহ বলে গোসাঞি রুষিবে এই ডাকে।
এগুলার সর্ব্বনাশ হৈবে এই পাকে॥

তাঁহারাই বঙ্গসাহিত্য গঠন করিয়াছেন। সংস্কৃতের দাসত্ব হেতু বঙ্গসাহিত্য মুকুলে শুকাইত, ইহার পৃথক অস্তিত্ব থাকিত না; কিন্তু বৈষ্ণবগণ ইহার ভিত্তি দৃঢ় করিয়া সজীব করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত বঙ্গভাষা শিক্ষাভিমানীর

কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
পরম উদ্ধত্যপানা কোন ব্যবহার॥
মনে মনে বলিলে কিপুণ্য নাহি হয়।
বড় করি ডাকিলে কি পুণ্য উপজয়॥" চৈ, ভা. মধ্যমখণ্ড।

ভট্টাচার্য্যগণ সর্ব্বদাই চৈতন্যপ্রভুকে বিদ্বেষ করিতেন; তাঁহারা পণ্ডিত হইয়াও প্রভুর মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন নাই, বৃন্দাবন দাস তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন;—

"মুরারি গুপ্তের দাস যে প্রসাদ পাইল।
সেই নদীয়ার ভট্টাচার্য্য না দেখিল॥" চৈ, ভা, মধ্যমখণ্ড।

চৈতন্যপ্রভুকে শাস্ত্রের বচন দ্বারা পরাভূত করিবার আশায়, এই মহাত্মাগণ তন্ত্ররত্নাকরে কতকগুলি শ্লোক যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে আছে, "বটুক ভৈরব একদা ভগবান গণদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিপুরাসুর হত হইলে, তাহার অসুর-তেজ নষ্ট হইয়াছিল কি কোন রূপে বিদ্যমান ছিল?"

গণদেব উত্তর করিলেন,—

" স এব ত্রিপুরোদৈত্যো নিহতঃ শূল পাণিনা।
রুষয়া পরয়াবিষ্ট আত্মানমকরোত্রিধা॥
শিবধর্ম্মবিনাশায় লোকানাং মোহহেতবে।
হিংসার্থং শিবভক্তানামুপায়ান সৃজবহুন॥
অংশেনাদ্যেন গৌরাখ্যঃ শচীগর্ভে বভূব সঃ।
নিত্যানন্দোদ্বিতীয়েন প্রাদুরাসীন্মহাবলঃ॥
অদ্বৈতাখ্যস্তৃতীয়েন ভাগেন দনুজাধিপঃ।
প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে বিজহার মহীতলে॥
ততো দুরাত্মা ত্রিপুরঃ শরীরৈস্ত্রিভিরাসুরৈঃ।
উপপ্লবায় লোকানাং নারীভাবমুপাদিশৎ॥"

ইহার সারার্থ এই, "ত্রিপুরাসুর মহাদেবের দ্বারা নিহত হইয়া শিবধর্ম্ম নাশের জন্য গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত এই তিনরূপে আবির্ভূত হইলে, পরে নারীভাবে ভজনের উপদেশ দিয়া লোকসমূহকে মোহভাবে বশীভূত করিলেন।" ইহার পর এইরূপ আরও অনেক ইতর-জনোচিত নিন্দাবাদ আছে। যাহা ভাল তাহা পৃথিবী 'লুফে' নেয় না। তাহা হইলে এতদিন পৃথিবী স্বর্গ হইত।

উপেক্ষার বস্তু ছিল। কিন্তু যে দিন (১৫০৩ শকে) সংস্কৃতভাষার অসাধারণ পণ্ডিত, অশিতিপরবৃদ্ধ কৃষ্ণদাসকবিরাজ বহুবৎসরের চেষ্টায় চৈতন্য-চরিতামৃতের ন্যায় অপূর্ব্ব দর্শনাত্মক ইতিহাস রচনা করেন, সেই দিন বঙ্গভাষার এক যুগ। আবার যে দিন শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর বাঙ্গলা 'পদামৃতেসমুদ্রের' সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করেন, বঙ্গভাষার সেই আর এক যুগ। দেবভাষা বঙ্গভাষার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল, ইহা হইতে সেই যুগে এভাষার আর অধিক গৌরবের কথা কি হইতে পারিত ?

২। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ।

যাঁহারা টেইন, ডাউডান পড়িয়া বঙ্গভাষার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা একটি বিষয় মনে রাখিবেন; বিলাতী লিলি আর দেশী পদ্মে, জেসিমাইন আর জুইএ একটা প্রভেদ আছে; ইংরেজীও বাঙ্গালী চরিত্রে সেইরূপ একটা প্রভেদ আছে; জাতীয়সাহিত্যেও সেই প্রভেদের প্রতি-বিম্ব পড়িয়াছে।

ইংরেজী কবি চছার যে গীতি গাহিয়াছেন, স্পেন্সার তাহা স্পর্শ করেন নাই; আবার ক্যাণ্টারবারিটেলস কি ফেয়ারিকুইনের সৌন্দর্য্যের ছায়াপাত প্যারাডাইসলষ্টে লক্ষিত হয় না। এইরূপে জনওয়েবষ্টার, ফোর্ড, বেনজনসন্, চ্যাটারটন্, স্কট, শেলি প্রভৃতি কবিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শে কাব্য রচনা করিয়াছেন; একজনের চিহ্নিত পথ অপর কবি অনুসরণ করেন নাই, একজনের রাগিণীর সঙ্গে অন্যের রাগিণী জড়িত হইয়া যায় নাই। উদীয়মান স্বাধীন জাতির ব্যক্তি-গত স্বাবলম্বন একটি বিশেষ লক্ষণ।

কিন্তু বাঙ্গালী কবিগণ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির পথ না দেখিয়া প্রায়ই অগ্রসর হয়েন নাই। অনুবাদ-গ্রন্থের আদি লেখক কৃত্তিবাস, সঞ্জয় কি মালাধর বসু হইতে পারেন, কিন্তু মৌলিক গ্রন্থগুলির তাবতই পূর্ব্ববর্ত্তী কবির চেষ্টার পরে পুনশ্চ সেই চেষ্টার বিকাশ। আদি-কবি বলিয়া কাহাকেও নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত করা যায় না; এক কবির পূর্ব্বে আর এক কবি, তৎপূর্ব্বে অন্য এক জন, এইভাবে একই কাব্যের রচনায় যুগ-ব্যাপী চেষ্টার বিকাশ দেখা যায়। আদি-কবি একজন মানিয়া লইলে ও তিনি কল্পনাবলে গল্পের উৎপত্তি করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, সম্ভবতঃ তিনি লোক-পরম্পরা-শ্রুত আখ্যানটি গীতে পরিণত করিয়াছেন। চণ্ডী-

কাব্যের আদি-লেখক কে, আমরা জানি না।০ চৈতন্য ভাগবতকার মঙ্গলচণ্ডীর গীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন; আমরা দ্বিজ জনার্দ্দন নামক কবির অতি প্রাচীন এবং সংক্ষিপ্ত চণ্ডীর উপাখ্যান পাইয়াছি। বোধ হয় এইরূপ কোন মাল মসল্লা লইয়া মাধবাচার্য্য কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, মাধবাচার্য্যের উদ্যম মুকুন্দরাম পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের তপস্যার বলে নিজে অমরবর লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের যশ হরণ করিয়াছেন। কবি কঙ্কণের পর লালাজয়নারায়ণ আবার সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। আমরা কাণাহরিদত্ত, নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া একুনে ৩১টি মনসার গীতি-লেখক পাইয়াছি।* কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, পরে রামপ্রসাদ ও তাঁহার পরে ভারতচন্দ্র সেই উপাখ্যানটি উৎকৃষ্ট কাব্যে পরিণত করেন। ভারতচন্দ্রের পর, পাগল প্রাণারাম তাঁহার দৃঢ় যশের কেল্লা ফতে করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তিনি প্রতিমা গড়িতে পারেন নাই, ভেক গড়িয়াছিলেন।

দক্ষিণারায়ের উপাখ্যানের প্রথম কবি মাধবাচার্য্য, দ্বিতীয় কবি নিমতা-নিবাসী কৃষ্ণরাম। মৃগলব্ধ রতিদেব দ্বারা বিরচিত হওয়ার পর, পুনশ্চ রঘুরামরায় কবি সেই প্রসঙ্গে কাব্য রচনা করেন। ধর্ম্ম মঙ্গলের কবি ৩ জন পাওয়া যাইতেছে, খেলারাম, রূপরাম, ঘনরাম। অনুবাদ গ্রন্থ গুলিতে ও এইরূপ বিবিধ হস্তের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়; সঞ্জয়ের পর কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দী ও পরে কাশীদাস মহাভারতের অনুবাদ প্রণয়ন করেন। রামায়ণের কবি অসংখ্য, কিন্তু কৃত্তিবাসের আদি-গৌরব কেহই বিনষ্ট করিতে পারেন নাই। গুণরাজ খাঁর পথ অনুসরণ করিয়া মাধবাচার্য্য ও লাউরাকৃষ্ণদাস প্রভৃতি অনেককবিই ভাগবতের অনুবাদ রচনা করেন। এইরূপ সমস্ত কবির নাম উল্লেখ করিতে গেলে বঙ্গীয় প্রায় তাবত প্রাচীন

* ১। কাণা হরিদত্ত, ২। নারায়ণ দেব, ৩। বিজয় গুপ্ত, ৪। রঘুনাথ, ৫। যদুনাথ, ৬। বলরাম দাস, ৭। বৈদ্য জগন্নাথ, ৮। বংশীধন, ৯। বংশীদাস, ১০। বল্লভ ঘোষ, ১১। হৃদয়, ১২। গোবিন্দ দাস, ১৩। গোপীচন্দ্র, ১৪। জানকীনাথ, ১৫। দ্বিজবলরাম, ১৬। কেতকা দাস, ১৭। ক্ষেমানন্দ, ১৮। অনুপচন্দ্র, ১৯। রাধা কৃষ্ণ, ২০। হরিদাস, ২১। কমলনয়ন, ২২। সীতাপতি ২৩। রামনিধি, ২৪। কবিচন্দ্র পতি, ২৫। গোলকচন্দ্র, ২৬। কবিকর্ণপুর, ২৭। জানকীনাথ, ২৮। বর্দ্ধমান দাস, ২৯। ষষ্ঠীবর, ৩০। গঙ্গাদাস, ৩১। রামবিনোদ।

কবির কথাই বলিতে হয়। পরবর্ত্তী কবি প্রায় সব স্থলেই পূর্ব্ববর্ত্তী কবির রচনার খুঁৎ বাহির করিয়া কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। আমরা 'ভেলুয়া সুন্দরী' কাব্য ও কৃষ্ণরামের 'রায় মঙ্গলের' ভূমিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া উদাহরণ দেখাইতেছি;—

"পুস্তকের কথা এই কয় অবগতি।
যেরূপে রচিল এই ভেলুয়ার পুঁথি॥
আমীসুত নাম এক তজমুল আলি।
আছিল আমার জেন সবাকারে বলি॥
অল্পবুদ্ধি শিশু-মতি ছিল শিশুজ্ঞান।
না ছিল পণ্ডিত গুণী না ছিল বিদ্বান॥
লোকমুখে ভেলুয়ার গীত কথা শুনি।
রচিল পুস্তক প্রায় সেই সে কাহিনী॥
আপনার শিশুবুদ্ধি শক্তি যত ছিল।
অল্পমাত্র সেইরূপে পুস্তক রচিল॥
না ছিল পুস্তকে সেই পদের মিলন।
ভাটের কাহিনীরূপে আছিল গাঁথন॥
... ...
একদিন আছি আমি বসি নিজ স্থান।
হেনকালে বন্ধুগণ আসি বিদ্যমান॥
কহিল আমাকে সবে করিয়া মান্যতা।
ভেলুয়ার খণ্ডকাব্য রচিবার কথা॥
আদি অন্ত ভেলুয়ার যতেক কাহিনী।
বিরচিয়া কহ মিত্র আমি সব শুনি॥
গীতরূপে গায় সবে শুনিতে সুন্দর।
না হয় সংযুক্ত কথা না মিলে অক্ষর॥
আর যে রচিল খণ্ড অল্প বাক্য তার।
শাস্ত্ররূপে নাই তাতে সমস্ত প্রচার॥
... ...
অলজ্য তাসব বাক্য ধরি আমি শিরে।
'ভেলুয়া' নামেতে এই রচিল পুস্তক।"

হামিদুল্লা প্রণীত "ভেলুয়া সুন্দরী।"

"শুনহ সকল লোক অপূর্ব্ব কথন।
যেমতে হইল এই কবিতা রচন॥
খাসপুর পরগণা নাম মনোহর।
বড়িস্যা তথায় একতপ বিশ্বাম্বর॥
তথায় গেলাম ভাদ্রমাস সোমবারে।
নিশিতে শুইলাম গোয়ালের গোলাঘরে॥
রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘপীঠে আরোহণ এক মহাজন॥
করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিল মোরে দক্ষিণের রায়॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
আঠারভাটীর মধ্যে হইবে প্রচার॥
পূর্ব্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য্য।
না লাগে আমার মনে, তাহে নাহি কার্য্য॥
চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা।
সম্মান নাহিক তাহে, সাধু খেলে পাশা॥"

কৃষ্ণরাম প্রণীত 'রায় মঙ্গল।'

এই পুচ্ছগ্রাহিতা বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের সূত্র। নূতন পথ খোলার অধিকার আছে, প্রাচীনকবিগণ বোধ হয় একথা স্বীকার করিতেন না। তাই কবিগণ কল্পনার পুষ্পক রথারোহী হইয়া মেঘ হইতে নূতন নূতন ছাড়ি কি ডোনাজুলিয়া সংগ্রহ করিয়া বেড়ান নাই। ধর্ম্মের বন্ধনীর মধ্যে খোঁটাবাঁধা কল্পনা অন্য কোন দিগের পুষ্পপল্লব লক্ষ্যে ধাবিত

হইতে পারে নাই। একথা প্রশংসনীয় হউক, কিন্তু যখন বিদ্যাসুন্দরের মত কাব্যকেও বিল্বপত্র এবং তুলসীদল দ্বারা শোধন করিয়া লওয়ার চেষ্টা দেখিতে পাই, তখন ধর্ম্মের গণ্ডী অনেকদূর প্রসারিত হইয়াছিল, একথা অবশ্যই মানিতে হইবে।

বাঙ্গলা প্রাচীন কাব্যের এখনও ভালরূপ খোঁজ হয় নাই। আমরা যাঁহাদিগকে আদি কবির যশোমাল্য দিতেছি, তাঁহারই আদি কি না ঠিক বলা যায় না, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ দ্বারা এই প্রাচীন ক্ষেত্রের আবাদ হইলে তাঁহাদের চেষ্টা ও গবেষণার হলাগ্রভাগে নূতন কবির কঙ্কাল প্রকাশ পাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র হইবে না।

বড় নদীতে যে নিয়ম, ক্ষুদ্র জল-রেখায় ও তাহাই; সৌর-জগতে যে নিয়ম, গৃহশীর্ষস্থ অলাবুলতার চক্রে ও সেই নিয়ম দৃষ্ট হয়। কেবল বড় বড় কাব্যগুলিতে নহে, কাব্যের অংশগুলিতে ও সেই অনুকরণ-বৃত্তির পরিচয় লক্ষিত হয়। একটি উৎকৃষ্ট ভাব পাইয়া কবিকে প্রশংসা করার পথ নাই; কোন্ কবি সেই ভাবের আদি প্রণেতা, সে প্রশ্ন সহজে মীমাংসা হইবার নহে। আমরা প্রতি চণ্ডীকাব্যেই ফুল্লরা ও খুল্লনার 'বারমাস্যা' পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত বিজয়গুপ্তের 'পদ্মপুরাণে' পদ্মাবতীর 'বারমাস্যা' পদকল্পতরুতে বিষ্ণুপ্রিয়ার 'বারমাস্যা' (১৭৮৩ পদ), বিদ্যাসুন্দর গুলিতে বিদ্যার 'বারমাস্যা', সৈয়দ আলোয়াল কবির পদ্মাবতীতে নাগমতীর 'বারমাস্যা' এইরূপ রাশি রাশি 'বারমাস্যার' সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ঘাটে পথে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। যেখানে একটি সুন্দর ভাব পাওয়া যাইতেছে, তাহা উপর্য্যুপরি কবিগণের চেষ্টায় তন্তুসার হইয়াছে। বিদ্যাপতির,—"না পুড়িও মোর অঙ্গ না ভাসাও জলে। মরিলে রাখিও বাঁধি তমালের ডালে॥ কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে। পরাণ পায়ব হাম পিয়া দরশনে॥" এই কবিতার ভাবটি রাধামোহন ঠাকুর,—"এ সখি, কর তহুঁ পর উপকার। ইহ বৃন্দাবনে দেহ উপেখব, মৃত তনু রাখবি হামার॥ কবহুঁ শ্যাম তনু পরিমল পাওব, তবহুঁ মনোরথ পূর।" (পদ কল্পতরু ৪৬ পদ।) যদুনন্দন দাস,—"উত্তর কালে এক করিহ সহায়। এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয়॥ তমালের কাঁধে মোর ভুজ লতা দিয়া। নিশ্চয় করিয়া তুমি রাখিহ বাঁধিয়া॥ কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পুরিবেক আশ।" (পদকল্পতরু ১৮৬ পদ), নরহরি (ঘনশ্যাম),—"করিহ উত্তরকালে ক্রিয়া। রাখিহ তমালে তনু যতনে বাঁধিয়া॥ লেহ এ ললিতা মণিহার। অপুখন গলায় পরিহ আপনার॥

রূপিহু মল্লিকা নিজ করে। গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইহ তারে। তোমরা কুশলে সব রৈয়ো। এই বনে বারেক আসিতে তারে কৈয়ো। নরহরি কৈয়ো এই কাম। সে সময়ে কাণে শুনাইও তাঁর নাম।।" (সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় ভাগ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১২৯৯।) ও কৃষ্ণকমল,—"দেহ দাহন ক'র না দহন দাহে। ভাসাও না।তাহা যমুনা প্রবাহে।" (স্বপ্নবিলাস।) ইত্যাদি পদে নকল করিয়াছেন। জয়দেবের,—"হৃদি বিসলতা হারো নায়ং ভুজঙ্গম নায়কঃ।" ইত্যাদি শ্লোক হইতে বিদ্যাপতি,—'হাম নহ শঙ্কর হুঁ বরনারী।" ও রামবসু "হর নই হে আমি যুবতী। কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি।। করো না আমার দুর্গতি। বিচ্ছেদে লাবণ্য, হয়েছে বিবর্ণ। ধরেছি শঙ্করের আকৃতি।। ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ অনঙ্গ, একি রঙ্গ হে তোমার। হর ভ্রমে শরাঘাত কেন করিতেছ বার বার। ছিন্ন ভিন্ন বেশ, দেখে কণ্ড মহেশ, চেননা পুরুষ প্রকৃতি। কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পরেছি নীল রতন। অরুণ লোচন করে পতি বিরহে রোদন। এ অঙ্গ আমার, ধুলায় ধুসর। মাখি নাই বিভূতি।" (বিদ্যাপতি, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভদ্রের সংস্করণ, ১৫৫—১৫৬ পৃঃ।) গানের ভাব চুরি করিয়াছেন। অপর একটি সংস্কৃত শ্লোক হইতে কবি-শেখর, "নিজকর পল্লব দেহ না পরশই শঙ্কই পঙ্কজ ভানে। মুকুরতলে নিজ মুখ হেরি সুন্দরী শশি বলি হেরই গগনে।। (পদকল্পতরু ১৮৭১ পদ) চুরি করিয়াছেন; চোরের উপর বাটপার কৃষ্ণকমল উহা হইতে "প্যারী হেরি নিজ করে, নখর নিকরে, ভেবে শশী করে আবরণ করে" (দিব্যোন্মাদ) ইত্যাদি গানটি প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা ইংরেজীর Parallel passage অর্থাৎ সমভাব-রচনা নহে, ইহা সাহিত্যের ঘরে দিনে দুপরে ডাকাতি।

আমরা এই প্রবন্ধাংশে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি; কতগুলি ধর্ম্ম প্রসঙ্গের সীমা-বন্ধনীতে বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা আবদ্ধ ছিল। যে পর্য্যন্ত কোন এক খানা কাব্যের সম্পূর্ণ বিকাশ না হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিগণ ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করিয়া তাহা প্রস্ফুট করিয়াছেন। সম্পূর্ণ কাব্য এবং কাব্যান্তর্গত বিচ্ছিন্ন ভাবরাশি উভয়ই এইরূপ ক্রমে ক্রমে বিকাশ পাইয়াছে। কিন্তু বিকাশই সর্ব্বত্র প্রকৃতির নিয়ম নহে। উদ্যানের কতকগুলি ফুল ফোটে, আবার কোন কোনটি কোরকেই শুষ্ক হয়। সেইরূপ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান, ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি সম্পূর্ণ কাব্যগুলির পার্শ্বে সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী, ধান্যপূর্ণিমা ব্রত-গীতি প্রভৃতি অসংখ্য খণ্ডকাব্য দৃষ্ট হয়, সে গুলিতে উদগম আছে, বিকাশ নাই। আকরে খাটি স্বর্ণের পার্শ্বে, ঈষৎ স্বর্ণে পরিণত লোষ্ট্রখণ্ড যেরূপ দেখায় চণ্ডী কাব্য, পদ্মপুরাণ প্রভৃতির পার্শ্বে এইগুলি সেইরূপ দেখায়।

কাব্যগুলির সম্পর্কে এই অনুকরণবৃত্তি নিন্দনীয় কি প্রশংসনীয় ঠিক বলিতে পারি না। তবে বোধ হয় ক্রমে ক্রমে গঠিত প্রাচীন বঙ্গীয় প্রত্যেক কাব্যেই নিপুণতা ও অভিনিবেশযুক্ত সৌন্দর্য্য অধিক লক্ষিত হয়। দোষ এই, এই সব কাব্যে স্বাধীনতার বায়ু বহে নাই, কল্পনার উন্মাদকর স্বপ্ন ও তপ্তমদিরার আবেশ নাই। কাব্যগুলির পুরুষ চরিত্র প্রায় তাবতই সমাজের কঠিন নিয়মের বশবর্ত্তী, বিপদের সময় স্বীয় চেষ্টা ব্যবহারে অনিচ্ছুক—অলৌকিক দৈব শক্তির উপর অনুচিত বিশ্বাস পরায়ণ। যে জাতির শাসনে দাসত্ব, চিন্তায় দাসত্ব, সমাজে দাসত্ব, তাহাদের সাহিত্যে অন্যরূপ হইবে কেন? আমরা যাহা, তাহা ভুলিব কিরূপে? স্বপ্রকৃতি তাহা হইতে মুছিয়া ফেলিব কিরূপে?

কিন্তু সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পবাসের ন্যায় বৈষ্ণবীয় গীতি-রাশি, একটি স্বাধীন মুগ্ধকর-ভাব-জাত। সেই ভাবের নাম প্রেম। 'লম্বোদর', 'নাভী সুগভীর', ও 'আজানুলম্বিতবাহু'র ন্যায় রাশি রাশি সংস্কৃতের আবর্জ্জনা বঙ্গসাহিত্য কলুষিত করিয়াছিল। সদ্যজাতি এই ভাবটি অপ্রকৃত উপমা রাশির স্থলে "শীতের ওঢ়নীপিয়া, গিরিষীর বা। বরষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না (বিদ্যাপতি)" প্রভৃতি প্রকৃত কথা জাগাইয়া দিল। জয়দেব শ্রীহরিকে দিয়া যে দিন "দেহিপদ পল্লব মুদারং" গাওয়াইয়াছিলেন, সেদিন সমাজ-সংস্কারে প্রাণ-হারা যন্ত্র প্রায় মানুষ দাঁতে জিভ কাটিয়া একটি দৈবঘটনা দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছিল; কিন্তু জ্ঞানদাস যে দিন "নিদঁ যায় চাঁদ বদন শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা" (পদকল্পতরু ১১০০পদ)" ও কৃষ্ণকমল "অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি, আলতা পরাত বঁধু কতই বাখানি" (দিব্যোন্মাদ) রচনা করিয়াছিলেন সেদিন আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। জাতীয়-জীবনে প্রেম ফিরিয়া আসিয়াছিল; তাই বলিতেছিলাম, এই অধীনত্ব-গন্ধী প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণবীয় পদে স্বাধীনতার বায়ু খেলা করিতেছে।